সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

পঞ্চচত্বারিংশ ভাগ

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গাব্দ ১৩৪৫

কলিকাতা, ২৪৩।১, আপার সার্কুলার রোড
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির
হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত।

বিষয়-সূচী

চিত্র-সূচী

বঙ্কিমচন্দ্র

HE BENGAL AUTOTYPE CO.. CA

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৪৫শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা
১৩৪৫

প্রত্নতাত্ত্বিক বঙ্কিমচন্দ্র

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বেদান্তরত্ন

বঙ্কিমচন্দ্র নিজের সাহিত্যিক প্রচেষ্টার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "আমি 'বঙ্গদর্শনে'র দ্বারা সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা করিতাম।" তাঁহার ঐ প্রচেষ্টা যে অনেকাংশে সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছিল, এ কথা অসংকোচে বলা যায়। এ সম্পর্কে তাঁহার নিজের কথা এই :—

> যেমন কুলিমজুর পথ খুলিয়া দিলে অগম্য কানন বা প্রান্তর মধ্যে সেনাপতি সেনা লইয়া প্রবেশ করিতে পারেন, আমি সেইরূপ সাহিত্য-সেনাপতিদিগের জন্য সাহিত্যের সকল প্রদেশের পথ খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতাম।

এখানে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের বিবিধ ক্ষেত্রে নিজের 'মজুরদারি'র উল্লেখ করিলেন—ইহা বিনয়ের পরাকাষ্ঠা বটে, কিন্তু এ আত্মগ্লানি অনাবশ্যক। প্রকৃত কথা এই, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা বহুমুখী ছিল—সেই জন্য তিনি একাধারে কবি, শিল্পী, সমালোচক, সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক, ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, দার্শনিক, সামাজিক ও ধর্ম্মবেত্তা ছিলেন। অর্থাৎ তাঁহা হইতে উৎসারিত যে বিবিধ ধারা বঙ্গসাহিত্যকে সমৃদ্ধ ও শ্রীবৃদ্ধ করিয়াছিল, আমাদের আলোচ্য প্রত্নতত্ত্বধারা ঐ বিভিন্ন ধারাসমূহের অন্যতম।

নানা ভাবে প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা করা যায়—প্রাচীন মুদ্রা মূর্ত্তি পুথি পুস্তক লিপি লেখ স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের ভগ্নাবশেষ, ভূগর্ভ হইতে খনিত সৌধ শিলা সীল সজ্জা সরঞ্জাম ভূষণ বেশ অলঙ্কার প্রভৃতি উপকরণসমূহের যুগপৎ বা পৃথক্ পৃথক্ ব্যবহার দ্বারা। বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানতঃ প্রাচীন গ্রন্থাদির উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহার প্রত্নতথ্য নির্মাণ করিতেন। তাঁহার 'বিবিধ প্রবন্ধে' সংগৃহীত "দ্রৌপদী", "প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি", "আর্য্যজাতির সূক্ষ্ম-শিল্প" প্রভৃতি প্রবন্ধ ঐরূপ অনুসন্ধানের ফল এবং তাঁহার "বাঙ্গালীর বাহুবল", "ভারত-কলঙ্ক", "বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার"—বিশেষতঃ তাঁহার "বাঙ্গলার ইতিহাস", "বাঙ্গলার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা" (৭ পরিচ্ছেদ) প্রভৃতি নিবন্ধ তাঁহার ঐতিহাসিক গবেষণার জাজল্য নিদর্শন।

প্রত্নতত্ত্ব গতিশীল শাস্ত্র—দিন দিন অনুসন্ধানের ফলে নবতর উপকরণ সংগৃহীত হইতেছে এবং নূতন আলোক সম্পাতের ফলে প্রাচীন সিদ্ধান্ত সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত হইতেছে। বঙ্কিম-যুগে সারনাথ, সাঁচী, তক্ষশিলা, পাহাড়পুর প্রায় অবিজ্ঞাত ছিল—বেসনগরে খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকে বাসুদেবের উদ্দেশে গ্রীক-উপাসক 'হিলিওডোরেণ

সমর্পিতং গরুড়ধ্বজং' ভূপ্রোথিত ছিল—সুতরাং "যীশুখ্রীষ্টের অনুকরণে বাসুদেব কৃষ্ণের অবতারত্ব"—এই পাশ্চাত্ত্য উক্তির কোন চরম উত্তর ছিল না। বিশেষতঃ ঐ যুগে হারপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর খনন হইতে আবিষ্কৃত সুপ্রাচীন "সিন্ধুসভ্যতা" স্বপ্নেরও অতীত ছিল।

প্রত্নতত্ত্বের উর্বর ক্ষেত্র প্রাচ্যবিদ্যা। যাঁহারা প্রাচ্যবিদ্যার আলোচক ও গবেষক, তাঁহাদিগকে 'Orientalist' বলে। বঙ্কিম-যুগে এ দেশে বেবার, লাসেন, কোলব্রুক, গোল্ডষ্টকর, উইলসন, ম্যাক্সমুলর প্রভৃতি প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্‌গণের একাধিপত্য ছিল। তাঁহারা যে প্রভূত শ্রম ও অধ্যবসায় দ্বারা অনেক নূতন তথ্য সংগ্রহ করিয়া প্রত্নতত্ত্বালোচনার পথ সুগম করিয়া দিয়াছিলেন—ইহা অবিসংবাদিত; তবে ইহাও নিঃসংশয় যে, তাঁহারা প্রধানতঃ 'গরিমাগ্রন্থির' (superiority complex এর) ফলে অনেক সময় অপসিদ্ধান্তে উপনীত হইতেন। ঐ ওরিয়েণ্টালিষ্টদিগের প্রতি "দ্রৌপদী" প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বেশ রোষ-কটাক্ষ করিয়াছেন,—

> ইউরোপীয়েরা এ দেশীয় প্রাচীন গ্রন্থসকল কিরূপ বুঝেন, তদ্বিষয়ে আমাকে সম্প্রতি কিছু অনুসন্ধান করিতে হইয়াছিল। আমার এই বিশ্বাস হইয়াছে যে, সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ে তাঁহারা যাহা লিখিয়াছেন, তাঁহাদের কৃত বেদ, স্মৃতি, দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য প্রভৃতির অনুবাদ, টীকা, সমালোচনা পাঠ করার অপেক্ষা গুরুতর মহাপাতক সাহিত্য-জগতে আর কিছুই হইতে পারে না। আর মূর্খতা উপস্থিত করিবার এমন সহজ উপায়ও আর কিছুই নাই! এখনও অনেক বাঙ্গালী তাহা পাঠ করেন, তাঁহাদিগকে সতর্ক করিবার জন্য এ কথাটা কতক অপ্রাসঙ্গিক হইলেও আমি লিখিতে বাধ্য হইলাম।

একটা দৃষ্টান্ত দিই। সকলেই কোলব্রুকের নাম শুনিয়াছেন। অধ্যাপক গোল্ডষ্টকর ইহাকে Prince of Orientalists—'প্রাচ্যবিদ্যাবিদের অধিরাজ' বলিয়াছেন। বস্তুতঃ কোলব্রুকের মত নিপুণ গবেষক ও নৈষ্ঠিক পণ্ডিত পাশ্চাত্ত্যের মধ্যে এ পর্য্যন্ত হয় নাই। তাঁহার একটা প্রকাণ্ড ভুল দেখুন। সাংখ্যাচার্য্যেরা বলেন,—যাঁহাদের উৎকট বৈরাগ্য হইয়াছে অথচ তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয় নাই—দেহান্তে তাঁহাদের মোক্ষ হয় না—'প্রকৃতিলয়' হয়—"বৈরাগ্যাৎ প্রকৃতিলয়ঃ" (সাংখ্যকারিকা)। ঐ প্রকৃতিলয় কি, এখানে তাহার আলোচনা করিব না—গত বৈশাখের 'পরিচয়ে' সে আলোচনা করিয়াছি।

সাংখ্যকারিকার প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যের গুরুর গুরু গৌড়পাদ প্রকৃতিলয়ের অর্থ করিয়াছেন—

> মৃতঃ অষ্টাসু প্রকৃতিষু প্রধানবুদ্ধ্যহংকারতন্মাত্রেষু লীয়তে।

সকলেই জানেন, সাংখ্যমতে 'অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ'—অব্যক্ত, মহৎ, অহংকার ও পঞ্চ তন্মাত্র। যিনি প্রকৃতিলীন, তিনি ঐ অষ্ট তত্ত্বের কোন এক তত্ত্বে সুদীর্ঘ কাল বিলীন থাকেন, তদন্তে তাঁহার 'ভবপ্রত্যয়' বা পুনর্জ্জন্ম হয়। সাংখ্যমতের যাঁহারা পল্লবগ্রাহী, এ কথা তাঁহাদেরও অবিদিত নয়। কিন্তু প্রাচ্যবিদ্যাবিদের অধিরাজ কোলব্রুক কি বলিতেছেন, শুনুন,—

> Gaurapada makes the meaning of the phrase sufficiently clear; according to him it signifies the resolution of even the subtle body into its constituent elements: but this is not in this case equivalent

to liberation ; it is only the term of one series of migrations, the soul being immediately reinvested with another *person*, and commencing a new career of migratory existence until knowledge is attained.

প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান অবদান—'কৃষ্ণচরিত্র'। কৃষ্ণচরিত্র একাধারে ধর্মতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব। ধর্মতত্ত্বের কথা এখানে কিছু বলিব না, কিন্তু কি প্রকারে ও প্রণালীতে প্রত্নতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়—পাঠক যদি তাহা শিখিতে চান, তবে নিবিড় ভাবে এই 'কৃষ্ণচরিত্র' অধ্যয়ন করুন।

বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্রে' প্রথমতঃ মহাভারতের ঐতিহাসিকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন—তিনি নিপুণভাবে দেখাইয়াছেন, মহাভারত কল্পনামূলক কাব্য নয়, অনেকাংশে প্রামাণিক ইতিহাস (History)। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, যে সকল প্রাচীন গ্রন্থে কৃষ্ণের বৃত্তান্ত পাওয়া যায়, তন্মধ্যে মহাভারতই প্রাচীনতম—তাহার পর হরিবংশ ও পুরাণ (ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, পদ্মপুরাণ প্রভৃতি)। হরিবংশ মহাভারতের খিলপর্ব্ব—হরিবংশেই উল্লেখ আছে, উহা মহাভারতের পরিশিষ্টরূপে রচিত। পুরাণ কি সত্যই প্রাচীন গ্রন্থ—না, পাশ্চাত্যদিগের সিদ্ধান্তিত খ্রীষ্টপর দশম হইতে চতুর্দ্দশ শতকে সংকলিত অর্বাচীন গ্রন্থ? স্মরণ রাখিতে হয়, প্রাচীন ব্রাহ্মণে ও উপনিষদে—এমন কি, অথর্ববেদেও পুরাণের নাম পাওয়া যায়।

> ঋচঃ সামানি ছন্দাংসি পুরাণং যজুষা সহ—অথর্ববেদ, ১১।৭।২৪
>
> পুরাণং বেদঃ সোঽয়ম্ ইতি কিঞ্চিৎ পুরাণম্ আচক্ষীত—শতপথব্রাহ্মণ, ১৩।৪।৩।১৩
>
> ইতিহাসঃ পুরাণং—বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ২।৪।১০
>
> ইতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদম্—ছান্দোগ্য, ৭।১।১

'পুরাণার্থবিশারদ' মহর্ষি বেদব্যাস তদানীং প্রচলিত ঐ 'পুরাণ' আখ্যান উপাখ্যান গাথা ও কল্প সংগ্রহ করিয়া পুরাণসংহিতা নামে এক সংগ্রহগ্রন্থ সঙ্কলন করেন।

> আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈর্গাথাভিঃ কল্পশুদ্ধিভিঃ।
>
> পুরাণসংহিতাং চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ ॥—বিষ্ণুপুরাণ, ৩।৬।১৬

মহামুনি ব্যাস ঐ পুরাণসংহিতা স্বশিষ্য লোমহর্ষণকে প্রদান করেন—

> পুরাণসংহিতাং তস্মৈ দদৌ ব্যাসো মহামুনিঃ।

তৎশিষ্য কাশ্যপ, সাবর্ণি ও শাংসপায়ন সেই মূল সংহিতার উপর তিনখানি উপসংহিতা প্রস্তুত করেন।

> কাশ্যপঃ সংহিতাকর্ত্তা সাবর্ণিঃ শাংসপায়নঃ।
>
> লৌমহর্ষণিকা চান্যা তিসৃণাং মূলসংহিতা ॥—বিষ্ণুপুরাণ, ৩।৬।১৭

এই চারিখানি সংহিতাই ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত প্রভৃতি অষ্টাদশ পুরাণের ভিত্তি। এ ভাবে বেদব্যাসকে অষ্টাদশ পুরাণের বক্তা বলা অসঙ্গত নয়।

> অষ্টাদশপুরাণানাং বক্তা সত্যবতীসুতঃ।

অর্থাৎ, আদিতে পুরাণ এক ছিল, পরে অষ্টাদশ হইয়াছিল—

> পুরাণম্ একমেবাসীৎ তদা কল্পান্তরেঽনঘ।—মৎস্যপুরাণ, ৫৩।৪

প্রশ্ন উঠিবে, খ্রীষ্টপূর্ব্ব যুগে ঐ অষ্টাদশ পুরাণের অন্ততঃ কয়েকখানি বিদ্যমান ছিল কি না? নিশ্চয়ই ছিল—কারণ, আমরা দেখিতে পাই, আপস্তম্ব-ধর্ম্মসূত্রে পুরাণ হইতে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে—

অথ পুরাণে শ্লোকৌ উদাহরন্তি

অষ্টাশতসহস্রাণি যে প্রজামীষিরর্ষয়ঃ ইত্যাদি।—আপস্তম্ব, ২।২

ঐ দুই শ্লোক কিছু পরিবর্ত্তিত আকারে অধুনা-প্রচলিত বিষ্ণুপুরাণে, মৎস্যপুরাণে ও ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে পাওয়া যায়।

আপস্তম্ব-ধর্ম্মসূত্রের আর এক স্থলে নাম করিয়া ভবিষ্যপুরাণ হইতে বচন উদ্ধৃত হইয়াছে—

আভূতসংপ্লবাং তে সর্গজিতঃ পুনঃ সর্গে বীজার্থা ভবন্তি ইতি ভবিষ্যপুরাণে—আপস্তম্ব-ধর্ম্মসূত্র, ২।২৪।৫-৬

আপস্তম্ব কত দিনের লোক? প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ ব্যূলার সাহেব বলেন, আপস্তম্ব খুব সম্ভব, পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী (পাণিনি খ্রীষ্টপূর্ব্ব অষ্টম শতকে জন্মিয়াছিলেন)—অধস্তন পক্ষে তিনি খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতকের লোক।

পাণিনির কালনির্ণয় সম্বন্ধে প্রচুর মতভেদ আছে, কিন্তু তিনি যে বুদ্ধদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহা একরূপ নিঃসংশয়। কারণ, যে সময় পাণিনি সূত্র-রচনা করেন, তখনও 'নির্ব্বাণ' শব্দ মোক্ষ-অর্থে প্রচলিত হয় নাই এবং 'আরণ্যক' শব্দ দ্বারা আরণ্যক গ্রন্থ বুঝাইত না। পাণিনির সূত্র দুইটি এই :—

'অরণ্যং মনুষ্যে'—অরণ্য শব্দের উত্তর 'ষ্ণিক' প্রত্যয় দ্বারা অরণ্যবাসী মনুষ্যবাচক 'আরণ্যক' শব্দ নিষ্পন্ন হয়।

'নির্ব্বাণোঽবাতে'—নির্ব্বাণ শব্দের অর্থ নির্ব্বাত (বায়ুশূন্য স্থান)।

আর এক কথা। লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, কয়েকখানি পুরাণ নিজ নিজ সঙ্কলন-কাল স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করিয়াছে। বিষ্ণুপুরাণকার বলিতেছেন—অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎ সম্প্রতি ভারতবর্ষের সম্রাট্।

অভিমন্যোঃ উত্তরায়াং…পরীক্ষিৎ জজ্ঞে যোঽয়ং সাম্প্রতং এতৎ ভূমণ্ডলং অখণ্ডিতায়তি ধর্ম্মেণ পালয়তীতি—বিষ্ণুপুরাণ, ৪।২০।১২-৩

গরুড়পুরাণ বলেন, জনমেজয়ই বর্ত্তমান রাজা এবং তাঁহার উত্তর ভবিষ্য রাজবংশ কীর্ত্তন করেন।

সুহোত্রাণি রমিত্রশ্চ পরীক্ষিৎ অভিমন্যুজঃ।

জনমেজয়স্ত চ সুতো ভবিষ্যাংশ্চ নৃপান্ শৃণু।—গরুড়পুরাণ, ১৪৪।৪২

মৎস্যপুরাণ ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ বলেন যে, অধিসীমকৃষ্ণ (ইনি জনমেজয়ের প্রপৌত্র) 'সাম্প্রতং যো মহাযশাঃ'।

অথাশ্বমেধেন ততঃ শতানীকস্ত বীর্য্যবান্।

যজ্ঞেঽধিসীমকৃষ্ণাখ্যঃ সাম্প্রতং যো মহাযশাঃ।

তস্মিন্ শাসতি রাষ্ট্রং তু যুষ্মাভিরিদমাহৃতং।—মৎস্যপুরাণ, ৫০।৬৬-৭

ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, খ্রীষ্টজন্মের অনেক পূর্ব্ব হইতে অষ্টাদশ পুরাণের অন্ততঃ কয়েকখানি বিদ্যমান ছিল। অতএব পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ উড়াইয়া দিবার যোগ্য নয়।

তথাপি বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্রের বিবরণে প্রধানতঃ মহাভারতেরই ব্যবহার করিয়াছেন। এই মহাভারত 'শতসাহস্রী' অর্থাৎ লক্ষ শ্লোকাত্মক—উহা উগ্রশ্রবা-সৌতি-বিরচিত। সৌতি বলেন, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব (ইনি শ্রীকৃষ্ণের সমসাময়িক) চব্বিশ হাজার শ্লোকাত্মক ভারতসংহিতা নামে এক আদিগ্রন্থ রচনা করেন—

চাতুর্বিংশতিসাহস্রীং চক্রে ভারতসংহিতাম্।

ভারতসংহিতার বক্তা সঞ্জয় এবং শ্রোতা ধৃতরাষ্ট্র। উহার আরম্ভ ছিল পাণ্ডুর দিগ্‌বিজয়ে—'পাণ্ডুর্জিত্বা বহূন্ দেশান্ যুধা চ বিক্রমেণ চ' এবং অবসান ছিল ভারত-যুদ্ধের পর পাণ্ডব-বিজয়ে। সেই জন্য ভারতসংহিতার নাম ছিল 'জয়'—'ততো জয়ম্ উদীরয়েৎ।'

ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন ঐ ভারতসংহিতা সম্প্রসারণ করিয়া অর্জ্জুনপৌত্র জনমেজয়ের সর্পসত্রে পাঠ করিয়াছিলেন। ঐ সম্প্রসারিত গ্রন্থই মহাভারত। মহাভারতের বক্তা বৈশম্পায়ন এবং শ্রোতা জনমেজয়। যত দূর ধরিতে পারা যায়, বৈশম্পায়নের মহাভারতে অষ্টাদশ পর্ব্ববিভাগ ছিল না, সমগ্র গ্রন্থ এক শত পর্বাধ্যায়ে (chaptersএ) বিভক্ত ছিল।

পরে শৌনকের নৈমিষারণ্যে-অনুষ্ঠিত দ্বাদশবর্ষব্যাপী যজ্ঞে সেই মহাভারত সৌতি কর্ত্তৃক সমবেত ঋষিসভায় পঠিত হইয়াছিল। আদিম ভারতসংহিতার এই দ্বিতীয় সংস্করণই প্রচলিত মহাভারত। সৌতিই মহাভারতকে অষ্টাদশ পর্বে বিভক্ত করেন। পরবর্ত্তী কালে উহাতে যোগ-বিয়োগ হয় নাই, তা বলি না; তবে মোটের উপর প্রক্ষেপ সত্ত্বেও প্রচলিত মহাভারত সৌতি-রচিত মহাভারতই বটে।

ভারতসংহিতা সম্প্রসারিত হইয়া কবে মহাভারতে পরিণত হইয়াছিল? নিঃসংশয়ে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না। কিন্তু এ কথা ঠিক যে, খ্রীষ্টপূর্ব্ব অষ্টম শতকে পাণিনির সময় মহাভারত প্রচলিত ছিল। পাণিনিতে যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, নকুল, কুন্তী, দ্রোণ ও বাসুদেব (শ্রীকৃষ্ণ) প্রভৃতির শুধু উল্লেখ আছে, তাহা নয়—পাণিনি 'মহাভারত' শব্দ নিষ্পন্ন করিয়াছেন—

মহান্ ব্রীহ্যপরাহ্ণ-গৃষ্টীষ্বাস-জাবাল-ভার-ভারত-
হৈলিহিল-রৌরব-প্রবৃদ্ধেষু—পাণিনিসূত্র, ৬।২।৩৮

আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রেও মহাভারতের উল্লেখ আছে—

সুমন্ত-জৈমিনি-বৈশম্পায়ন-পৈল-সূত্র-ভাষ্য-ভারত-
মহাভারত-ধর্ম্মাচার্য্যাঃ যে চান্যে আচার্য্যাস্তে সর্ব্বে তৃপ্যন্তু—৩।৪

আশ্বলায়নের সময়ে সম্ভবতঃ ভারত ও মহাভারত উভয়ই বিদ্যমান ছিল। কারণ, তিনি যাঁহাদিগের তর্পণ করিতে বলিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে 'ভারত-ও-মহাভারত-ধর্ম্মাচার্য্যাঃ' রহিয়াছে। প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ ব্যুলার সাহেব বলেন, আশ্বলায়নের গৃহ্যসূত্র খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতকে রচিত। কাহারও কাহারও মতে আশ্বলায়ন বুদ্ধদেবেরও পূর্ব্ববর্ত্তী। সে যাহা

হউক, তাঁহার পূর্ব্বে ভারতসংহিতা যে মহাভারতের আকার ধারণ করিয়াছিল, ইহা নিঃসংশয়।

উপরে যে ভাবে ভারত-সংহিতা ও মহাভারতের সম্বন্ধ নির্ণয় করিলাম, বঙ্কিমচন্দ্র যে ঠিক তাহাই করিয়াছেন, তাহা নয়। তবে মোট সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাঁহার ঐ-রূপই মত।

মহাভারতের ঐতিহাসিকতা স্থাপন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে বিচার উত্থাপন করিয়াছেন। ঐ বিচারও বেশ নিপুণ বিচার। তদ্দ্বারা সিদ্ধান্তিত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ ঐতিহাসিক ব্যক্তি—কবি-ভক্ত-ভাবুকের কল্পনাপ্রসূত রূপকমাত্র নহেন।

এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, ঋগ্‌বেদসংহিতার কয়েকটি সূক্তের ঋষি একজন কৃষ্ণ। এ কৃষ্ণ বাসুদেব কৃষ্ণ কি না, নির্ণয় করা দুরূহ। তবে ছান্দোগ্য উপনিষদে যে দেবকীপুত্র কৃষ্ণের উল্লেখ আছে, আঙ্গিরস-ঘোর-ঋষি যাহাকে 'অক্ষিত' ও 'অচ্যুতে'র উপদেশ করিয়াছিলেন, তিনি খুব সম্ভব বাসুদেব কৃষ্ণ—

তদ্‌এতদ্‌ ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায় উক্ত্বা উবাচ। অপিপাস এব স বভূব।

ছান্দোগ্য হইতে প্রাচীনতর কৌষীতকী ব্রাহ্মণেও ঐ আঙ্গিরস ঘোরের ও কৃষ্ণের নামোল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ ঐ কৃষ্ণ ও ছান্দোগ্যের দেবকীপুত্র কৃষ্ণ অভিন্ন ব্যক্তি। তৈত্তিরীয়-আরণ্যকের একটি মন্ত্রেও কৃষ্ণ-শব্দ পাওয়া যায় (বঙ্কিমচন্দ্র ইহার উল্লেখ করেন নাই)—

উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেণ শতবাহুনা।

ইহার অর্থ—'শতবাহু কৃষ্ণ বরাহরূপে পৃথিবীর উদ্ধার করিয়াছিলেন' অথবা 'শতবাহু কৃষ্ণবর্ণ বরাহ কর্ত্তৃক পৃথিবী উদ্ধৃতা হইয়াছিল'—তাহা নিশ্চয় করা কঠিন। অতএব প্রমাণস্থলে ঐ মন্ত্রের মূল্য অত্যল্প।

তবে বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা প্রসঙ্গে পুরাণের একটি মূল্যবান্ উপকরণের ব্যবহার করেন নাই—সে উপকরণ পুরাণান্তর্গত 'বংশ' বা genealogy। সকলেই জানেন, পুরাণ পঞ্চলক্ষণ—সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত।

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতং চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্॥

সেই প্রাচীন যুগে চারণেরা বিখ্যাত রাজবংশের ও ঋষি-বংশের যে সকল genealogy সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন, পুরাণ-সংকলনের সময় ঐ সকল 'বংশ' তাহাতে রক্ষিত হইয়াছিল। যদুবংশের genealogy ঐরূপ 'বংশ' এবং কয়েকখানি পুরাণে ঐ বংশ-তালিকায় শ্রীকৃষ্ণের সবিশেষ উল্লেখ আছে। কৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা প্রতিপাদন পক্ষে ইহা অকাট্য প্রমাণ।

'রাধয়া মাধবো দেবঃ মাধবেনৈব রাধিকা'—কৃষ্ণলীলায় রাধার বিশিষ্ট স্থান। অথচ মহাভারত, হরিবংশ, ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ—এমন কি, ভাগবতেও রাধার নামগন্ধ নাই। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলায় শ্রীরাধা কবে প্রবেশ করিলেন ?

বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্রে'র দ্বিতীয় খণ্ডে এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছেন এবং ব্রজ-গোপীর কথা বলিতে রাসের কথা তুলিয়াছেন। হরিবংশ, ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতে রাস আছে, কিন্তু রাধা নাই, অথচ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও পদ্মপুরাণে রাধিকাই রাসেশ্বরী। পুরাণদ্বয়ের মধ্যে ব্রহ্মবৈবর্ত্তই প্রাচীনতর। ব্রহ্মবৈবর্ত্তকার শ্রীরাধাকে যে বিশিষ্ট স্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাহার পশ্চাতে নিশ্চয়ই একটা বিলম্বিত বিবর্ত্তনের দীর্ঘ ইতিহাস বিদ্যমান। বঙ্কিমচন্দ্র ঐ ইতিহাস উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেন নাই—করাও সম্ভব নয়। কিন্তু তিনি এ ক্ষেত্রে যাহা করিয়াছেন, তাহাতে প্রত্নতত্ত্বের একটা অজ্ঞাতপূর্ব অধ্যায় উদ্‌ঘাটিত হইয়া রাধার সম্পর্কে সম্পূর্ণ নূতন আলোকসম্পাত হইয়াছে।

হোরেস উইলসন (ইনি পুরাণ লইয়া অনেক আলোচনা করিয়াছিলেন) বলিতেন, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ অতি অপ্রাচীন গ্রন্থ, উহার বয়ঃক্রম মাত্র দুই তিন শত বৎসর—অতএব কৃষ্ণলীলায় রাধার যোগ নিতান্ত আধুনিক। আমরাও নির্বিবাদে ঐ মত উদরস্থ করিতাম। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথমতঃ 'কৃষ্ণচরিত্রে' ঐ মতের অসারতা প্রতিপন্ন করেন। তিনি বলেন, জয়দেব গোস্বামী একাদশ শতকের শেষ ভাগের লোক। তাঁহার 'গীতগোবিন্দে'র কথা কে না জানেন? ঐ গীতগোবিন্দের নায়ক শ্রীকৃষ্ণ আর নায়িকা শ্রীরাধা। গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকটি এই :—

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ
নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে! গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃকেলয়ঃ॥

—'রাধে! আকাশ দেখ, ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন, বনভূমি তমালদ্রুমে অন্ধকারময়। তাহাতে আবার রজনী উপস্থিত। আমার এ শিশুটি (শ্রীকৃষ্ণ) ভয়শীল—তুমিই ইহাকে সঙ্গে লইয়া গৃহে পঁহুছিয়া দাও।' নন্দের এই নিদেশে পথিস্থ কুঞ্জদ্রুমাভিমুখে চলিত রাধা-মাধবের যমুনাকূলে অনুষ্ঠিত বিজনকেলিসমূহ জয়যুক্ত হউক।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, যে সময় গীতগোবিন্দ রচিত হয়, সে সময় ঐ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রচলিত ও অতিশয় সম্মানিত না থাকিলে, গীতগোবিন্দ লিখিত হইত না এবং বর্ত্তমান ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণের অন্তর্গত শ্রীকৃষ্ণ-জন্মখণ্ডের পঞ্চদশ অধ্যায় তখন সুবিজ্ঞাত না থাকিলে, গীতগোবিন্দের 'মেঘৈর্মেদুরম্' ইত্যাদি প্রথম শ্লোক কখনও রচিত হইত না। এ কথার তাৎপর্য্য কি?

পাঠক লক্ষ্য করিবেন, গীতগোবিন্দের ঐ প্রথম শ্লোকের ভাবার্থ বেশ অস্পষ্ট—টীকাকার, কি অনুবাদকার, কেহই উহা বিশদ করিয়া বুঝাইতে পারেন নাই। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের উক্ত পঞ্চদশ অধ্যায়ের প্রতি দৃষ্টি করিলে জয়দেবের ঐ 'মেঘৈর্মেদুরম্' শ্লোকের ভাবার্থ বেশ বিস্পষ্ট হয়। কিরূপে?

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত বলেন, একদা নন্দ, শিশু কৃষ্ণকে সঙ্গে করিয়া বৃন্দাবনের ভাণ্ডীরবনে গোচারণ করিতেছিলেন—

একদা কৃষ্ণসহিতো নন্দো বৃন্দাবনং যযৌ।
তত্রোপবনভাণ্ডীরে চারয়ামাস গো-কুলম্॥—শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড, ১৫।১

ইতিমধ্যে মায়া-শিশু শ্রীকৃষ্ণ মায়া দ্বারা আকাশকে মেঘাচ্ছন্ন করিলেন—

চকার মায়য়াকস্মাৎ মেঘাচ্ছন্নং নভো মুনে !

সেই মেঘাবৃত গগন ও শ্যামল কানন দেখিয়া বজ্রাঘাত ও ঝঞ্ঝাবাতের শব্দে নন্দ ভীত হইলেন—নন্দো ভয়মবাপ হ।

মেঘাবৃতং নভো দৃষ্ট্বা শ্যামলং কাননান্তরং।

ঝঞ্ঝাবাতং মেঘশব্দং বজ্রশব্দংচ দারুণম্॥ ১৫।৪

নন্দ বলিতে লাগিলেন—'কি করি, কোথা যাই—ভবিতা বালকস্য কিম্? শিশুর কি উপায় হয়?' এদিকে শ্রীকৃষ্ণ যেন ভয়ে ভীত হইয়াই পিতার কণ্ঠ ধরিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

মায়াভিয়া ভয়েভ্যশ্চ পিতুঃ কণ্ঠং দধার সঃ।

এমন সময় শ্রীরাধা (তিনি তখন পূর্ণ কিশোরী) শ্রীকৃষ্ণের সমীপে উপনীত।

এতস্মিন্ অন্তরে রাধা জগাম কৃষ্ণসন্নিধিম্।

নন্দ, রাধিকার রূপলাবণ্যে বিস্মিত হইয়া সাশ্রুনেত্রে ভক্তিভরে বলিলেন—'আমি ঋষিমুখে শুনিয়াছি, তুমি পরাপ্রকৃতি—কমলার অপেক্ষাও হরি-প্রিয়া।'

জানামি ত্বাং গর্গমুখাৎ পদ্মাধিকপ্রিয়াং হরেঃ।

পরাং নির্গুণমচ্যুতাম্ + +॥

—'হে ভদ্রে! এই তোমার প্রাণনাথকে গ্রহণ কর—যথাসুখে বিচরণ কর—পরে মনোরথ পূর্ণান্তে আমার পুত্র আমাকে দিও'—

গৃহাণ প্রাণনাথঞ্চ গচ্ছ ভদ্রে! যথাসুখং।

পশ্চাৎ দাস্যসি মৎপুত্রং কৃত্বা পূর্ণং মনোরথম্॥ ১৫।১৫

রাধা মধুর হাস্য করিয়া বালককে গ্রহণ করিলেন—

জগ্রাহ বালকং রাধা জহাস মধুরং সুখাৎ।

এবং কৃষ্ণকে সানন্দে বক্ষে ধারণ করিয়া যথেপ্সিত দূরদেশে গমন করিলেন—

এবমুক্ত্বাতু সানন্দং কৃত্বা কৃষ্ণং স্ববক্ষসি।

গত্বাদূরে তং নিনায় বাহুভ্যাং চ যথেপ্সিতম্॥ ১৫।২৫

স্মৃতিমাত্রে সেই বিচিত্র কাননে অপূর্ব্ব রাসমণ্ডলের আবির্ভাব হইল—রাধা বিস্মিত নেত্রে দেখিলেন—সেখানে পীতাম্বর বনমালী মদনমোহন কিশোর শ্রীকৃষ্ণ বিরাজিত রহিয়াছেন—

পুরুষং কমনীয়ঞ্চ কিশোরং শ্যামসুন্দরং।

কোটিকন্দর্পলীলাভং চন্দনেন বিভূষিতম্॥

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! সেই ক্রোড়স্থ শিশু অন্তর্ধান করিয়াছেন—তাঁহার স্থলে নবযুবা শ্যামসুন্দর!

ক্রোড়ং বালকশূন্যঞ্চ দৃষ্ট্বা তং নবযৌবনং।

সর্ব্বস্মৃতিস্বরূপা সা তথাপি বিস্ময়ং যযৌ॥ ১৫।৩৫

রাধিকা অনিমেষ নয়নে সেই রূপসুধা পান করিতে লাগিলেন—তাঁহার চিত্ত লালসায় পূর্ণ হইল—তিনি 'মদনাতুরা' হইলেন—

নিমেষরহিতা রাধা নবসঙ্গমলালসা।
পুলকাঙ্কিতসর্ব্বাঙ্গী সস্মিতা মদনাতুরা ॥

ইহার পর 'রহঃকেলয়ঃ' যেমন হওয়া উচিত, সম্পন্ন হইল—কোনরূপ অঙ্গহানি হইল না—

পুনস্তাঞ্চ সমাকৃষ্য সস্মিতাং বক্রলোচনাং।
ক্ষতবিক্ষতসর্ব্বাঙ্গাং নখদন্তৈশ্চকার হ ॥

রতিরণের পর রাধিকা যেমন শ্রীকৃষ্ণের বেশবিন্যাস করিতে গেলেন—কি আশ্চর্য্য! অমনি শ্রীকৃষ্ণ কিশোর রূপ পরিহার করিয়া পূর্ব্ববৎ শিশুরূপ পরিগ্রহ করিলেন! রাধা কি করেন? ত্বরায় বৃন্দাবন হইতে বহির্গত হইয়া মেঘজলের মধ্যে আর্দ্র বসনে রোরুদ্যমান শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে লইয়া নন্দ-গৃহে উপনীত হইলেন এবং যশোদাকে পুত্র প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলেন—

গৃহাণ বালকং ভদ্রে স্তনং দত্ত্বা প্রবোধয়।

যশোদা তাহাই করিলেন—

যশোদা বালকং নীত্বা চুচুম্ব চ স্তনং দদৌ।

ইহাই ব্রহ্মবৈবর্ত্তের বিবরণ—জয়দেবের 'মেঘৈর্মেদুরম্' শ্লোক যে, এই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, এ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে কি?

বঙ্কিমচন্দ্র ঠিকই বলিয়াছেন—বর্ত্তমান আকারেও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ জয়দেবের পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের পূর্ব্বগামী।

বঙ্কিমচন্দ্র ইহাও দেখাইয়াছেন যে, পঞ্চম শতকে রচিত কালিদাসের 'মেঘদূতে'ও বর্হাপীড়াভিরাম গোপবেশ বিষ্ণুর উল্লেখ আছে—

বর্হেণেব স্ফুরিতরুচিণা গোপবেশস্য বিষ্ণোঃ

কিন্তু শ্রীরাধা যে তাঁহার বামে, তাহার নিশ্চয়তা কি?

অনেক দিন অবধি ইহাই পর্য্যন্ত ছিল। ঘটনাক্রমে কয়েক বৎসর হইল 'হালসপ্তশতী' নামক প্রাকৃত শ্লোকসংগ্রহগ্রন্থ আবিষ্কৃত হয়। ঐ গ্রন্থে রাধিকার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। প্রাকৃত শ্লোকটি এই :—

মুখমারুতেণ তং কহ্ন! গোরঅং রাহিআএ অবণোন্তো
এতাণং বল্লবীণং অন্নাণং বি গোরবং হরসি ॥ ১৮৯

ইহার সংস্কৃত রূপ এই :—

মুখমারুতেন ত্বং কৃষ্ণ! গোরজো রাধিকায়া অপনয়ন্।
এতাসাং বল্লবীনাম্ অন্যাসামপি গৌরবং হরসি ॥

—'রাধিকার মুখসক্ত গোধূলি মুখমারুতে অপনোদন করিয়া হে কৃষ্ণ! তুমি অন্য গোপিকাদিগের গৌরব হরণ করিতেছ।'

হাল কত দিনের লোক? এ বিষয় লইয়া মতভেদ আছে। অধ্যাপক সেনা (Senart) বলেন, হাল খ্রীষ্টপর তৃতীয় শতকের লোক। অপরে বলেন, তিনি প্রথম শতাব্দীর লোক। যাহাই হউক, হালের সংগৃহীত এই প্রাকৃত শ্লোক নিশ্চয়ই তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী। অতএব কৃষ্ণলীলায় রাধার যোগ কোন মতেই অর্ব্বাচীন নহে। এইরূপে বঙ্কিমচন্দ্রের সিদ্ধান্ত কালসহকারে দুর্ব্বল না হইয়া দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে।

প্রত্নতত্ত্ব-ক্ষেত্রে ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ অবদান। তিনি কত বড় প্রত্নতাত্ত্বিক ছিলেন--কিরূপ নিপুণ গবেষক ও সূক্ষ্ম বিচারক ছিলেন—এই রাধাতত্ত্বের আলোচনাই তাহার চরম নিদর্শন।

"কলিকাতা" নামের ব্যুৎপত্তি

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম্-এ, ডি-লিট্

কলিকাতা-নগরী অধিবাসি-সংখ্যায় এবং অন্য বহু কারণে ভারতবর্ষের বৃহত্তম ও সর্বপ্রধান নগরী। সমগ্র ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যে, লণ্ডনের পরেই কলিকাতার স্থান। "কলিকাতা" এই নামটী, ইহার ইংরেজী উচ্চারণ "ক্যাল্‌কাটা" ও বানান Calcutta রূপে (জরমানেরা এই নাম লেখে Kalkutta রূপে ও উচ্চারণ করে "কাল্‌কুতা" বা "কালকুটা," এবং ইউরোপের বহু জাতি Calcutta বা Kalkutta লেখে ও "কাল্‌কুতা" উচ্চারণ করে), এখন পৃথিবীর সর্বত্র সুপরিচিত। আমরা সকলেই জানি, কলিকাতা শহর খুব প্রাচীন স্থান নহে। অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ ও উনবিংশ শতকের প্রারম্ভ হইতে কলিকাতার গৌরবের পত্তন। ইহার কয়েক শতক পূর্বে কলিকাতার কোনও বিশেষ পরিচয় নাই। তবে অনুমান হয়, অন্ততঃ খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগ হইতে, একটী বড় বা সমৃদ্ধ স্থান হিসাবে কলিকাতার নাম অন্ততঃ দক্ষিণ-বঙ্গে সুপরিচিত হইয়াছিল, এবং ষোড়শ শতকে ইহার নাম বাঙ্গালার বাহিরেও পঁহুছাইয়াছিল। সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে বাণিজ্য-কেন্দ্র হিসাবে কলিকাতা বিখ্যাত স্থান হইয়া দাঁড়ায়।

দেড় শত বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া ভারতে ব্রিটিশ-রাজ্যের রাজধানী হইবার গৌরব ছিল যে নগরীর, সেই কলিকাতা-নগরীর নামের ব্যুৎপত্তি এখনও নির্ধারিত হইল না, ইহা বড় আশ্চর্যের বিষয়। সাধু বা পুরাতন বাঙ্গালার রূপ "কলিকাতা," কলিকাতা-অঞ্চলে ও পশ্চিম-বঙ্গে প্রচলিত কথিত বাঙ্গালার (চলিত-ভাষার) রূপ "ক'ল্‌কাতা, ক'ল্‌কেতা (কোল্‌কাতা, কোল্‌কেতা)," পূর্ব-বঙ্গে প্রচলিত কথিত বাঙ্গালার রূপ "কইল্‌কাতা, কইল্‌কাত্তা," উড়িয়া ভাষার রূপ "কলিকতা," পশ্চিমের হিন্দুস্থানীর রূপ "কল্‌কতা" বা "কল্‌কত্তা," এবং সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে প্রথম ইংরেজীতে Hedges হেজেস্ কর্তৃক লিখিত Calcutta, অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে ওলন্দাজ-লেখক Valentijn ভ্যালেনটাইন কর্তৃক লিখিত Collecatte, ও ঐ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ফরাসীদিগকর্তৃক লিখিত Colicotta ও Calecuta—এইগুলি লইয়া, এই শব্দের ব্যুৎপত্তি বিষয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা চলিয়াছে। নিম্নে সংক্ষেপে প্রচলিত ব্যুৎপত্তিগুলির উল্লেখ করা যাইতেছে।

[১] "কালীঘাট" শব্দের বিকারে "কলিকাতা" শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। এই মতটীতে অনেকেই বিশ্বাস করেন। কিন্তু এই মত একেবারেই গ্রহণযোগ্য নহে—প্রাচীন বইয়ে "কলিকাতা" ও "কালীঘাট" দুইটী বিভিন্ন স্থান বলিয়া উল্লিখিত; এবং "কালীঘাট" শব্দ ভাষায় এখন বিদ্যমান আছে, হঠাৎ "কলিকাতা" এই বিকৃত রূপ, সুপরিচিত অর্থ-যুক্ত মূল শব্দটীর পাশে গড়িয়া উঠিবার কোনও কারণ নাই।

[২] এক ইংরেজ সাহেব এই অঞ্চলে প্রথম যখন আসেন, তখন কলিকাতা-অঞ্চলে লোকের বসতি বেশী ছিল না। সাহেবের ঐ স্থানের নাম জানিবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু তখন স্থানটীর কোনও নাম ছিল না। সাহেব দেখিলেন, এক জন ঘাসিয়াড়া ঘাস কাটিতেছে। জমীর দিকে হাত দেখাইয়া হিন্দুস্থানীতে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন (সাহেব হইলেই প্রথম হিন্দুস্থানীতে কথা বলিবেন !), এ জায়গার নাম কি ? ঘাসিয়াড়া কখনও সাহেব দেখে নাই, সে তাঁহার কথা বুঝিতে পারিল না, ভাবিল, সাহেব তাহার কাটা ঘাসের স্তূপের দিকে দেখাইয়া বোধ হয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন এই ঘাস সে কবে কাটিয়াছে। তাই সে হিন্দুস্থানীতে বলিল, "হুজুর, কল্ (কাল) কাটা।" সাহেব তাহাতে বুঝিলেন, স্থানটীর নাম "কাল্‌কাটা", তাহা হইতে "ক্যালকাটা" Calcutta ও পরে বাঙ্গালায় "কলিকাতা" বিখ্যাত হইয়া উঠিল। বাল্যকালে ইস্কুলে পড়িবার সময়ে এই রূপ গল্প করিয়া আমরা আমোদ করিতাম। কলিকাতা-শব্দের এই ব্যুৎপত্তিকে অবশ্য বিচারের যোগ্য বলিয়া কেহ মনে করিবেন না। কিন্তু অন্ততঃ আর একটী দেশের নামের সম্বন্ধে অনুরূপ উপাখ্যান আছে। মধ্য-আমেরিকার Guatemala "গুআতেমালা" বা "উআতেমালা" দেশের নামের সম্বন্ধে একটী ঐতিহ্য আছে যে, স্পেনীয়েরা যখন জাহাজে করিয়া গিয়া, ঐ দেশে প্রথম পদার্পণ করে, তখন ঐ দেশের কতকগুলি লোক সমুদ্রের তীরে অদ্ভুত আকারের ও অদ্ভুত বেশের এই বিদেশীদের আগমন ভীত-চকিত হইয়া দেখিতেছিল। স্পেনীয় নায়ক জাহাজ হইতে স্থলে নামিয়া, মাটির দিকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এই দেশের নাম কি ? স্থানীয় লোকেরা ভাবিল, সমুদ্রকূলে মাটির উপরে যে এক প্রকার মোটা-মোটা ঘাস জন্মিয়াছিল, বিদেশী বোধ হয়, সেই ঘাসকে তাহারা কি বলে, তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। তাই তাহারা নিজেদের ভাষায় ঐ ঘাসের নাম করিল "উআতে মালা" বা 'মোটা ঘাস'। স্পেনীয় নায়ক স্থানীয় ভাষা জানিতেন না, তিনি ভাবিলেন, উহাই বুঝি দেশের নাম,—স্পেনীয় বানানে লিখিলেন, Guatemala, এবং তাহাই দেশের নাম দাঁড়াইয়া গেল (এবং ভারতবর্ষীয় পণ্ডিত ইহা অনুমান করিয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন, Guatemala সংস্কৃত "গৌতমালয়" হইতে হইয়াছে, আমেরিকায় প্রাচীন কালে হিন্দু বা বৌদ্ধ সংস্কৃতি প্রচারের এক অকাট্য যুক্তি এই Guatemala বা "গৌতমালয়" নামের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে !) ।

[৩] সুখে কাল কাটানো যায় বলিয়া এই শহরের নাম "কালকাটা" Calcutta, পরে ইহার বাঙ্গালা বিকৃতি "কলিকাতা"। এই ব্যুৎপত্তিও ইস্কুলের ছেলেদের উপযোগী।

[৪] "কালীক্ষেত্র" হইতে "কলিকাতা"। "কলিকাতা" নামটী কখনও-কখনও সংস্কৃত পুস্তকাদিতে "কালীক্ষেত্র" রূপে রূপান্তরিত হয়, কেহ-কেহ তদ্দৃষ্টে মনে করেন, "কালীক্ষেত্র"-ই আদি নাম। বস্তুতঃ তাহা নহে।

[৫] "কিলকিলা" এই রূপে "কলিকাতা" নামের আর একটী সংস্কৃতীকরণ শুনিয়াছি—পশ্চিমের পণ্ডিতদের মুখে। ইহা একটী প্রাচীন রূপ বলিয়া কোনও বইয়েও ইহার উল্লেখ দেখিয়াছি। বলা বাহুল্য, এই নামের সহিত "কলিকাতা" নামের কোনও ব্যুৎপত্তিগত যোগ নাই।

[৬] Hobson-Jobson অভিধানে, Yule ইউল্ ও Burnell ব্যর্নেল্ সাহেবদ্বয় দেখাইয়াছেন, "কলিকাতা" নামের সহিত হুগলী Golgot বা Golghat "গোলঘাট"-এর গোলমাল ঘটায়, ফরাসী লেখকদের হাতে "কলিকাতা" Golgota, Golgouthe, Golgotha রূপে পরিবর্তিত হয়। Golgotha যীশু-খ্রীষ্টের জীবনীতে উল্লিখিত যেরূশালেমের নিকটবর্তী একটী স্থান, যেখানে যীশুকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া হত্যা করা হয়। Golgotha শব্দটী ইহুদী ভাষায় 'মাথার খুলি' অর্থে gulgoleth শব্দের গ্রীক রূপ, এই শব্দ লাটিনে Calvaria রূপে অনূদিত হয়, তাহা হইতে ইংরেজী Calvary. ইউরোপীয়দের পক্ষে কলিকাতার আবহাওয়া এক সময়ে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর ছিল বলিয়া, অনেক ইউরোপীয়ের মনে সপ্তদশ শতকের শেষে ও অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে এই নামের ('মাথার খুলির বা নরকপালের স্থান') একটা সার্থকতা ছিল।

কালীঘাটের বিকারে কলিকাতা—অথবা কালীঘাটের কালীর সঙ্গে যোগের দরুন কলিকাতা—এই মতটাই এতাবৎ বেশীর ভাগ লোকের মনঃপূত।

"কলিকাতা" নামটীর ইতিহাস, পুরাতন পুস্তক ও কাগজ-পত্রে ইহার অবস্থান লইয়া বিচার করা যাউক।

[১] কলিকাতার সর্বপ্রাচীন উল্লেখ পাওয়া যায়, বিপ্রদাস-কৃত মনসামঙ্গল কাব্যে। এই পুস্তক খ্রীষ্টীয় ১৪৯৫ সালে (১৪১৭ শাকে) রচিত হয়। (বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য, শ্রীযুক্ত সুকুমার সেনের প্রবন্ধ, 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃষ্ঠ ৬৪-৭৩)। বিপ্রদাস সম্ভবতঃ কলিকাতার নিকটবর্তী বাদুড়িয়া-বটগ্রামে বাস করিতেন। চাঁদ সদাগরের সিংহল-যাত্রা প্রসঙ্গে কলিকাতার উল্লেখ আছে (সুকুমার সেনের প্রবন্ধ, পৃঃ ৭০)। কলিকাতার পাশ দিয়া গিয়া, হাওড়া-শিবপুরে বেতড় নামক স্থানে বেতাই-চণ্ডীর পূজা করিয়া, ধনও (?) বাহিয়া, চাঁদ সদাগর কালীঘাটে গিয়া কালিকার পূজা করেন।

১৪৯৫-এর লেখা বইয়ের প্রমাণে, কলিকাতা ও কালীঘাট দুইটী পৃথক্ স্থান। কালীঘাটের বিকারে কলিকাতা—আধুনিক বাঙ্গালায় এই রূপ ধ্বনি-পরিবর্তন, এবং প্রাচীন ও নবীন দুই রূপের এভাবে পাশাপাশি অবস্থান—ইহা অসম্ভব।

[২] কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যে (খ্রীষ্টাব্দ ১৫৮০-১৫৮৫ ?) কলিকাতা ও কালীঘাটের পৃথক্-পৃথক্ উল্লেখ আছে। এই উল্লেখ সুপরিচিত।

[৩] ইহার পরে কলিকাতার উল্লেখ পাওয়া যায় আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে—আনুমানিক ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দ। Hobson-Jobson-এ আইন-ই-আকবরীর প্রমাণ উদ্ধৃত আছে। Blochmann ব্লখ্মান্ সাহেবের সম্পাদিত মূল ফারসী আইন-ই-আকবরীতে Klkt' (Kalkatā, বা Kalikatā) রূপে নামটী পাওয়া যায়; আবার এই বইয়ের বিভিন্ন হস্তলিখিত পুঁথিতে পাঠান্তর আছে—Kln'="কল্না", Klt'="কল্তা", Tlp' "তল্পা"। "কল্কতা" ও "তল্পা" এই দুই পাঠভেদ, সর্বপ্রাচীন দুইখানি পুঁথিতে পাওয়া যায়। "কল্কতা, Bkw' বকোয়া ও B'rbkpwr বারবকপুর", এই তিনটী

মহাল সাতগাঁ সরকারের অধীনে ছিল। Bkw' "বকোয়া" এই নামটার আর তিনটী পাঠভেদ আছে—Mkwm' "মকোমা" বা "মকুমা", Pkwm' "পকোমা" বা "পকুমা", এবং Kw' "কুআ" বা "কোআ"। কোন্‌টা ঠিক পাঠ, তাহা জানা যায় না। তবে ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে আইন-ই-আকবরীর সময়ে কলিকাতা যে একটী লক্ষণীয় স্থান ছিল, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে—১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই ইহা ভাগীরথীর তীরে উল্লেখযোগ্য গ্রাম বা ব্যবসায়কেন্দ্র-রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

কলিকাতা-শহরের মধ্যে প্রাপ্ত প্রাচীনতম দলিল হইতেছে একখানি পাথুরে' দলিল। বহু কাল হইল, কলিকাতার অধিবাসী বিখ্যাত আরমানী ইতিহাসবিৎ শ্রীযুক্ত Mesrobv J. Seth মেস্‌রোভ সেথ্‌ মহাশয়, কলিকাতার আরমানী গির্জার সংযুক্ত গোরস্থানে প্রাচীন আরমানী সমাধিফলকগুলির মধ্যে একখানিতে নিম্নপ্রমাণে লিপি পাঠ করেন—'এই সমাধি-ফলক হইতেছে, দানশীল বণিক্ Sukias স্থকিয়াস্‌-এর পত্নী Rezabeebeh রেজা-বীবা-র।' ইহাতে আরমানী সন-তারিখ দেওয়া হইয়াছে, হিসাব করিয়া খ্রীষ্টান বা ইংরেজী শকের ১৬৩২ অব্দ হয়। বণিক্ স্থকিয়াস্ পারস্য-দেশ হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া-ছিলেন, ইস্‌পহান্‌-এর নিকটে Julfa জুলফা নগরে তাঁহার নিবাস ছিল। (জুলফা এখনও পারস্য-দেশে উপনিবিষ্ট আরমানীদের একটী প্রধান কেন্দ্র)। এই লেখ হইতে জানা যায় যে, ১৬৩০ সালের দিকে, সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের রাজত্বশেষে ও শাহ্‌জাহানের রাজত্বের প্রারম্ভে, কলিকাতায় আরমানী বণিক্‌দের একটী কেন্দ্র ছিল, এবং এই কেন্দ্রে ইহারা স্ত্রী পুত্র পরিবার আনিয়া বাস করিতেন। ইংরেজ Job Charnock যোব চার্নক ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় আসিয়া বাস করিবার প্রায় ৬০ বৎসর আগে—দুই পুরুষ আগে—আরমানীরা কলিকাতায় উপনিবিষ্ট হইয়াছিল। আরমানীদের পরে আসে পোর্তুগীসেরা, ও তৎপরে ইংরেজেরা। ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দের দিকে, আরমানী, পোর্তুগীস ও ইংরেজ, এই তিন জাতীয় খ্রীষ্টান বণিক্‌গণ কলিকাতায় পাশাপাশি বাস করিয়া কলিকাতার বাণিজ্য-সম্পদে অংশীদার হইত। তখন অবশ্য কলিকাতা ইংরেজদের হাতে চলিয়া গিয়াছিল। বাঙ্গালা-দেশের অন্তর্বাণিজ্যে ও বহির্বাণিজ্যে ইংরেজেরা দিল্লী হইতে ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে কতকগুলি বিশেষ অধিকার লাভ করায়, এবং ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা ইংরেজদের পূরা অধিকারে আসার ফলে, আরমানী ও পোর্তুগীসদের প্রতিপত্তি বাঙ্গালা-দেশের বাণিজ্যে ও কলিকাতায় ক্ষুণ্ণ হইতে থাকে।

১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজেরা বড়িষার সাবর্ণচৌধুরী-বংশীয় জমীদারগণের নিকট হইতে সুতানুটী, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর এই তিনটী গ্রাম (ভাগীরথীর পূর্ব তীরে, উত্তর হইতে দক্ষিণে পাশাপাশি অবস্থিত) ক্রয় করে। এবং কলিকাতায় তাহাদের কুঠী নির্ম্মাণ করে। ইহাই হইল কলিকাতার ভবিষ্যৎ গৌরবের সূত্রপাত।

"সুতানুটী" গ্রাম—এখনকার চিৎপুর অঞ্চল লইয়া—মোটামুটি ভাবে, উত্তরে কাশীপুর বাগবাজারের খাল হইতে দক্ষিণে নিমতলাঘাট, জোড়াবাগান, বীডন ষ্ট্রীট পর্যন্ত লইয়া "সুতানুটী" গ্রাম ছিল। সুতানুটীর দক্ষিণে কলিকাতা—মোটামুটি এখনকার ধর্মতলা ষ্ট্রীট

পর্যন্ত কলিকাতা গ্রাম ছিল, এখনকার বহুবাজার ষ্ট্রীট এই কলিকাতা-গ্রামের কেন্দ্রস্থল ছিল। গোবিন্দপুর গ্রাম আদিগঙ্গার ধারে, এখনকার গড়ের মাঠের ও ফোর্ট উইলিয়াম গড়ের কতক অংশ লইয়া ছিল।

"সুতানুটী" নাম সম্বন্ধে কোনও গোলমাল নাই। বেশ বুঝিতে পারা যায়, সুতানুটীতে সুতার হাট বা বাজার বসিত—সুতার নুটী, অর্থাৎ জড়াইয়া গোলাকার তাল বা পিণ্ড করিয়া রাখা সুতা, বহুল পরিমাণে বিক্রয় হইত বলিয়া ঐ নাম। হয়তো ঐ অঞ্চলের আদি নাম ছিল "চিৎপুর", পরে চিৎপুরের অন্তর্গত বা সন্নিকটে যে 'সুতার নুটীর হাট' বসিত, তাহাই "সুতানুটীর হাট" বা "সুতানুটী-হাট" রূপে পরিচিত হয়, ও শেষে সংক্ষেপে হাট ও হাটের সংশ্লিষ্ট স্থানেরই নাম দাঁড়ায় "সুতানুটী"। এই "সুতানুটী" নামেরই অনুরূপ "কলিকাতা" নাম।

"কলিকাতা"—একটী খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ। ইহার অর্থ, "কলি" বা কলিচুনের জন্য "কাতা" বা শামুক পোড়া। সুতার নুটী বা গোলার হাট বা আড়ত হইতে যেমন "সুতানুটী" নাম, তেমনি কলির বা চুনের ও কলিচুনের জন্য শামুকের আড়ত, এবং চুনের কারখানা হইতে "কলি-কাতা" নাম। পাথরিয়া চুন দক্ষিণ-বঙ্গে হয় না, এ অঞ্চলে শামুক ও ঝিনুক পোড়াইয়াই চুন প্রস্তুত হয়। এই চুন দেওয়ালে চুনকাম করিবার বা 'কলি ফিরাইবার' জন্যই প্রশস্ত, সেই জন্য ইহাকে কলিচুন বলে। শামুক-পোড়ানো চুন জৈব পদার্থের বিকার বলিয়া, নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণেতর অন্য ঘরের নিষ্ঠাবতী বিধবারা ঐ চুন দিয়া পান খাইতেন না। পাথরিয়া চুন এ অঞ্চলে সুলভ হওয়ার পূর্বে, ঐ কারণে পান খাওয়াই সদাচার-পালনের বিরুদ্ধ হইয়া দাঁড়াইত।

"কলি"-শব্দ বাঙ্গালায় সুপরিচিত। "কাতা" শব্দ চুন অর্থে কলিকাতা অঞ্চলে ব্যবহৃত হইত, প্রাচীনদের মুখে শুনিয়াছি। (এই শব্দ, খয়ের বা খদির অর্থে, "ক্বাথ"-শব্দ-জাত যে "কত্থা" বা "কাথা" শব্দ হিন্দুস্থানীতে ও অন্য পশ্চিমা ভাষায় ব্যবহৃত হয়, তাহা হইতে ভিন্ন)। উত্তর-বঙ্গে, রাজশাহী জিলায়, শামুক পোড়াইয়া, তাহাতে জল দিয়া চুনে রূপান্তরিত করিবার পূর্বে, পোড়ানো শামুক বা জোঙ্গড়াকে "কাতা" বলে। পোড়ানো শামুক বা জোঙ্গড়াকে বাঙ্গালা-দেশে কোনও-কোনও অঞ্চলে "বাখারী"ও বলে।

কলিকাতা-গ্রামে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত চুন প্রস্তুত হইত, তাহার নিদর্শন আছে। এখনকার বহুবাজার ষ্ট্রীট (অষ্টাদশ শতকে এই রাস্তা 'বৈঠকখানা ষ্ট্রীট' নামেও পরিচিত ছিল) খাস কলিকাতা-গ্রাম বা নগরের একটী প্রধান রাস্তা—পূর্ব হইতে পশ্চিমে শহরের মেরুদণ্ড-স্বরূপ ছিল। এই রাস্তার উত্তর ধারে যে এক সময়ে চুনের কাজ হইত, কতকগুলি রাস্তা ও পল্লীর নামে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। বহুবাজার ষ্ট্রীটের উত্তরে "চুনাগলি" পল্লী, মেটে বা কালো ফিরাঙ্গীদের (অর্থাৎ পোর্তুগীস ও অন্য ইউরোপীয়দের সহিত মিশ্রিত দেশীয় খ্রীষ্টানদের) বাসস্থান বলিয়া এক সময়ে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এখন যেখান দিয়া নূতন রাস্তা "চিত্তরঞ্জন আভেনিউ" গিয়াছে, বহুবাজারের উত্তরে সেই অঞ্চলে, অর্থাৎ চিৎপুর ও ছাতাওয়ালা গলীর পূর্বে এবং আধুনিক কলেজ

ষ্ট্রীট-এর পশ্চিমে মাঝামাঝি একটী স্থানে "চুনারীতলা" (Chunarytollah) নামে একটী পল্লীর উল্লেখ, অষ্টাদশ শতকের কলিকাতার পুরাতন নক্‌শা ও কাগজ-পত্রে পাওয়া যায়। এই "চুনারীতলা"-তে "চুনারী" বা চুনের কাজ করিত, এমন লোকেরা বাস করিত। এখন যেমন "শাঁখারীটোলা"-তে এক ঘরও শাঁখারী নাই, তেমনি "চুনারীতলা" হইতে চুনারীদের অস্তিত্ব অনেক কাল হইল লোপ পাইয়াছিল, কিন্তু অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগেও তাহাদের অধ্যুষিত পল্লীর নাম তাহাদের স্মৃতি বহন করিয়া বিদ্যমান ছিল, এবং "চুনাগলি"র রাস্তা ও পল্লীর নামে এখনও তাহাদের ব্যবসায়ের স্মৃতি জড়িত রহিয়াছে। চুনারীতলার আরও একটু পূর্বে, এখনকার কলেজ ষ্ট্রীট ও আম্‌হার্ষ্ট ষ্ট্রীটের মধ্যে, লেডি ডফরিন হাসপাতালের সন্নিকটে, বহুবাজার ষ্ট্রীট হইতে বাহির হইয়াছে "চুনাপুখুর লেন"। এই অঞ্চলও চুনের ব্যবসায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। সুতরাং, খাস কলিকাতা-গ্রামে, উত্তর হইতে দক্ষিণে মিলিত সুতানুটী ও কলিকাতা গ্রামদ্বয়ের মেরুদণ্ড-স্বরূপ চিৎপুর রোড ও কসাইটোলা রোডের (এখনকার বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটের) পূর্বে, কলিকাতা গ্রামের পূর্ব সীমানায় বৈঠকখানা পর্যন্ত যে রাস্তা বিস্তৃত ছিল, তাহার উত্তরে অনেকখানি জুড়িয়া—"চুনাগলি, চুনারীতলা ও চুনারীপুখুর" অঞ্চলগুলিকে আশ্রয় করিয়া—চুনের কাজ হইত। সুতানুটী গ্রাম যদি সুতার ব্যবসায়ের জন্য, তাঁতের কাপড়ের জন্য (কলিকাতার আদি অধিবাসীদের মধ্যে তন্তুবায়-জাতীয় লোকেরা প্রধান ছিল, একথা স্মরণ করিতে হইবে) ক্রমে ঐ নাম পাইয়া থাকে, জোঙ্গড়া চুন, শামুক-পোড়া কলিচুনের ও অন্য চুনের কাজের জন্য "কলি-কাতা" বা কলিচুন এবং কাতা-চুনের বা শামুক-পোড়া কাতার আড়ত হিসাবে, এখন হইতে সাড়ে চারি শত পাঁচ শত বৎসর পূর্বে, দ্রব্যের নাম হইতে স্থানের নাম-স্বরূপ এই নাম গৃহীত হইয়া যাইতে কোনও বাধা নাই।

এইরূপ দ্রব্যের নামে স্থানের বা গ্রামের নাম এদেশে বা অন্যত্র বিরল নহে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কতকগুলির উল্লেখ করা যাইতেছে : "কেন্দুবিল্ব"—জয়দেব গোস্বামীর বাসস্থান, এক প্রকার ফলের নাম হইতে ; "শশা, মুখী, সেহড়া (=শ্যাওড়া), বেত, পটল, কাঁঠাল (ময়মনসিংহ) ; জগডুম্বুর (বগুড়া) ; খাগড়া, বয়ড়া (বাঙ্গালার বহু স্থানে—"বহেড়া" ফল হইতে এই নাম হওয়া সম্ভব, যদিও প্রাচীন বাঙ্গালা তাম্রপট্টে এই নামের সংস্কৃতীকরণ পাওয়া যায় 'বথটক' রূপে) ; শ্রীফলা (যশোহর) ; বালি (হুগলী) ; কলাছড়া (হাওড়া) ; বাবলা, ডুমুর, আমড়া, পাণিফলা (বর্দ্ধমান)"—প্রভৃতি, গাছ বা ফলের নামে গ্রামের নাম, বাঙ্গালা দেশে খুবই সাধারণ। সেই হিসাবে কোনও বস্তুর জন্য বিখ্যাত বা লক্ষণীয়, কোনও স্থানের সহিত সেই বস্তুর নাম সহজেই জড়িত হইয়া যাইতে পারে—বিশেষতঃ যদি জিনিসের নামটী একটু বড় হয়, এবং তাহার সহিত "হাট, গোলা, গঞ্জ, পোতা, নগর, পুর, কাঁদী, পাশা, পাড়া" প্রভৃতি স্থান-বাচক শব্দ সংযুক্ত হইলে নামটী অত্যন্ত বড় হইয়া যায়।

"কলিকাতা" নামটী মাত্র কলিকাতা-মহানগরীতে নিবদ্ধ নহে—বাঙ্গালা-দেশের দুই কোণে, পূর্বে ও পশ্চিমে, "কলিকাতা" নামে দুইটী গ্রাম আছে। আমার ছাত্র শ্রীমান্

কৃষ্ণপদ গোস্বামী বাঙ্গালা দেশের গ্রামের নাম লইয়া কাজ করিতেছেন। তিনি এই গ্রাম দুইটীর সম্বন্ধে আমায় খবর দেন। ঢাকা জেলার লোহজঙ্গ থানার অধীনে, এবং হাওড়া জেলার আমতা থানার অধীনে এই দুই কলিকাতা গ্রাম। গত ১৯৩৭ সালের মে মাসে আমি ঐ দুই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীদের পত্র লিখিয়া গ্রাম দুইটীর সম্বন্ধে খবর আনাই। লোহজঙ্গ থানার শ্রীযুক্ত ক. মুখোপাধ্যায় মহাশয় জানাইয়াছেন যে, উক্ত থানার প্রায় তিন মাইল উত্তরে "কলিকাতা-ভোগদিয়া" নামে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম আছে; ইহার অধিবাসি-সংখ্যা মাত্র ৩।৪ শত, প্রায় সকলেই মুসলমান চাষী; ঐ গ্রামে চুনের কাজ হয় না। আমতা থানার সব্-ইন্স্পেক্টর শ্রীযুক্ত অ. বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন, আমতা থানার বায়ুকোণে প্রায় আড়াই মাইল দূরে "রসপুর-কলিকাতা" গ্রাম অবস্থিত। (এই গ্রামকে "ছোট-কলিকাতা" বলিতেও শোনা যায়)। সব্-ইন্স্পেক্টর মহাশয়ের বিবরণ তুলিয়া দিতেছি: "The village is situated on the northern bank of the river Damodar. Its population is about 1000, mainly cultivators. Lime is manufactured in this village from snail-shells (শামুক চুন) on an extensive scale so as to meet the local demands." ঐ স্থানে তিন জন চুনারী মহাজন আছেন, তাঁহাদের নামও দিয়াছেন।

বাঙ্গালা-দেশের তিনটী কলিকাতার মধ্যে একটীতে এখনও শামুকের খোলা পুড়াইয়া চুন তৈয়ারী হইয়া থাকে; মহানগরী কলিকাতাতে এক সময়ে চুন প্রস্তুত হইত, এই নগরীর মুখপাত যে কলিকাতা-গ্রামকে অবলম্বন করিয়া, তাহার একটা বড় অংশেও চুনের কাজ হইত; সম্ভবতঃ প্রথমটায় এই গ্রামে শামুক-পোড়া ('কাতা') চুন বা কলিচুন প্রস্তুতই ইহার লক্ষণীয় ব্যবসায় ছিল।

'কলি' শব্দ (হিন্দুস্থানীতে 'কলী') দেওয়ালে লাগাইবার জন্য শামুক-পোড়া চুন অর্থে উত্তর-ভারতে সুপ্রচলিত। শব্দটীর বুৎপত্তি অজ্ঞাত। তামিলে Karcunnampu 'কর্-চুন্নাম্পু' বা 'কর্-শুণ্ণাম্বু' শব্দটী, গৃহনির্ম্মাণে ব্যবহৃত চুন অর্থে প্রযুক্ত হয়। এই শব্দের প্রথম অংশ 'কর্' খাঁটী দ্রাবিড়ী শব্দ বলিয়া অনুমান হয়। এই শব্দে যে "র"-কার আছে, তাহার দ্বিত্ব হইলে "ত্ত"এর উচ্চারণ হয়। 'কলি' এবং 'কাতা'—উভয় শব্দই কি এই "কর্, কর্র্, বা কত্ত্" শব্দের সহিত সম্পৃক্ত ?

বাঙ্গালায় ও উড়িয়াতে "কাতা, কত্তা" শব্দ 'নারিকেল-দড়ী' অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই অর্থেও 'কাতা' শব্দের বুৎপত্তি অজ্ঞাত। 'কলি ও কাতা' অর্থাৎ কলিচুন ও নারিকেল-দড়ী, এই দুই জিনিসের নাম হইতে 'কলিকাতা' নামের উদ্ভব, এরূপ ব্যাখ্যা যদি কেহ করেন, তাহার বিরুদ্ধে জোর করিয়া বলিবার কিছু নাই; তবে এইটুকু বলিতে পারা যায় যে, 'চুনের জন্য শামুক-পোড়া' এই অর্থে 'কাতা' শব্দ বাঙ্গালা-দেশের অন্ততঃ একটী প্রান্তে পাইতেছি, এবং প্রাচীন কালের কলিকাতা-গ্রামে চুন প্রস্তুত হওয়ার কিছু প্রমাণ, ও সঙ্গে-সঙ্গে হাওড়া জিলার কলিকাতা-গ্রামে এখনও চুনের কাজের অস্তিত্ব পাইতেছি। এই জন্য "কলিকাতা" শব্দের দ্বিতীয় অংশকে 'নারিকেল-দড়ী' অর্থে 'কাতা' বলিতে প্রবৃত্তি হয় না।

কিছু কাল পূর্ব্বে আমি 'কাতা' শব্দকে চলিত বাঙ্গালা 'কাত' অর্থাৎ 'পার্শ্বদেশ' অর্থে ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম ('কলির কাতা'—'কলিচুনের স্থান বা আড়ৎ')। এখন সে ব্যাখ্যা সমীচীন বলিয়া মনে করি না।

কৃষ্ণকীর্তনের সুর ও তাল

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ

কৃষ্ণকীর্তনের পুথি আবিষ্কৃত হইবার পরে ইহার সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু আমি যত দূর জানি, ইহার সঙ্গীত সম্বন্ধে কোনও আলোচনা এ পর্যন্ত হয় নাই। এই পুথির সাঙ্গীতিক অংশে যে নূতনত্ব আছে, তাহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। আমাদের পরিচিত অন্য কোনও প্রাচীন বা অর্বাচীন পুথিতে রাগ রাগিণী ও তালের এরূপ বিস্তৃত সমাবেশ নাই, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। এই সকল পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশ-সংবলিত সঙ্গীতের সম্বন্ধে অনুসন্ধান আবশ্যক। সঙ্গীতে যাঁহারা বিশেষজ্ঞ, আমি এই প্রবন্ধে কয়েকটি বিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব।

প্রথম ইহার অভিনবত্ব। কৃষ্ণকীর্তনের সকল কবিতাই গীত; এই সকল কবিতার উপরিভাগে বিস্তারিত ভাবে সুর ও তাল দেওয়া আছে। (কোনও কোনও গীতে শুধু সুর দেওয়া হইয়াছে, তালের উল্লেখ নাই।) কয়েকটি নমুনা দিলেই আমার বক্তব্য সুস্পষ্ট হইবে :—

পাহাড়ীআ রাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

গুজ্জরী রাগঃ ॥ কুড়ুক্কঃ ॥

কোড়া রাগঃ ॥ অঢ়ুক্কঃ ॥

গুজ্জরী রাগঃ ॥ রূপকং ॥ লগনী ॥ জয়জয় ॥

মালব রাগঃ ॥ প্রকীর্ন্নকঃ ॥ চিত্রকঃ ॥ লগনী ॥ রূপকং ॥ দণ্ডকঃ ॥

মালব রাগঃ ॥ বিচিত্র লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥

রামগিরী রাগঃ ॥ প্রকীর্ন্নক ॥ চিত্রকং ॥ লগনী ॥ একতালী ॥ দণ্ডকঃ ॥

বিভাষ রাগঃ ॥ দণ্ডকঃ ॥ একতালী ॥ রূপকথা ॥

বিভাষ রাগঃ ॥ একতালী ॥ রূপকথা ॥ দণ্ডকঃ ॥

পাহাড়ীআ রাগঃ ॥ প্রকীর্ন্নক ॥ লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥ ক্রীড়া ॥

অনুস্বার বিসর্গ দেখিয়া আপাততঃ বোধ হইতে পারে যে, সংস্কৃত সঙ্গীত-গ্রন্থ হইতে এই সকল লওয়া হইয়াছে। কিন্তু যত দূর দেখা যায়, তাহাতে প্রাচীন সংস্কৃত সঙ্গীতশাস্ত্রে যে সকল রাগরাগিণী বা তালের উল্লেখ আছে, কৃষ্ণকীর্তনে তাহার অনেক ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়।

সঙ্গীতরত্নাকর একখানি অতি প্রাচীন গ্রন্থ। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এই গ্রন্থ নিঃশঙ্ক শার্ঙ্গদেব সংকলন করেন। শার্ঙ্গদেব দৌলতাবাদের যাদব-বংশীয় নরপতি সিংঘণের সমকালে বর্তমান ছিলেন। সিংঘণ নরপতি শকাব্দ ১১৩২ হইতে ১১৬৭ (১২১০-১২৪৫ খ্রীঃ অঃ) পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। সঙ্গীতরত্নাকর সঙ্গীত সম্বন্ধে একখানি অতি

প্রাচীন ও প্রামাণিক গ্রন্থ। ইহার টীকাকারও এক জন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতকে চতুর কল্লিনাথ ইহার টীকা প্রণয়ন করেন। কল্লিনাথ বিজয়নগরের অভ্যুদয়-কালে (১৪শ হইতে ১৬শ শতক) আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আমাদের দেশে প্রাচীন কাল হইতে সঙ্গীত সম্বন্ধে বহু প্রামাণিক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল: সঙ্গীতরত্নাকর, বৃহৎ সঙ্গীতরত্নাকর, সঙ্গীতপারিজাত, সঙ্গীতদামোদর, সঙ্গীতমুক্তাবলী, সঙ্গীতসার, সঙ্গীত-চন্দ্রিকা প্রভৃতি। এই সকল গ্রন্থে বহু রাগরাগিণীর নাম আছে এবং তালাধ্যায়ে তালের নাম আছে। সঙ্গীতরত্নাকরে এক শত বিশটি তালের নাম আছে। মতান্তরে তালের সংখ্যা দুই শত চব্বিশ (সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম)। রত্নাকরের টীকায় কল্লিনাথ 'দেশী' তালের কথাও বলিয়াছেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, প্রাচীন সঙ্গীতজ্ঞেরা দেশী তাল ও স্বরের সন্ধান রাখিতেন এবং সেগুলিকে তাঁহাদের গণনার মধ্যে আনিতেন। তাল সম্বন্ধে ভারতীয় সঙ্গীতের এক অসাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। অন্য দেশের স্বর এবং প্রণালী সম্বন্ধে যতই উৎকর্ষ স্বীকার করা যাউক না কেন, তালের অশেষ প্রকার ভেদ ও তাহার লক্ষণ-নির্দেশ ভারতবর্ষের এক অনন্যসাধারণ বৈলক্ষণ্য। প্রাচীন কালেও বিভিন্ন তালের বোল সঙ্গীতশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। (সঙ্গীতরত্নাকরের বাদ্যাধ্যায়ে মৃদঙ্গের বোল দ্রষ্টব্য।)

কিন্তু সঙ্গীতের এইরূপ বিস্তৃত বর্ণনার মধ্যেও কৃষ্ণকীর্ত্তনে ব্যবহৃত সাঙ্গীতিক শব্দগুলির মধ্যে অনেকগুলির সন্ধান মিলে না। কতকগুলি হয়ত কিছু রূপান্তরিত হইয়া ব্যবহৃত হইতেছে। যথা: কহ্রু, কহু=ককুভ ; আহের=আভীর, আভীরী বা আহীর। রামগিরি= রামক্রী, রামকলি বা রামকেলি। ধানুষী=ধনাশ্রী। লগনী=লাউনী বা লগ্নী নামক গীত। দেশাগ=দেশাখ, দেশাখ্য।

'দণ্ডক' বলিতে একটি ছন্দ বুঝায়।* কিন্তু গীতের প্রসঙ্গে তাহার অবকাশ কোথায়, তাহা বুঝিতে পারা কঠিন। ক্রীড়া, কুডুক্ক প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত অপ্রসিদ্ধ তালের উল্লেখ সঙ্গীত-রত্নাকরের এক শত একবিংশতি তালের মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকীর্ণক কি বস্তু? প্রকীর্ণক অর্থে চামর জানি। চৈতন্যমঙ্গল গানে চামরের ব্যবহার দেখা যায়। গায়ক মধ্যে মধ্যে চামর হস্তে লইয়া নাচিয়া নাচিয়া গান করেন। রামায়ণ-গানেও কোথাও কোথাও এই প্রথা আছে।†

* পাদৈঃ স্বরৈর্দণ্ডকেন ছন্দসা দণ্ডকো মতঃ।—সঙ্গীতরত্নাকর।
দণ্ডকাশাবরীবৃত্ত দণ্ডকাশাবরী যথা।
তথা দণ্ডক-কোডারে স রাগঃ কিল জায়তে ॥—রাগতরঙ্গিণী (৩০০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত)

† সঙ্গীতরত্নাকরে রাগরাগিণীর বর্ণনায় 'প্রকীর্ণক' নামে একটি অধ্যায় আছে। সেখানে এরূপ কতকগুলি স্বরের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, যাহা বিষয়-বিভাগের মধ্যে ধরা পড়ে নাই।
প্রকীর্ণকং চ গ্রন্থস্য বিষয়বিভাগেন বিনা প্রবৃত্তত্বমুচ্যতে।
কিন্তু কৃষ্ণকীর্ত্তনে স্বরের বিশেষ উল্লেখ থাকায় এ অর্থ প্রযোজ্য নহে বলিয়া মনে করি।

কিন্তু অটুক, জয়জয়, চিত্রক, রূপকথা, লগনী, বিচিত্র বা চিত্রক লগনীর অর্থ কি? 'রূপকথা' শব্দটি বেশী প্রাচীন বলিয়া জানা ছিল না। 'রূপকড়া' নামে একটি অল্পপরিচিত তাল আছে বটে, কিন্তু ইহাও আধুনিক। বিশেষজ্ঞেরা এ সম্বন্ধে হয়ত বলিতে পারিবেন।

আমরা জানি, রাগরাগিণী ও তাল অসংখ্য। সঙ্গীতশাস্ত্রকারেরা সঙ্গীতকে অনন্ত সমুদ্র বলিয়াছেন,—

নাদাব্ধেস্তু পরং পারং ন জানাতি সরস্বতী।
অদ্যাপি মজ্জনভয়াৎ তুম্বং বহতি বক্ষসি॥

ভিন্ন ভিন্ন দেশে গানের ভিন্ন ভিন্ন গতি, ইহাও সঙ্গীতকারেরা লক্ষ্য করিয়াছেন :—

দেশে দেশে ভিন্ন নাম তদ্দেশীগানমুচ্যতে।

আমার মনে হয়, কৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গীত-প্রণালী কোনও দেশীয় বা স্থানীয় রীতির পরিচয় দিতেছে। এই রীতির সম্বন্ধে প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্র হইতে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ইহা সম্ভবতঃ বেশী প্রাচীন নহে। কারণ, চর্যাপদে আমরা যে প্রাচীন সরল রীতির পরিচয় পাই, তাহা কৃষ্ণকীর্তনে নাই। যথা : রাগ গবড়া, রাগ অরু, পটমঞ্জরী, রামক্রী, বলাড্ডি, মালসী ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলিই সঙ্গীতশাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। চর্যাপদে তালের উল্লেখ নাই, কিন্তু সুরের সরল উল্লেখ আছে।

ইহার পরে জয়দেবে আমরা সঙ্গীতের যে ধারা পাইতেছি, তাহাও প্রাচীন রীতির অনুগামী। গীতগোবিন্দে যে সুর ও তালের উল্লেখ আছে, তাহা সরল। যথা—মালব রাগ রূপক তাল, গুজ্জরী রাগ নিঃসার তাল, বসন্ত রাগ যতি তাল, কর্ণাট রাগ, দেশাগ রাগ একতালী ইত্যাদি। এ সকল কোনও স্থানীয় বা দেশীয় রীতির অনুসরণ করে নাই। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কৃষ্ণকীর্তন অনেক স্থলে জয়দেবের একান্ত অনুকরণ করিলেও সুর তাল সম্বন্ধে অনুকরণ করেন নাই। ইহার কারণ কি? তাহাও ভাবিবার বিষয় বটে।

চৈতন্য-পূর্ববর্তী মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় বা গোবিন্দবিজয় গ্রন্থে সঙ্গীতের যে প্রণালী দেখা যায়, তাহা কৃষ্ণকীর্তনের অনুরূপ নহে। এই পুস্তকের প্রাচীনতম পুথি দেখিয়া কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয় প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে যে পুস্তক ছাপিয়াছিলেন, তাহাতে রাগরাগিণীর যে ক্রম দেখা যায়, তাহা সঙ্গীতশাস্ত্রসম্মত। তালের নির্দেশ নাই, কেবল সুর দেওয়া আছে ; যথা : শ্রীরাগ, সুইরাগ, রামক্রী, পটমঞ্জরী, বসন্ত, মল্লার, ধানশ্রী ইত্যাদি। এই পুস্তকের ভূমিকায় ভক্তিবিনোদ মহাশয় বলিতেছেন যে, আদর্শ পুথিখানি চৈতন্য-জন্মের দুই বৎসর পূর্বে লিখিত হইয়াছিল (১৪০৫ শক)। কৃষ্ণকীর্তন যদি ইহার ১০০ কি ১৫০ বৎসর পূর্বে (রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়) রচিত বা লিখিত হইয়া থাকে, তবে সে পদ্ধতি শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে কেন অনুসৃত হইল না, তাহাও বিবেচ্য।

আমার মনে হয়, কৃষ্ণকীর্তন চৈতন্য-পরবর্তী কালের কোন দেশীয় বা স্থানীয় সঙ্গীত-রীতি অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছিল। এই পুথিখানি বাঁকুড়া জেলায় প্রাপ্ত হওয়া

যায়। শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ১৩১৮ সালে ইহা আবিষ্কার করেন বনবিষ্ণুপুরের সন্নিকটে। ঐ অঞ্চলের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সপ্তদশ শতকে বিষ্ণুপুরে দেশীয় রাজাদিগের প্রভাবে নানা বিষয়ে উৎকর্ষ ঘটিয়াছিল।* সম্ভবতঃ বিষ্ণুপুর এই সময়ে সঙ্গীতচর্চার জন্যও প্রসিদ্ধি লাভ করে। বীরহাম্বির ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মোগল-পাঠান কলহে লিপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা ইতিহাস হইতে জানা যায়। বৈঠকী সঙ্গীতের চর্চা বঙ্গদেশের মধ্যে এই মল্লরাজগণের প্রভাবে বনবিষ্ণুপুরেই বেশী পরিমাণে হইয়াছিল। সেই জন্য এখনও আমরা বিষ্ণুপুরী রীতি বলিয়া উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতের একটি অপেক্ষাকৃত স্বতন্ত্র প্রণালীর সন্ধান পাই। প্রচলিত হিন্দুস্থানী রীতি হইতে ইহা উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট, সে প্রশ্নের কোনও প্রয়োজন নাই। আমরা শুধু জানিতে পারিতেছি যে, বিষ্ণুপুরই সঙ্গীতচর্চায় এক দিন বঙ্গদেশের গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গীতেও যে সেই প্রভাবের ঢেউ পৌঁছিয়াছিল, এই অনুমানই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। কারণ, এই সময়ে অর্থাৎ প্রায় তিন শত কিংবা সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্বে বঙ্গের সর্বত্র সঙ্গীতচর্চার ধুম পড়িয়া গিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে কীর্তনেরও প্রসার ঘটে। এই সময়ে শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর গরাণহাটী বা গড়েরহাটী কীর্তনের প্রবর্তন করেন। রাঢ়ে জ্ঞানদাস, বলরাম দাস প্রভৃতি মনোহরসাহী সুরের সৃষ্টি করেন। সুতরাং এই যুগ হইতে সঙ্গীতের অনুশীলন বঙ্গদেশে প্রবলভাবে হইয়াছিল ধরা যায় এবং কৃষ্ণকীর্তনও সেই যুগে লিখিত বলিয়া অনুমান করিলে তাহা অসঙ্গত হয় না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম্ এ দুইখানি পুঁথি প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার এই আবিষ্কার সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ১৩৩৯ ও ৪০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। এই পুঁথি দুইখানিতে কৃষ্ণকীর্তনের কতকগুলি পদ পাওয়া যায়। এই পুঁথির সম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক লিখিত এক প্রবন্ধ (পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৯) ব্যতীত বিশেষ কোন আলোচনা এ পর্যন্ত হইয়াছে বলিয়া আমি জানি না। এই পুঁথি দুইখানি আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, বাঁকুড়া অঞ্চলে সম্প্রদায়-বিশেষের মধ্যে একটি বিশেষ সঙ্গীতরীতি প্রচলিত ছিল। বলা বাহুল্য, ঐ পুঁথি দুইখানিও বাঁকুড়া অঞ্চলে সংগৃহীত হইয়াছিল।

এই পুঁথিদ্বয়ের একখানি ১২৩৭ সালে লিখিত, অপরখানি তাহারও প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে লেখা। প্রথমতঃ এই পুঁথি দুইখানিই সঙ্গীতবিষয়ক। অর্থাৎ গীতবাদ্য

* The Rajas of Mallabhum seem now (from the time of Raghunath Singh—Seventeenth Century) to have entered on their palmiest days, if we may judge by the exquisite memorials left by him and his descendants.—O'Maley (District Gazetteer).

ব্যতীত ইহাদের অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই। কোন তালের কোন গান এবং তাহার কতগুলি কলা ইত্যাদি ইহাদের মধ্যে প্রাচীনতর পুথিখানিতে আলোচিত হইয়াছে। কৃষ্ণকীর্তনের অদ্ভুত সাঙ্গীতিক নির্দেশ ইহাতে অনুসৃত না হইলেও, যে সকল তালের উল্লেখ হইয়াছে, তাহার অভিনবত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যথা : হরগৌরী, অপূর্বকলা, কুন্দশেখর (কুন্দুশেখর) আলুটী, বিষমসন্ধি, জদ্দ (বা জজ্ঞ ?) কাঠের (কাচের ?) তাল, চুটখিলা তাল ইত্যাদি। দ্বিতীয় পুথিখানিতে আরও সব নূতন তালের সন্ধান আছে : দশকোসি জন্ধতাল, অপূর্বকলিকা, বশুতাল, জলদকান্তি ইত্যাদি। এই সকল তালের বোলে দ্বিতীয় পুথিখানির কলেবর পূর্ণ; সেগুলি মণীন্দ্র বাবু ছাপান নাই। এ পুথিতেও কোন তালের কত কলা, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় আছে। এই কলার মধ্যে আবার লঘু, গুরু, সদ্‌গুরু, গুরুর গুরু পরম গুরু প্রভৃতি নানা বিধি-বিধান আছে।

একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কৃষ্ণকীর্তনের প্রকীর্ণক লগনী চিত্রক প্রভৃতির নামগন্ধ ইহাতে নাই। বরং পাহিড়া, গুজ্জরী প্রভৃতির সঙ্গে বহু পরিচিত সুরের উল্লেখ আছে, যথা : বাগেশ্রী, মঙ্গল, ভীমপলাশী (ডিম্পনাশী নহে—১৮৩ পৃঃ), মাউর, শ্রী ইত্যাদি। এই পুথি দুইখানিতে সুরের সরলতা থাকিলেও তালের অভিনবত্ব লক্ষিত হয়।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, এই পুথিদ্বয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য গীতবাদ্য। গীত অপেক্ষা বাদ্যই প্রধান স্থান গ্রহণ করিয়াছে। বাদ্য সম্বন্ধে ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রের অনুকরণে বাদ্যের সংস্কৃত সংজ্ঞা দিবারও চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু তাহা অতি দীন অনুকরণ; না আছে তাহাতে ব্যাকরণ, না আছে কোনও অর্থ-সঙ্গতি। যথা—দ্রুতংদ্বয়ং লঘু দ্বয়ং [...] স তাল দশকুশীরু ভবেং। হয়ত ইহা অশিক্ষিত লোকের লেখা, সে জন্যও এরূপ বিকৃতি ঘটিতে পারে। যাহা হউক, তালগুলির উদাহরণস্বরূপেই গানগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা : হরগৌরী তালের পদাবলী, আলুটী তালের পদাবলী, জদ্দকাঠের তালের পদাবলী, ইত্যাদি। উদাহরণ ব্যতীত গীতের অন্য কোনও মূল্য এই দুই পুথিতে নাই।

সুতরাং তালের উদাহরণ হিসাবে নানা কবির গীত উদ্ধৃত হওয়া উচিত ছিল। ইহাই সাধারণতঃ প্রত্যাশা করা যায় যে, গায়ক বা বাদক বিভিন্ন তালের বিভিন্ন ছন্দ দেখাইবার জন্য চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি হইতে পদ বাছিয়া লইবেন। কিন্তু এক্ষেত্রে সে প্রণালী অনুসরণ করা হয় নাই। এক জন কবির পদই উদ্ধৃত হইয়াছে এবং তিনি বড়ু (বোঁড়ু, বাঁড়ু বা বটু) চণ্ডীদাস। আর কোনও কবির পদের সঙ্গে যে সংগ্রহকার পরিচিত ছিলেন, এরূপ প্রমাণ একেবারেই পাওয়া যায় না। দুইখানি পুথিতে অনেকগুলি পদ প্রায় সমান এবং প্রায়শঃ দানখণ্ড হইতেই সেই সকল পদ সংগৃহীত হইয়াছে। পদগুলির কবিত্ব বিশেষ কিছু থাকুক বা না-থাকুক, অশ্লীলতা অংশে কৃষ্ণকীর্তনের অনুসারী। যথা,

১ম পুথি (প্রাচীনতর)

মোরে শেহ [...] বড়াই করু কোন বুদ্ধি।
শুনিঞা বা কি বলিবে শ্বামি গুননিধি ॥
অমূল্য রতন মানে (মাগে ?) ধরে মোর হাথে।
মাগএ যুরতি দান * * দেই হাথে ॥

(সাঃ পঃ পত্রিকা, ১৩৩৯ সাল ১৮৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।)

২য় পুথি

মোর সিশুমতি বড়াই করি কোন বুদ্ধি।
শুনিঞা বা কি বলিব স্বামি গুণনিধি।
য়মুল্য রতন মাগে ধরি মোর হাথে ॥
মাগএ শুরতি দান * * দেই হাথে ॥

(ঐ ১৩৪০ সাল ৫০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।)

কৃষ্ণকীর্তন :

মোএঁ শিশুমতী বড়ায়ি করোঁ কোণ বুধী।
শুণিআঁ বা কি বুলিবে সামী গুণনিধী ॥
অমূল রতন মানে ধরে মোর হাথে।
মাঙ্গে সুরতি দান সান দেই মাথে ॥ (৮৭ পৃঃ)

'সান দেই মাথে' এই পাঠে কোন অর্থ হয় কি? বসন্ত বাবু জোর করিয়া অবশ্য একটি অর্থ করিয়াছেন: মস্তকসঞ্চালন দ্বারা সঙ্কেত করিয়া, কিন্তু ঐ সময় মস্তক-সঞ্চালন-রূপ সঙ্কেতের কি অর্থ হইতে পারে, তাহা বুঝা যায় না। পদাবলীতে 'সান দেও শিঙ্গায়' এরূপ প্রয়োগ পাই। কিন্তু মাথায় সান দেওয়া এই প্রথম দেখিতেছি।*

এই নবাবিষ্কৃত পুথি দুইখানির অনেকগুলি পদ কৃষ্ণকীর্তনে আছে। রুচি, গ্রাম্যতা-দোষ ও অভিনবত্ব হিসাবেও প্রাপ্ত পুথি এবং কৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গে অসাধারণ সাম্য দেখা যায়। ভাষার বিচার করিলেও কৃষ্ণকীর্তন ও এই পুথি দুইখানির মধ্যে বড় বেশী কালের ব্যবধান অনুমিত হয় না। অশিক্ষিত লিপিকরের খামখেয়ালী বানান দেখিয়া প্রাচীনত্ব অনুমান করা সঙ্গত হইবে না। এই খামখেয়ালীপনা কৃষ্ণকীর্তন ও এই পুথি দুইখানি তুলনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়। যথা: অমূল [কৃঃ কীঃ], য়মুল (আধুনিক পুথি); আঙ্গুল (কৃঃ কীঃ), য়ঙ্গুলি [আঃ পুঃ], বেশ্যাক [কৃঃ কীঃ] বেউশ্যাক [আঃ পুঃ]।

এই দুইখানি পুথি দেখিলে এইরূপ অনুমান হয় যে, বাঁকুড়া জেলায় কৃষ্ণকীর্তন-লেখকের সম্প্রদায়ে তাঁহার পদগুলি গীত হইত এবং নূতন নূতন তাল সহযোগে সেগুলির

* সান—অবগুণ্ঠন; সান কাড়া বা দেওয়া—ঘোমটা দেওয়া। বীরভূম অঞ্চলে এই অর্থে 'সান' শব্দ বহুল প্রচলিত। উত্তমপুরুষে 'দেই' ক্রিয়ার প্রয়োগ সেকালের প্রাচীন সাহিত্যে যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে 'সান দেই' কথাটির চমৎকার অর্থ-সঙ্গতি হয়।—সা. প. প.-সম্পাদক।

প্রচারের চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু এই চেষ্টা যে বহুদূর বিস্তৃত হয় নাই, তাহার প্রমাণ—

১। কৃষ্ণকীর্তনের অন্য পুথি পাওয়া যায় না।

২। আধুনিক পুথিরও অন্য প্রতিলিপি পাওয়া যায় নাই।

এই গীতগুলির মধ্যে যে একটি সাম্প্রদায়িক ভাব আছে, তাহা এই নবাবিষ্কৃত পুথি হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়। প্রাচীনতর পুথিখানির অনেকগুলি পদ দ্বিতীয় পুথিখানিতে উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহা ব্যতীত অপর একটি পদও বড়ু চণ্ডীদাসের নামে চালাইবার চেষ্টা দেখা যায়। পদটি দ্বিজ চণ্ডীদাসের একটি উৎকৃষ্ট পদ; ইহা পদকল্পতরুতে এবং নীলরতন বাবুর সংগ্রহে উদ্ধৃত হইয়াছে। মণীন্দ্রবাবু এই পদটি তুলিতে ভুলিয়াছেন:

বষু তালের পদাবলি ॥ রাগিণি পটমঞ্জরি ॥

এক কাল হইল মোর জমুনার জল।
আর কাল হইল মোর কদম্বের তল ॥
আর কাল হইল মোরে পাসে বৃন্দাবন।
আর কাল হইল মোর নহলি জৌবন ॥

লঘু তুবারে ১৪ চৌদ্য কলা ॥ পরে গুরু ॥

আর কাল হইল মোরে ভ্রমরার বোল।
আর কাল হইল মোরে কানু মাগে কোল ॥
আর কাল হইল মোরে তরলিয়া বাঁসি।
আর কাল হইল মোরে কানু মুখের হাসি ॥
আর কাল হইল মোরে নয়ানের নির।
আর কাল হইল মোর চিত নহে স্থির ॥
আর কাল হইল মোরে কোকিল্যার স্বর।
আর কাল হইল মোর নিজ পাপ ঘর ॥
আর কাল হইল মোরে বড়ায়ের সঙ্গ।
আর কাল হইল দানি করে কত রঙ্গ ॥
আর কাল হইল মোরে মোহনিঞা বাঁসি।
আর কাল হইল মোরে কাল মুখের হাসি ॥
আর কাল হইল মোরে নাহিক উপায়ে।
আর কাল হইল বটু চণ্ডিদাসে গায়ে ॥

এবং লঘু গুরু সকলে ৬৪ চৌসট্টি কলা।

এই পদটি কৃষ্ণকীর্তনে নাই। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মণীন্দ্রবাবু এই সুন্দর পদটি তাঁহার বিবরণ হইতে বাদ দিয়াছেন। নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসের পদাবলী ১৫৭ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত পাঠ ধৃত হইয়াছে:

পটমঞ্জরী।

একে কাল হৈল মোর নয়লি যৌবন।
আর কাল হৈল মোর বাস বৃন্দাবন ॥
আর কাল হৈল মোর কদম্বের তল।
আর কাল হৈল মোর যমুনার জল ॥
আর কাল হৈল মোর রতন ভূষণ।
আর কাল হৈল মোর গিরি গোবর্দ্ধন ॥
এত কাল সনে আমি থাকি একাকিনী।
এমন ব্যথিত নাই শুনয়ে কাহিনী ॥
দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে না কহ এমন।
কার কোন দোষ নাই সব এক জন ॥

পদকল্পতরু (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ) ২য় খণ্ড ৯৪৫ পদ ইহারই প্রায় অনুরূপ, ভণিতাও প্রায় এক ঃ

দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে না কহ এমন।
কারু কোন দোষ নাই সবে এক জন ॥

এই পদটির ভাষা, ভাব, ব্যঞ্জনা কৃষ্ণকীর্ত্তন হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রাপ্ত পুথির পদটিতে দ্বিরুক্তি-দোষ ঘটিয়াছে, ভণিতার কলিটি টানিয়া বুনিয়া মিলিত, এইরূপ মনে হয়। পদটিকে দানের পদের মধ্যে ফেলিবার চেষ্টাও দেখা যায়; কারণ, ঐ পুথিতে উদ্ধৃত সবগুলি পদই দানখণ্ডের।

আর কাল হৈল মোরে বড়ায়ের সঙ্গ।
আর কাল হইল দানি করে কত রঙ্গ ॥

এই কলিটি যেন গানের অপরাংশ হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে।

এই সকল কারণে আমার মনে হয়, কৃষ্ণকীর্ত্তন এই দুইখানি পুথির সহিত মিলাইয়া পড়া উচিত। তাহা করিলে, যে ভাবধারার জন্য কৃষ্ণকীর্ত্তন পুথিখানিকে চতুর্দশ শতকের বলিয়া গণ্য করা হইতেছে, তাহার জের উনবিংশ শতকেও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইবে। সে যাহা হউক, সঙ্গীতের দিক্ দিয়া এই অপূর্ব পুথিত্রয়ের সম্যক্ আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর নবজাগরণের ইতিহাস বড় বিচিত্র। পলাসীর যুদ্ধের পর হইতেই ক্লাইভ, ওয়ারেন হেষ্টিংস প্রভৃতির নেতৃত্বে ইংরেজ সওদাগরেরা বাংলা দেশকেই ব্যবসায়ের কেন্দ্র করিয়া যে অর্থলোলুপতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহার একমাত্র শুভফল—বাংলা দেশে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তার। কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা যাহা সুরু করিয়াছিলেন, মিশনরীরা আসিয়া তাহারই বিস্তার সাধন করিলেন এবং ফলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের মধ্যেই শিক্ষায় দীক্ষায়, সাহিত্যে সমাজে, এমন কি, রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে দ্রুত উন্নতি করিয়া বাঙালী ভারতবর্ষের অপর সকল প্রদেশকে পিছনে ফেলিয়া রাখিয়া চলিল; ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল; মাইকেল, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ঘটিল এবং ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের ভিত্তিও স্থাপিত হইল।

সুতরাং উনবিংশ শতাব্দীর এই নবজাগরণের ইতিহাস জানিবার জন্য এ যুগের বাঙালীর সহজ কৌতূহল আছে। কিন্তু এ যুগের কোন বিধিবদ্ধ প্রামাণিক ইতিহাস নাই। বিভিন্ন সামাজিক, নৈতিক ও শিক্ষা-সম্পর্কীয় আন্দোলনের মধ্যে, অধুনা-দুষ্প্রাপ্য সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠায় এবং কয়েক জন কৃতী পুরুষের ব্যক্তিগত জীবনী হইতে এই যুগের ইতিহাস আমাদিগকে কষ্ট করিয়া সংগ্রহ করিতে হইতেছে। একটা মোটামুটি কাহিনী পাইতেছি বটে কিন্তু যুগের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ, কৌতুক-কৌতূহলের ঘনিষ্ঠ পরিচয় এই সকল বিচ্ছিন্ন উপকরণের মধ্যে বড়-একটা মিলিতেছে না।

গত যুগের এক জন কৃতী পুরুষের ব্যক্তিগত জীবন ও স্মৃতিকথার সাহায্যে যুগের অন্তরতম রহস্যের খানিকটা সন্ধান আমরা জানিয়াছি, বর্ত্তমান প্রসঙ্গ তাঁহারই জীবনী ও কীর্ত্তির সামান্য পরিচয় দিবার জন্য লিখিত হইয়াছে। তিনি আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য। উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে জন্মগ্রহণ করিয়া বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক পর্য্যন্ত দীর্ঘ ৯২ বৎসর তিনি বাঙালীর জাতীয় মনের বহু ঘাত-প্রতিঘাত ও তজ্জনিত পরিবর্ত্তন স্বয়ং লক্ষ্য করিয়াছেন এবং আমাদের নিতান্ত সৌভাগ্য যে 'পুরাতন প্রসঙ্গ' নামক পুস্তকে গল্পচ্ছলে তাহার কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এক হিসাবে, বিস্মৃত ও বর্ত্তমান যুগের মধ্যে যোগসূত্র রূপে তাঁহার এই কাহিনীগুলি অত্যন্ত মূল্যবান্ এবং তাঁহার বহুবিচিত্র কর্ম্মজীবনও আমাদের নিকট কম মূল্যবান্ নয়।

বংশ-পরিচয়

১৮৬৯ সনে কৃষ্ণকমল তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা "রামকমলের জীবনবৃত্ত" লিখিয়া 'বেকন'

পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা-স্বরূপ প্রকাশ করেন। ইহাতে তিনি তাঁহার পিতৃ-পিতামহ সম্বন্ধে যেটুকু সংবাদ দিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

> ১২৪০ শালের ১৬ই চৈত্র কলিকাতা শহরের সিমুলিয়া পল্লীর অন্তঃপাতী মালিরবাগান নামক স্থানে রামকমলের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম রামজয় তর্কালঙ্কার। ইনি জাতিতে বারেন্দ্র শ্রেণী ব্রাহ্মণ ছিলেন, এবং বরেন্দ্র ভূমির অন্তর্গত ও গৌড় দেশের ভূতপূর্ব্ব রাজধানী মালদহ নগরের অধিবাসী ছিলেন। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ রাধাকৃষ্ণ বসাকের বিমাতার যত্নাতিশয়ে রামজয়ের পিতা আসিয়া পুত্র সমেত কলিকাতাবাসী হয়েন। ঐ বসাক গোষ্ঠী হইতেই একটী বাসবাটী, এক বিগ্রহ ঠাকুর এবং মাসিক কিঞ্চিৎ বৃত্তির বিধান করা হয়, রামজয়ের পিতা এবং তদীয় পরলোকের পর রামজয় নিজে, উভয়েই সেই বৃত্তি উপলক্ষ করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। রামজয় ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ব্যবসায়ী ছিলেন; সংস্কৃত শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তিও ছিল, বিশেষতঃ ভাগবত পুরাণ নামক দুরূহ দুরবগাহ পুরাণ গ্রন্থের রসজ্ঞ বলিয়া তাঁহার কিঞ্চিৎ প্রতিষ্ঠাও ছিল। কিন্তু এতদ্দেশীয় অধ্যাপকমণ্ডলী মধ্যে তাঁহার নামের সেরূপ প্রভা প্রকাশ পায় নাই।…তিনি পুত্রের শৈশবদশাতেই এতদ্দেশীয় রীতি অনুসারে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করান। দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমের মধ্যেই উল্লিখিত সুকঠিন ব্যাকরণ সমগ্র, অমরকোষ অভিধান, এবং ভট্টিকাব্য ও শ্রীমদ্‌ভাগবত পুরাণের কিয়দংশ পাঠ সাঙ্গ হইলে রামকমলের পিতৃবিয়োগ হয়; তৎকালে রামজয়ের এক কন্যা ও রামকমল ব্যতীত আর এক পুত্র [কৃষ্ণকমল] বর্ত্তমান থাকে। তন্মধ্যে রামকমল ভগিনী অপেক্ষা বয়সে ছোট এবং সহোদর অপেক্ষা বড় ছিলেন।*

---

* রামকমল ১৮৫৭ সনে নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি তিন বৎসর কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৮৬০ সনের ১১ই জুন তারিখে তিনি আত্মহত্যা করেন।

রামকমলের মৃত্যুর পর তাঁহার রচিত ও অপ্রকাশিত পুস্তকগুলির অধিকাংশই তদীয় ভ্রাতা কৃষ্ণকমল মুদ্রিত করিয়া প্রচার করেন। আমি রামকমলের নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির সন্ধান পাইয়াছি :—

(১) Bacon's Essays | Selected and | rendered | with | sundry adaptations | By | Ramkamal Bhattacharya. | বেকন | অর্থাৎ | তদীয় কতিপয় সন্দর্ভ। | রামকমল ভট্টাচার্য্য | সংকলিত। | কলিকাতা | মৃজাপুর, ফকিরচাঁদ মিত্রের লেন, ৯ নং ভবন। | গৌড়ীয় যন্ত্র। | ১৮৬১ | [পৃ. ৬৮+১ শুদ্ধিপত্র]

এই সংস্করণের এক খণ্ড পুস্তক বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে বিদ্যাসাগর-গ্রন্থসংগ্রহে আছে। ১৮৬৯ সনে এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় (*The Calcutta Gazette* for 8 Decr. 1869); তাহার প্রথম ২৫ পৃষ্ঠায় "রামকমলের জীবনবৃত্ত" দেওয়া আছে। এই জীবনবৃত্ত কৃষ্ণকমলের রচনা। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসের নিকট দ্বিতীয় সংস্করণের 'বেকন' এক খণ্ড আছে।

(২) ইংলণ্ডের ইতিহাস। পৃ. ১২৬। কলিকাতা ১৮৬১।

ইহাতে ৩য় জর্জ্জের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে। বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে এই পুস্তকের এক খণ্ড আছে।

(৩) Elements | of | GEOMETRY | By | Ramkamal Bhattacharya. | Published after his death | With an English Translation. | জ্যামিতি। | রামকমল ভট্টাচার্য্য প্রণীত। | Calcutta: | The Presidency Press. | 1862. | [পৃ. ৩২+28+xx]

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারে ও প্রেসিডেন্সী কলেজ লাইব্রেরিতে রামকমলের 'জ্যামিতি' আছে।

ছাত্রজীবন

আনুমানিক ১৮৪০ সনে কৃষ্ণকমল জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কালীপ্রসন্ন সিংহের সমবয়স্ক ছিলেন। ছাত্রজীবন সম্বন্ধে কৃষ্ণকমল তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

তখন আমার বয়স আন্দাজ ৬।৭ বৎসর; বোধ হয় ইংরাজি ১৮৪৭ সাল হইবে। আমি আমার দাদার সঙ্গে সংস্কৃত কলেজে যাইতাম। তিনি আমাকে একটা বেঞ্চে বসাইয়া রাখিতেন। এই রকম ২।৫ দিন যাইতে যাইতে একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাকে বলিলেন, 'আয় তোকে ইস্কুলে ভর্ত্তি করে দি।' তখন কোনও ছাত্রের বেতন দিবার পদ্ধতি ছিল না; কাযেই ইস্কুলে ভর্ত্তি হওয়ার প্রতিবন্ধক হইল না।···

ইস্কুলে ভর্ত্তি হইয়াই আমার 'মুগ্ধবোধ' পড়া আরম্ভ হইল। প্রথম দুই বৎসর ৺প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর* মহাশয়ের কাছে অধ্যয়ন করিলাম।···তৃতীয় বৎসর ৺গোবিন্দ শিরোমণি† মহাশয়ের ক্লাসে ও চতুর্থ বৎসর ৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের কাছে 'মুগ্ধবোধ' অধ্যয়ন করিলাম।··· এই চারি বৎসরে 'মুগ্ধবোধ' পড়া শেষ হইল।···অঙ্কের অধ্যাপক···শ্রীনাথ দাস; ইংরাজির অধ্যাপক প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী। আমি তাঁহাদের উভয়ের কাছেই পড়িয়াছি। (পৃ. ৩৩-৩৬)

আসলে কৃষ্ণকমল আট বৎসর বয়সে ১৮৪৮ সনের প্রথম ভাগে সংস্কৃত কলেজে শিক্ষার্থী হিসাবে প্রবেশ করেন। সংস্কৃত কলেজের পুরাতন নথিপত্র হইতে এই সংবাদ পাওয়া

* প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্নের জ্যেষ্ঠভ্রাতা; তিনি ১৮৪৩-৪৫ সনে প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যাকরণ-শ্রেণীর অধ্যাপকের প্রতিনিধিরূপে প্রায় তিন বৎসর সংস্কৃত কলেজে কাজ করিয়াছিলেন। তৎপরে ২০ মে ১৮৪৬ তারিখ হইতে তিনি মাসিক ৪০ টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজের চতুর্থ ব্যাকরণ-শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৫৫ সনের ৭ই মে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার রচনাবলী সম্বন্ধে আমি ১৩৪৪ সালের প্রথম সংখ্যা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (পৃ. ২৫-৩০) আলোচনা করিয়াছি।

† কৃষ্ণকমল স্মৃতিবিভ্রমের ফলে রামগোবিন্দ গোস্বামী (তর্করত্ন) মহাশয়ের নামের পরিবর্ত্তে গোবিন্দ শিরোমণির নাম করিয়াছেন।

১১ সেপ্টেম্বর ১৮৪০ তারিখে সংস্কৃত কলেজের ৩য় ব্যাকরণ-শ্রেণীর অধ্যাপক হরিপ্রসাদ তর্কপঞ্চাননের মৃত্যু হইলে রামগোবিন্দ তর্করত্ন মাসিক ৪০৲ বেতনে ১ ডিসেম্বর ১৮৪০ তারিখে তাঁহার স্থলে নিযুক্ত হন; তৎপূর্ব্বে (জুলাই ১৮৩৭ হইতে) প্রুফ সংশোধনাদি কার্য্যের জন্য তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির পণ্ডিত ছিলেন। কৃষ্ণকমল তাঁহারই শ্রেণীতে ১৮৫০ সনে ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ১৫ জুন ১৮৫৬ তারিখে রামগোবিন্দ মাসিক ৫০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজের ২য় ব্যাকরণ-শ্রেণীর অধ্যাপকের পদে উন্নীত হন। ২৮ মার্চ ১৮৬০ তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়। এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে যে সংস্কৃত মহাভারত প্রকাশিত হয় তাহার ৪র্থ খণ্ডে (১৮৩৯) সম্পাদক হিসাবে নিমাইচন্দ্র শিরোমণি প্রভৃতির নামের সহিত তাঁহার নামও আছে।

গোবিন্দচন্দ্র শিরোমণি সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণের অধ্যাপক ছিলেন না। তিনি ১ জুন ১৮৩৯ হইতে ৩০ এপ্রিল ১৮৪৪ তারিখ পর্য্যন্ত হিন্দু ল কমীটির পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ অসুস্থ হইয়া পড়িলে (এবং অবশেষে ২ মার্চ ১৮৪৫ পরলোক গমন করিলে) শিরোমণি মহাশয় ১১ জুন ১৮৪৪ হইতে ২৫ জুন ১৮৪৫ তারিখ পর্য্যন্ত মাসিক ২৫৲ টাকা পারিশ্রমিকে অস্থায়ী ভাবে সংস্কৃত কলেজের সহ-সম্পাদকের কার্য্য করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮৬০-৬১ সনের ক্যালেণ্ডারে হুগলী কলেজের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে, তাহাতে কলেজ-বিভাগের হেডপণ্ডিত রূপে শিরোমণির নাম পাইতেছি।

যায়। সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন সেক্রেটরী রসময় দত্ত ১৫ মে ১৮৪৮ তারিখে কাউন্সিল-অব-এডুকেশনের সেক্রেটরী জে. ময়েট (Mouat) সাহেবকে নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি লেখেন :—

I have the honor to report that since my letter No. 373 dated 25th January 1848 the undermentioned Students have been admitted in the Sanscrit College.

Names	Age in year	Class
*	*	*
Krishnacomul	8	4th Grammar Class

কৃষ্ণকমল সংস্কৃত কলেজের এক জন কৃতী ছাত্র; তিনি জুনিয়র সিনিয়র বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সংস্কৃতে তাঁহার অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল।

১৮৫৭ সনে এনট্রান্স পরীক্ষার প্রবর্ত্তন হয়। এই বৎসর এপ্রিল মাসে কৃষ্ণকমল সংস্কৃত কলেজ হইতে এনট্রান্স পরীক্ষা দেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও ঐ বৎসর প্রেসিডেন্সী কলেজের আইন-বিভাগ হইতে এনট্রান্স পরীক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। পরীক্ষার পর ১৮৫৭ সনেই কৃষ্ণকমল প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন। তিনি তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে য়ুনিভার্সিটি স্থাপিত হইলে, ঐ বৎসরই এনট্রান্স পরীক্ষা দিয়া সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করিলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয় শুনিলেন যে, আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হইতেছি। তিনি আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন; আমাকে বলিলেন,—'তুমি ষোল টাকা বৃত্তি নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে যা'চ্চ; আমি বলি, তুমি মেডিক্যাল কলেজে যাও, ডাক্তারি পড়, আমি তোমার আটাশ টাকা বৃত্তি ক'রে দেবো।' আমার কেমন দুর্ব্বুদ্ধি, আমি তাঁহার কথা শুনিলাম না; প্রেসিডেন্সি কলেজেই ভর্ত্তি হইলাম।...আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে এক বৎসর অধ্যয়ন করিয়া কয়েক মাস ডভ্‌টন্ কলেজে পড়িয়াছিলাম।—'পুরাতন প্রসঙ্গ,' ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭, ১১৯।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কৃষ্ণকমল প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ২৯ জুন ১৮৫৭ তারিখে ডিরেক্টর অব পাব্‌লিক ইন্‌স্ট্রাক্‌শনকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লেখেন :—

I have the honor to state that the three students of the Sanscrit College who passed at the last Entrance Examination are anxious to enter the Presidency College, two (1. Ramakhoy Chatterjee, 2. Shomanath Mookerjee) into the Law Class and one (Krishnakamal Bhattacharjee) into the General Branch. I have therefore to request that you will be pleased to issue the necessary instructions for their admission into that Institution.

As all the three students hold Senior Scholarships* in the Sanscrit College I beg to recommend that they may be permitted to retain their in the Presidency College.

* কৃষ্ণকমলের বৃত্তি প্রসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১ জুন ১৮৫৭ তারিখে ডি. পি. আই.-কে লিখিয়াছিলেন :—

Krishnacomal Bhattacharjee was on the receipt of 12 Rupees per month... during the last Session, but he has since become entitled to a higher scholarship of Rs. 16 per month...

প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করিবার কয়েক মাস পরে—১৮৫৮ সনের এপ্রিল মাসে কৃষ্ণকমল কিছু দিনের জন্য নিরুদ্দেশ হন। তাঁহার স্মৃতিকথায় প্রকাশ :—

> প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হইলাম।—এক বৎসর পরে কাহাকেও কিছু না বলিয়া পশ্চিমে যাইলাম।—'পুরাতন প্রসঙ্গ,' পৃ. ৪১।

সমসাময়িক সংবাদপত্রে প্রকাশিত তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকমলের একটি বিজ্ঞাপন হইতে কৃষ্ণকমলের নিরুদ্দেশের কথা জানিতে পারা যায়। বিজ্ঞাপনটি এই :—

> বিজ্ঞাপন।—আমার ভ্রাতা শ্রীমান কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য গত ৫ বৈশাখ শনিবার দিবস নিরুদ্দেশ হইয়াছে। তাহার বয়স ১৬।১৭ বৎসর কিন্তু খর্ব্বাকৃতি জন্য অল্প বোধ হয়, গৌরাঙ্গ, কৃশ, সংস্কৃত কালেজ হইতে প্রেসিডেন্সি কালেজে অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিল যে কেহ তাহার অনুসন্ধান করত ধৃত করিতে পারেন, প্রভাকর যন্ত্রালয় অথবা নরমেল স্কুলে আমার নিকট সংবাদ দিলে তাঁহার নিকট যথোচিত বাধিত ও উপকৃত হইব। শ্রীরামকমল ভট্টাচার্য্য। নরমেল স্কুলের প্রধান শিক্ষক।—'সংবাদ প্রভাকর', ২০ এপ্রিল ১৮৫৮। ৮ বৈশাখ ১২৬৫।

১৮৬০ সনে কৃষ্ণকমল বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

> কলেজে অধ্যয়ন না করিয়া আমি এন্‌ট্রান্স পাসের দুই আড়াই বৎসরের মধ্যে ঘরে পড়িয়া বি, এ, পাস দিয়াছিলাম,…। (পৃ. ১০৩)

এই পরীক্ষার ফল ২১ জুন ১৮৬০ তারিখের 'ক্যালকাটা গেজেটে' বিজ্ঞাপিত হয়; তাহাতে প্রকাশ :

2nd Class.

4th—Kristocomul Bhuttacharyya. Ex-student Sanskrit College.

কর্ম্মজীবন

ডেপুটি ইন্‌স্‌পেক্টর-অব-স্কুলস্

খুব সম্ভব ১৮৬০ সনের শেষ দিকে, ইন্‌স্‌পেক্টর-অব-স্কুলস্ উড্‌রো সাহেবের চেষ্টায় কৃষ্ণকমল ২৪-পরগণার দক্ষিণাংশের ডেপুটি ইন্‌স্‌পেক্টর-অব-স্কুলসের পদ প্রাপ্ত হন। তিনি তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন,—

> ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে আমার দাদা উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেন। সুতরাং আমাকে চাকরি করিতে হইল। ইস্কুলের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর হইলাম। ইন্‌স্পেক্টর উড্রো সাহেব আমায় বড় ভাল বাসিতেন।

এই পদে তিনি অল্প দিনই নিযুক্ত ছিলেন। ১ জুন ১৮৬১ তারিখে ডি. পি. আই.-কে লিখিত ইন্‌স্‌পেক্টর-অব-স্কুলস্ উড্‌রো সাহেবের পত্রের সহিত কৃষ্ণকমলের একটি রিপোর্ট প্রেরিত হইয়াছিল। ঐ রিপোর্টের কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

> "…Whatever scheme of liberal education may be conceived for Bengal, it will be narrow and imperfect, unless it take in a thorough mastery over Bengali and Sanscrit, together with a critical, extensive, and profound acquaintance with English."—Extracts from the Report

of Baboo Krishna Comul Bhuttacharjee B. A., late Deputy Inspector of Schools, for the Southern part of the 24-Pergunnahs (Appendices to General Report on Public Instruction in the Lower Provinces of the Bengal Presidency, for 1860-61. App. A, pp. 58-60.)

খানাকুল কৃষ্ণনগরে শিক্ষকতা

কৃষ্ণকমল ১৮৬২ সনের প্রথম চারি মাস খানাকুল কৃষ্ণনগরের সংস্কৃত ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের কর্ম্ম করিয়াছিলেন। তাঁহার স্মৃতিকথায় ইহার উল্লেখ নাই। এই বিদ্যালয়ের বার্ষিক পারিতোষিক-বিতরণ-সভার যে বিবরণ ৭ জুলাই ১৮৬২ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশিত হয়, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; ইহা হইতে কৃষ্ণকমলের খানাকুল কৃষ্ণনগরে শিক্ষকতার কথা জানা যাইবে :—

খানাকুল কৃষ্ণনগরের সংস্কৃত ইংরাজী বিদ্যালয়।—গত ১৬ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার [? ২৯ মে] খানাকুল কৃষ্ণনগরস্থ সংস্কৃত ইংরাজী বিদ্যালয়ের সাংবৎসরিক পারিতোষিকী ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রামগোবিন্দ তর্কালঙ্কার সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন পাঠ করেন।···

···এই চারি বৎসর কাল পাঠশালার সমুদায় কার্য্য আমার পিতৃঠাকুর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের বাটীতে সম্পাদিত হইয়া আসিতেছে।··· বিদ্যামন্দিরটী যে এরূপ সুগঠন ও সুশ্রী দেখিতেছেন তাহা কেবল তাঁহার অবিশ্রান্ত যত্ন, অক্লিষ্ট পরিশ্রম ও অবিচলিত অধ্যবসায় বলেই সম্পাদিত হইয়াছে।···

আপনারা ছাত্রদিগের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ গত বৎসর এইরূপে সমবেত হইবার প্রায় দেড় মাস পরে শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, বি এ প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। ··· শ্যামাচরণ বাবু শ্রাবণ মাস অবধি পৌষ মাস পর্য্যন্ত প্রধান শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।···শ্যামাচরণ বাবুর গমনের পর কয়েক দিবস শ্রীযুক্ত বাবু ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়···কর্ম্ম করিলে পরেই শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বি এ প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়া আমাদের এই বিদ্যালয়ের যৎপরোনাস্তি উপকার করিয়াছেন। তিনি সংস্কৃত ও ইংরেজী শাস্ত্রে যেরূপ ব্যুৎপন্ন শিক্ষাকার্য্যে যেরূপ আগ্রহযুক্ত ও পটু আমাদের এই বিদ্যালয়ের প্রতি তাঁহার যেরূপ স্নেহ দৃষ্টি এখানকার ছাত্রেরা তাঁহার প্রতি যেরূপ অনুরক্ত তিনি যেরূপ শান্তস্বভাব ও অমায়িক তাহাতে সমুদয় বিবেচনা করিলে আমাদের এই পাঠশালার পক্ষে তাঁহার মত অন্য শিক্ষক অতি বিরল অবশ্যই বলিতে হইবে। কিন্তু সুখ কি চিরস্থায়ী হয়? আমাদের এই বিদ্যালয়ের সৌভাগ্য কি চিরকালই অব্যাহত থাকিবে? কৃষ্ণকমল বাবু আর এখানে থাকিতে পারিবেন না, আগামি ২০এ জ্যৈষ্ঠ অবধি তাঁহাকে কলিকাতায় অবস্থিতি করিতে হইবে। শিক্ষাকার্য্যের গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মকর্ত্তা মহোদয়ের অভ্যর্থনায় তাঁহাকে প্রেসিডেন্সি কালেজের অন্যতম সহকারী অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিতে হইয়াছে। তাঁহার এখানকার কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বড় ইচ্ছা ছিল না আমি সবিশেষ অনুরোধ করিয়া ও পরামর্শ দিয়া তাঁহাকে কর্ম্মটী স্বীকার করাইলাম। বুঝিতেছি যে এরূপ করিয়া আমাদের এই বিদ্যালয়ের বিলক্ষণ ক্ষতি করিলাম। কিন্তু বলিলে কি হয়, আমাদের এখানে মাসে ৮০ আশি টাকা মাত্র বেতন, নূতন কর্ম্মটীর মাসিক বেতন ২০০ দুই শত টাকা। কৃষ্ণকমল

বাবুকে এ কর্ম্মটি গ্রহণ করিতে প্রবর্ত্তনা না দিলে, বন্ধুর মত কাজ না হইয়া নিতান্ত স্বার্থপর ব্যক্তির মত কাজ হইত। এক্ষণে ভরসা করি যে তিনি সচ্ছন্দ শরীরে ও সচ্ছন্দ মনে নূতন কর্ম্মটি করিতে থাকুন এবং ক্রমশঃ তাঁহার পদ বৃদ্ধি হইতে থাকুক।…

প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা

ইহার পর ১৮৬২ সনের মে মাসের শেষাশেষি কৃষ্ণকমল মাসিক দুই শত টাকা বেতনে প্রেসিডেন্সী কলেজে বাংলা ভাষার সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ৩০ মে ১৮৬২ তারিখে বাংলা-সরকারের জুনিয়র সেক্রেটরী তাঁহাকে যে নিয়োগ-পত্র পাঠান, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

> I am directed to inform you that the Lieutenant Governor has been pleased to appoint you to be Assistant Professor of Vernacular Literature in the Presidency College on a salary of Rupees 200 Two hundred per mensem.

ইহার ছয় মাস পরে, ১৮৬২ সনের ডিসেম্বর মাসে কৃষ্ণকমল প্রেসিডেন্সী কলেজের বাংলা ভাষার অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। ২২ ডিসেম্বর ১৮৬২ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশ :—

> বিবিধ সংবাদ। ৩রা পৌষ বুধবার।… পরিদর্শক সম্পাদক বলেন প্রেসিডেন্সি কালেজের বাঙ্গালা ভাষার প্রথম অধ্যাপক পদে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, দ্বিতীয় পদে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়োজিত হইয়াছেন।

কৃষ্ণকমল তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

> ছয় মাস পরে রামচন্দ্র মিত্র অবসর গ্রহণ করিলে বিদ্যাসাগর মহাশয় ছোটলাট Sir Cecil Beadonকে বলিয়া আমাকে Senior Professorএর পদে নিযুক্ত করাইয়া দিলেন,…। আমি বাঙ্গালা পড়াইতাম। কাশীদাস ও কৃত্তিবাস লইয়া আরম্ভ করা হইল। ক্রমে ক্রমে অন্যান্য পুস্তক যেমন প্রকাশিত হইতে লাগিল, অমনি আমি কলেজে পড়াইতে লাগিলাম। কৃষ্ণ বন্দ্যোর 'ষড়দর্শন', হেম বন্দ্যোর 'চিন্তাতরঙ্গিণী', 'মেঘনাদবধ' প্রভৃতি ধরাইলাম।

কৃষ্ণকমল প্রেসিডেন্সী কলেজে ১৩ বৎসর অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। ১৮৭২ সনের জানুয়ারি মাসে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি-এল পরীক্ষা দেন; পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় বিভাগে চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি ওকালতি করিবার সঙ্কল্প করেন। ১৮৭৩ সনের ৮ই জানুয়ারি তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করেন। এই প্রসঙ্গে কলেজের অধ্যক্ষ জে. সাট্‌ক্লিফ্ সাহেব ৭ ডিসেম্বর ১৮৭২ তারিখে ডিরেক্টর অব্ পাব্লিক ইন্‌ষ্ট্রাকশনকে নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি লেখেন :—

> I have the honor to forward a letter from Baboo Krishna Komol Bhuttachargie B. A., Professor of Sanskrit of this College in which he

desires to resign his appointment from the 8th January with the intention of joining the Bar. The College is closed for the winter vacation from this date and will reopen on the 8th January. I therefore recommend that the Baboo be allowed to resign his appointment from that date. I have received several applications for the post about to be vacated which I forward for your consideration.···The salary of the Professorship is 300 Rupees and that of the assistant Professorship 200 Rupees a month.

তাঁহার পদত্যাগের প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে ৩ জানুয়ারি ১৮৭৩ তারিখে 'এডুকেশন গেজেট' লেখেন :—

সাপ্তাহিক সংবাদ ।—প্রেসিডেন্সি কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক বাবু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য কর্ম্মে জবাব দিয়াছেন। তিনি হাইকোর্টে ওকালতী করিবেন। প্রেসিডেন্সির ন্যায় সর্ব্বপ্রধান কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপকের পদ শিক্ষা বিভাগের গ্রেডভুক্ত না হওয়া উক্ত বাবুর পদত্যাগের কারণ।

ওকালতি

প্রেসিডেন্সী কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপকের পদ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণকমল অল্প দিনের জন্য হাইকোর্টে, এবং তৎপরে হাবড়া-কোর্টে কয়েক বৎসর ওকালতি করেন। তাঁহার স্মৃতিকথায় প্রকাশ :—

আমি যখন হাইকোর্টে ওকালতি করি,···। (পৃ. ১২০)

[বঙ্কিম বাবু] যখন হাবড়ায় ছিলেন, আমি তাঁহার এজলাসে অনেক সময়ে ওকালতি করিয়াছি। (পৃ. ৭২)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কৃষ্ণকমল ১৮৭৩ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্য হন। ১৮৮৪ সনে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক 'ঠাকুর আইন অধ্যাপক' (Tagore Law Lecturer) পদে নিযুক্ত হইয়া হিন্দু একান্নবর্ত্তী পরিবার সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ইহার পারিশ্রমিক-স্বরূপ তিনি প্রায় দশ হাজার টাকা পাইয়াছিলেন। ১৯০৪ সনে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অনরারী ফেলো' নির্ব্বাচিত হন।

রিপন কলেজের অধ্যক্ষ

কৃষ্ণকমল ১৮৯১ সনে রিপন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত হন এই পদে তিনি ১৯০৩ সন পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া অবসর গ্রহণ করেন।

সাহিত্যালোচনা

বিদ্যোৎসাহিনী সভার সভ্য

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে কৃষ্ণকমলের বিশেষ দখল ছিল। ফরাসী ভাষাও তিনি আয়ত্ত করিয়াছিলেন।

অল্প বয়স হইতেই তিনি বাংলা ভাষার চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী সভার তিনি এক জন সভ্য ছিলেন। তিনি স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

> আমার যখন ১৫।১৬ বৎসর বয়স, তখন কালীপ্রসন্ন সিংহের সহিত আমার প্রথম আলাপ হয়।...তাঁহার বাড়ীর দোতালায় একটি Debating Club ছিল, আমি সেই সভার সভ্য হইয়াছিলাম। সেই স্থানে ৺কৃষ্ণদাস পালের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। এখনও আমার বেশ মনে আছে, যেদিন কৃষ্ণদাস পাল commerce সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন; ইংরাজিতে তাঁহার সেই বক্তৃতা শুনিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম।...আমিও প্রবন্ধ পাঠ করিতাম, কিন্তু বাঙ্গালায়। আমি ছেলে মানুষ বলিয়াই হৌক বা আর কোনও কারণেই হৌক, প্রবন্ধগুলির জন্য আমি প্রশংসা পাইতাম। একদিন আমার একটি প্রবন্ধের আলোচনা হইতেছিল—কি বিষয়ে সে প্রবন্ধ রচিত হইয়াছিল, এখন আমার স্মরণ নাই, বোধ হয় বিধবা-বিবাহের উপর,—এমন সময় একজন সভ্য বলিয়া উঠিলেন, 'ছেলে মানুষের প্রশংসা ক'রে ক'রে রাত কাটান যাবে নাকি ?' (পৃ. ৮৪-৮৫)

সাপ্তাহিক পত্র পরিচালন

১৮৫৮ সনের জানুয়ারি মাসে কৃষ্ণকমল 'বিচারক' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। এ-সম্বন্ধে তিনি তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

> সে [সিপাহীবিদ্রোহের] সময়ে বাঙ্গালা রচনার দিকে আমার কিছু ঝোঁক ছিল। 'বিচারক' নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র তৎকালে আমি বাহির করিয়াছিলাম। ইহা অ্যাডিসনের Spectatorএর ধরণে গঠিত হইয়াছিল। একটি সন্দর্ভে সমস্ত কাগজ পূর্ণ হইত। সর্ব্বোপরি একটি করিয়া সংস্কৃত motto থাকিত। কি কারণে, মনে নাই, পাঁচ ছয় সংখ্যা বাহির হইয়াই উহা কিন্তু বন্ধ হইয়া যায়। পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের জ্ঞাতিভ্রাতা তারাধন ভট্টাচার্য্য পত্রিকার ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন।—'পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম পর্য্যায়, পৃ. ২০০-২০১।

'বিচারকে'র প্রথম তিন সংখ্যা হস্তগত হইবার পর ২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৮ তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর' নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য করেন :—

> 'বিচারক' নামক একখানি অভিনব সাপ্তাহিক পত্রের ১ হইতে ৩ সংখ্যা প্রাপ্ত হইলাম, বিচারক তত্ত্ব বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এই অনুষ্ঠানটি অতি সদনুষ্ঠান বটে।...সম্পাদক মহাশয় কি জন্য আপনার নামটি গোপন করিয়াছেন, তাহা জানিতে পারিলাম না।

১৮৯১ সনে* সাপ্তাহিক পত্র 'হিতবাদী' প্রথম প্রকাশিত হয়। ঐ সাপ্তাহিক

* কৃষ্ণকমল-সম্পাদিত ১ম ভাগ ১১শ সংখ্যা 'হিতবাদী' দেখিয়াছি। ইহার তারিখ ৮ আগষ্ট ১৮৯১।

পত্রের প্রথমাবস্থায় কৃষ্ণকমল কিছু দিন সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

> সাপ্তাহিক পত্রিকা 'হিতবাদী' নামটি দ্বিজেন্দ্র বাবুরই সৃষ্টি, এবং "হিতং মনোহারি চ দুর্ল্লভং বচঃ" এই Mottoটিও তিনিই বলিয়া দেন। হিতবাদীর জন্মকালে পাঁচজন একত্র মিলিয়া এক বৈঠক বসিয়াছিল; তথায় আমিও ছিলাম, দ্বিজেন্দ্র বাবুও ছিলেন। সেই সময়েই ঐ নাম ও Motto পরিগৃহীত হয়। সুতরাং এক হিসাবে দ্বিজেন্দ্র বাবুই ঐ কাগজের জন্মদাতা বলিতে হইবে। সেই বৈঠকে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে সম্পাদক হইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সম্পাদক হইয়া কাগজের উন্নতিকল্পে আমি বিশেষ কিছুই করিতে পারি নাই, এবং ঐ পদও আমি অধিক দিন রাখিতে পারি নাই, কারণ তখন আমার অনেক ঝঞ্ঝাট ছিল।—'পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৬-৭৭।

রচনা—পুস্তক ও প্রবন্ধ

আচার্য্য কৃষ্ণকমল অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; অনুসন্ধানে যেগুলির সন্ধান আমরা পাইয়াছি, নিম্নে সেগুলির পরিচয় দেওয়া হইল।

১। দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ। পৃ. ৬২। ১৮৫৮ (?)

পুস্তকখানির আখ্যা-পত্র এইরূপ :—

> দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ॥ | কলিকাতা। | ১৭৭৯ শকাব্দা | টামর্স লেনে বিশ্বপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত। |

এই পুস্তকখানি ১৮৫৮ সনের গোড়ায় প্রকাশিত বলিয়া মনে হইতেছে। আষাঢ়, ১৭৮০ শকের 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে' রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইহার একটি সংক্ষিপ্ত সমালোচনা প্রকাশিত করেন। সমালোচনাটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

> "দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ কলিকাতা বিশ্ব প্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত।" এতদ্দেশীয় উপন্যাস সকলেরই এক ধারা; সকলেই "এক রাজা ছিলেন তাঁহার সো দো দুই রাণী" এই রূপ বান্ধা ধরণে আরম্ভ হইয়া থাকে; এই উপন্যাস তদ্রূপ নহে, এবং গল্পটীও তাদৃশ নিন্দনীয় বোধ হয় না।

পুস্তকখানির আখ্যা-পত্রে গ্রন্থকর্ত্তার নাম নাই। কৃষ্ণকমল তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

> শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার...কাহার মুখে অবগত হইয়াছেন যে, উহা আমার জ্যেষ্ঠ রামকমলের রচনা। আমার এক্ষণে বলিতে বাধা নাই যে, বাস্তবিক তাহা নহে। উহা আমারই রচনা। কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি আমার কয়েকজন বন্ধুবান্ধব তাহা জানিতেন।...ঐ গ্রন্থ সিপাহীবিদ্রোহের সময় প্রকাশিত হইয়াছিল।—'পুরাতন প্রসঙ্গ,' ১ম খণ্ড, পৃ. ২০০।

'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' যে কৃষ্ণকমলেরই রচনা, ৩০ জুন ১৮৬২ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি হইতেও তাহা জানা যাইবে :—

নিউ ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরি।　কালেজ ষ্ট্রীট নং ৮৬

প্রেসিডেন্সি কালেজের বাঙ্গলার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺রামকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের রচিত যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে যাহা প্রকাশিত হইবে সে সকলের মুদ্রাঙ্কন ও বিক্রয়ের সম্পূর্ণ ভার আমাদিগের উপর অর্পণ করিয়াছেন। অতএব উক্ত গ্রন্থ সকল প্রয়োজন হইলে আমাদিগের গ্রন্থালয়ে পাইবেন। নিম্নলিখিত গ্রন্থ সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

বেকনের সন্দর্ভ (৺ রামকমল ভট্টাচার্য্য কৃত)	...	।৵০
ইংলণ্ডের ইতিহাস (ঐ কৃত)	...	।০
দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথাভ্রমণ (কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য কৃত)	...	।০
বিচিত্র বীর্য্য (ঐ কৃত)	...	।০

গুপ্ত ব্রাদর্শ।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় তাঁহার "পিতা-পুত্র" প্রবন্ধে 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' পুস্তক সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া আমি যেন ভাষা রাজ্যের আর এক দেশে উপস্থিত হইলাম। এ ত কাদম্বরী নয়, বেতাল পঁচিশ নয়, তারাশঙ্করও নয়। প্যারীচাঁদও নয়—এ যে এক নূতন সৃষ্টি। ইহাতে কাদম্বরীর আড়ম্বর নাই, বিদ্যাসাগরের সরসতা নাই, অক্ষয়কুমারের প্রগাঢ়তা নাই, প্যারীচাঁদের গ্রাম্য সরলতা নাই, অথচ যেন সকলই আছে। এবং উহাদের ছাড়া, আরও যেন কিছু নূতন আছে। আমি বার বার তিনবার পাঠ করিলাম। কিন্তু কিছুতেই ভাষার বিশেষত্ব আয়ত্ত করিতে পারিলাম না।...বিশেষত্ব এই যে, সংজ্ঞাপদে এবং বিশেষণে, স্থলে স্থলে সংস্কৃতের মত। ক্রিয়া পদগুলি অনেক স্থলেই খাঁটি বাঙ্গালা।...আমার বিশ্বাস দুরাকাঙ্ক্ষের ভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার জননী।

আমি বালককালে এই গ্রন্থের ভাষায় যে কেবল মুগ্ধ হইলাম এমন নহে, ইহার ভাবেও আকৃষ্ট হইলাম।

আর উহার গল্প বড়ই ভাল লাগিয়াছিল।...আমি চুঁচুড়া হইতে প্রকাশিত সুবোধিনী পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক ছিলাম। তাহাতে 'ভারতবর্ষীয় কুটীর' নাম দিয়া একটা গল্প খণ্ডশ বাহির হইত। সেই গল্পে ছিল, জগন্নাথ যাইবার পথে—পথের একটু তফাতে, জটাঘটাসঙ্ঘটিত—এক মহাবটবৃক্ষ। তাহার তলদেশ নিতান্ত নিভৃত নিরালয়। সেখানে সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ লাভ করিতে পায় না। ভীষণ বায়ু উপরে হু হু করিলেও তলদেশে মন্দ মন্দ বিচরণ করে। প্রচুর পত্রসন্নিবেশে সেখানে বৃষ্টিও পড়িতে পারে না। সেইখানে একটী ছোট খাট সামান্য কুটীর; বাস করেন এক পড়িয়া বা চণ্ডাল খৃষ্টান, তাহার সহধর্ম্মিণী ও একটি ছোট কন্যা। এ পুস্তকে পড়িলাম দুরাকাঙ্ক্ষ যখন মান্দ্রাজ, মহীশর, মালব উলট পালট করিয়া সেই বটতলে উপস্থিত হইলেন, তখন পড়িয়ার সহধর্ম্মিণী মরিয়াছে, কন্যা যুবতী হইয়াছে, দুইটা বিভিন্ন সময়ে,* বিভিন্নরূপে প্রকাশিত গল্পের এইরূপ অপূর্ব্ব মিল দেখিয়া, আমার বালক মনে বড়ই আনন্দ

* বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয় নাই; প্রায় একই সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল। রামচন্দ্র দিক্ষিত-সম্পাদিত 'সুবোধিনী' পত্রিকা ১৩ জানুয়ারি ১৮৫৮ তারিখে চুঁচুড়া হইতে প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম সংখ্যা হইতেই 'ভারতবর্ষীয় কুটীর' খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল। কৃষ্ণকমলের 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ'ও ১৮৫৮ সনের গোড়ার দিকে প্রকাশিত—একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুতরাং উভয় রচনাই একই লেখনী-প্রসূত হওয়া বিচিত্র নহে।

হইল।···ভারতবর্ষীয় কুটীরে ও দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণে, কেন যে মিল হইল, এখন তাহা জানি। দুই খানিই ইংরাজী রোমান্স অফ্ হিসটরি হইতে সঙ্কলিত।—'বঙ্গ-ভাষার লেখক', পৃ. ৫২৫-২৮।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারে ও তদন্তর্ভুক্ত বিদ্যাসাগর-গ্রন্থসংগ্রহে এক এক খণ্ড 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' আছে।

২। **বিচিত্রবীর্য্য।** পৃ. সংখ্যা ৭৬। জানুয়ারি ১৮৬২।
ইহার আখ্যা-পত্রটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

Bichitrabyrya | A | Heroic Tale | By | Krishnakamal Bhattacharya. | বিচিত্রবীর্য্য | নামক | বীররসাশ্রিত আখ্যান। | শ্রীকৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য | প্রণীত। | কলিকাতা | গৌড়ীয় যন্ত্রে মুদ্রিত | ইং ১৮৬২ সাল |

এই পুস্তকখানি সম্বন্ধে কৃষ্ণকমল তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

পুস্তকখানি আমি সতের আঠার বৎসর বয়সে রচনা করি, কিন্তু পাঁচ সাত বৎসর ছাপান হয় হয় নাই; পরে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক হইয়া আন্দাজ ইংরাজি ১৮৬৪ সালে উহা মুদ্রিত করিয়াছিলাম।—'পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৩।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারে (আখ্যাপত্রবিহীন), চৈতন্য লাইব্রেরিতে ও উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরিতে 'বিচিত্রবীর্য্য' আছে।

৩। **নাগানন্দম্।** শ্রীকৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য সহকৃতেন শ্রীমাধবচন্দ্র ঘোষেণ মুদ্রাঙ্কিতম্। পৃ. সংখ্যা ৭৪+১৯। সম্বৎ ১৯২১ (১৮৬৪)।

ইহার এক খণ্ড কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারে আছে।

৪। **কুমার সম্ভব।** প্রথম সাত সর্গের বাঙ্গালা অনুবাদ। পৃ. সংখ্যা ১০৮। ১৮৭৫।
ইহার আখ্যা-পত্রটি এইরূপ :—

কুমার সম্ভব। | অর্থাৎ | মহাকবি কালিদাসের সুপ্রসিদ্ধ মহাকাব্যের | প্রথম সাত সর্গের | বাঙ্গালা অনুবাদ। | বিশ্ব বিদ্যালয়ের ফার্স্‌ট্ আর্টস্ পরীক্ষার্থীদিগের | উপকারার্থে | প্রেসিডেন্সি কালেজের ভূতপূর্ব্ব-সংস্কৃত অধ্যাপক | শ্রীকৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বিদ্যানিধি বি, এল কর্তৃক | প্রণীত। | শ্রীহেমনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত। | সন ১২৮২ সাল |

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারে এক খণ্ড 'কুমার সম্ভব' আছে।

৪। *On some unsettled questions of Succession under the Bengal School of Hindu Law.* Calcutta, 1877.

৫। *Tagore Law Lectures*—1884-85. The Law relating to the Joint Hindu Family. 1885.

৬। *Notes of Lectures on Hindu Law.* Calcutta, 1886.

৭। *The Institutes of Parasara.* Translated into English by Krishnakamal Bhattacharyya. (Bibliotheca Indica), pp. 82, Calcutta, 1887.

উপরের চারিখানি পুস্তক ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে আছে।

৮। *The Bhattikavya* for the use of the Students preparing for the First Examination in Arts···Together with an elaborate Appendix by Umacharan Tarkaratna···pp. 226+48+xvIII. 1891.

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারে ইহার এক খণ্ড আছে।

৯। **কুমারসম্ভব।** পৃ. ৪৯৬। ১৮৯২।

ইহা ইংরেজী, বাংলা ও সংস্কৃতে মুদ্রিত। 'ক্যালকাটা গেজেটে' মুদ্রিত পুস্তকের তালিকায় ইহার উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে।

১০। *Raghuvansam* Canto VI With the commentary of Mallinatha and Translations of Krishnakamal Bhattacharya, Principal Ripon College···1895.

১৯০৩ সনে, মল্লিনাথের টীকা-সমেত রঘুবংশের প্রথম ও দ্বিতীয় সর্গের ইংরেজী-বাংলা অনুবাদ কৃষ্ণকমল প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১১। **পুরাতন প্রসঙ্গ।** প্রথম খণ্ড। ১৩২০।

অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত এই পুস্তকে কৃষ্ণকমলের স্মৃতিকথা নিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা পাঠে কৃষ্ণকমলের সমকালিক ব্যক্তিগণ সম্বন্ধেও অনেক কাজের কথা জানা যায়।

এই স্মৃতিকথায় প্রকাশ (পৃ. ২০২), তিনি "একখানি ক্ষুদ্র ইংলণ্ডের ইতিহাস" রচনা করেন। প্রকৃতপক্ষে 'ইংলণ্ডের ইতিহাস' তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকমলের রচনা।

'পূর্ণিমা', 'অবোধবন্ধু', প্রভৃতি তৎকালীন মাসিকপত্রাদিতে কৃষ্ণকমল বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তখন প্রবন্ধের শেষে বড়-একটা লেখকের নাম থাকিত না। এই কারণে আজিকার দিনে তাঁহার রচনাগুলি নির্ণয় করা দুরূহ। কয়েকটি রচনা সম্বন্ধে তিনি নিজেই সন্ধান দিয়াছেন ; তিনি স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

> সুহৃদ্বর কবি বিহারীলাল 'পূর্ণিমা' নামে একখানি মাসিক পত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। আমি তাহার অন্যতম লেখক হইলাম।···ঐ পত্রিকায় আমার দুইটি শ্লোকখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল,—'জুঁইফুলের গাছ'* ও 'তাঁতিয়া টোপি'। কবিতা দুইটি কোনও কোনও ব্যক্তির নিতান্ত মন্দ লাগে নাই। ৺কামাখ্যাচরণ ঘোষ, স্বপ্রণীত 'রত্নসার' নামক বাল্যপাঠ্য সংগ্রহগ্রন্থে ঐ দুইটি সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন ; পরে কিন্তু 'তাঁতিয়া টোপি' কবিতাটি পাছে রাজভক্তির বিরুদ্ধ বলিয়া পরিগৃহীত হয়, এই ভয়ে সেটিকে বাদ দিয়াছিলেন। 'পূর্ণিমাতে' আর কি কি লিখিয়াছিলাম, এক্ষণে মনে নাই।···
>
> কিছুদিন পরে বিহারীলাল ও যোগীন্দ্রচন্দ্র [যোগীন্দ্রনাথ ?] ঘোষ (ইনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক) প্রভৃতি কয়েকজন বন্ধু একত্র হইয়া 'অবোধবন্ধু' নামক একখানি মাসিকপত্র প্রতিষ্ঠিত

* কবিতাটি "জুঁইফুল" নামে ৫ম সংখ্যা 'পূর্ণিমা'তে প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারে এই সংখ্যা 'পূর্ণিমা' আছে।

করেন। এই পত্রিকাখানি বোধ হয়, ইংরাজি ১৮৭১ সাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিল। ইহাতে আমি অনেক বিষয়ে লিখিয়াছিলাম; সমগ্র 'পল-বর্জ্জিনিয়া'* গ্রন্থ ফরাসী ভাষা হইতে অনুবাদ করিয়া ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল; নেপোলিয়নের একটি জীবনবৃত্তান্ত† বহুবিস্তারিতভাবে লোডির যুদ্ধ পর্য্যন্ত বাহির করা হইয়াছিল। অনেক প্রবন্ধও লিখিয়াছিলাম। মনে পড়ে, একটি প্রবন্ধে য়ুরোপের duel (অর্থাৎ য়ুরোপীয়েরা অপমানিত হইলে পরস্পর প্রাণান্ত পর্য্যন্ত যে মারামারিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারই) সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম।‡ ... ইহার পর 'ভারতী' পত্রিকায় আমি কয়েকটি বড় বড় প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম; সকলগুলিই আমার নামসম্বলিত বাহির হইয়াছিল।§

মৃত্যু

আনুমানিক ৯২ বৎসর বয়সে, ১৩ আগষ্ট ১৯৩২ (২৮ শ্রাবণ ১৩৩৯) তারিখে কৃষ্ণকমল পরলোকগমন করেন।

কৃষ্ণকমল কোঁতের শিষ্য ছিলেন; তিনি তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন, "আমি Positivist; আমি নাস্তিক।"

রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত একখানি পত্রে ('সুপ্রভাত', আশ্বিন ১৩১৭) কৃষ্ণকমল সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে মন্তব্য করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম:—

> কৃষ্ণকমল is not যে সে লোক—he is a terrible fellow. He knows how to write and how to fight and how to slight all things divine.

[এই প্রবন্ধ সঙ্কলনকালে আমাকে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পুরাতন নথিপত্র দেখিতে হইয়াছে। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত এই সকল নথিপত্র দেখিবার সুযোগ দিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসও প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রাচীন নথিপত্র হইতে দুইখানি পত্র সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।]

---

* "পৌল ভর্জ্জীনী"—'অবোধ-বন্ধু', পৌষ-চৈত্র ১২৭৫; পৌষ-চৈত্র ১২৭৬।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'জীবন-স্মৃতি' পুস্তকের ৮২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন:—"এই অবোধবন্ধু কাগজেই বিলাতী পৌলবর্জ্জিনী গল্পের সরস বাংলা অনুবাদ পড়িয়া কত চোখের জল ফেলিয়াছি তাহার ঠিকানা নাই। আহা সে কোন্ সাগরের তীর! সে কোন্ সমুদ্রসমীরকম্পিত নারিকেলের বন! ছাগলচরা সে কোন্ পাহাড়ের উপত্যকা! কলিকাতা সহরের দক্ষিণের বারান্দায় দুপুরের রৌদ্রে সে কি মধুর মরীচিকা বিস্তীর্ণ হইত! আর সেই মাথায় রঙীন রুমালপরা বর্জ্জিনীর সঙ্গে সেই নির্জ্জন দ্বীপের শ্যামল বনপথে একটি বাঙালী বালকের কি প্রেমই জমিয়াছিল!"

† "নেপোলিয়ন বোনাপার্টের জীবন বৃত্তান্ত"—'অবোধ-বন্ধু', বৈশাখ-শ্রাবণ ও আশ্বিন ১২৭৬।

‡ "ডুয়েল"—'অবোধ-বন্ধু', অগ্রহায়ণ ১২৭৬।

§ "Positivism কাহাকে বলে?"—'ভারতী', শ্রাবণ, আশ্বিন ১২৯২।

"বিবাহের জন্য পূর্ব্বরাগ আবশ্যক কি না"—'ভারতী ও বালক', কার্ত্তিক ১২৯৪।

"জান্তব চুম্বক শক্তি"—'ভারতী ও বালক', শ্রাবণ ১২৯৮।

বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ

শ্রীসজনীকান্ত দাস

ভূমিকা

পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসেই দেখা যায় যে সূত্রপাত পদ্যে, গদ্যের আবির্ভাব পরে। ইহার অর্থ এই নয় যে, কোনও দেশ বা জাতির মৌখিক ভাষা পদ্য হইতে ক্রমশঃ গদ্যে রূপান্তরিত হয়; সর্ব্বত্র লোকে বরাবরই গদ্যেই কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে—ভাষা ও সাহিত্য লিখিতে গেলেই স্বভাবত প্রথমে ছন্দ ও মিল বাহন হইয়া বসে। লেখনীমুখে মানুষ গদ্যের সাহায্যে পরে মনের ভাব ব্যক্ত করিতে অভ্যস্ত হয়।

প্রাচীনতম বাংলা চর্য্যাপদকে যদি ৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি রচিত বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলে এখন পর্য্যন্ত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের যতটুকু জ্ঞান জন্মিয়াছে তাহাতে নিঃসন্দেহে বলিতে পারি—সাহিত্যপদবাচ্য না হইলেও উল্লেখযোগ্য বাংলা গদ্য ইহার ঠিক ৮৫০ বৎসর পরে, ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে রামরাম বসু কর্ত্তৃক রচিত ও শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে মুদ্রিত হয়। অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতকের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা গদ্যের যথার্থ সূত্রপাত। বাঙালী যে গীতিপ্রধান কবির জাতি, ইহা তাহার আর একটি প্রমাণ; অন্য কুত্রাপি গদ্যের প্রাদুর্ভাব এত দীর্ঘবিলম্বিত হয় নাই।

সুতরাং অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাংলা গদ্যের ইতিহাস নিতান্ত হাঁটি-হাঁটি-পা-পা অবস্থার ইতিহাস। বাংলা গদ্যের ভাষা তখন পর্য্যন্ত বাংলা সাহিত্যের বাহন হইয়া উঠিবার মত সামর্থ্য অর্জ্জন করে নাই; যে অবসর এবং মনের উদ্বৃত্ত শক্তি মানুষের শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা দান করে এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সামান্যতাকে অতিক্রম করিয়া অসামান্য কল্পনালোকে বিহার করিবার অবকাশ ও উপাদান জোগাইয়া তাহাকে মহত্তর জীবনের পথে লইয়া যায়, বাঙালী তখন মঙ্গলকাব্য, টপ্পা, পাঁচালী ও কবিগান রচনায় সেই অবসর ও শক্তি নিয়োগ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেছিল। তাম্রশাসন, চিঠিপত্র ও দলিল-দস্তাবেজে নিতান্ত মামুলি প্রয়োজনের খাতিরে বাংলা গদ্য ব্যবহৃত হইতেছিল, এই পর্য্যন্ত।

রবীন্দ্রনাথ 'একটা আষাঢ়ে গল্পে' নিরুপদ্রব তাসের দেশে রাজপুত্রের হঠাৎ আগমনে যে বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। এই রূপক বাংলা গদ্য-সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে খাটে। সমুদ্রপারের সওদাগর ও পাদ্রিদের আগমনে কবিতাপ্রবণ বাংলা দেশে যে আলোড়ন উপস্থিত হয়, তাহার ফলেই সত্যকার বাংলা গদ্যসাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ এবং বাঙালীর আত্মচেতনা উদ্বুদ্ধ হইয়া তাহার পরিণতি। বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইহাই সংক্ষিপ্ততম ইতিহাস।

ইতিহাসের উপকরণ

বিচ্ছিন্ন এবং সংক্ষিপ্ত হইলেও রাজপুত্রের সোনার কাঠির স্পর্শের পূর্ব্বেকার একটা ইতিহাস আছে ; তাহা সমসাময়িক ও প্রামাণিক নয় ; পূর্ব্বগামীরা কল্পনা ও কিম্বদন্তীর সাহায্যে এই যুগের যতটুকু পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই আমাদের উপজীব্য। যে যুগে প্রাকৃত ও অপভ্রংশের খোলস সদ্য পরিত্যাগ করিয়া দুর্ব্বোধ্য সন্ধ্যাভাষায় বৌদ্ধচর্য্যাপদ রচিত হইয়াছিল, সে যুগে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কোন্ ভাষায় পরস্পর মনের ভাব ব্যক্ত করিতেন, অনুমান করা ছাড়া তাহা জানিবার আজ উপায় নাই। ইতিহাসের উপকরণ যৎসামান্য। এখন পর্য্যন্ত ইতিহাস বলিয়া যাহা চলিতেছে তাহার অধিকাংশই প্রমাণসাপেক্ষ দলিলের উপর গঠিত নয় ; যে সকল উপকরণের উপর ইহার নির্ভর, সেগুলি প্রায়ই ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে গোপনে সুরক্ষিত অথবা একেবারেই অস্তিত্ববিহীন ; চেষ্টা করিলেও চোখে দেখিবার উপায় নাই। নকলের নকলে বহুলপ্রচারের ফলে এগুলিই প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য ; বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সত্যকার ইতিহাস রচনায় ঐতিহাসিকের এইখানেই বিপদ। এই তমসাচ্ছন্ন যুগের ভাষার ও বাক্যগঠন-রীতির নমুনা হিসাবে যাহা সচরাচর দাখিল করা হইয়া থাকে, আধুনিক ইতিহাস-বিজ্ঞানের যুক্তিপ্রণালী অনুসরণ করিলে সেগুলি গ্রহণযোগ্য না হইবারই কথা। যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা কাহিনী রচনা করিয়াছেন, ইতিহাস লেখেন নাই।

আসলে ইতিহাস বস্তুটা আমাদের ধাতস্থ নয়। যাহাদের জাতীয় ইতিহাস পুরাণ-কাহিনীতে পর্য্যবসিত, তাহাদের ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস না থাকিবারই কথা। বিশেষ করিয়া, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য দেশের পণ্ডিত-সমাজে স্বীকৃত হইয়াছে বহু বিলম্বে। বৈদেশিক রাজকর্ম্মচারী ও ধর্ম্মপ্রচারক পাদ্‌রিগণই গোড়ার দিকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে কিঞ্চিৎ প্রতিষ্ঠা দিতে সহায়তা করিয়াছিলেন। শ্রীরামপুর মিশন কর্ত্তৃক পরিচালিত সাপ্তাহিক 'সমাচার দর্পণ' ও মাসিক 'দি ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'তেই সর্ব্বপ্রথম বাংলা ভাষায় রচিত পুস্তক ও পত্রিকা সম্বন্ধে আলোচনা দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে এই দুই স্থলেই ইতিহাসের সূত্রপাত। 'দি ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র প্রথম বৎসরের তৃতীয় সংখ্যায় (জুলাই, ১৮১৮) ৫৯ হইতে ৬৪ পৃষ্ঠায় বাংলা ভাষার ইতিহাসের গোড়াপত্তন দেখিতে পাই। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে উক্ত পত্রিকার কোয়ার্টারলি সিরিজ প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৮২১-এর ১ম সংখ্যায় ও ১৮২৫-এর ১ম সংখ্যায় "On the effect of the Native Press in India" ও "On the progress and present state of the Native Press in India" শীর্ষক দুইটি প্রবন্ধে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হুগলিতে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনের ও বাংলা হরফ প্রস্তুত করিয়া নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেডের ইংরেজী ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ মুদ্রণ হইতে আরম্ভ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে সমাচার পত্রিকার সফল প্রকাশ পর্য্যন্ত সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে। 'দি ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র মাসিক ও ত্রৈমাসিক সংখ্যাগুলিতে এবং 'সমাচার দর্পণে' তৎকালীন প্রসিদ্ধ কয়েকটি বাংলা পুস্তকের

বিষয়বস্তু রচনাভঙ্গী ও লেখক সম্বন্ধেও ঐতিহাসিক আলোচনা করা হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালে 'সমাচার চন্দ্রিকা', 'সংবাদ প্রভাকর', 'সম্বাদ ভাস্কর', 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ', 'সোমপ্রকাশ' ও 'রহস্য-সন্দর্ভ' পত্রিকায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের বহু উপকরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে প্রকাশিত 'দি ক্যালকাটা রিভিয়ু' ত্রৈমাসিকেও রেভারেণ্ড লং প্রমুখ বহু বৈদেশিক ও দেশীয় পণ্ডিত লিখিত প্রবন্ধে এবং পত্রিকাশেষে সন্নিবিষ্ট দেশীয় ভাষার পুস্তক-সমালোচনার মধ্যে যথেষ্ট উপকরণ আছে। রেভারেণ্ড লং, জে. ওয়েঙ্গার, জে. মার্ডক প্রভৃতিও অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষায় এবং বাংলা ভাষা সম্বন্ধে প্রকাশিত পুস্তকের কয়েকটি তালিকা প্রস্তুত ও প্রকাশ করিয়া ইতিহাস-রচনার বহু উপকরণ জোগাইয়া গিয়াছেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষ চতুর্থাংশ হইতে 'ক্যালকাটা গেজেটে'র লিটারারি সাপ্লিমেণ্টে সেই বৎসর হইতে প্রকাশিত যাবতীয় বাংলা পুস্তকের তালিকা দেওয়া হইতেছে।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি তারিখে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস ও ৪ঠা মে তারিখে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পত্তন হইতে সুরু করিয়া ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে মে 'সমাচার দর্পণে'র প্রকাশকাল পর্য্যন্ত এই আঠার বৎসরের ইতিহাস অতিশয় মূল্যবান। ডক্টর সুশীলকুমার দে ও শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অশেষ অধ্যবসায়ের ফলে সম্পূর্ণ আধুনিক পদ্ধতিতে এই যুগের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে—ইঁহারাই সর্ব্বপ্রথম বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীর অনুসরণ করেন। এই উভয়ের, বিশেষ করিয়া ব্রজেন্দ্রবাবুর যত্নলব্ধ গবেষণার উপর নির্ভর করিয়া বর্ত্তমানে যে কেহ এই যুগের ইতিহাস রচনা করিতে পারেন। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দী ও পূর্ব্ববর্ত্তী বাংলা গদ্যসাহিত্যের উপকরণ এখনও পর্য্যাপ্ত নয়।

মুদ্রিত ইতিহাস

সুশীলকুমার দে ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্ব্বে অনেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস, পুস্তক ও পুস্তিকাকারে মুদ্রিত করিয়াছেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা কুমারটুলি ১৯ নং জয়মিত্র ঘাট লেনের মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথম 'বঙ্গভাষার ইতিহাস' পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। অনেকে ভুল করিয়া 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব'-রচয়িতা রামগতি ন্যায়রত্নকে প্রথম ইতিহাস রচনার সম্মান দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার পুস্তকের প্রকাশকাল ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ। রমেশচন্দ্র দত্তের *The Literature of Bengal* পুস্তক ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বাহির হয়। 'জাতীয় সভা'য় প্রদত্ত রাজনারায়ণ বসুর 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা' ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে, ঢাকার কলেজভবনে প্রদত্ত গঙ্গাচরণ সরকারের 'বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভাষা বিষয়ে বক্তৃতা' ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে এবং 'সাবিত্রী লাইব্রেরি'র বাৎসরিক উপলক্ষে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক পঠিত "বর্ত্তমান শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্য" ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। কৈলাসচন্দ্র ঘোষের 'বাঙ্গালা সাহিত্য' পুস্তক ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় এবং ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে কুমিল্লা হইতে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র

সেন তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' পুস্তক প্রকাশ করেন। পদ্মনাভ ঘোষালের কোনও ইতিহাস আমরা দেখি নাই। কৈলাসচন্দ্র সিংহ ধারাবাহিকভাবে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় (দশম কল্প, ৩য় ও ৪র্থ ভাগ, ১৮৮১-৮২ খ্রীঃ) এবং বঙ্কিমচন্দ্র 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকার ১০৪ সংখ্যায় (১৮৭১ খ্রীঃ) বেনামীতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণী* প্রকাশ করেন, তাহা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয় নাই। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত জন ক্লার্ক মার্শম্যানের 'দি লাইফ এণ্ড টাইমস অব কেরী মার্শম্যান এণ্ড ওয়ার্ড' পুস্তকের নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মার্শম্যানের বাংলার ইতিহাস-অবলম্বনে বিদ্যাসাগর মহাশয় যে 'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রকাশ করেন (১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ) তাহাতেও কিছু উপকরণ আছে।†

বিংশ শতাব্দীতে, বিশেষ করিয়া বিগত দশ বৎসরের মধ্যে, ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে অনেকগুলি পুস্তক ও পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। সকলগুলির পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয় এবং তাহার প্রয়োজনও নাই। ইহার মধ্যে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বঙ্গভাষার লেখক', ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'রাজনারায়ণ বসুর আত্ম-চরিত', ১৯১৩ ও ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বিপিনবিহারী গুপ্তের 'পুরাতন প্রসঙ্গ' ১ম ও ২য় পর্য্যায়, ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত কেদারনাথ মজুমদারের 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য' ১ম খণ্ড, ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে প্রণীত *History of Bengali Literature in the Nineteenth Century, 1800—1825*, ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের *The Origin and Development of the Bengali Language* এবং ১৯৩২ হইতে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' তিন খণ্ড, 'দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস' প্রথম খণ্ড, 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা ১-৯—এই কয়খানি পুস্তকই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাংলা গদ্যের ইতিহাস অসম্পূর্ণ ও পরস্পরবিরোধী

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে যে সকল পুস্তক লিখিত ও প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ সম্পর্কে এমন পরস্পরবিরোধী সংবাদ পাওয়া যায় যে একটা ধারাবাহিক ইতিহাস গড়িয়া তোলা কঠিন। অধ্যবসায় এবং

---

* "Bengali Literature", pp. 294-316.

† কালিদাস মৈত্র প্রণীত 'বাষ্পীয় কল ও ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে' (১৮৫৫ খ্রীঃ), হরিমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'কবিচরিত' (১৮৬৯ খ্রীঃ) এবং 'দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন' প্রভৃতি পুস্তকে ইতিহাসের উপাদান থাকিলেও ঠিক ইতিহাসের পর্য্যায়ে এগুলিকে ফেলা চলে না।

উপকরণের অভাবে ইঁহারা প্রত্যেকেই ভ্রান্ত এবং কল্পিত বিবরণী দিয়াছেন বিংশ শতাব্দীতে এই যুগের একটা সত্য ইতিহাস রচনার প্রয়াস আরম্ভ হয়। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের *History of Bengali Language and Literature* পুস্তকের ৮২৮ হইতে ৮৪৪ পৃষ্ঠায় বাংলার প্রাচীনতম গদ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। ইহা মূলত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু-সঙ্কলিত অষ্টাদশ ভাগ 'বিশ্বকোষে'র (১৯০৭ খ্রীঃ) "বাঙ্গালা সাহিত্য" বিষয়ক আলোচনা হইতে গৃহীত। বস্তুত পরবর্ত্তী কালে এই 'বিশ্বকোষ'কেই কেন্দ্র করিয়া বাংলা গদ্যের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে। 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র ২য় বৎসরে (১৮৯৫ খ্রীঃ) রজনীকান্ত গুপ্ত "বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্য" (পৃ. ৩০-৫০) নাম দিয়া এক বিস্তৃত নিবন্ধ প্রকাশ করিয়া গদ্যসাহিত্য সম্বন্ধে স্বতন্ত্র আলোচনায় সকলকে উৎসাহিত করেন। পরে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে *History of Bengali Literature in the Nineteenth Century* পুস্তকের Appendix I (পৃ. ৪৫৫-৮৬)-এ প্রথম যুগের বাংলা গদ্যের আর একটু সুষ্ঠু এবং ধারাবাহিক ইতিহাস দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন-সম্পাদিত 'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়ে'র দ্বিতীয় খণ্ডে এবং শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র-সম্পাদিত *Types of Early Bengali Prose* (১৯২২ খ্রীঃ) পুস্তকে প্রাচীনতম বাংলা গদ্যের অনেক নমুনাও উদ্ধৃত হইয়াছে। কেদারনাথ মজুমদার-প্রমুখ কয়েক জন কেবলমাত্র বাংলা গদ্যসাহিত্যের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য' (১৯৩৪ খ্রীঃ) ও শ্রীযুক্ত জহরলাল বসুর 'বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস' (১৯৩৬ খ্রীঃ) অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত আলোচনা। কিন্তু উপকরণের অভাবে এ ইতিহাসগুলি সম্পূর্ণ নয়। বহু পরস্পরবিরোধী কথাও আছে।

এই বহুল পরিমাণে কল্পিত ও পরস্পরবিরোধী উপকরণের মধ্য হইতে একটা ধারাবাহিক ইতিহাস গড়িয়া তোলা সহজ নয়। অধুনা-অজ্ঞাত উপাদানে ও পদ্ধতিতে নির্ম্মিত কোনও প্রাচীন মন্দির ভাঙিয়া গেলে আমরা যেমন বিচ্ছিন্ন উপাদানগুলিই দেখাইতে পারি, তদ্দ্বারা কিছু গড়িয়া তুলিতে পারি না, আজিকার দিনে বাংলা গদ্যের আদিম অবস্থা বুঝাইতে হইলে আমাদিগকে সেইরূপ বিচ্ছিন্ন উপাদানই দেখাইতে হইবে।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গোড়ার কথা

প্রথমেই শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের *Origin and Development* পুস্তকের ভূমিকায় "Oldest Remains of Bengali" শীর্ষক আলোচনা হইতে (পৃ. ১০৮-১৩৫) গোড়ার কয়েকটি কথা সঙ্কলন করিতেছি।

১। সংস্কৃত→প্রাকৃত→অপভ্রংশ হইতে খ্রীষ্টীয় দশম শতকের কোনও সময়ে পুরাতন বাংলার জন্ম।

২। উড়িয়া, আসামী ও বাংলা সমগোত্রজ।

৩। ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে প্রাচীনতম বাংলার নমুনা—

(ক) কয়েকটি শিলা ও ধাতু লেখে এবং প্রাচীন পুস্তকে ব্যবহৃত স্থানের নাম। পঞ্চম শতাব্দী হইতেই এগুলির সূত্রপাত। কোনও কোনও ক্ষেত্রে পণ্ডিতেরা এই নামগুলিকে সংস্কৃতরূপ দিবার প্রয়াস করিয়াছেন।

(খ) বন্দ্যঘাটীয় বাঙালী পণ্ডিত সর্ব্বানন্দ-কৃত (১১৫৯ খ্রীঃ) 'অমরকোষে'র টীকায় ('টীকাসর্ব্বস্ব') ত্রিশতাধিক বাংলা শব্দ। এই গ্রন্থ বাংলা দেশে লুপ্ত হইয়া মালাবার অঞ্চলে রক্ষিত ছিল। ১৩২৬ বঙ্গাব্দের ২য় সংখ্যা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় রায়-বাহাদুর যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি ("সাড়ে সাত শত বৎসর পূর্ব্বের বাংলা শব্দ") ও শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় ("দ্বাদশ শতকের বাংলা শব্দ") এই শব্দগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

(গ) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক নেপালে আবিষ্কৃত ৪৭টি চর্য্যাপদ। এগুলি শাস্ত্রীমহাশয়-সম্পাদিত ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত—'হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা', (১৯১৬ খ্রীঃ) পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে।

৪। ইহার পরেই বাংলা ভাষার নমুনা হিসাবে চণ্ডীদাস-কৃত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' ও রমাই (বা রামাই) পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণ' উল্লিখিত হইয়া থাকে। এগুলি খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ হইতে ষোড়শ শতকের মধ্যে রচিত। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার 'প্রাকৃতপিঙ্গল' নামক অপভ্রংশ ভাষায় বিরচিত গ্রন্থের কয়েকটি গানকে বাংলা বলিয়াছেন; এগুলি ৯০০ হইতে ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত। শিখেদের 'আদিগ্রন্থে' দুইটি পদ জয়দেবের রচিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে; কাহারও কাহারও মতে তাহাও প্রাচীন বাংলায় রচিত। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'কেও অনেকে প্রাচীন বাংলা হইতে পরে সংস্কৃতে রূপান্তরিত বলিয়া মনে করেন। জয়দেব খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের কবি।

৫। ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষা সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত।

৬। ১৫০০ খ্রীঃ হইতে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইহার পূর্ণ বিকাশ।

বাংলা গদ্যের অন্ধকার-যুগ

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই নয় শত বৎসরের সাহিত্যের ইতিহাসে গদ্যের স্থান নাই। খ্রীষ্টীয় ১৭৪৩ অব্দে পোর্ত্তুগালের লিসবন নগরে প্রথম বাংলা গদ্যগ্রন্থ 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' মুদ্রিত হয়। এই তারিখকে বাংলা গদ্যের প্রামাণিক যুগের সূত্রপাত ধরিয়া বাংলা ভাষার জন্ম হইতে (৯০০ খ্রীঃ) উক্ত ১৭৪৩ খ্রীঃ পর্য্যন্ত ৮৪৩ বৎসর বাংলা গদ্যের অন্ধকার-যুগ।

কিছু শিলালেখ ও তাম্রশাসন, কিছু দলিল-দস্তাবেজ ও চিঠিপত্র, কয়েকটি গ্রন্থের অংশ এবং কয়েকটি সম্পূর্ণ সহজিয়া পুথি এই যুগের গদ্যের নমুনা হিসাবে উল্লিখিত ও

প্রদর্শিত হইয়া থাকে। যাঁহারা ইতিপূর্ব্বে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন,* তাঁহাদের সকলেরই মূল অবলম্বন 'বিশ্বকোষে'র "প্রাচীন গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস" প্রবন্ধ। 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র নানা প্রবন্ধেও বহু নূতন উপকরণের সন্ধান পাওয়া যায়। এই সকল উপকরণের প্রামাণিকতা নির্ণয়ের উপায় নাই। এইগুলিকে বিশ্বাস করিলে এই যুগের বাংলা গদ্যসাহিত্যের বিচ্ছিন্ন রূপ ধারাবাহিকভাবে এইরূপ দাঁড়ায়:

চণ্ডীদাসের 'চৈতন্যরূপপ্রাপ্তি' ও রমাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণান্তর্গত 'বারমাসি' প্রভৃতি গদ্যাংশ বাংলা গদ্যের আদিমতম নমুনা বলিয়া উল্লিখিত হয়। বর্ত্তমানে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, চণ্ডীদাস ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দের শেষ পাদের লোক; শূন্যপুরাণ (যাহা আমরা মুদ্রিত আকারে পাইতেছি) সপ্তদশ শতকের রচনা। তাহা হইলে প্রথম বাংলা গদ্যের নমুনা তারকেশ্বর মোহন্তের প্রসিদ্ধ মামলার আপীলের পেপার-বুক হইতে জহরলাল বসু কর্তৃক উদ্ধৃত (পৃ. ২৫) হইয়াছে। ইহা রাজা ভারামল্ল রায় প্রদত্ত একটি ছাড়পত্র, ৭৮৫ সালের ১০ই চৈত্র লিখিত; ইংরেজী ১৩৭৮-৭৯ খ্রীষ্টাব্দ। এই পত্রের একটি ফটো-প্রতিলিপি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত হওয়া উচিত। পত্রটি এইরূপ—

৺শ্রীশ্রীরাম

স্বস্তি সকল মঙ্গলময় শ্রীশ্রী৺তারকেশ্বর ঠাকুর চরণযুগলেষু—

দেবত্তর জমি পত্রহ মিদং কার্য্যনঞ্চাগে পরগণে বালিগড়ি ও সেনাবাগ দীঃ গ্রাম জোতশমস, ভঞ্জপুর, নাগাদী শাহাপুর—এই সকল গ্রাম সেবার কারণ—জমি শালীগুনা হর্দ্দ মহদুদ ঘোড় দৌড় জত জোত করিতে পার তাহা জোত করিবে—সেবাত শ্রীযুক্ত মায়াগিরি ধূম্রপান মোহন্তীতে নিযুক্ত থাকিয়া [রা ?] জুতিয়া যোতায়া শ্রীশ্রী৺সেবা করহ এ সকল জমির রাজস্ব সহিত দায় নাস্তি ইতি সন ৭৮৫ সাল ১০ই চৈত্র।

শ্রীরাজা ভারামল্ল রায় [নাগরীতে]

রায়নার কৈলাসচন্দ্র ঘোষ তাঁহার 'বাঙ্গালা সাহিত্য' (১২৯২ বঙ্গাব্দ) পুস্তকে আদি-যুগের বাংলা গদ্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

গোবিন্দ দাস, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস রচিত বহুল গদ্য রচনা পাঠ করিয়াছিলেন; সেই জন্যই তিনি বিদ্যাপতি প্রভৃতির বন্দনাস্থলে এ কথার উল্লেখ করিয়াছেন,...

কিয়ে কিয়ে করে চিত চমকয়ে ঐছন,
রসময় চম্পূ বিথারি। ইত্যাদি।

চম্পূ শব্দের অর্থ গদ্য পদ্যময় কাব্য;...আরও দেখিতে পাই, বৈষ্ণব কবি বৈষ্ণবদাস [পদকল্পতরু-কার] কবিবন্দনাস্থলে...লিখিয়াছেন...

---

* বিশ্বকোষ, প্রথম সংস্করণ, ১৮ ভাগ, পৃ. ১৮৮-১৯৬; দীনেশ সেন—Bengali Language and Literature, ১৯১১, পৃ. ৮২৮-৮৪৪; ঐ—'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৫৬৫-৫৭০; ঐ—'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়', ২য় ভাগ, পৃ. ১৬৩০-৪৩, ১৬৫৫-৫৬, ১৬৭২-১৬৭৯; শিবরতন মিত্র—Types of Early Bengali Prose, ১৯২২; সুশীল দে—Bengali Literature in the Nineteenth Century, 1919, পৃ. ৪৫৫-৮৬; জহর বসু—'বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস', ১৯৩৬, পৃ. ২০-৫৪।

জয় জয় চণ্ডীদাস রস শেখর
অখিল ভুবনে অনুপম।
যাকর রচিত মধুর রস নিরমল
গদ্য পদ্যময় গীত। [পৃ. ১২-১৩]

সুতরাং চণ্ডীদাস যে গদ্য লিখিয়াছিলেন এই বিশ্বাস বহুদিন হইতেই চলিতেছে। 'বিশ্বকোষ'-কার চণ্ডীদাসকৃত 'চৈত্যরূপপ্রাপ্তি'র পরিচয় দিয়াছেন—"ইহার যে সকল পাণ্ডুলিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহা বাং ১০৮১ সালের লিখিত।" ভাষার নমুনা এইরূপ—

চৈতন্নপের রা চ অধরূপ লাড়ি। রা অক্ষরে রাগ লাড়ি। চ অক্ষরে চেতন লাড়ি। র এতে চ মিশিল, রা এতে বসিল। ইবে এক অঙ্গা লাড়ি।…জিহু রজকিনী তিহু রাগমই। রাগ আত্মা শ্রীমতীর অঙ্গ এক হন। জিহু চেতনরূপ তিহু চণ্ডীদাস। কার দেহ। শ্রীমতীর অন্তরঙ্গা দেহ। রজকিনী কার দেহ। চণ্ডীদাসের অন্তরঙ্গা দেহ।

চৈতন্যদেবের পার্শ্বচর রূপগোস্বামী-কৃত 'কারিকা' গদ্যে লিখিত। কৈলাসচন্দ্র ঘোষ ইহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ভাষা এইরূপ—

প্রথম শ্রীকৃষ্ণ গুণ নির্ণয়। শব্দগুণ গন্ধগুণ রূপগুণ রসগুণ স্পর্শগুণ এই পাঁচ গুণ। এই পঞ্চ গুণ শ্রীমতি রাধিকাতেও বসে।…পূর্ব্বরাগের মূল দুই হটাৎ শ্রবণ অকস্মাৎ শ্রবণ।

বাংলা গদ্যের প্রাচীনতম নমুনার অন্যতম, রূপগোস্বামী-কৃত 'কারিকা'টিও কোনও সাধারণ প্রতিষ্ঠানে সযত্নে রক্ষিত হওয়া উচিত।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে শূন্যপুরাণের যে সংস্করণ বাহির হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, পুস্তকটি মূলত পদ্য হইলেও মধ্যে মধ্যে ভাঙা গদ্য-রচনা আছে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় যে পুথি হইতে ইহা সম্পাদনা করিয়াছেন তাহা সপ্তদশ শতকের লেখা বলিয়া অনুমান হয়। শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মনে করেন—

……the so-called prose passages, if not the verse, reveal a much earlier and more antique form of diction. If the language of the recently published *Sri Krsna Kirtana* belongs to the early part of the 14th century, we can safely assume that the prose of *Sunya Puran* must have had its origin in a somewhat earlier age…… —*Bengali Literature in the Nineteenth Century*, p. 457.

এই উক্তি সত্য বলিয়া মানিয়া লইলে শূন্যপুরাণের ভাঙা গদ্যকেই প্রথম বাংলা গদ্যের গৌরব দিতে হয়। ভাষার নমুনা এইরূপ—

কোন মাসে কোন রাসি। চৈত্র মাসে মীন রাসি। হে কালিন্দিজল বার ভাই বার আদিত্ত। হস্ত পাতি লহ সেবকর অর্ঘ পুষ্পপানি। সেবক হব সুখি আমনি ধামাং কল্লি। গুরু পণ্ডিত দেউল্যা দানপতি। সাংসুর ভোক্তা আমনি।

এইগুলি ব্যতীত শ্রীনীলাচলদাস-কৃত 'দ্বাদশপাট নির্ণয়', কৃষ্ণদাস কবিরাজ-কৃত 'রাগময়ীকণা' ও 'আলম্বনচন্দ্রিকা' নরোত্তম দাসের 'রাগমালা' ও 'শিক্ষাপটল' এবং সহজিয়া সম্প্রদায়ের নিম্ননামাঙ্কিত পুথিগুলি 'বিশ্বকোষ' কর্তৃক বাংলা গদ্যের এই অন্ধকার-যুগের নমুনা হিসাবে উল্লিখিত হইয়াছে।

আশ্রয় নির্ণয়, আত্মজিজ্ঞাসা, দাস্যাদ্যষ্টভাবার্থ, উপাসনাতত্ত্ব, সিদ্ধতত্ত্ব, ত্রিগুণাত্মিকা, আত্মসাধন, ভোগপটল, দেহভেদতত্ত্বনিরূপণ, চন্দ্রচিন্তামণি, আত্মজিজ্ঞাসা-সারাৎসার, তিন মানুষের বিবরণ, সাধনাত্রয়, সিদ্ধান্তটীকা, কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ, উপাসনানির্ণয়, স্বরূপবর্ণন, দেহকড়চ, চম্পককলিকা, আত্মতত্ত্ব, তত্ত্বকথা, পঞ্চাঙ্গনিগূঢ় তত্ত্ব, হরিনামের অর্থ, গোষ্ঠীকথা, সিদ্ধিপটল, জিজ্ঞাসাপ্রণালী, জবামঞ্জরী, ব্রজকারিকা, রসভজনতত্ত্ব ইত্যাদি।

এগুলির ভাষা প্রায় সর্ব্বত্রই এক, যে কোনও পুথির নমুনা দিলেই সাধারণভাবে ইহাদের ভাষা সম্বন্ধে ধারণা জন্মিবে। 'ব্রজকারিকা' হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—

এই পঞ্চগুণ হইতে প্রেমবৃক্ষ হৈল। সেই সে রাধিকার রূপ। সেই বৃক্ষে দুই শাখা নিকসিল। সে কে কে ? এক সখীভাব আর শাখাবিভাব। ক্রমে দক্ষিণ বাম জানিবেন। দর্শন আনন্দ মহাভাব দক্ষিণে। বিচ্ছেদ স্পর্শন বামশাখাতে নিকসিল। এই দুই শাখাবৃক্ষ উজ্জ্বল হইল। তাহার ফল দক্ষিণ শাখার ফল তার নাম মিলন।

এই অন্ধকার-যুগের শেষের দিকে আরও কয়েকটি গ্রন্থ লিখিত ও প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। ভাষা তখন রূপ লইয়াছে ; নিতান্ত খাপছাড়া বা ভাঙা ভাঙা সন্ধ্যাভাষা নয়। গ্রন্থগুলির নাম ও সংক্ষেপ বিবরণ এইরূপ।

১। বৃন্দাবনপরিক্রমা। যে পুথি হইতে ইহা উদ্ধৃত হইয়া থাকে তাহা ১২১৮ সালে লিখিত। কেহ কেহ অনুমান করেন এই পুথি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রচিত হইয়াছিল।

২। বৃন্দাবনলীলা। দুই শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। ভাষা প্রাঞ্জল।

৩। বেদাদিতত্ত্ব নির্ণয়।

৪। ভাষাপরিচ্ছেদ। যে পুথি হইতে ইহা উদ্ধৃত তাহার তারিখ বঙ্গাব্দ ১১৮১। সম্ভবত উহা ঐ নামীয় সংস্কৃত মূলের বঙ্গানুবাদ।

৫। জ্ঞানাদি সাধনা। পুথির তারিখ ১১৫৮ বঙ্গাব্দ। ১৩০৪ বঙ্গাব্দের 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র ৩৪১ পৃষ্ঠায় 'সাধনা কথা' নামে উল্লিখিত।

৬। ব্যবস্থাতত্ত্ব।

৭। স্মৃতিকল্পদ্রুম।

৮। বেদান্তাদি দর্শনশাস্ত্রের অনুবাদ।

৯। দেব ডামর তন্ত্র।

১০। পাচনসংগ্রহ।

১১। কবিরাজী পাতড়া।

১২। কামিনীকুমার। দীনেশবাবুর বিবেচনায় ইহা ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত।

১৩। কুলজীপটী ব্যাখ্যা।

১৪। জয়নাথ ঘোষের রাজোপাখ্যান।

দৃষ্টান্ত হিসাবে 'ভাষাপরিচ্ছেদ' অংশত উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই অন্ধকার-যুগের কথা শেষ করিতেছি।

গোতম মুনিকে শিষ্য সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমারদিগের মুক্তি কি প্রকারে হয় তাহা কৃপা করিয়া বলহ। তাহাতে গোতম উত্তর করিতেছেন তাবৎ পদার্থ জানিলেই মুক্তি হয়। তাহাতে শিষ্যেরা সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন পদার্থ কতো। তাহাতে গোতম কহিতেছেন। পদার্থ সপ্ত প্রকার। দ্রব্য গুণ কর্ম্ম সামান্ত বিশেষ সমবায় অভাব। তাহার মধ্যে দ্রব্য নয় প্রকার।

এই সকল পুথি ও পুস্তকের অস্তিত্ব মানিয়া লইলে বাংলা গদ্যের বয়স যথেষ্ট বাড়িয়া যায় সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রদর্শিত নমুনাগুলি যে সকল পুথি হইতে সংগৃহীত তাহাদের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট অবকাশ আছে। অনেকগুলি নমুনা হইতে সন্দেহ হয়, সেগুলি গদ্য নয়, গুহ্যসাধন-সম্পর্কিত (সন্ধ্যাভাষায়) কতকগুলি ইঙ্গিত মাত্র। শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দের মতে, এগুলি বাংলা গদ্যের সূত্রপাতের যুগের নমুনা। আমাদের মনে হয়, তৎকাল-প্রচলিত কথ্য গদ্য ভাষার সহিত ইহাদের সম্পর্ক নাই। এগুলি সন্ধানী লোকের পরম্পর জানিত ইঙ্গিত—পরবর্ত্তী কালের বহু সহজিয়া পুথিতে এই ভাষারই ক্রমপরিণতি লক্ষিত হয়। বাংলা গদ্যের ইতিহাসে পাশাপাশি বসানো এই সকল দুর্ব্বোধ্য শব্দ লইয়া আলোচনা সমীচীন হইবে না।

অন্ধকার-যুগের অপেক্ষাকৃত প্রামাণিক পরিচয়

তারিখ-সম্বলিত চিঠিপত্র দলিল-দস্তাবেজগুলিকে প্রামাণিক বলিয়া মানিয়া লইলে ৭৮৫ বঙ্গাব্দের পূর্ব্বোদ্ধৃত ভারামল্ল রায়ের ছাড়পত্র হইতে সুরু করিয়া হালহেডের ব্যাকরণে মুদ্রিত (১৭৭৮ খ্রীঃ) ১১৮৫ বঙ্গাব্দের ১১ শ্রাবণ তারিখে লিখিত জগতধির রায়ের পত্র পর্য্যন্ত অপেক্ষাকৃত প্রামাণিক যুগ। ভারামল্লের ছাড়পত্রের পরই প্রাচীনতম প্রামাণিক পত্রটি ১৪৭৭ শক অর্থাৎ ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে কুচবিহারেব মহারাজা নরনারায়ণ কর্ত্তৃক আহোম বা আসামরাজ চুকাম্ফা স্বর্গদেবকে (ওরফে খোঁড়া রাজা) লিখিত হয়। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জুন তারিখের 'আসামবন্তি' পত্রিকায়* ইহা সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত হয়; পরে ১৩১৬ বঙ্গাব্দের উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের তৃতীয় (গৌরীপুর) অধিবেশনের সভাপতির (পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ) অভিভাষণে (কার্য্যবিবরণী, ৩৭ পৃ.) এই পত্র পুনর্মুদ্রিত হয়। পত্রটি এইরূপ—

স্বস্তি সকলদিগ দন্তিকর্ণতালাস্ফালসমীরণপ্রচলিতহিমকরহারহাসসকাশকৈলাসপাণ্ডবযশোরাশি-বিরাজিতত্রিপিষ্টপত্রিদশতরঙ্গিণীসলিলনির্ম্মলপবিত্রকলেবরধীষণপ্রচণ্ডধীরধৈর্য্যমর্য্যাদাপারাবারসকলাদিক্‌কামিনী-গীয়মানগুণসন্তানশ্রীশ্রীস্বর্গনারায়ণমহারাজপ্রচণ্ডপ্রতাপেষু।

লেখনং কার্য্যঞ্চ। এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি। অখন তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে। তোমার আমার কর্ত্তব্যে বার্দ্ধতাক পাই পুষ্পিত ফলিত হইবেক। আমরা সেই উদ্যোগত আছি।

* আসাম, তেজপুর হইতে প্রকাশিত।

তোমারো এগোট কর্ত্তব্য উচিত হয় না কর তাক আপনে জান। অধিক কি লেখিম। সত্যানন্দ কর্ম্মী রামেশ্বর শর্ম্মা কালকেতু ও ধুমা সর্দ্দার উভগু চাউনিয়া শ্যামরাই ইমরাক পাঠাইতেছি তামরার মুখে সকল সমাচার বুঝিয়া চিতাপ বিদায় দিবা।

অপর উকীল সঙ্গে ঘুড়ি ২ ধনু ১ চেঙ্গর মৎস ১ জোর বালিচ ১ জকাই ১ সারি ৫ খান এই সকল দিয়া গৈছে। আর সমাচার বুজি কহি পাঠাইবেক। তোমার অর্থে সন্দেশ সোমচেং ১ ছিট ৫ ঘাগরি ১০ কৃষ্ণচামর ২০ শুক্লচামর ১০। ইতি শক ১৪৭৭ মাস আষাঢ়।

১৫৫৩ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৩১ খ্রীষ্টাব্দে গৌহাটীর তদানীন্তন ফৌজদার নবাব আলেয়ার খাঁকে কোনও আসামী নৃপতি-লিখিত একখানি পত্রও ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট তারিখের 'আসামবন্তি'তে "ঐতিহাসিক চিঠি" শীর্ষক প্রবন্ধে মুদ্রিত হইয়াছে। এই পত্রের ভাষা অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য।

স্বস্তি বিবিধ গুণগাম্ভীর্য্য পরমোদার শ্রীযুক্ত নবাব আলেয়ার খাঁ সদাশয়েষু।

সস্নেহ লিখনং কার্য্যঞ্চ। আগে এথা কুশল। তোমার কুশল সততে চাহি। পরং সমাচার পত্র এহি। এখন তোমার উকিল পত্র সহিত আসিয়া আমার স্থান পহুঁছিল। আমিও প্রীতিপ্রণয়পূর্ব্বক জ্ঞাত হইলাম। আর তুমি যে লিখিয়াছ তোমার উত্তম পত্র আসিতে আমার কিঞ্চিৎ মনস্বিতা না রহে এ যে তোমার ভালাই দৌলত। অতএব আমিও পরম আহ্লাদরূপে জানিতে আছো তোমার আমার অদ্বয়ভাব প্রীতি ঘটিলে মনমাকিক সন্তোষ কি কারণ না হইবেক।...

অষ্টাদশ শতকে বাংলা-গদ্যের ভাষা একটা নির্দ্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। এখন পর্য্যন্ত পুরাতন পত্র ও দলিলাদি যাহা কিছু বাংলা-গদ্যের নমুনা হিসাবে আবিষ্কৃত হইয়াছে উপরোক্ত কয়েকটি দৃষ্টান্ত বাদে তাহার অধিকাংশই অষ্টাদশ শতাব্দীর রচনা। 'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়ে'র ১৬৭৩ পৃষ্ঠায় ১৬৮৯ ও ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দের লিখিত দুইখানি পত্র মুদ্রিত আছে, কিন্তু এই পত্রগুলির মূল ও তাহাদের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কোনও পরিচয় দীনেশবাবু দেন নাই। সপ্তদশ শতকের বাংলা-গদ্যের সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক নমুনা ব্রিটিশ মিউজিয়মের বাংলা কাগজপত্র হইতে শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ফটোগ্রাফ করিয়া আনিয়া ১৩২৯ বঙ্গাব্দের 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র তৃতীয় সংখ্যায় (পৃষ্ঠা ১১২) প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা একখানি প্রাচীন চুক্তিপত্র। ১১০৩ সাল অর্থাৎ ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহা রচিত হইয়াছিল। চুক্তিপত্রটি এইরূপ—

শ্রীকৃষ্ণ | সাখি শ্রীধর্ম্ম

শ্রীযুত মিত্রি গই সাহেব মিত্রি গারবেল মহাসহেযু

লিখিতং শ্রীকৃষ্ণদাস ও নরসিংহ দাস আগে আমারা দুই লুকে করার করিলাম জে কিছু বারে সুনারগায় ও গর খ রিকরি সকরাত ২ ছ ই রূপাইয়া করিআ আরত দলালি লইব আর কুন দায়া নাই খুরাক সমেত এই নিঅমে করা পত্র দিলাম স ১১০৩ তে ১৪ আগ্রান

সুনীতিবাবু ব্রিটিশ মিউজিয়ম হইতে ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দের একটি পত্র এবং অষ্টাদশ শতকে রচিত '৺মহারাজ বিক্রমাদিত্য চরিত্র' নামক গদ্যগল্পেরও নকল আনিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই গল্পটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

৺মহারাজ বিক্রমাদিত্য চরিত্র ।—

সাং অবন্তিকে—

মোং ভোজপুর শ্রীযুত ভোজরাজা তাহার কন্যা নাম শ্রীমতি মৌনাবতি সোডষ বরিস্যা বড় যুন্দরি মুখ চন্দ্রতুল্য কেষ মেঘের রঙ্গ চক্ষু আকর্ন্ন পর্য্যন্ত যুগ্য ভ্রূর ধনুকের নেয়ায় ওষ্ঠ রক্তিমে বর্ন্ন হস্ত পদ্মের মৃণাল স্তন দাড়িম্ব ফল রুপলাবন্য বিদ্যুৎছটা তার তুলনা আর নাঞী এমন যুন্দরি সে কন্যার বিবাহ হয় নাঞী। কন্যা পন করিয়াছে রাত্রের মধ্যে জে কথা কহাইতে পারিবেক তাহাকে আমি বিভা করিব। একথা ভোজরাজা স্থনে বড় বড় রাজার পুত্রকে নিমন্ত্রন করিয়া আনিলেক এক২ রাজার পুত্রকে এক২ দীন রাত্রের মধ্যে এক২ জোন কে সয়ন ঘরে লইয়া সয়ন করায় সে ঘরে আর কেহো থাকে না কেবল কন্যা : আর রাজপুত্র এক খাটে কন্যা সোয়ে : এক খাটে রাজপুত্র সোয়ে। জে রাজপুত্র জেমন জ্ঞানবান হয়। সে : সেইরূপ কথা সারারাত্র কহে। কন্যাকে কথা কহাইতে পারে না : সকালে উঠে : রাজপুত্র : ঘরে জায়। এইরূপ প্রকারে কত ২ রাজপুত্র আইল কেহো কথা কহাইতে পারিলেক না : কতমৎ প্রকার করিলেক তবু : কন্যাকে : কথা কহাইতে পারিলেক না।...

১১৭৮ সালের (ইংরেজী ১৭৭১) ২৯শে পৌষ তারিখে মহারাজ নন্দকুমার লিখিত একটি পত্র ইতিহাসের দিক্ দিয়া বাংলা গদ্যসাহিত্যের কাহিনীতে স্থান পাইবার যোগ্য। মহারাজ নন্দকুমার ইহা পুত্র গুরুদাসকে লিখিয়াছিলেন।

প্রাণপ্রতিমেষু পরম শুভাশীর্ব্বাদশিবঞ্চ বিশেষ :—

তোমার মঙ্গল সর্ব্বদা বাসনা করনক অত্র কুশল পরন্তু : ২৫ তারিখের পত্র ২৭ রোজ রাত্রে পাইয়া সমাচার জানিলাম শ্রীযুত ফেতরত আলি খাঁ এর এখানে আইশনের সম্বাদ জে লিখিয়াছিলে এতক্ষণ তক পঁহুছেন নাই পঁহুছিলেই জানা জাইবেক শ্রীযুত রায় জগৎচন্দ্র বিষরোজের পর বাটী হইতে আসিয়াছেন যেমত২ কুচেষ্টা পাইতেছেন তাহা জানাই গেল তিনি যথা২ জাউন ফলস্ত কার্য্যের দ্বারাতেই বুঝিবেন পষ্ট হইয়া আপনারি মন্দ করিতেছেন সে সকল লোকেও অবশ্য বুঝিবেক।

বাংলা গদ্যের প্রথম যুগের ভাষার নমুনা-স্বরূপ আরও অনেকে অনেক চিঠিপত্র ও দলিল প্রকাশ করিয়াছেন। সবগুলি প্রায়ই একই রীতিতে লিখিত সুতরাং প্রত্যেকটির উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বাংলা হরফে সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড প্রণীত ও ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হুগলিতে মুদ্রিত *A Grammar of the Bengal Language* পুস্তকে এই জাতীয় একটি পত্র আছে। বাংলা হরফে সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত বাংলা গদ্যের নমুনা হিসাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে তাহা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকা প্রয়োজন।

৭ শ্রীরাম—

গরিবনেওাজ শেলামত—

আমার জমিদারি পরগনে কাকজোল তাহার দুই গ্রাম দরিয়াশীকিশ্‌তী হইয়াছে শেই দুই গ্রাম পয়শ্‌তী হইয়াছে চাকলে একবরপুরের শ্রীহরেকৃষ্ণ চৌধুরি আজ রায় জবরদস্তী দখল করিয়া ভোগ করিতেছে আমি মালগুজারির শরবরাহতে মারা পড়িতেছি উমেদওয়ার যে সরকার হইতে আমিন ও এক চোপদার সর-জমিনেতে পহুচিয়া তোরফেনকে তলব দিয়া লইয়া আদালত করিয়া হকদারের হক দেলায়া দেন ইতি শন ১১৮৫ শাল তারিখ ১১ শ্রাবন

ফিদবি

জগতধির রায়

এই নমুনাটুকু হইতেই প্রাক্‌-আধুনিক যুগের বাংলা গদ্যের রীতি ও প্রকৃতি সুস্পষ্ট ধরা পড়িবে। মূল কাঠামোটি বাংলা হইলেও আরবি ও পারসি শব্দের প্রয়োগবাহুল্যে ইহা প্রায় দুর্বোধ্য ; অথচ আরবি ও পারসি শব্দে বাংলা প্রত্যয় নিরঙ্কুশভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে।

বাংলা গদ্যের ইতিহাসে পোর্ত্তুগীস প্রভাব

চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত 'চৈতন্যরূপপ্রাপ্তি'র 'রা অক্ষরে রাগ লাড়ি' অথবা 'শূন্যপুরাণে'র 'হস্ত পাতি লহ সেবকর অর্ঘ পুষ্পপানি' হইতে আরম্ভ করিয়া উপরিউক্ত ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের 'তোরফেনকে তলব দিয়া' পর্য্যন্ত ভাষার একটা প্রগতি ও ধারাবাহিকতা প্রায় অব্যাহত আছে। বাংলা-গদ্যের উহাই মূল ধারা। এই ধারাই পরবর্ত্তী কালে শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, ভবানীচরণ ও রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র ও অক্ষয়কুমার, কৃষ্ণমোহন ও রাজেন্দ্রলাল, ভূদেব ও বঙ্কিম কর্ত্তৃক পরিপুষ্ট হইয়া বর্ত্তমান বাংলা গদ্য-সাহিত্যরূপ সুবিশাল নদীতে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু মধ্যে ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ভূমিকম্পের মত একটা আকস্মিক বিপর্য্যয় ঘটিয়া গিয়াছে ; অন্ততঃ আজিকার দিনে ধারাবাহিকতার দিক্‌ দিয়া বিচার করিতে বসিয়া ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনাকে আকস্মিক বলিয়াই মনে হইতেছে। আকস্মিক না হউক মূল ধারার সহিত ইহার বিশেষ যোগ নাই।

সৌভাগ্যের বিষয়, এই ব্যাপারের মুদ্রিত দলিল আছে ; 'অন্ধকার যুগ' এবং 'চিঠিপত্র ও দলিলের যুগে'র মত আমাদিগকে সম্পূর্ণ অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হয় না। এবং এই কারণেই আমরা ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দেই প্রাথমিক যুগের সূত্রপাত বলিয়াছি।

১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ইতিহাসকে স্বতন্ত্র করিবার অথবা সাধারণ ধারার মধ্যে একটা বিপর্য্যয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার কারণ এই যে, এই ইতিহাস একটি বিশেষ প্রাদেশিক কথিত ভাষা সম্পর্কিত এবং এই আলোড়নের তরঙ্গ সীমাবদ্ধ কাল ও দেশে পরিসমাপ্ত। এই আলোড়নের ইতিহাস ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদে আরম্ভ এবং ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত ; ইহা সম্পূর্ণ পোর্ত্তুগীস প্রভাবের ফল। ষোড়শ শতাব্দী হইতেই এই প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ইহার ফলে বাংলা ভাষায় যে কিছু কাজ হইয়াছিল সমসাময়িক চিঠিপত্র ও বিবরণী হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। যথা—

১। Father Marcos Antonio Santucci, S. J., the Superior of the Misson among these Bengali converts between 1679 and 1684, wrote from Nolua Cot to the Provincial of Goa on January 3, 1683 : "The Fathers [Ignatius Gomes, Manoel Sarayva and himself] have not failed in their duty : they have learned the language well, have composed vocabularies, a grammar, a confessionary and prayers ; they have translated the Christian Doctrine [*Doutrina Christa* or Catechism], etc., nothing of which existed until now." [*O Chronista de Tissuary*, Goa, vol. II., 1867, p. 12.)—Father Hosten in ***Bengal : Past & Present***, **Vol IX, Part I, p. 46.**

২। "১৫৯৯ সালের ৭ই জানুয়ারী তারিখে যেসুইট্-সম্প্রদায়ভুক্ত ধর্মপ্রচারক Francisco Fernandes ফ্রান্সিস্কো ফের্নান্দেস্ পূর্ব্ব-বঙ্গে সোনারগাঁর সন্নিকটস্থ শ্রীপুর হইতে গোয়ায় উক্ত সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ Nicolas Pimenta নিকোলাস পিমেন্তা-র নিকট একখানি পত্র লেখেন, তাহাতে এই কথার উল্লেখ আছে যে, ফের্নান্দেস্ খ্রীষ্টান ধর্ম্মের মূল কথাগুলির ব্যাখ্যানপ্রসঙ্গে ছোট একখানি বই এবং একখানি প্রশ্নোত্তরমালা লেখেন, এবং ফের্নান্দেসের সহকর্ম্মী পাদ্রি Dominic de Souza দোমিনিক্-দে-সুজা বাঙ্গালাভাষা শিখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; তিনি এই দুইখানি বই বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন।"—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ', প্রবেশক, পৃ. ।/০

৩। "Father Barbier, as early as 1723, mentions that he prepared a little catechism in Bengali."—শ্রীসুশীলকুমার দে, *Bengali Literature*, p. 68.

৪। ১৫৯৯ সালে দোমিনিক সোসা নামক আর এক জন যীশুট যাজক বাঙ্গালা ভাষায় এই প্রকারের গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ("Sosa endeavoured to learn the Bengalan Language and translated into it a tracte of Christian Religion in which were confuted the Gentile and Mahumetan errours : to which was added a short Catechisme by way of Dialogue, which the children frequenting the schoole learned by heart." —*Purchas His Pilgrimes*, Vol. X. p. 205)...১৫৯৯ হইতে ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত একাধিক খ্রীষ্টান প্রচারক এই জাতীয় পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন।—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ', প্রস্তাবনা, পৃঃ ২।/০-২।৵০

কিন্তু এই সকল রচনার অধিকাংশই আজও পর্য্যন্ত আমাদের অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে।

তিনটি মাত্র গ্রন্থ আমাদের কাল পর্য্যন্ত পৌছিয়াছে। তন্মধ্যে আমাদের বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আলোচ্য পুস্তক দুইখানি—

(ক) Crepar Xaxtrer Orth, Bhed | Xixio Gurur | Bichar | Fr Manoel | da Assumpcam | Liqhiassen, O buzhaiassen Bengallate | Baoal dexe ; Xonhazar Xat Xoho pointix bossor | Christor Zormo bade | Bhetton | corilo boro Tthacurque | D. Fr Miguel | de Tavora | Evorar Xohorer Arcebispo | + Lisboate | Francisco | da Sylvar Xaze | Patxaer quitaber Xap | corinia | Xpor Zormo bossore 1743 | Xocol Uchiter hucume.

এই পুস্তকের এক খণ্ড ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এভোরার লাইব্রেরিতে রক্ষিত ছিল, সম্প্রতি তাহা লিসবনে স্থানান্তরিত হইয়াছে। একটি খণ্ডিত পুস্তক কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরিতে আছে। এই পুস্তক সম্বন্ধে যাঁহারা বিস্তৃতভাবে জানিতে চান, তাঁহাদিগকে নিম্নলিখিত পুস্তক ও প্রবন্ধ পড়িতে হইবে।

১। "The Three First Type-Printed Bengali Books"—H Hosten, S. J.; *Bengal: Past & Present*, Vol IX. Part I, July-Sept, 1914, pp. 40-63.

২। "ইউরোপীয়-লিখিত প্রাচীনতম মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তক"—শ্রীসুশীলকুমার দে; 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,' ত্রয়োবিংশ ভাগ, ৩য় সংখ্যা, ১৩২৩, পৃ. ১৭৯-১৯৫।

৩। "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ ও বাঙ্গালা উচ্চারণতত্ত্ব"—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়; ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ১৯৭-২১৭।

৪। *Bengali Literature in the Nineteenth Century*—S. K. De, 1919, pp. 67-75.

৫। 'পাদ্রি মানোয়েল-দা-আস্-সুম্প্‌সাম্-রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ'—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৯৩১, 'প্রবেশক' ও 'প্রবেশকের পরিশিষ্ট'। পৃ. ✓০-৩✓০

৬। 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ'—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, ১৯৩৭, 'প্রস্তাবনা' পৃ. ১✓০-৩।✓০।

এই পুস্তক কলিকাতা রঞ্জন পাবলিশিং হাউস হইতে শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রবন্ধ-লেখকের সম্পাদনায় বিস্তৃত ভূমিকা ও টীকা সহিত বাহির হইতেছে।

(খ) 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ,'—ভূষণার রাজপুত্র দোম আন্তোনিয়ো দো রোজারিয়ো প্রণীত।

এই পুস্তক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেনের সম্পাদনায় বাহির হইয়াছে। ফাদার হষ্টেনের নিকট লিখিত ফাদার লোপেসের পত্রে এটিও ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে লিসবনে ফ্রান্সিস্কো দা সিলভার ছাপাখানায় মুদ্রিত হওয়ার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে; শ্রীযুত সুরেন্দ্রবাবু তাহা বিশ্বাস করেন না। তিনি এভোরাতে ইহা পাণ্ডুলিপি আকারেই দেখিয়াছেন এবং মূল পুথির ১২০ পৃষ্ঠার মধ্যে ৮৫ পৃষ্ঠা নকল করিয়া আনিয়া ছাপাইয়াছেন। এই পুস্তক সম্বন্ধে তিনি ছাড়া এখন পর্য্যন্ত অন্য কেহ বিশেষ আলোচনা করেন নাই। "প্রস্তাবনা" দ্রষ্টব্য।

'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' ও 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ'

'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে পোর্ত্তুগালের লিসবন শহরে সম্পূর্ণ রোমান অক্ষরে মুদ্রিত হয়। ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৩৯১; গ্রন্থের বাঁ-দিকের পৃষ্ঠায় বাংলা এবং ডান দিকের পৃষ্ঠায় পোর্ত্তুগীস ভাষায় গুরুশিষ্যে রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে—সুতরাং বাংলা অংশের পরিমাণ ছাপার অক্ষরে প্রায় দুই শত পৃষ্ঠার মতন। টাইটেল পেজে গ্রন্থকর্ত্তা-হিসাবে পাদ্রী মানোএল দা আসসুম্পসাঁউ-এর নাম আছে। ইনি পোর্ত্তুগালের এভোরা শহরের অধিবাসী এবং পূর্ব্বভারতের মণ্ডলীভুক্ত অগস্তিনীয় সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ছিলেন। ইনি ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে আগমন করেন এবং ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই দেশে ক্যাথলিক ধর্ম্মপ্রচারে ব্যাপৃত থাকেন, তাহার প্রমাণ আছে। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে'র ভূমিকা হইতে জানা যায় যে, এই পুস্তক ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ভাওয়াল পরগণার নাগরীতে লিখিত হয়। মূল পোর্ত্তগীস অংশ মানোএলের লেখা, তিনি সম্ভবতঃ কোনও দেশীয় খ্রীষ্টানকে দিয়া বাংলা

অনুবাদ করাইয়া লইয়াছিলেন। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে চন্দননগরের ফরাসী পাদ্রী ফাদার গেরেঁ (Guerin) 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে'র একটি বিশুদ্ধীকৃত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। এই সংস্করণের লাতিন ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন যে, অনুবাদের কালে বৃদ্ধ ফাদার মানোএল মাঝে মাঝে যখন ঝিমাইয়া পড়িতেন, তখন দেশীয় অনুবাদক তাঁহার অজ্ঞাতে খ্রীষ্টধর্মবিরোধী নানা গালগল্প নিজেই জুড়িয়া দিত—অনেক ক্ষেত্রে মূল পোর্ত্তুগীসে ও অনূদিত বাংলায় মিল না থাকার ইহাই কারণ। পাদ্রী গেরেঁর উক্তি সত্য হইলে বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম বাংলা গদ্য-পুস্তকের রচয়িতা কোনও অজ্ঞাতনামা দেশীয় রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টান—ভাওয়ালের কোনও অধিবাসী। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' ভাওয়ালে প্রচলিত মৌখিক ভাষায় লিখিত। ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেনের 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ' পুস্তকের "প্রস্তাবনা" হইতে জানা যায়, "১৮৬৯ সালে গোয়ার সন্নিহিত মারগাঁও শহরে ক্রেপার শাস্ত্রের অর্থভেদ তৃতীয় বার মুদ্রিত হয়। লিসবনের জাতীয় গ্রন্থালয়ে (*Bibliotheca Nacional*) প্রথম ও তৃতীয় সংস্করণের পুস্তক আছে।"

'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ' ভূষণার রাজপুত্র দোম আন্তোনিয়োর রচিত। এ সম্বন্ধে যে কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে তাহা বিশ্বাস করিলে বলিতে হয়, 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ' সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রচিত হইয়াছিল—অর্থাৎ ইহা 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদের'ও পূর্ব্বের রচনা এবং ইহা নিঃসন্দেহে বাঙালীর রচনা। ভূষণার রাজপুত্র বাল্যকালে ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মগেদের দ্বারা অপহৃত হইয়া আরাকানে নীত হন। সেখানে ফাদার মানোএল দো রোজারিও নামক এক জন সেণ্ট অগস্তিন মণ্ডলীর ধর্ম্মযাজক তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। কথিত আছে যে, পরবর্ত্তী কালে ইঁহার প্রচারে ও প্রভাবে ঢাকা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রায় ত্রিশ হাজার লোক রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদে' এক জন ব্রাহ্মণ ও এক জন ক্যাথলিকের মধ্যে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে খ্রীষ্ট-মহিমা বর্ণিত হইয়াছে। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে'র ভাষার সহিত ইহার ভাষা খুব বেশী পৃথক্ নহে।

'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে'র ভাষার নমুনা—

গুরু। অপূর্ব্ব কথা কহিলা। কিন্তু কেহ কহিবে: আমি মালা জপি না; তথাচ আন ধরণ ভজনা করি; জপি খ্রিস্তর কাছে, আর আর সিদ্ধারে ভজনা করি, এহি ভজনার কারণ আশা রাখি স্বর্গের যাইবার, তাহান কৃপায়। তুমি কি বল।

শিষ্য। যে আমি কহি, তাহা তুমি শোন; সকল যত ভজনা ভালো, কিন্তু বিনে ঠাকুরাণীর ভজনায় কিছু নাহি, এবং ঠাকুরাণীর ভজনা বিনে আর যত ভজনায় বাছ মুক্তি পাইবার পাপ না করিলে। এবং ঠাকুরাণীর ধ্যান সকলের অতি উত্তম মালার ধ্যান। আশ্চর্য্য বুঝাই শোন।—পৃ. ৫৪

'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদে'র নমুনা—

ব্রা। যদি পরমার্থে জিগাসো, তবে যে বিচার তুমি কহো, এহাতে তো চিতে কদাচিতো লএনা যে পরমেশর এমত করেন; কিন্তু শাস্ত্রে কহে যে এ কথা যেতো কালের পাপে করমাক্কিতে লওয়াএ।—পাণ্ডুলিপি পৃ. ৬

১৭৪৩—১৭৭৮

ইহার পরেই বেণ্টো ডি সেলভেস্ত্রে বা ডিসুজা-রচিত দুইখানি পুস্তকের উল্লেখ পাওয়া যায়। বেণ্টো সম্ভবত ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে গোয়া নগরে জন্মগ্রহণ করেন এবং পরে কলিকাতা ও বাণ্ডেলে আসিয়া বাস করেন। কথিত আছে, তিনি প্রায় পনর বৎসর বঙ্গদেশে ছিলেন এবং এখানে অবস্থানকালে 'বুক অব কমন প্রেয়ার' ও 'ক্যাটিকিজম' পুস্তকের অনেক অংশ বাংলায় অনুবাদ করিয়া প্রচার করেন। তাঁহার পুস্তক দুইটি 'প্রশ্নোত্তরমালা' ও 'প্রার্থনামালা' নামে রোমান্ অক্ষরে লণ্ডনে মুদ্রিত হয়। 'বিশ্বকোষে' শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় 'প্রশ্নোত্তরমালা'র প্রকাশ-তারিখ ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়াছেন, কিন্তু শ্রীসুশীলকুমার দের মতে ইহার প্রকাশ-কাল আর কয়েক বৎসর পরে। এই দুইটি পুস্তক সম্বন্ধে আমাদের কোনও প্রত্যক্ষ পরিচয় নাই। কুত্রাপি ইহার অস্তিত্ব আছে বলিয়াও আমরা জানি না। বেণ্টোর পুস্তকের সন্ধান এবং ভাষার নমুনাও কেহ দেন নাই।

বাংলা অক্ষরের মুদ্রিত প্রতিলিপি

(১৬৯২-১৭৭৬)

এ পর্য্যন্ত বাংলা গদ্য সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হইল, 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' ব্যতীত তাহার কোনটিরই মুদ্রিত প্রমাণ নাই; 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'ও রোমান অক্ষরে মুদ্রিত। বাংলা উপকরণস্বরূপ কতকগুলি হস্তলিখিত পুথি, চিঠিপত্র ও দলিল মাত্র সম্বল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাংলা-গদ্যের ইতিহাসের সহিত ছাপাখানা ও ছাপার অক্ষরের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। বাংলা-গদ্যের আলোচনা সম্পর্কে বাংলা অক্ষরের মুদ্রিত প্রতিলিপি, মুদ্রাযন্ত্র ও ছাপার হরফের ইতিহাস আলোচনাও অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে এখন পর্য্যন্ত আলোচনাই হয় নাই। ডক্টর জি. এ. গ্রিয়ারসন তাঁহার বিখ্যাত *Linguistic Survey of India*, 1903, পুস্তকের পঞ্চম খণ্ডে "Specimens of the Bengali and Assamese Languages" প্রসঙ্গে (পৃ. ২৩) বাংলা অক্ষর সম্বন্ধে প্রথম আলোচনা করেন। পরে অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ('বাঙ্গালা ব্যাকরণ'—প্রবেশক) এ বিষয়ে বিস্তৃততর আলোচনা করেন।

বাংলা অক্ষরের মুদ্রিত প্রতিলিপির আদিমতম নিদর্শনের উল্লেখ করিয়াছেন ফাদার এইচ. হস্টেন। ১৬৯২ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত একটি পুস্তকে বাংলা অক্ষরের প্রতিলিপি সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত হয়।* মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রণের কথা বলিতেছি, কারণ শিলা ও তাম্রলিপিতে, তাল-

* "It was published with a Burmese alphabet in 1692 in a work containing observations by the Jesuit Fathers Jean de Fontenay, Guy Tachard, Etienue Noel and Claude de Beze. The title of the book is *Observations Physiques et Mathematiques pour servir a l'histoire naturelle, et a la perfection*

পাতায় এবং তুলোট কাগজে বাংলা অক্ষর বহুকালাবধি খোদিত বা লিখিত হইয়া আসিতেছে। ইহার ইতিহাস ১২০০ বৎসরের কম হইবে না। বাংলা অক্ষরের দ্বিতীয় নমুনা পাওয়া যায় ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর লাইপ্‌ৎসিক নগরে মুদ্রিত Georg Jacob Kehr (গেওর্গ্‌ য়াকোব্‌ কের্‌) প্রণীত লাটিন ভাষায় *Aurenk Szeb* নামক পুস্তকে।

১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত বাংলা বর্ণমালা

এই পুস্তকের ৪৮ পৃষ্ঠাতে ১ হইতে ১১ পর্য্যন্ত বাংলা সংখ্যা এবং ৫১ পৃষ্ঠার সম্মুখের প্লেটে বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণ ও একটি জার্মান নাম "শ্রীসরজন্ত বলপকাং মাএর" (Sergeant Wolffgang Meyer) বাংলা অক্ষরে ছাপা আছে। বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের এই চিত্রটিই পরে (১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে) লাইপ্‌ৎসিক নগর হইতে মুদ্রিত যোহান ফ্রীদ্‌রিখ্‌ ফ্রিৎস্‌ (Johann Friedrich Fritz) লিখিত 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাষা শিক্ষক' (*Orientalischer und*

de l'Astronomie et de la Geographie : Envoyees des Indes et de la Chine a l' Academie Royale des Sciences a Paris, per les Peres Jesuites. Avec les reflexions de Mrs. de l' Academie, et les Notes du P. Gouye, de la Compagnie de Jesus. A Paris, de l' Imprimerie Royale, M.DC.XCII ; 4°, pp. 113, 2 maps and 1 plate containing the characters of the people of Bengala and Baramas [Burma].—*Bengal : Past & Present,* vol. IX Part I, p. 40.

১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত বাংলা বর্ণমালার প্রতিলিপি

Occidentalischer Sprachmeister) নামক পুস্তকে পুনর্মুদ্রিত হয়। বাঙালী পাঠকের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য আমরা বাংলা অক্ষরের এই আদি নমুনার প্রতিলিপি প্রকাশ করিলাম।

I. *Devanagaram*

a ā ĭ ī ŭ ū ru rū lu lū ie ei o au am ahá ka kāga gā

gna schā scha dsā dsi gnā ta ta tta thā na ta tā da dā na pa pā ba ba

ma ja ra la wa schā schā sa ha la tha ra i tthi

II *Balabandu*

Wo na ma sidham A ā ĭ ī ŭ ū ri rī li lī ie ei o au am

ahá ka kā ga gā nha tsa tsa tse se je tha thā da da na ta da da

da napa ba ba ba ma ie ra la wa sa scha scha ha la itscha.

১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দের মুদ্রিত দেবনাগরী বর্ণমালার প্রতিলিপি

১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দের পরই ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে হলাণ্ডের লাইডেন নগর হইতে ডেভিড্ মিল (Davidis Millius) *Dissertationes Selectae* নামক (লাটিন ভাষায়) একখানি বই প্রকাশ করেন। এই বইয়ের শেষে Joannes Josua Ketelaer লিখিত 'Miscellanea Orientalia' নামক হিন্দুস্থানী ভাষার একটি ব্যাকরণ আছে। এই ব্যাকরণ-অংশে বাংলা ও দেবনাগরী বর্ণমালার প্রতিলিপি দুইটি স্বতন্ত্র প্লেটে ছাপা আছে। এখানে তাহা পুনর্মুদ্রিত হইল।*

* ডেভিড্ মিলের পুস্তকের এক খণ্ড ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সংগ্রহে আছে। তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে পুস্তকটি ব্যবহার করিতে দিয়াছেন। Georg Jacob Kehr প্রদত্ত নমুনা ব্রিটিশ মিউজিয়াম হইতে আনাইয়াছি।—লেখক।

কেটেলের নিজে ওলন্দাজ ছিলেন এবং তিনি ওলন্দাজ ভাষাতেই তাঁহার ব্যাকরণ লেখেন। ডেভিড্ মিল লাতিন ভাষায় তাহার অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। কেটেলের প্রণীত মূল ব্যাকরণ পাণ্ডুলিপি অবস্থাতেই আছে, ছাপা হয় নাই।

अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ

ऌ ॡ ए ऐ ओ औ अं अः

क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ

ट ठ ड ढ ण त थ द ध न

प फ ब भ म य र ल व

श ष स ह क्षः

क का कि की कु कू

के कै को कौ कं कः

১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত দেবনাগরী বর্ণমালা

বাংলা বর্ণমালার প্রতিলিপি সম্বন্ধে ডেভিড্ মিল তাঁহার লাতিন ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছেন তাহা কৌতূহলোদ্দীপক।

"আমি আরও দুইটি বর্ণমালা তাম্রফলকে খোদাই করিয়াছি—ব্রাহ্মণদিগের বর্ণমালার পরিচয় হিসাবে এখানি মূল্যবান বিবেচিত হইবে।...টেব্‌ল III Bতে যে ব্রাহ্মণ বর্ণমালা [অর্থাৎ বাংলা] প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা সমগ্র ভারতবর্ষে—বিশেষ করিয়া বাংলা, বেহার ও উড়িষ্যায় ব্যবহৃত হয়।"

বাংলা বর্ণমালা কোনও কালে সমগ্র ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হইত কি না ভাষাতত্ত্ববিদ্‌দের তাহা অনুসন্ধানের বিষয়।

মিল-প্রদত্ত দেবনাগর বর্ণমালা তেমন সুষ্ঠু নয়। সম্ভবতঃ লেখকের দোষে এইরূপ ঘটিয়াছে। ১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দে আমস্টারডামে প্রকাশিত আতানাসিউস কির্খের (Athanasius Kircher) লিখিত *China Illustrata* পুস্তকে দেবনাগরী বর্ণমালার সর্ব্বপ্রথম প্রতিলিপি পাওয়া যায়।

১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড অনূদিত *A Code of Gentoo Laws* পুস্তকে দুইটি স্বতন্ত্র প্লেটে বাংলা ও হিন্দী বর্ণমালা মুদ্রিত আছে। তাহার প্রতিলিপিও এই সঙ্গে প্রকাশিত হইল।

ইহার দুই বৎসর পরে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা হরফের জন্ম। এবং তখন হইতেই বাংলা গদ্যের উন্নতির সূত্রপাত। ক্রমশঃ

মুসলমান-যুগে ভারতের ঐতিহাসিকগণ

স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার, এম-এ, ডী-লিট

(প্রথম)

ছয় শত বৎসর ধরিয়া মুসলমানগণ ভারতে রাজত্ব করেন, এবং তাহার পরও কিছু দিন শাসনকার্য্যে মুসলমান-যুগের সরকারী ভাষা ও পদ্ধতি চলিতে থাকে। এই সুদীর্ঘ কালে মুসলমান রাজা ও সমাজ হইতে ভারতবর্ষ কতকগুলি দান পাইয়াছে যাহা আমাদের জাতীয় জীবনে নিজ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, এবং এখনও শেষ হয় নাই। বর্ত্তমান ভারতীয় সভ্যতা একটি মিশ্র পদার্থ, ইহার ক্রমবিকাশে মুসলমান-যুগের কৃতিত্ব কম আদরের নহে, কারণ ঐ ছয় শত বৎসরের শাসনের ফল ভারতবাসীদের দেহের, মনের অংশ হইয়া পড়িয়াছে। অনেক দিক্ দিয়া আমরা মুসলমান-যুগের আনীত পরিবর্ত্তনগুলি ভোগ করিতেছি; কিন্তু আজ তাহার একটি মাত্র আলোচনা করিব।

আমার মনে হয়, মুসলমান জগৎ ভারতকে যে দানগুলি দিয়াছে তাহার মধ্যে ইতিহাস-সাহিত্য একটি প্রধান। এটি ভারতের পক্ষে অপূর্ব্ব। আমরা দম্ভ করিয়া বলি, হিন্দুযুগে কি ইতিহাস ছিল না? আমাদের পুরাণই ইতিহাস, রামায়ণ মহাভারতও ইতিহাস, হর্ষচরিত, বিক্রমাঙ্কচরিত, রামচরিত এই ত ইতিহাস। এই যুক্তির উত্তর আমাদের এক জন বিখ্যাত লেখক রহস্যের আকারে কিন্তু সত্যসত্যই দিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "হনূমানের লেজ দু-হাজার ফুট লম্বা যে গ্রন্থে লেখা তাহা পুরাণ, আর যদি ঐ লেজটা ঘর্ষণ কর্ত্তন করিয়া তিন ফুটে নামান যায় তবে তাহা ইতিহাস হইবে।" অর্থাৎ ইতিহাস সত্য প্রকৃত জগতের ছবি, ইহা প্রকৃতির সত্য অতিক্রম করিতে পারে না। এজন্য পুরাণকে ইতিহাস বলা যাইতে পারে না, কোন ব্যক্তিকে ধরিয়া রচিত কাব্যকেও এই নাম দেওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ, ইতিহাস সময় ও ব্যক্তিগণের ঠিক পরে পরে সাজান একটি অস্থিকঙ্কাল অবলম্বন করিয়া রচিত হইবে, শুধু ভাবের উচ্ছ্বাস বা কথার রঙ্গীন কুয়াশা দিয়া এই শ্রেণীর সাহিত্য গঠিত হইতে পারে না।

হিন্দুযুগে এরূপ ইতিহাস রচিত হয় নাই, যদি হইয়া থাকে তবে তাহা সম্পূর্ণ লোপ পাইয়াছে। চীন-পরিব্রাজক ইয়াং চুয়াং (৬৩০ খ্রীঃ) বলেন যে ভারতবর্ষের "মধ্যদেশে" প্রত্যেক প্রদেশের ঘটনার কাহিনী সদ্য সদ্য লিখিবার পদ্ধতি ছিল, এবং এই বিবরণগুলিকে "নীলপীট" নাম দেওয়া হইত। কিন্তু এরূপ রচনার এক পৃষ্ঠাও রক্ষা পায় নাই, এবং সংস্কৃত সাহিত্যে ইহার উল্লেখ নাই।

সুতরাং মুসলমান-বিজেতাগণ যখন ইন্দ্রপ্রস্থে সাম্রাজ্য স্থাপন করিলেন, তখন তাঁহাদের সভাসদ কর্ত্তৃক রচিত কাহিনীই প্রথমে ভারতে ইতিহাস-পদবাচ্য হইল, সাহিত্যে

একটা নূতন ধারা আনিয়া দিল। পরে হিন্দুরা পারসিক ও অন্যান্য ভাষায় ইতিহাস লিখিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তাহা মুসলমান-লিখিত ইতিহাস অপেক্ষা অনেক অংশে নিরেশ হইল। মুসলমান-লেখকদের কয়েকটি মহা সুবিধা ছিল, যেমন—(প্রথম) এক সন ও তারিখ—হিন্দুদের অসংখ্য সন ও মাস-গণন পদ্ধতির মত নহে। (দ্বিতীয়) এক সাহিত্যিক ভাষা পারসিক। (তৃতীয়) একই সাহিত্যিক আদর্শ। (চতুর্থ) জাতিভেদ না থাকায় অনেক স্থলে মুসলমান অসিধারীরা কলম চালাইতেও দক্ষ ছিলেন—সাহিব-ই-সয়েফ্ ব কলম্; ইহার ফলে তাঁহাদের দৃষ্ট ঘটনার বর্ণনা অতিশয় সত্য ও উজ্জ্বল আকারে লিখিত হইত। এই সুবিধাগুলি হিন্দুদের ছিল না। তদ্ভিন্ন নানা দেশের নানা জাতি ইসলামের প্রভাবে ভারতে মিলিত হইয়া, অতি শীঘ্র প্রাদেশিক বা জাতিগত বৈষম্য ভুলিয়া গিয়া এক মিশ্রিত সাধারণ সমাজ গঠন করিয়া ফেলিত, এইরূপ লোকদের মধ্যে সাহিত্যের ছাঁচটা একই উচ্চ আদর্শ অনুসরণ করিত, এবং ইতিহাসগুলিও এলোমেলো হইতে পারিত না।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত হিন্দু ও মুসলমানের ইতিহাস পাশাপাশি রাখিয়া দেখিয়া আমার বিশ্বাস হইয়াছে যে হিন্দুরা ইহজগৎ অপেক্ষা পরলোকের কথাই বেশী ভাবে, তাহারা এই সব নশ্বর রাজরাষ্ট্র সন্ধিবিগ্রহ প্রভৃতি পার্থিব জিনিষ মনোযোগ করিয়া দেখিয়া লিখিয়া তাহা হইতে স্থায়ী সাহিত্য রচনা করিতে স্বভাবতঃই অনিচ্ছুক, অপারক, এক্ষেত্রে তাহারা মুসলমানদের তুলনায় অনেক নীচে। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি—সুবিখ্যাত নজীব্-উদ্দৌলার পারসিক জীবনী সৈয়দ নুরুদ্দীন হোসেন লেখেন, আর তাঁহারই সমসাময়িক এবং প্রতিদ্বন্দ্বী জাঠরাজা সুরজমলের জীবনী 'সুজনচরিত্র' নামে হিন্দী ভাষায় মিশ্রণ নামক এক হিন্দু রচনা করেন। দুই জনই শিক্ষিত পদস্থ লেখক, কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থ দুখানির মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। এমন কি হিন্দু মুন্‌শী বিহারীলাল কর্তৃক পারসিক ভাষায় রচিত নজীব্-উদ্দৌলার জীবনী, নুরুদ্দীনের গ্রন্থের তুলনায় চাঁদের পাশে জোনাকির মত নিষ্প্রভ দেখা যায়।

ভারত-বিজয়ী মুসলমান রাজারা ভারতের বাহিরের মুসলমান জগৎ হইতে ইতিহাস-রচনার আদর্শ সঙ্গে করিয়া আনেন, আর যুগে যুগে ইসলামীয় সভ্যতার কেন্দ্র খোরাসান, বাগদাদ, মিসর ও কর্ডোভা হইতে মুসলিম পণ্ডিতগণ ভারতে আসিয়া এই সাহিত্যকে নূতন রসে সতেজ করিয়া তুলিতেন। আমাদের এই সব রাজাদের নিজ নিজ ইতিহাস—অন্ততঃ পূর্ব্বজগণের কাহিনী, রচনা করাইবার একটি স্বাভাবিক আগ্রহ ছিল; অথবা তাঁহাদের সভায় প্রতিপালিত পণ্ডিতগণ নিজ নাম অমর করিবার জন্য উৎকৃষ্ট পারসিক ভাষায় সেই সেই যুগের ইতিহাস লিখিতেন। এইরূপে মহমূদ গজনবী হইতে দ্বিতীয় শাহ্ আলম পর্য্যন্ত আট শত বৎসর ধরিয়া ভারতের কোন-না-কোন অংশ লইয়া পারসিক ইতিহাস রচিত হওয়ায় এক মহাসমুদ্রের মত প্রকাণ্ড সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে। আমাদের মহা সৌভাগ্যের বিষয় যে, ইহার অতি অল্প অংশই লোপ পাইয়াছে।

আরও সৌভাগ্যের বিষয়, এই মহাসমুদ্রে আমরা এক জন প্রবলপ্রতাপান্বিত

কর্ণধার পাইয়াছি। তিনি লর্ড ডালহৌসীর ফরেন্ সেক্রেটারি সার্ হেনরি মায়ার্স এলিয়ট। তাঁহার আরব্ধ ও অধ্যাপক ডাউসন কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ-কৃত আট ভলুম *History of India as told by its own Historians* এই সব মুসলমান ঐতিহাসিকগণের জীবনী, গ্রন্থ-পরিচয়, সমালোচনা এবং অনেক স্থলে আংশিক অনুবাদ দিয়া এই ক্ষেত্রের বিস্তৃতি ও মূল্য বুঝিবার, এই ক্ষেত্রের নিজ নিজ নির্ব্বাচিত কোণ-টুকুতে গবেষণা করিবার পথ অতি সুগম করিয়া দিয়াছেন। এলিয়টের আরও মহান্ কীর্ত্তি এই সব পারসিক ইতিহাসের হস্তলিখিত পুথি সংগ্রহ। ডালহৌসী অতি জবরদস্ত বড়লাট ছিলেন, আজ এই রাজার রাজ্য জপ্ত করেন, কাল উহাকে কিছু জমি দেন, অথবা তৃতীয় এক রাজার সর্ব্বস্ব নীলামে চড়ান (যেমন নাগপুরকর ভোঁসলাদের)। সমস্ত ভারতের রাজন্যবর্গ তাঁহার প্রতাপে কম্পমান। এহেন লাটের ফরেন্ সেক্রেটারি ছিলেন—রাজার উপর রাজা, নবাব মহারাজ-শ্রেণীর দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। এই সাহেবের সখ ছিল পুরাতন পুথি সংগ্রহ করা, অর্থাৎ ভারতীয় ইতিহাস বা ঐতিহাসিক জীবনী লইয়া লেখা ফারসী গ্রন্থ পাইলে তিনি বড়ই সন্তুষ্ট হইতেন, ঐ বিষয়েই অনুসন্ধান আলোচনা করিতে ভালবাসিতেন। সুতরাং অতি দুষ্প্রাপ্য, অথবা সে পর্য্যন্ত জগতে অজ্ঞাত কোন ফারসী ঐতিহাসিক পুথি তাঁহাকে উপহার দিলে তাঁহার দরবারে অতি সহজে প্রবেশ করা যাইত, এমন কি তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া ছোটখাট রাজ্যও রক্ষা করা যাইত, অথবা কোন নবাবের পেন্‌সন বাড়ান যাইত। এইরূপে দিল্লীর বাদশাহী প্রাসাদে রক্ষিত অথবা প্রাচীন ওমরাদের জন্য সুন্দর অক্ষরে লিখিত মহামূল্যবান্ ফারসী পুথি তাঁহাদের বর্ত্তমান হতভাগ্য বংশধরেরা এলিয়টের নিকট ভেট দিতেন। ইহার মধ্যে এমন এমন গ্রন্থও আছে জগতে যাহার আর কোন নকল নাই। ভারতের মুসলমান-যুগের সমস্ত ফারসী ইতিহাস সংগ্রহ এবং অনুবাদ করা এলিয়টের জীবনের ব্রত ছিল ; এ কাজ তিনি আরম্ভ করিয়াছিলেন মাত্র, কারণ পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িল, তিনি বিলাত যাইবার পথে মারা গেলেন (১৮৫৩)। তখন এক ভলুম মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার আরব্ধ এই ঐতিহাসিক মহাকোষ তাঁহার মৃত্যুর অনেক বৎসর পরে ভারত-সচিবের খরচে অধ্যাপক ডাউসন্ শেষ করেন (১৮৭৭ খ্রীঃ, আট ভলুমে, এবং পরিশিষ্ট লইয়া নয় ভলুমে)।

আমাদের আরও একটি সৌভাগ্যের বিষয়, এলিয়ট্ এই সব ঐতিহাসিক পুথি কুড়াইয়া একত্র করিয়া বিলাতে পাঠান সিপাহী-বিদ্রোহের পাঁচ ছয় বৎসর আগে। তাহাতেই এগুলি রক্ষা পাইয়াছে, আমরা এখন এগুলি দেখিতে পাইতেছি। নচেৎ, যদি এগুলি দেশী মালিকদের বাড়ীতে থাকিত, তবে ঐ উত্তর-ভারতব্যাপী মহাবিপ্লবে একেবারে ধ্বংস হইয়া যাইত। সিপাহী-বিদ্রোহের ফলে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশময় (অর্থাৎ এলাহাবাদ-আগ্রায়) অশান্তি ও দাঙ্গা চলিতে থাকে, অর্দ্ধেক জেলার সরকারী কাগজ-পত্র পুড়াইয়া ফেলা হয় ; দিল্লী লক্ষ্ণৌর উপরে তোপ চালান এবং জয় করিবার পর লুঠ করা হয় ; অনেক নবাবের ও রাজার রাজবাড়ী নষ্ট এবং তাহাদের রাজ্য জপ্ত হইয়া

যায়। এই সব স্থানের পুথি লোপ পাইয়াছে। ইহার চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ঠিক এই মত একটি অরাজকতার ফলে এলফিনষ্টোন্ কর্ত্তৃক সংগৃহীত অসংখ্য দুর্লভ ফারসী ঐতিহাসিক পুথি, মারাঠা সৈন্যদের দ্বারা তাঁহার পুণা রেসিডেন্সী-ভবন আক্রমণের সময় ধ্বংস হয় (১৮১৭ খ্রীঃ)। সুতরাং যে এলিয়ট-সংগ্রহ এখন ব্রিটিশ মিউজিয়মে এক পৃথক্ কক্ষে রক্ষা পাইতেছে তাহা জগতে অমূল্য, কারণ অনেক স্থলে অদ্বিতীয়।

ফারসী ভারত-ইতিহাস-মালার অনুবাদ সুদীর্ঘ আট ভলুমে প্রকাশ করিয়া এলিয়ট্-ডাউসন্ কত বড় উপকার করিয়াছেন তাহা বুঝা যায় যদি আমরা ১৮৭৭ সালের আগে ও পরে লিখিত মুসলমান-ভারতের ইতিহাস দুখানি লইয়া তুলনা করিয়া দেখি। ঐ আট ভলুমের একটি সুফল ষ্টান্‌লি লেন্-পুল্-রচিত "মধ্যযুগীয় ভারত"। ইহাতে চারি শত পৃষ্ঠায় মুসলমান ভারত-ইতিহাস-রূপ মহানাটকের অঙ্কের পর অঙ্ক দৃশ্যপটের মত পাঠকের সম্মুখে খুলিয়া দিয়াছে; ইহার সমস্ত উপাদান এলিয়ট্ হইতে লওয়া। সব বর্ণনা নিখুঁত সত্য, সাক্ষীদ্বারা প্রমাণিত, অথচ বইখানি জীবন্ত মানুষে ভরা, আমরা সব বড় বড় ঐতিহাসিক পুরুষদের চরিত্র অতি স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইতেছি; পাঠক যাহা পড়িবেন তাহা মনে বহুদিন স্মরণ থাকিবে। ফলতঃ মেকলে যেমন ইতিহাসকে সরস ও জীবন্ত করিয়া দিতেন, লেন্-পুল্‌ও তাহাই করিয়াছেন, এবং এলিয়টের গ্রন্থে অসংখ্য সমসাময়িক বিস্তৃত বিবরণ ও উক্তি পাইয়াছিলেন বলিয়াই এরূপ করিতে পারিয়াছেন। তাঁহার পর অনেকেই অংশতঃ বা ব্যাপকভাবে গবেষণা করিবার সুবিধা এই আট ভলুম হইতেই পাইয়াছেন।

কিন্তু এলিয়ট্ আমাদের প্রথম পথ-প্রদর্শক এবং নমুনা-দেখাইবার ব্যবসায়ী ছিলেন। এখন আর নমুনায় চলে না, আমরা প্রতি মূলগ্রন্থের অবিকল সম্পূর্ণ অনুবাদ চাই, এবং তাঁহার পর অনেক নূতন গ্রন্থও আবিষ্কৃত হইয়াছে।

১৫৫৬ সালে আকবর দিল্লীর সিংহাসনে বসিলেন, এবং ভারতে স্থায়ী মুঘল সাম্রাজ্য স্থাপিত হইল। তাঁহার রাজ্যকাল হইতে যে যুগ আরম্ভ হইল তাহার এবং মুঘলদের পূর্ব্বেকার যুগের ভারতের ফারসী ইতিহাসগুলির মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ—শুধু সংখ্যাতে নহে, গুণেও। ইতিহাসের ক্ষেত্রে মুঘল-যুগের প্রধান কীর্ত্তি সরকারী ইতিহাস; অসংখ্য ছোট ছোট ঘটনা, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তারিখ ও স্থানের লোকের নাম দিয়া, মাস ও বৎসর অনুসারে সাজাইয়া প্রত্যেক সম্রাটের রাজ্যকালের সুদীর্ঘ ইতিহাস লেখা হইয়াছে, এবং সেগুলির সেই সেই বাদশাহের নাম-অনুসারে নাম দেওয়া হইয়াছে, যেমন "আকবর-নামা" অর্থাৎ আকবরের গ্রন্থ (ফারসীতে নামাঃ শব্দের অর্থ গ্রন্থ, ইহা 'নাম' শব্দ হইতে ভিন্ন), পাদিশাহ-নামা (অর্থাৎ শাহজাহানের), আলমগীর-নামা ইত্যাদি। দ্বিতীয়তঃ, এগুলির উপাদান ইতিহাসের আদি ও অবিকৃত সমসাময়িক মশলা, অর্থাৎ নানা স্থান হইতে কর্ম্মচারিগণ বাদশাহ ও মন্ত্রীদের যে-সব পত্র, ডায়েরী, যুদ্ধের এবং শত্রুর দূতের সহিত আলোচনার রিপোর্ট, সন্ধির খসড়া, হিসাবের কাগজ প্রভৃতি লিখিয়া পাঠাইতেন তাহা বাদশাহী রেকর্ড অফিসে ("বস্তা-খানায়") জমা থাকিত; তাহা দেখিয়া এই শ্রেণীর বইগুলি রচিত।

মুঘল বাদশাহদের আগে এই শ্রেণীর ইতিহাস একখানিও ভারতে রচিত হয় নাই। তাহার

প্রথম কারণ সে সময় সভ্যতা তত অগ্রসর হয় নাই, আর দেশে শান্তিও কম ছিল। কোন রাজবংশই তখন দিল্লীতে তিন পুরুষের বেশী সিংহাসন রাখিতে পারেন নাই। আর এই সব রাজারা প্রায় যাযাবর ছিলেন ; সৈন্যসামন্ত লইয়া আজ এখানে, কাল ওখানে তাঁবু খাটাইয়া মাস ও বৎসর কাটাইতেন ; এক নির্দ্দিষ্ট রাজধানীতে স্থির হইয়া বসিয়া সভা করিতে পারিতেন অতি কম দিনই। যাঁহাদের অর্দ্ধেক জীবনের অধিক কাল বিদ্রোহদমনে বা রাজ্য-বিস্তারে কাটাইতে হইত, তাঁহারা সাহিত্যে ইতিহাস সৃষ্টি করাইবার অবসর পাইতেন না। পুথি দলিল প্রভৃতি সংগ্রহ করিবার পক্ষেও নানা বাধা ছিল। যদি বা কিছু সংগৃহীত হইত তাহাও অশান্তি এবং ঘন ঘন স্থান-পরিবর্ত্তনে শীঘ্রই নষ্ট হইত, অথবা চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িত।

কিন্তু ঠিক মুঘল-যুগের "নামা"-গুলির মত বড় না হইলেও, কয়েক খানি মূল্যবান্ ইতিহাস আমরা তাহার পূর্ব্বের যুগে পাই। এগুলি একটানা ইতিহাস, অনেক সময়ে বাবা আদম্ হইতে আরম্ভ ! কেবল মাত্র রাজার সমস্ত রাজত্বকাল বা কয়েক বৎসর লইয়া লিখিত নহে।

আরবী ভাষায় লিখিত ঘজ়নীর সুলতান মামুদের ইতিহাস "কিতাব্-ই-ইয়ামিনি" বড় কম সংবাদ প্রদান করে, ইহার ইংরাজী অনুবাদ (ফারসী অনুবাদের অনুবাদ) বিশুদ্ধ নহে। ঐ রাজবংশের বৈহাকী নামক এক জন কর্ম্মচারী একখানি সুদীর্ঘ ইতিহাস রাখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার গ্রন্থের মামুদ-পুত্র মাসূদের কাহিনী—এই অংশটুকু মাত্র রক্ষা পাইয়াছে, যে খণ্ডে মামুদের কার্য্যকলাপ বর্ণিত ছিল তাহা লোপ পাইয়াছে, কোথাও মিলে না। সুতরাং ঐ রাজার ভারতে কীর্ত্তির জন্য এখন শিলালিপি প্রধান সম্বল।

তাহার পর ঘোরী-বংশ। ইঁহাদের জন্য "তাজ-উল্-মাসির" নামক গ্রন্থ আছে, কিন্তু ইহা নামতঃ ইতিহাস হইলেও কবিতা ও অলঙ্কারের ভারে ইতিহাস প্রায় দমবন্ধ হইয়া মারা গিয়াছে। "তবকাৎ-ই-নাসিরী" (১২৬০ খ্রীষ্টাব্দে) আমাদের ভারতীয় মুসলমানযুগীন প্রথম ইতিহাস বলিলে অত্যুক্তি হয় না। রাভ্যার্টি সাহেব এখানির সম্পূর্ণ ও বিশুদ্ধ ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন (যদিও তাঁহার অনেক টীকা অতিপাণ্ডিত্য-দোষে দূষিত এবং ভুল)। খিলজী-বংশের জন্য আছে জিয়া বারণী-রচিত "তারিখ-ই ফিরোজশাহী", অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ (যদিও গ্রন্থকারের পক্ষপাতদোষ পরলোকগত অধ্যাপক গার্ডনার ব্রাউন প্রথমে দেখাইয়া দেন) ; এখানিতে প্রথম দুই তুঘলুক সুলতান, এবং ফিরোজ শার ১-৬ বৎসরের বিবরণও আছে। শেষোক্ত সুলতানের সম্পূর্ণ ইতিহাস শমস্-ই-আফিফ্-রচিত "তারিখ-ই-ফিরোজশাহী" (এলিয়ট এই দুই গ্রন্থের দীর্ঘ অনুবাদ দিয়াছেন এবং প্রথমখানির অপর এক অনুবাদ *J. A. S. B.*তে অতি পূর্ব্বে ১৮৬৩-৬৪তে ছাপা হয়।) আফঘান অর্থাৎ লোদী এবং সুর-বংশের ইতিহাস তেমন ভাল নাই। এই সব ইতিহাস ভিন্ন আমির খসরুর কাব্য ও গদ্য রচনাগুলি, মহরুর চিঠিপত্র, ইবন্-বতুতার ভ্রমণকাহিনী প্রভৃতি গ্রন্থ ঐ যুগের অনেক খবর দেয় এবং কোন ঐতিহাসিক এগুলিকে উপেক্ষা করিতে পারেন না।*

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে প্রদত্ত 'অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বক্তৃতামালা'র প্রথম বক্তৃতা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

চতুশ্চত্বারিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ

বর্ত্তমান ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল। গত চতুশ্চত্বারিংশ বর্ষের কার্য্যবিবরণ নিম্নে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইল।

সদস্য

১৩৪৪ বঙ্গাব্দে পরিষদের সদস্য-সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধির তালিকা-

		বর্ষারম্ভে		বর্ষশেষে
(ক)	বিশিষ্ট-সদস্য	১০	...	৮
(খ)	আজীবন-সদস্য	১৪	...	১৪
(গ)	অধ্যাপক-সদস্য	৯	...	৯
(ঘ)	মৌলভী-সদস্য	০	...	০
(ঙ)	সাধারণ-সদস্য	৮৩৪	...	৮২৫
(চ)	সহায়ক-সদস্য	২১	...	১৬
		৮৮৮		৮৭২

(ক) আলোচ্য বর্ষে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু এবং ডক্টর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় পরলোকগমন করায় বিশিষ্ট-সদস্য-সংখ্যা ১০ স্থানে ৮ হইয়াছে। বর্ষশেষে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ বিশিষ্ট-সদস্য আছেন—

১। স্যর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ২। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৩। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, ৪। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ৫। স্যর জর্জ্জ এ. গ্রীয়ার্সন, ৬। রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর, ৭। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ৮। ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন।

আলোচ্য বর্ষে তিন জন বিশিষ্ট-সদস্য প্রস্তাবিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের নির্ব্বাচন-ফল অদ্য বিজ্ঞাপিত হইবে।

(খ) আলোচ্য বর্ষে আজীবন-সদস্য-সংখ্যার কোন হ্রাসবৃদ্ধি হয় নাই। যাঁহারা আজীবন-সদস্য আছেন, তাঁহাদের নাম নিম্নে দেওয়া হইল—

১। রাজা শ্রীযুক্ত গোপাললাল রায়, ২। কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, ৩। রাজা শ্রীযুক্ত জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী, ৪। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, ৫। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার, ৬। ডক্‌টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা, ৭। ডক্‌টর শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা, ৮। ডক্‌টর শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা, ৯। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস, ১০। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১১। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, ১২। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু, ১৩। শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ, ১৪। শ্রীযুক্ত লালবিহারী দত্ত।

(গ) অধ্যাপক-সদস্য-সংখ্যার কোন পরিবর্ত্তন আলোচ্য বর্ষে হয় নাই। ইঁহারা অধ্যাপক-সদস্য আছেন—

১। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন, ২। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ, ৩। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ৪। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, ৫। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র শাস্ত্রী, ৬। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ৭। শ্রীযুক্ত সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ, ৮। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী, ৯। শ্রীযুক্ত কালীপদ তর্কাচার্য্য।

(ঘ) কেহই মৌলভী-সদস্যপদে নির্ব্বাচিত হন নাই।

(ঙ) সাধারণ সদস্য—কলিকাতা ও মফস্বলবাসী সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা আলোচ্য বর্ষের আরম্ভে ৮৩৪ ছিল। বর্ষ মধ্যে ১৩ জন সদস্যের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে এবং ৪১ সংখ্যক নিয়মানুসারে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশ অনুসারে ৯২ জন সাধারণ-সদস্যের নাম বাদ দেওয়া হইয়াছে। বর্ষ মধ্যে ৯৬ জন ব্যক্তি সাধারণ-সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল হ্রাসবৃদ্ধির ফলে বর্ষশেষে সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা ৮২৫ হইয়াছে।

(চ) সহায়ক-সদস্য—বর্ষারম্ভে ২১ জন সহায়ক-সদস্য ছিলেন। বর্ষশেষে এই বার্ষিক অধিবেশনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ৫ জনের স্থিতিকাল ফুরাইয়াছে। এই জন্য এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা এখন ১৬ জন।

পরলোকগত সদস্য

বিশিষ্ট-সদস্য—১। আচার্য্য স্যর জগদীশচন্দ্র বসু, ২। ডক্‌টর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সাধারণ-সদস্য—১। রায় অক্ষয়ভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় বাহাদুর, ২। অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, ৩। রায় সাহেব অরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪। রায় কৃষ্ণকালী মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, ৫। জ্ঞানদাপ্রসাদ চৌধুরী, ৬। রায় বিপিনবিহারী বসু, ৭। রায় বিহারীলাল সরকার বাহাদুর, ৮। ব্রজমোহন বর্ম্মণ, ৯। ভূতনাথ দাস, ১০। ডাক্তার মণিভূষণ ঘোষ, ১১। রায় যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর, ১২। ডাক্তার সুরেশচন্দ্র রায়, ১৩। কুমার হিরণ্যকুমার মিত্র।

এই সকল পরলোকগত সদস্যের নিকট পরিষৎ বিশেষভাবে উপকৃত হইয়াছেন। তন্মধ্যে অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক মহাশয় পরিষদের প্রথম যুগে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। রায় যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর বারাণসী শাখা-পরিষদের সভাপতিরূপে ও মূল পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে এবং কুমার হিরণ্যকুমার মিত্র বাহাদুর রমেশ-ভবন সমিতির অন্যতম সম্পাদকরূপে এবং নানা অনুষ্ঠানে সাহায্য করিয়া পরিষদের সেবা করিয়াছিলেন।

পরলোকগত সাহিত্যসেবী ও বন্ধুগণ

বর্ষমধ্যে নিম্নলিখিত সাহিত্যসেবী ও বন্ধুগণ পরলোকগমন করিয়াছেন—

১। কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন, ২। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৩। জে. সি. ব্যানার্জি, ৪। বরদাদাস বসু, ৫। যোগীন্দ্রনাথ সরকার, ৬। রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী, ৭। শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৮। ডক্টর হেরম্বচন্দ্র মৈত্র।

ইঁহারা এক সময়ে সকলেই পরিষদের সদস্য ছিলেন। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় নানা দ্রব্য উপহার দিয়া এবং পরিষদ্‌গ্রন্থ 'মিলিন্দ পঞ্‌হো' প্রকাশের সম্পূর্ণ ব্যয় বহন করিয়া ও নানাভাবে অর্থ সাহায্য করিয়া পরিষদের প্রথম যুগে বিশেষ উপকার করিয়াছিলেন। জে. সি. ব্যানার্জ্জি (যতীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) মহাশয় নিজব্যয়ে কয়েক জন সাহিত্যিকের তৈলচিত্র প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন। রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী মহাশয় পরিষৎ-পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন ও চিত্রশালার জন্য দ্রব্যাদি দান করিয়াছিলেন। শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আলোচ্য বর্ষে তাঁহার পিতা ৺তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এক তৈলচিত্র দান করিয়াছিলেন।

অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সাধারণ অধিবেশনগুলি হইয়াছিল,—(ক) ত্রিচত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন ১, (খ) মাসিক অধিবেশন ১০, (গ) সাহিত্যিকগণের বার্ষিক স্মৃতি-সভা ৪, (ঘ) বিশেষ অধিবেশন ৭, মোট ২২।

(ক) **ত্রিচত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন**—৮ই শ্রাবণ, শনিবার, অন্যতম সহকারী সভাপতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে এই অধিবেশন হয়। পরিষদের সভাপতি স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় অধিবেশনে উপস্থিত হইতে না পারিয়া দার্জিলিঙ্‌ হইতে যে 'নিবেদন' লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহা পঠিত হইলে পর, মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর কর্ত্তৃপক্ষের প্রদত্ত ৺রাধানাথ সিকদার এবং ৺শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়-প্রদত্ত ৺তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র-প্রতিষ্ঠা হয়। তৎপরে ত্রিচত্বারিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ, চতুশ্চত্বারিংশ বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ বিজ্ঞাপন, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচনের ফলাফল বিজ্ঞাপন ও কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন হয়।

(খ) **মাসিক অধিবেশন**—প্রথম মাসিক অধিবেশন—১৩ই আষাঢ়, রবিবার, 'বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম বাংলা অভিধান,' শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন—২৭এ আষাঢ়, রবিবার, 'দ্বিজ রামচন্দ্র বা কবিকেশরী রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার', শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন, ২৫এ ভাদ্র, শুক্রবার, (ক) 'গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য' ও (খ) 'পীতাম্বর মিত্র', শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন, ২২এ অগ্রহায়ণ, বুধবার, (ক) 'জেমস্ ষ্টুয়ার্ট', (খ) 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত', শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন, ৭ই পৌষ, বুধবার, 'বৌদ্ধ অপদান', ডক্টর শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন, ৫ই মাঘ, বুধবার, 'কালীপ্রসন্ন সিংহ', শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন, ৪ঠা ফাল্গুন, বুধবার। (কোন প্রবন্ধ পঠিত হয় নাই)

অষ্টম মাসিক অধিবেশন, ৯ই চৈত্র, বুধবার, 'দশাঙ্ক সংখ্যা প্রণালীর উদ্ভাবন', ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত।

নবম মাসিক অধিবেশন, ১৯এ চৈত্র, শনিবার, 'হিন্দু জ্যোতিষে শককাল,' ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত।

দশম মাসিক অধিবেশন, ২৯এ চৈত্র, মঙ্গলবার, 'বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের বয়স', ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত।

এই সকল মাসিক অধিবেশনে উক্ত প্রবন্ধপাঠ ব্যতীত পরিষদের কতিপয় সদস্য ও সাহিত্যিকের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ করা হয়, কর্ম্মাধ্যক্ষ-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্ধারণ বিজ্ঞাপিত হয়, আলোচ্য বর্ষের সংশোধিত বাজেট বিজ্ঞাপিত হয় এবং একজন সাহিত্যিকের চিত্র-প্রতিষ্ঠা ব্যতীত ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যপদ-প্রার্থিগণের ভোট গণনার জন্য শ্রীযুক্ত সৌরেন্দ্রনাথ দে, শ্রীযুক্ত বিনোদ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত অমিয়লাল মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মিশ্র ভোট-পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হন।

(গ) **বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব**—(১) ২৩এ জ্যৈষ্ঠ, রবিবার, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের সভাপতিত্বে আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতিপূজা হয়, (২) ১৫ই আষাঢ়, মঙ্গলবার, মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের স্মৃতি-বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়—প্রাতে লোয়ার সার্কুলার রোডস্থিত গোরস্থানে কবির সমাধিক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নেতৃত্বে প্রার্থনা, কবিতা ও বাণী পাঠ এবং বক্তৃতা হয়। অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে বিশেষ অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্তা মানকুমারী বসু ও শ্রীযুক্ত দিলীপ দাশগুপ্তের কবিতা, ডক্টর শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র-নাথ সোম, শ্রীযুক্ত মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের বক্তৃতা ; শ্রীযুক্ত ত্রিদিবনাথ রায়ের আবৃত্তি ও বঙ্গীয়-নাট্য-পরিষদের সদস্যগণ কর্ত্তৃক গান ও 'মেঘনাদবধ কাব্য' হইতে অংশবিশেষ অভিনীত হয়। (৩) ১৯এ চৈত্র, শনিবার, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে ৺ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের স্মৃতি-বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয় এবং (৪) ২৬এ চৈত্র, শনিবার, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

ও পাইকপাড়ার রাজবাটীর সম্মিলিত আয়োজনে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু-বার্ষিকী উপলক্ষে পাইকপাড়া রাজবাটীতে বঙ্কিম-উৎসব সম্পন্ন হয়। বাসন্তী বিদ্যাবীথির ছাত্রীগণ 'বন্দে মাতরম্' গান করিলে পর বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর সভার উদ্বোধন করেন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র-নাথ দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাণী পঠিত হয় এবং কুমার শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সিংহ বাহাদুর স্বাগত সম্ভাষণ করেন। সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ পাঠের পর স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের 'বঙ্কিম-প্রতিভার ক্রমবিকাশ,' শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার মহাশয়ের 'বঙ্কিম-সাহিত্যের রস-বিচার', শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র', শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা মহাশয়ের 'বঙ্কিমচন্দ্র' এবং শ্রীযুক্তা সোফিয়া খাতুন মহাশয়ার 'ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র' পঠিত হয়। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী ও শ্রীযুক্তা মানকুমারী বসুর কবিতা পঠিত হয়। এই অধিবেশনের কার্য্যারম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্বে পাইকপাড়া রাজবাটীতে বঙ্কিম-প্রদর্শনী হয়। স্যর শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ঐ প্রদর্শনীর দ্বার উন্মোচন করেন।

(ঘ) **বিশেষ অধিবেশন**—(১) ২২এ জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবারের অধিবেশনে মহারাজ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের সভাপতিত্বে শ্রীযুক্ত অমরনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় 'ধ্রুপদ সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা' পাঠ করেন এবং সঙ্গীত আলাপ করেন। (২) ডক্টর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগীর সভাপতিত্বে ২০এ আষাঢ়, রবিবারের অধিবেশনে শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার মহাশয় "একই কথার বা একরূপ ধ্বন্যাত্মক কথার বিপরীতার্থ বিষয়ে মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া আলোচনা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। (৩) শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে ১৭ই আশ্বিন, রবিবারের অধিবেশনে শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় "সিন্ধু-সভ্যতা" বিষয়ে 'অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বক্তৃতামালা'র অন্তর্গত প্রথম বক্তৃতা করেন এবং ম্যাজিক ল্যাণ্টার্নের সাহায্যে চিত্রপ্রদর্শন করিয়া বক্তব্য বিষয় ব্যাখ্যা করেন। (৪) ২১এ অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশার্থ বিশেষ অধিবেশন হয়। শোক-প্রস্তাব এবং স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, স্যর শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার, শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মহলানবীশ, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও ডক্টর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী বক্তৃতা করেন। (৫) মহারাজাধিরাজ স্যর শ্রীযুক্ত বিজয়চাঁদ মহাতাব বাহাদুরের সভাপতিত্বে ৩রা পৌষ, শনিবার, স্বর্গীয় মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহের চিত্র-প্রতিষ্ঠার্থ সভা হয়। রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মহারাজ স্যর শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ও রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর বক্তৃতা করেন। (৬) ৮ই ফাল্গুন, রবিবার, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে ডক্টর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশার্থ বিশেষ অধিবেশন হয়। শোকজ্ঞাপক প্রস্তাব এবং স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাব ব্যতীত স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, ডক্টর শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ, ডক্টর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বক্তৃতা করেন এবং শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু একটি কবিতা পাঠ করেন। (৭) ২০এ চৈত্র, রবিবার, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে বিশেষ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয় "বাংলা সাহিত্যের প্রথম যুগ" বিষয়ে 'অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বক্তৃতামালা'র অন্তর্গত প্রথম বক্তৃতা করেন।

উৎসবাদি

(ক) **পঞ্চচত্বারিংশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-উৎসব**—প্রতিষ্ঠা-দিবস ৮ই শ্রাবণ, কিন্তু ঐ দিন বার্ষিক অধিবেশন হওয়ায় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশে ৯ই শ্রাবণ, রবিবার এই উৎসব হয়। সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সমবেত সভ্যমণ্ডলীকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া স্বর্গীয়া কামিনী রায় মহাশয়ার চিত্র প্রতিষ্ঠা করেন। এই উৎসব উপলক্ষে প্রাপ্ত পুস্তক (আধুনিক ও দুষ্প্রাপ্য), প্রাচীন পুথি, পুস্তকাধার প্রভৃতি উপহারগুলি প্রদর্শিত হয়। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র এবং শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আবৃত্তি, কুমারী দীপিকা দের মণিপুরী ও সাঁওতালী নৃত্য, বাসন্তী বিদ্যাবীথির ছাত্রীগণের গান, শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান এবং শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় ও কুমারী উমা বসুর গানের পর জলযোগান্তে উৎসব সমাপ্ত হয়। এই উৎসরের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য যাঁহারা অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা সঙ্গীতাদির দ্বারা সমবেত সজ্জনগণের মনোরঞ্জনে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে এবং উপহারদাতৃগণকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়।

(খ) ৯ই আশ্বিন, শনিবার সন্ধ্যায় বঙ্গীয় রাজসরকারের মন্ত্রিগণকে এবং বিশিষ্ট নাগরিকগণকে এক প্রীতি-সম্মিলনে সংবর্দ্ধিত করা হয়। পরিষদের নানা বিষয়ের অভাবের বিষয় সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কর্ত্তৃক বিবৃত হইলে মাননীয় শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয় বলেন, বঙ্গীয় রাজসরকার হইতে পরিষৎ সর্ব্বতোভাবে সাহায্যের দাবী করিতে পারেন এবং তাহা ন্যায়সঙ্গত এবং এ বিষয়ে সমবেত চেষ্টা করা প্রয়োজন। এই উপলক্ষে জলি গার্লস্ এসোসিয়েশনের বালিকাগণ সঙ্গীতাদি করেন। জলযোগান্তে এই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

(গ) পরিষদের রমেশ-ভবনের দ্বিতল নিৰ্ম্মাণের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া উক্ত কার্য্য সমাধা করায় ৩০এ ফাল্গুন সোমবার রমেশ-ভবন সমিতির সভানেত্রী শ্রীযুক্তা লেডী প্রতিমা মিত্র মহাশয়াকে রমেশ-ভবন সমিতির সহিত একযোগে এক সান্ধ্য-সম্মিলনে সংবর্দ্ধনা করা হয়। পরিষদের পক্ষে পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় এবং রমেশ-ভবন সমিতির পক্ষে মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় শ্রীযুক্তা লেডী প্রতিমা মিত্র মহাশয়াকে অভিনন্দিত করেন। এই কার্য্য সম্পাদনের জন্য যাঁহারা অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে এবং কার্য্য পরিদর্শনাদির জন্য শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার সরকার

মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এই সান্ধ্য সম্মিলন উপলক্ষে ভারতী বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণের নৃত্য ও গীত হইয়াছিল এবং জলযোগের আয়োজন করা হইয়াছিল।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু

ভারত-গৌরব আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের বিয়োগ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ইতিহাসে আলোচ্য বর্ষে একটি স্মরণীয় ঘটনা। তিনি ১৩২৩।২৪।২৫ বঙ্গাব্দে পরিষদের সভাপতি ছিলেন, এবং ১৩০৭, ১৩২৬, ১৩২৮ বঙ্গাব্দে সহকারী সভাপতিরূপে তিনি পরিষদের সেবা করিয়াছিলেন। তিনি যখন সভাপতি ছিলেন, সেই সময় পরিষদের নানা বিষয়ে উন্নতি সাধনের মধ্যে পরিষদে বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণের দ্বারা লোকশিক্ষার্থ বৈজ্ঞানিক বক্তৃতার প্রবর্ত্তন করেন। পরিষৎকে তিনি কি ভাবে দেখিতেন, তাহা তিনি তাঁহার বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্থ অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণে স্পষ্টতঃ ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। নিম্নে সেই অভিভাষণের একাংশ উদ্ধৃত হইল।—

"সেই আমাদের সৃজনশক্তিরই একটি চেষ্টা বাঙ্গালা সাহিত্য-পরিষদে আজ সফল মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। এই পরিষৎকে আমরা কেবলমাত্র একটি সভাস্থল বলিয়া গণ্য করিতে পারি না; ইহার ভিত্তি কলিকাতার কোন বিশেষ পথপার্শ্বে স্থাপিত হয় নাই এবং ইহার অট্টালিকা ইষ্টক দিয়া গ্রথিত নহে। অন্তর-দৃষ্টিতে দেখিলে দেখিতে পাইব, সাহিত্য-পরিষৎ সাধকদের সম্মুখে দেবমন্দিররূপেই বিরাজমান। ইহার ভিত্তি সমস্ত বাঙ্গালা দেশের মর্ম্মস্থলে স্থাপিত এবং ইহার অট্টালিকা আমাদের জীবনস্তর দিয়া রচিত হইতেছে। এই মন্দিরে প্রবেশ করিবার সময় আমাদের ক্ষুদ্র আমিত্বের সর্ব্বপ্রকার অশুচি আবরণ যেন আমরা বাহিরে পরিহার করিয়া আসি এবং আমাদের হৃদয়-উদ্যানের পবিত্রতম ফুল ও ফলগুলিকে যেন পূজার উপহারস্বরূপে দেবচরণে নিবেদন করিতে পারি।"

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র শেষ উইল করিবার সময়ে পরিষৎকে ভুলেন নাই। পরিষদের বৈজ্ঞানিক চর্চ্চার সৌকর্য্যার্থে পরিভাষা প্রণয়নের জন্য তিনি পরিষৎকে তিন হাজার টাকা দানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

বঙ্গীয় রাজসরকার

আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ বঙ্গীয় রাজসরকারের নিকট বিশেষরূপ সাহায্য প্রাপ্তির ভরসা পাইয়াছেন। বহুদিন হইতে পরিষদ্ মন্দির সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা, পুস্তকাদির সংরক্ষণের উপযুক্ত আধারাদির অভাবের কথা এবং রমেশ-ভবন সম্পূর্ণ করিবার জন্য অর্থাভাবের কথা কার্য্যবিবরণে বর্ষের পর বর্ষে উল্লেখ করা হইয়াছে। বঙ্গীয় রাজসরকারকে আলোচ্য বর্ষে এই সকল অভাবের বিষয় জানাইয়া তাহার জন্য অর্থ সাহায্য চাওয়া হইয়াছিল। অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, বঙ্গীয় রাজসরকার পরিষদের উক্ত আবেদনের ফলে (ক) রমেশ-ভবন সম্পূর্ণ করিবার জন্য, (খ) পরিষদ্ মন্দির সংস্কার

করিবার জন্য, এবং (গ) আসবাব আদি প্রস্তুত করিবার জন্য ২৫০০০৲ পঁচিশ হাজার টাকা দানের ব্যবস্থা বাজেটভুক্ত করিয়াছেন। আশা করা যায়, বর্ত্তমান বর্ষ মধ্যেই এই টাকা হস্তগত হইবে।

বঙ্গীয় রাজসরকার পরিষৎকে গ্রন্থপ্রকাশের জন্য বহুদিন হইতে বার্ষিক ১২০০৲ টাকা দান করিয়া আসিতেছিলেন। সরকারের বিগত ব্যয়-সঙ্কোচ-নীতির ফলে গত বর্ষ পর্য্যন্ত পরিষৎকে ঐ টাকার শতকরা ১০৲ হারে বাদ দিয়া ১০৮০৲ দেওয়া হইত। আলোচ্য বর্ষ হইতে রাজসরকার পরিষদের পক্ষে উক্ত ব্যয়-সঙ্কোচ-নীতি প্রত্যাহার করিয়া বার্ষিক ১২০০৲ দানের আদেশ দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আমাদের অন্যতম সহকারী সভাপতি স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের অনুরোধে বঙ্গীয় রাজসরকার গ্রন্থপ্রকাশের জন্য তিন বৎসর (১৯৩৭-৩৮, ১৯৩৮-৩৯ এবং ১৯৩৯-৪০) পরিষৎকে উক্ত ১২০০৲ টাকার সমপরিমাণ অর্থ ব্যয় করিবার আদেশ দিয়াছেন। এ সম্বন্ধে পূর্ব্ব স্থায়ী আদেশ, ১২০০৲ টাকার দ্বিগুণ ২৪০০৲ ব্যয় করিতে পরিষৎ বাধ্য।

পরিষৎ বঙ্গীয় রাজসরকারের নিকট এবং সহৃদয় মন্ত্রিগণের নিকট এই সকল আদেশের জন্য বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র

১২৪৫ বঙ্গাব্দে আষাঢ় মাসে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। বর্ত্তমান ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে তাঁহার জন্মের শতবর্ষ পূর্ণ হইল। এই স্মরণীয় ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া বঙ্গের নানা স্থানে ও বঙ্গের বাহিরে নানা স্থানে বঙ্কিমচন্দ্রের স্মরণোৎসব করিবার সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি আলোচ্য বর্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের পুণ্যস্মৃতির প্রতি সশ্রদ্ধ সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, নিম্নে তাহা লিপিবদ্ধ হইল—

(১) আলোচ্য বর্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু-বার্ষিক-উৎসব পাইকপাড়া রাজবাটীর সহযোগিতায় উক্ত রাজবাটীতে বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই উৎসবের জন্য যে বিপুল ব্যয় হইয়াছে, তাহা পাইকপাড়ার কুমার শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সিংহ স্বয়ং বহন করিয়াছেন। তজ্জন্য তিনি পরিষদের ধন্যবাদভাজন।

(২) বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে, নগরে নগরে এবং বঙ্গের বাহিরে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মোৎসবের জন্য পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদকের স্বাক্ষরে অনুরোধ-পত্র প্রেরণ করা হয়। তাহার ফলে বঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্রই এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে ও হইতেছে।

(৩) বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মভূমি কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের যে বৈঠকখানাটি আছে—যেখানে বসিয়া তিনি তাঁহার যুগান্তরকারী সাহিত্যসাধনা করিতেন—তাহা অতি জীর্ণ অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়াছে। উহার ১/৪ অংশের মালিক বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম দৌহিত্র এডভোকেট

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ৷ অংশের মালিক কাঁটালপাড়া বঙ্কিম-সাহিত্য-সম্মেলন। এই সম্মেলন বঙ্কিমচন্দ্রের উক্ত ত্রিচতুর্থাংশ, বঙ্কিমচন্দ্রের অন্য তিন জন দৌহিত্রের নিকট খরিদ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার অংশ সম্প্রতি পরিষদ্‌কে দান করিয়া দলিল সম্পাদন করিয়া দিয়াছেন। কাঁটালপাড়া বঙ্কিম-সাহিত্য-সম্মেলন তাঁহাদের সকল স্বত্ব পরিষদ্‌কে দান করিবার উদ্দেশ্যে বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত মন্তব্য অনুসারে দানপত্র রেজেষ্টারী করিয়া দিয়াছেন। এই বৈঠকখানাটির বর্ত্তমান অবস্থা শোচনীয়। প্রচুর অর্থ ব্যয় না করিলে ইহার সংস্কারসাধন সম্ভব নহে। গত ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু-বার্ষিক সভায় এই বিষয় উপলব্ধি করিয়া এডভোকেট শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসু মহাশয় ১০০৲ টাকা সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করেন এবং পরিষদ্‌কে এই বৈঠকখানাটি সংরক্ষণের জন্য ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। এই দানের প্রতিশ্রুতি ব্যতীত শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ শেঠ মহাশয়ও ২০৲ সাহায্য পাঠাইয়াছেন। দেশবাসী বাঙ্গালীর পুণ্যতীর্থ সংস্কার করিবার জন্য মুক্তহস্ত হইবেন—ইহা আমরা সাগ্রহে আশা করি।

(৪) পরিষৎ বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মদিনের সময় বর্ত্তমান বর্ষের ১০।১১।১২ই আষাঢ় দিবসত্রয় বঙ্কিম উৎসব করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন এবং ঐ দিবসত্রয় সসমারোহে উক্ত উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই উৎসবের বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

(৫) বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র গ্রন্থের জন্ম-শতবার্ষিক সংস্করণ প্রকাশের সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে। এই সঙ্কল্পের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যে বাণী প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। এই সংস্করণে থাকিবে (১) বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে প্রকাশিত পুস্তকগুলি, (২) তাঁহার মৃত্যুর পর প্রকাশিত গ্রন্থ, এবং (৩) অপ্রকাশিত বাংলা ও ইংরেজী প্রবন্ধাদি ও চিঠিপত্র। গ্রন্থের সাধারণ ভূমিকা লিখিবেন—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভূমিকা লিখিবেন—স্যর্ শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এবং গ্রন্থ সম্পাদন করিবেন—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস। এই বিষয়ে বিস্তৃত অনুষ্ঠানপত্র সদস্যগণের নিকট পূর্ব্বেই বিতরিত হইয়াছে। ইতিমধ্যেই চারিখানি গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে, অন্য একখানি প্রায় শেষ হইয়া আসিল এবং এক মাসের মধ্যে আরও দুইখানি মুদ্রিত হইবে। অপর খণ্ডগুলি পর পর প্রকাশিত হইবে।

ঝাড়গ্রামরাজ

আলোচ্য বর্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থ প্রকাশ সম্পর্কে আর একটি আনন্দের সংবাদ জানাইতেছি। ঝাড়গ্রামরাজ কুমার শ্রীযুক্ত নরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর পরিষদ্ কর্ত্তৃক বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী প্রকাশের সঙ্কল্পের বিষয় অবগত হইয়া এবং পরিষৎ এ পর্য্যন্ত যে সকল মূল্যবান্ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার বিবরণ সম্যক্ আলোচনা করিয়া, ঊনবিংশ শতকের এবং

তৎপরবর্ত্তী যুগের বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণের গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশে পরিষদের হস্তে ১০০০০৲ দশ হাজার টাকা দান করিয়া একটি ভাণ্ডার স্থাপনের প্রস্তাব করেন। আলোচ্য বর্ষে এই দান সম্পর্কে সর্ত্তাদির আলোচনার পর কুমার বাহাদুরের প্রস্তাব কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে, এবং বর্ত্তমান বর্ষে গত ১১ই মে তারিখে এই দান পাওয়া গিয়াছে। কুমার বাহাদুরের অভিপ্রায় অনুসারে প্রথমেই এই ভাণ্ডারের অর্থ হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থ প্রকাশের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। পরে এই তহবিল হইতে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের গ্রন্থাবলী মুদ্রিত হইবে, ঝাড়গ্রাম-রাজের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত বি. আর. সেনের প্রস্তাবে তাহাই স্থির হইয়াছে। কুমার বাহাদুরের উক্ত পত্রে পরিষদের এই গ্রন্থপ্রকাশের বিষয়ে তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ ও শ্রদ্ধার নিদর্শন পরিস্ফুট হইয়াছে। লালগোলার মহারাজ স্যর শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের পরে গ্রন্থপ্রকাশের জন্য পরিষৎকে এত টাকা কেহ দান করেন নাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এবং বঙ্গ-সাহিত্যামোদিগণ কুমার বাহাদুরের নিকট এই জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

এই সম্পর্কে আর একটি বিষয় জ্ঞাপন করা অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করি। মেদিনীপুরবাসিগণ কর্ত্তৃক বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী প্রকাশের বিষয়ে শ্রীযুক্ত বিনয়রঞ্জন সেন আই. সি. এস. মহাশয়ের উদ্যম ও চেষ্টার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। এই বঙ্কিম-গ্রন্থাবলী প্রকাশ বিষয়ে তিনি তদনুরূপ আগ্রহান্বিত হইয়া ঝাড়গ্রামরাজকে এই কার্য্যে উৎসাহিত করেন। সৎসাহিত্য-প্রকাশে শ্রীযুক্ত সেন মহাশয়ের এই আগ্রহ ও চেষ্টা দেশবাসী সকলেই এবং পরিষৎ কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবে। পরিষৎ তাঁহাকে এই সূত্রে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছেন।

১০০০০৲ দানের জন্য পরিষদের নিয়মানুসারে ঝাড়গ্রামরাজ পরিষদের "বান্ধব" শ্রেণী-ভুক্ত হইলেন। অদ্য তাহা বিজ্ঞাপিত হইল।

কার্য্যালয়

নিম্নোক্ত সদস্যগণ আলোচ্য বর্ষে পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন—সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত; সহকারী সভাপতিগণ—স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, ইনি সম্পাদক নির্ব্বাচিত হওয়ায় ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায়, রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, শ্রীযুক্ত রায় জলধর সেন বাহাদুর, শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ; সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, ইনি পদত্যাগ করায় শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু; সহকারী সম্পাদকগণ—শ্রীযুক্ত আনন্দলাল মুখোপাধ্যায়, ইনি বর্ষশেষে পদত্যাগ করায় শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত

জিতেন্দ্রনাথ বসু ; পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী ; চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ; গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরী, ইনি বর্ষারম্ভেই পদত্যাগ করায় শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস ; কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত ; পুথিশালাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু ।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সদস্যগণ পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন—

(ক) মূল পরিষৎ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত—

১। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২। শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম, ৩। শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায়, ৪। ডক্‌টর শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায়, ৫। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার, ৬। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস, ইনি বর্ষারম্ভে গ্রন্থাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হওয়ায় শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ, ৭। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, ৮। শ্রীযুক্ত অনাথগোপাল সেন, ৯। রেভারেণ্ড শ্রীযুক্ত এ. দোঁতেন, ১০। শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ, ১১। শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, ১২। শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা, ১৩। শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী, ১৪। শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত, ১৫। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন, ১৬। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দাশ গুপ্ত, ১৭। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল, ১৮। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার, ১৯। শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন দত্ত।

(খ) শাখা-পরিষৎ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত—

২১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, ২২। শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, ২৩। শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়, ২৪। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, ২৫। শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু সরস্বতী,

(গ) কলিকাতা করপোরেশনের পক্ষে—

২৬। শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী, ২৭। ডাক্তার শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির বারোটি সাধারণ ও দুইটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল এবং সার্কুলার দ্বারা একবার সভ্যগণের মত লইয়া কাজ করা হইয়াছিল। সাধারণ কার্য্য ব্যতীত নিম্নলিখিত বিশেষ কার্য্যগুলির ব্যবস্থা ও মন্তব্যাদি এই সকল অধিবেশনে গৃহীত হইয়াছিল—

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগত্তারিণী-পদক সমিতিতে শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম মহাশয় পরিষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

২। নিম্নলিখিত সদস্যগণকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের পরিচালন-সমিতিতে সভ্য নির্ব্বাচন করা হইয়াছিল,—(১) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, (২) শ্রীযুক্ত রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, (৩) শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, (৪) শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, (৫) শ্রীযুক্ত আনন্দলাল মুখোপাধ্যায়।

৩। নিম্নলিখিত অনুষ্ঠানে পরিষদের প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়াছিল,—(ক) দিল্লীর মিউজিয়াম এসোসিয়েশন, (খ) প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন (পাটনা), (গ) বঙ্গীয়-

সাহিত্য-সম্মিলন—কৃষ্ণনগরে ২১শ অধিবেশন, (ঘ) মেদিনীপুর শাখা-পরিষদের রজতজয়ন্তী উৎসব, (ঙ) রঙ্গপুর শাখা-পরিষদের বার্ষিক উৎসব ও সাহিত্য-সম্মিলন এবং বঙ্কিম ও দিব্যস্মৃতি-উৎসব, (চ) কাঁথি বঙ্কিম-উৎসব ও শাখা-পরিষৎ-প্রতিষ্ঠা উৎসব।

৪। নিম্নলিখিত অনুষ্ঠানের প্রদর্শনীতে পরিষদের দ্রব্যাদি প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল,—(ক) বীরসিংহে বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-উৎসব সংক্রান্ত প্রদর্শনীতে, (খ) প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে, (গ) মেদিনীপুর শাখা-পরিষদের রজত-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে প্রদর্শনীতে, (ঘ) কাঁথিতে বঙ্কিম-উৎসব উপলক্ষে প্রদর্শনীতে, (ঙ) বিদ্যাসাগর কলেজের প্রাক্তন ছাত্রগণের সম্মিলনে, (চ) রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল-এর বার্ষিক অধিবেশন সংক্রান্ত প্রদর্শনীতে, (ছ) চন্দননগর বঙ্কিম-উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে।

৫। নিম্নলিখিত শাখা ও সমিতিগুলি গঠিত হইয়াছিল, (ক) সাহিত্য-শাখা, (খ) ইতিহাস-শাখা, (গ) দর্শন-শাখা, (ঘ) বিজ্ঞান-শাখা, (ঙ) আয়-ব্যয় সমিতি, (চ) পুস্তকালয়-সমিতি, (ছ) ছাপাখানা-সমিতি, (জ) চিত্রশালা-সমিতি, (ঝ) প্রচার-শাখা, (ঞ) পরিষদ্-মন্দির-সংরক্ষণ-সমিতি, (ট) নিয়মাবলী-সমিতি, (ঠ) বানান-সমিতি, (ড) হিসাব-পরিদর্শন-সমিতি, (ঢ) শাখা-পরিষৎ নির্ব্বাচন-সমিতি, (ণ) প্রাচীন মুদ্রা গণনা সমিতি, (ত) কর্ম্মচারিগণের ছুটী নির্দ্ধারণ সমিতি, (থ) পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী বিক্রয় সমিতি, (দ) পাইকপাড়া রাজবাড়ী বঙ্কিম-উৎসব সমিতি, (ধ) বঙ্কিম-উৎসব সমিতি, (ন) বঙ্কিমচন্দ্র শতবার্ষিক জন্মোৎসব সমিতি, (প) বঙ্কিম শতবার্ষিক-সমিতি, (ফ) ঝাড়-গ্রামরাজ গ্রন্থপ্রকাশ সমিতি, (ব) পরিষৎ-সম্পত্তির মূল্য নির্দ্ধারণ সমিতি, (ভ) বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পরিদর্শন সমিতি।

৬। প্রতি বাংলা মাসের প্রথম বুধবারে পরিষদের মাসিক অধিবেশন হইবে।

৭। পরিষদের চিত্রশালা মিউজিয়াম এসোসিয়েশনের সভ্য হইবে।

৮। পরিষদের সম্পত্তির মূল্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্য শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে ভার অর্পিত হইয়াছে।

৯। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের শত-বার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষে বিশেষ অধিবেশন আহ্বানের সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে।

১০। "কুরল" গ্রন্থ প্রকাশে শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল মহাশয়ের যে অর্থ ব্যয় হইয়াছে, ঐ গ্রন্থ বিক্রয় করিয়া অগ্রে তাঁহাকে উক্ত অর্থ দিতে হইবে।

১১। কলিকাতার ইটালি অঞ্চলের কোন এক অখ্যাত রাস্তার নাম বঙ্কিমচন্দ্রের নামে পরিবর্ত্তিত করিবার বিষয়ে কলিকাতা করপোরেশনের প্রস্তাবের প্রতিবাদ করা হয় এবং কলেজ ষ্ট্রীটের নাম 'বঙ্কিমচন্দ্র রোড' করিবার প্রস্তাব করা হয়।

১২। ইণ্ডিয়ান মিরার ষ্ট্রীটের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া তৎস্থলে অন্য নাম প্রবর্ত্তনের প্রস্তাবের প্রতিবাদ করা হয়।

১৩। বঙ্গভাষাই ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবার উপযুক্ত এবং এই ভাষাকে ভারতের রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণের বিষয়ে মন্তব্য গৃহীত হয়।

রমেশ-ভবন

আনন্দের সহিত জানান যাইতেছে যে, আলোচ্য বর্ষে পরিষদের চিত্রশালা রমেশ-ভবনের দ্বিতল নির্ম্মাণকার্য্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এই দ্বিতল নির্ম্মাণের সঙ্গে সঙ্গে উহার নিম্ন তলের আমূল সংস্কার সাধিত হইয়াছে। উহার দরজা জানালা লাগান এবং বৈদ্যুতিক আলো পাখার পয়েণ্ট লাগান হইয়াছে এবং বৈদ্যুতিক সংযোগ লওয়া হইয়াছে। প্রয়োজন মত সাময়িক ভাবে পাখা ও আলো ভাড়া করিয়া উহার দ্বিতলের হলে কয়েকটি উৎসবাদির অনুষ্ঠান হইয়াছে। কিন্তু এখনও কণ্ট্রাক্টারের দেনা মিটাইতে পারা যায় নাই। নিম্ন তলে চিত্রশালার দ্রব্যাদি সংরক্ষণের ও সাজাইবার জন্য উপযুক্ত আধারের ব্যবস্থা করিতে ও দ্বিতলের জন্য আসবাব প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে এবং পাখা ও আলো খরিদ করিতে কিঞ্চিদধিক ৫০০০৲ এখনও আবশ্যক। এই টাকার সম্বন্ধে 'বঙ্গীয় রাজ-সরকার' শিরোনামে অন্যত্র বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রথম সভাপতি স্বনামধন্য রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নামানুসারে এই চিত্রশালার নামকরণ হয়। রমেশ-ভবন নির্ম্মিত হইবার পর অর্থাভাবে বহুদিন পর্য্যন্ত উহার দ্বিতল নির্ম্মাণের কোন আয়োজনই করিতে পারা যায় নাই। এই অবস্থায় ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে পরিষদের প্রচার-শাখার কতিপয় সভ্যের অনুরোধে রমেশচন্দ্রের দৌহিত্রী শ্রীযুক্তা লেডী প্রতিমা মিত্র মহাশয়া নবগঠিত রমেশ-ভবন সমিতির সভানেত্রীরূপে উদ্যোগী হইয়া রমেশ-ভবনটি সম্পূর্ণ করিয়া দিবার ভার গ্রহণ করেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ করিয়া দ্বিতল নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করেন। এই কার্য্যে সমিতির কোষাধ্যক্ষ মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় এবং ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার সরকার মহাশয় যথোচিত সাহায্য করেন। ইঁহারা সকলেই এবং রমেশ-ভবন সমিতি পরিষদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন।

রমেশ-ভবনে প্রদর্শনের ও সংরক্ষণের আধারগুলি প্রস্তুত হইলে সংগৃহীত দ্রব্যগুলি সাজাইতে পারা যাইবে। আলোচ্য বর্ষে নূতন দ্রব্য সংগ্রহের বিশেষ কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই; তথাপি নিম্নলিখিত শ্রেণীর দ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছে—প্রাচীন দেবমন্দিরের ইষ্টক, প্রাচীন স্থানের ফটো, সাহিত্যিকগণের হস্তলিপি, প্রাচীন সাহিত্যিকের চিত্র এবং ব্যবহৃত দ্রব্যাদি। তন্মধ্যে স্বর্গীয়া কবি তরু দত্তের ব্যবহৃত দ্রব্যগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এইগুলি বিলাত হইতে শ্রীযুক্ত হরিহর দাস বি. লিট., মহাশয় সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

পুথিশালা

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত ভদ্র মহোদয়গণ পরিষদের পুথিশালায় নিম্নলিখিত পুথিগুলি উপহার দিয়াছেন,—শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ রায় ২ খানি, শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বিশ্বাস ৪ খানি এবং শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ ২ খানি। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত পুথির মধ্য হইতে বাছিয়া উদ্ধার করা হয় ৪১ খানি। মোট ৪৯ খানি পুথির মধ্যে ৩ খানি মুদ্রিত পুথি বাদে অবশিষ্ট ৪৬ খানির মধ্যে বাঙ্গালা ৯ খানি এবং সংস্কৃত ৩৭ খানি তালিকাভুক্ত করিয়া আলোচ্য বর্ষে সর্ব্বপ্রকার পুথির সংখ্যা এইরূপ হইয়াছে—

বাঙ্গালা	...	৩১৯০
সংস্কৃত	...	২১৬৬
তিব্বতী	...	২৪৪
ফার্সী	...	১৩
অসমীয়া	...	৩
ওড়িয়া	...	৪
হিন্দী	...	২
		৫৬২২

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত বাঙ্গালা পুথির তালিকার মুদ্রণ-কার্য্য কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছে এবং ইহার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতও অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে।

অর্থাভাববশতঃ আলোচ্য বর্ষেও পুথিগুলিতে পাটা ও খেরো লাগাইতে পারা যায় নাই। এ জন্য অনেক পুথির ক্ষতি হইবার আশঙ্কা ক্রমশঃই নিকটবর্ত্তী হইতেছে।

গ্রন্থাগার

বর্ষারম্ভে সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাগারে ৪০৮৬৪ খানি পুস্তক ও পত্রিকা ছিল। আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারে ৮৫৮ খানি নূতন পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও পরিষদের হিতৈষিবর্গের নিকট হইতে ৬৪১ খানি উপহারস্বরূপ পাওয়া গিয়াছে এবং ২১৭ খানি ক্রয় করা হইয়াছে। অতএব বর্ষশেষে পরিষদের পুস্তকসংখ্যা ৪১৭২২ হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে যে সকল প্রতিষ্ঠান হইতে পুস্তক ও পত্রিকাদি উপহার অথবা বিনিময়ে গ্রন্থাদি পাওয়া গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য।—

১। Supdt., Government Printing, Bengal, ২। Manager of Publications, Delhi, ৩। Secretary, Simthsonian Institution, ৪। Registrar,

Calcutta University, ৫। Director, Geological Survey of India, ৬। Supdt., Government Museum, Egmore, Madras, ৭। Supdt., Central Museum, Lahore, ৮। Manager, Gita Press, Gorakhpur, ৯। Librarian, Bengal Library, ১০। Royal Asiatic Society, China Branch, ১১। Director of Industries, Bengal ১২। School of Oriental Studies, London, ১৩। Secy. Gaudiya Math.

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকগুলির মধ্যে নিম্নোক্তগুলি উল্লেখযোগ্য।—

প্রদাতা	পুস্তকাদি
শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বসু	১। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা
" জয়দেব ঘোষ	১। Institute of Hindu Law, 1794
" ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১। Dictionary in English and Bengali By Ramcomal Sen Vol I, 1834
সজনীকান্ত দাস	১। শব্দকল্পদ্রুমঃ, ২য় খণ্ড, ১ম সংস্করণ, ১৭৪৯ শকাব্দ
নারায়ণচন্দ্র মৈত্র	১। Hitopadesa
ভূপেন্দ্রকুমার বসু	১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১ম-৯ম অধ্যায়
	২। ঐ ১০ম-১৮শ অধ্যায়
	৩। Hitopadesa, 1847
	৪। Johnson's Dictionary, 1856
খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	১। কিঞ্চিৎ জলযোগ
	২। হিন্দু পেট্রিয়ট-সম্পাদক মৃত হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্মরণার্থ কোন বিশেষ চিহ্ন স্থাপন জন্য বঙ্গবাসিবর্গের প্রতি নিবেদন।
	৩। ভারতবর্ষীয় সভা, ২৩শ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ, ১৮৭৫।
রাজেন্দ্রনাথ রায়	১। History of Serampore Mission Vol I
	২। Do Vol II

এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ১১৮ খানি পুস্তক, ৺কামিনী রায়ের পুত্রগণ একটী আলমারী সমেত ১৩৭ খানি পুস্তক, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত 'মহাকোষ' প্রত্যেক খণ্ড, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত 'বিশ্বকোষ, ২য় সং' প্রত্যেক খণ্ড এবং রঞ্জন পাবলিশিং হাউস 'দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা'র প্রত্যেক খণ্ড দান করিয়া পরিষদ্‌গ্রন্থাগারের সমৃদ্ধি বর্দ্ধন করিয়াছেন।

ক্রীত পুস্তকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কতকগুলির নাম নিম্নে দেওয়া হইল।

১। রামরসায়ন, ১ম—৫ম খণ্ড (রঘুনন্দন)

২। সংবাদ প্রভাকর—১৮৫৫

৩। History of Europe By Sir Archibald Alison in 12 vols (1840)

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে নিম্নোক্তসংখ্যক সাময়িক পত্রিকাগুলি পাওয়া গিয়াছিল,—১। দৈনিক—৬, ২। সাপ্তাহিক—২৮, ৩। পাক্ষিক—৩, ৪। মাসিক—৬৩, ৫। দ্বৈমাসিক—২৫, ৬। ত্রৈমাসিক—১০।

আলোচ্য বর্ষে তালিকা-মুদ্রণের কোনও ব্যবস্থা হয় নাই। সাধারণ গ্রন্থাগারের ও দুষ্প্রাপ্য বাঙ্গালা গ্রন্থের তালিকা একপ্রকার শেষ হইয়াছে। এই সকল তালিকা সত্বর প্রকাশ করা প্রয়োজন। কিন্তু অর্থাভাবে তাহা সম্ভব হইতেছে না।

কলিকাতা করপোরেশন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও পুস্তক ক্রয়ের জন্য ৬৫০৲ টাকা সাহায্য করিয়া পরিষৎকে বিশেষ অনুগৃহীত করিয়াছেন।

গ্রন্থপ্রকাশ

সঙ্কল্পিত গ্রন্থপ্রকাশের কার্য্যগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে :—

(ক) সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ। গ্রন্থসম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। গত বর্ষে জানান হইয়াছিল যে, এই গ্রন্থের ১ম সংস্করণ চারি বৎসর মধ্যে নিঃশেষিত হওয়ায় এই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এই সংস্করণে বহু নূতন তথ্য ও টীকা-টিপ্পনী সংযোজন করিয়া সম্পাদক মহাশয় গ্রন্থখানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়াছেন। পূর্ব্ববারের ন্যায় এবারও তিনি গ্রন্থের সর্ব্ব-স্বত্ব এবং সম্পাদকীয় পারিশ্রমিক হিসাবে তাঁহার প্রাপ্য ২৮৮৲ পরিষৎকে দান করিয়া পরিষৎকে উপকৃত করিয়াছেন। গ্রন্থের মুদ্রণব্যয় লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল হইতে নির্ব্বাহিত হইয়াছে। প্রথম সংস্করণ ২৪০ পৃষ্ঠায় শেষ হইয়াছিল, এই নব সংস্করণ ৫৮০ পৃষ্ঠায় শেষ হইল।

(খ) কবি রামদাস আদক-বিরচিত অনাদি-মঙ্গল বা শ্রীধর্ম্মপুরাণ। গ্রন্থসম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। মূল গ্রন্থ, ভূমিকা, শব্দসূচী ও সুভাষিতাবলী সমেত ৩০৪ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ শেষ হইয়াছে। এই গ্রন্থও লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ তহবিলের অর্থে প্রকাশিত হইল।

এতদ্ব্যতীত (ক) ন্যায়দর্শন, ১ম খণ্ড নিঃশেষিত হওয়ায় ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং ইহার ২৩২ পৃঃ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থসম্পাদক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় গ্রন্থখানিকে অধিকতর উপযোগী করিবার জন্য বহু নূতন বিষয় সংযোজন করিয়াছেন।

(খ) বাংলা প্রাচীন পুথির বিবরণ গ্রন্থের মুদ্রণ ধীরে ধীরে চলিতেছে। গ্রন্থসম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী।

(গ) রিকার্ডোর ধনবিজ্ঞান গ্রন্থ মুদ্রণের কার্য্য উহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত দে মহাশয়ের দীর্ঘকাল অসুস্থতার জন্য আলোচ্য বর্ষে অগ্রসর হয় নাই।

আলোচ্য বর্ষে 'বঙ্কিমজীবনীর খসড়া' নামক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনের কর্ম্মময় এবং বৈচিত্র্যময় ইতিহাসের মূল উপাদানগুলি সংগ্রহ করিয়া শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস এই গ্রন্থ সম্পাদনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। গ্রন্থস্বত্ব সম্পাদকগণের থাকিবে। অতি সত্বর এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে।

এতদ্ব্যতীত উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ লেখকগণের গ্রন্থপ্রকাশ সম্বন্ধে পরিষৎ হইতে যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা 'বঙ্কিমচন্দ্র' এবং 'ঝাড়গ্রামরাজ' শিরোনামে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা' প্রকাশ সম্বন্ধে সংবাদ "আচার্য্য জগদীশচন্দ্র" বসু শিরোনামে বিবৃত হইয়াছে।

গ্রন্থ প্রকাশের জন্য বঙ্গীয় রাজসরকারের নিকট ১০৮০৲ টাকা সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল। লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ তহবিলের সুদ ৪৫৫৲ ও ঐ তহবিলের অর্থে প্রকাশিত গ্রন্থ বিক্রয়দ্বারা ২১৫৲ মোট ৬৭০৲ টাকা পাওয়া গিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থ প্রকাশের সাহায্য এবং কিছু চাঁদা পাওয়া গিয়াছিল।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার চারি সংখ্যা—১ম ও ২য় সংখ্যা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে এবং ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা একত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির শ্রেণীভেদ এইরূপ—

(ক) প্রাচীন সাহিত্য—১। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনাবলী, ২। কবি পীতাম্বর মিত্র ও জনমেজয় মিত্র, ৩। কালীপ্রসন্ন সিংহ, ৪। ক্যাপ্টেন জেম্স ষ্টুয়ার্ট, ৫। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য (প্রথম বাঙ্গালী সাংবাদিক), লেখক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬। গৌড়েশ্বরের আদেশে রচিত বিদ্যাসুন্দর, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, ৭। চণ্ডীদাস (আলোচনা), শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, ৮। বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯। বৌদ্ধ অপদান, ডক্টর শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা, ১০। সংস্কৃত সাহিত্যে মুসলমানের প্রেরণা, শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, ১১। সেকালের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

(খ) ইতিহাস—১। মল্লসারুলে প্রাপ্ত বিজয়সেনের তাম্রশাসন, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার, ২। বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের বয়স, ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত।

(গ) বিজ্ঞান—১। হিন্দু জ্যোতিষে শককাল, ডাঃ শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত, ২। হিন্দু প্রাণিবিজ্ঞান, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ঘোষাল।

অর্থাভাবে পত্রিকার সহিত পরিষদের কোন কার্য্যবিবরণই প্রকাশ করিতে পারা যায় নাই। বর্ত্তমান বর্ষ হইতে সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ প্রকাশের সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে।

সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান-শাখা

আলোচ্য বর্ষে প্রাপ্ত প্রবন্ধগুলির মধ্যে সাহিত্য বিভাগের প্রবন্ধ-সংখ্যাই বেশী হইয়াছিল বলিয়া সাহিত্য-শাখার ৭টি অধিবেশন হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ইতিহাস বিভাগে ১টি; দর্শন বিভাগে ১টি এবং বিজ্ঞান বিভাগে ৩টি অধিবেশন হইয়াছিল। এই সকল অধিবেশনে মাসিক অধিবেশনে পাঠোপযোগী ও পত্রিকায় প্রকাশোপযোগী প্রবন্ধ নির্ব্বাচিত হইয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাঙ্খ্যতীর্থ এবং ডক্টর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয় যথাক্রমে সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দাশগুপ্ত, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু এবং শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা মহাশয় আহ্বানকারী ছিলেন।

শাখা-পরিষৎ

পরিষদের মফস্বলের শাখাগুলির মধ্যে মেদিনীপুর-শাখার পঞ্চবিংশ বর্ষ পূর্ণ হওয়ায় রজত-জয়ন্তী উৎসবের যে বিপুল আয়োজন হইয়াছিল, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সমগ্র মেদিনীপুরবাসী, কি সরকারী, কি বেসরকারী, সকল শ্রেণীর নগরবাসী এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বিনয়রঞ্জন সেন মহাশয় শাখার কর্ম্মিবৃন্দের সহিত একযোগে যেরূপ উদ্যমের সহিত এই অনুষ্ঠানের সফলতা সম্পাদনের জন্য পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহা এই সংক্ষিপ্ত বিবরণের মধ্যে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নহে। এই উৎসব সপ্তাহ কাল ধরিয়া চলিয়াছিল। বিরাট্ প্রদর্শনী, লোকশিক্ষার উপযোগী বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা, নানা স্থান হইতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকগণের সমাবেশ এবং তাঁহাদের বক্তৃতা ও প্রবন্ধপাঠের ব্যবস্থা এবং প্রচুর লোকরঞ্জক আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই জয়ন্তী উৎসবের সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মৃতি-উৎসবও যথোচিত আড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। এই উপলক্ষে মেদিনীপুরবাসিগণ যে স্থায়ী এবং মহান্ কার্য্যের সূচনা করিয়াছেন, তাহা বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিয়া রাখিবে। মেদিনীপুরের গৌরব এবং বঙ্গসাহিত্যের মহান্ মহীরুহ প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমগ্র

গ্রন্থাবলীর একটি বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশের এবং মেদিনীপুর শহরে বিদ্যাসাগর স্মৃতি-সৌধ নির্ম্মাণের ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামে তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং এই সকল কার্য্যের উদ্দেশ্যে বহু সহস্র টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। ইতিমধ্যেই বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলীর এক খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। মূল পরিষৎ মেদিনীপুর-শাখার এই কর্ম্ম-প্রচেষ্টায় বিশেষ গৌরব অনুভব করিতেছেন। এই সম্পর্কে আর একটি শুভ সংবাদ এই যে, মেদিনীপুরের কাঁথি শহরে পরিষদের একটি নূতন শাখা স্থাপিত হইয়াছে। সেখানেও কর্ম্মীর অভাব নাই। তাঁহারা শাখা স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিম-উৎসব সম্পন্ন করিবার যে বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মূল পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় উক্ত উভয় ক্ষেত্রেই নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত রঙ্গপুর শাখা-পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে সাহিত্য-সম্মিলনে এবং বঙ্কিম-উৎসবে মূল পরিষদের সভাপতি, সভাপতিরূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আলোচ্য বর্ষে ত্রিপুরা-শাখা কুমিল্লায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের দ্বাবিংশ অধিবেশন আহ্বান করিয়াছেন। বিভিন্ন শাখার কার্য্যবিবরণ সংক্ষেপে পরিশিষ্টে লিপিবদ্ধ হইল। আলোচ্য বর্ষে শিলং ও শিলচরে পরিষদের শাখা স্থাপনের প্রস্তাব আসিয়াছে। এই সকল প্রস্তাব এক্ষণে বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

আলোচ্য বর্ষের ২৯এ মাঘ, ১লা ও ২রা ফাল্গুন কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের একবিংশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কৃষ্ণনগর রাজবাটীর নাট-মন্দিরে সম্মিলনের অধিবেশনের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। বিংশ অধিবেশনের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সম্মিলনের উদ্বোধন করেন। মূল সভাপতি ছিলেন শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত সাহিত্য-শাখার, শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী কথা-সাহিত্য-শাখার, শ্রীযুক্তা অর্পণা দেবী পদাবলী-শাখার, ডক্টর শ্রীযুক্ত হরিদাস ভট্টাচার্য্য দর্শন-শাখার, ডক্টর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অর্থনীতি-শাখার, ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী ইতিহাস-শাখার, ডক্টর কুদরতি এ খোদা বিজ্ঞান-শাখার, শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস কাব্য-সাহিত্য-শাখার, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সাংবাদিক-সাহিত্য-শাখার, এবং শ্রীযুক্ত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় চারু-কলা-শাখার সভাপতি হইয়াছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে প্রস্তাব গ্রহণ ব্যতীত সম্মিলনের নিয়মাবলীর কিছু কিছু পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। মূল পরিষদের সম্পাদক, সম্মিলনের অন্যতম সম্পাদক এবং পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ৫ জন সভ্য সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ২০শ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ চন্দননগর হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। সম্মিলনের ২২শ অধিবেশন কুমিল্লায় আহূত হইয়াছে।

কলিকাতা করপোরেশন

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, আলোচ্য বর্ষে কলিকাতা করপোরেশন পরিষদের গ্রন্থাগারের জন্য পুস্তকাদি ক্রয় করিতে ৬৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত পরিষদ্ মন্দির ও রমেশ-ভবনের ট্যাক্স রেহাই দিয়াছেন। পরিষৎ কলিকাতা করপোরেশনের নিকট এই জন্য বিশেষ ঋণী। গত পূর্ব্ব বৎসরে করপোরেশনের শাখা-সমিতি পরিষদের মন্দির নির্ম্মাণাদির জন্য ৬০০০৲ টাকা সাহায্য দানের বিষয় বজেটভুক্ত করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ টাকা পাওয়া যায় নাই। পরিষৎ আশা করেন যে, বর্ত্তমান বর্ষে ঐ টাকা পুনরায় করপোরেশনের বজেটে যেন ধরা হয়।

করপোরেশনের দানের ও ট্যাক্স রেহাই দিবার অন্যতম সর্ত্তানুসারে দুই জন ওয়ার্ড-কাউন্সিলার পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ও পুস্তকালয় এবং চিত্রশালা-সমিতির সভ্য আছেন।

অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঐতিহাসিক অনুসন্ধান তহবিল

এই অনুসন্ধান তহবিলের অর্থে গত বৎসরের বিজ্ঞাপন অনুসারে শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় আলোচ্য বর্ষের ৯ই আশ্বিন 'সিন্ধুসভ্যতা' বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন এবং ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের সাহায্যে চিত্র প্রদর্শন দ্বারা তাঁহার বক্তৃতার বিষয় পরিস্ফুট করেন। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয় গত ২০এ চৈত্র তারিখে বঙ্গভাষার ঐতিহাসিকতা বিষয়ক 'বাংলা সাহিত্যের প্রথম যুগ' বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন। তিনি এই বিষয়ে আরও দুইটি বক্তৃতা দিবেন। শ্রীযুক্ত ননীগোপালবাবু এবং শ্রীযুক্ত সজনীবাবু তাঁহাদের প্রত্যেকের দক্ষিণার ২০০৲ পরিষদের সাধারণ তহবিলে দান করিয়া পরিষদের প্রভূত উপকার করিয়াছেন

স্মৃতিরক্ষা

আলোচ্য বর্ষে নিম্নোক্ত সাহিত্যিকগণের চিত্র প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে,—

১। রাধানাথ সিকদার—মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর কর্ত্তৃপক্ষ ইঁহার তৈলচিত্র প্রস্তুত করিয়া দান করিয়াছেন।

২। তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়—পুত্র ৺শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ইঁহার এক তৈলচিত্র প্রস্তুত করিয়া দান করিয়াছেন।

৩। ৺কামিনী রায়—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় তৈলচিত্র দান করিয়াছেন।

৪। ৺ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়—'জন্মভূমি'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় ইঁহার একখানি ব্রোমাইড চিত্র দান করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় 'সোমপ্রকাশ'-সম্পাদক ৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের এক তৈলচিত্র দান করিয়াছেন। এই চিত্র অদ্য বার্ষিক অধিবেশনে প্রতিষ্ঠিত হইবে। মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর কর্ত্তৃপক্ষ ৺ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের এক চিত্র দান করিয়াছেন। এই চিত্রও অদ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই উভয় চিত্র ব্যতীত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় পরিষদের বিশেষ অনুরোধে ৺রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয়ের এক তৈলচিত্র প্রস্তুত করাইয়া দান করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সত্বরেই এই চিত্র প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইবে।

(ক) পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের এবং (খ) ডক্টর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার সঙ্কল্প আলোচ্য বর্ষে গৃহীত হইয়াছে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্মৃতি-সমিতির নিকট হইতে ঐ সমিতির সম্পূর্ণ হিসাব না পাওয়ায় স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠায় সাহায্যকারিগণের নাম প্রভৃতি প্রকাশ করিতে পারা যাইতেছে না। এই বিষয়ে স্মৃতি-সমিতির সম্পাদকের সহিত পত্রব্যবহার চলিতেছে।

দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার

আলোচ্য বর্ষে এই ভাণ্ডার হইতে যে দুই জন সাহিত্যিকের বিধবা পত্নীকে মাসিক অর্থ সাহায্য করা হইত, তন্মধ্যে এক জনের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে। তাঁহার চিকিৎসার জন্য অগ্রিম ৫ মাসের টাকা তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল। এক্ষণে এক জন দুঃস্থ সাহিত্যিকের দুঃস্থা কন্যাকে মাসিক সাহায্য করা হইতেছে। আলোচ্য বর্ষে মাত্র তিন জনকে এই ভাণ্ডার হইতে সাহায্য করা হয়। প্রধানতঃ ৺পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয়ের প্রদত্ত টাকার সুদ হইতেই এই সাহায্য করা হয়। এতদ্ব্যতীত এই ভাণ্ডার পুষ্টির জন্য অনেকে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিয়াছেন এবং এই ভাণ্ডারের জন্য প্রদত্ত পুস্তক বিক্রয় দ্বারাও কিছু অর্থ পাওয়া গিয়াছে।

পদক ও পুরস্কার

আলোচ্য বর্ষে ঢাকার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে পূর্ব্ব বিজ্ঞাপন অনুসারে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি-পুরস্কার (১০০৲) দেওয়া হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে কোন নূতন পুরস্কারের বিজ্ঞাপন দিবার ব্যবস্থা হয় নাই।

পরিষদ্ মন্দির

পরিষদ্ মন্দির সংস্কারের ব্যবস্থা আলোচ্য বর্ষে করিতে পারা যায় নাই, কিন্তু এই উদ্দেশ্যে পরিষদের আবেদনের ফলে বঙ্গীয় রাজসরকার যে অর্থসাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন, তাহা যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে। ১৩৪৫ সালে এ সংস্কার কার্য্য সম্পূর্ণ হইবে—আশা করা যায়

বিশেষ বিশেষ দান

আলোচ্য বর্ষে সদস্যগণের নিকট চাঁদা ও প্রবেশিকা, এবং পরিষৎ-পত্রিকা ও গ্রন্থাবলী বিক্রয় দ্বারা সংগৃহীত অর্থ ব্যতীত নিম্নোক্ত আর্থিক সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল,—

১। গ্রন্থপ্রকাশের জন্য বঙ্গীয় রাজসরকারের বার্ষিক দান।

২। বঙ্গীয় রাজসরকারের নিকট পত্রিকার এবং গ্রন্থাবলীর মূল্য প্রাপ্তি।

৩। কলিকাতা করপোরেশনের দান—গ্রন্থাগারের পুস্তক ক্রয়ের জন্য।

৪। সাধারণ তহবিলে দান।

৫। গ্রন্থপ্রকাশের জন্য দান।

৬। দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডারে দান।

৭। প্রতিষ্ঠা-উৎসবে ও সংবর্দ্ধনার জন্য দান।

৮। মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-উৎসবে দান।

এই সকল আর্থিক দান ব্যতীত পরিষদের কার্য্যালয়-সংক্রান্ত কার্য্যের সাহায্যের জন্য শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার বসু ও ৺ভূতনাথ দাস মহাশয়, শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র এবং শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় দপ্তর-সরঞ্জামীর দ্রব্যাদি দান করিয়াছেন। ইঁহাদের সকলেরই নিকট পরিষৎ বিশেষ কৃতজ্ঞ।

আয়-ব্যয়

আলোচ্য বর্ষের উদ্বৃত্ত-পত্র (ব্যালান্স-শীট) হইতে পরিষদের আর্থিক অবস্থার বিষয় সম্যক্ জানা যাইবে। বৎসরের পর বৎসর পরিষদের নানা অভাব জ্ঞাপন ও তাহার প্রতিকারের জন্য সদস্যগণের নিকট সানুনয় প্রার্থনা জানান হইতেছে। কিন্তু আশানুরূপ এবং পরিষদের প্রয়োজনানুরূপ অর্থ সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই। তাহার ফলে পরিষদের অনেক অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন ও কোন নূতন প্রস্তাবে হস্তক্ষেপ করা সম্ভবপর হইতেছে না। সুখের বিষয়, আলোচ্য বর্ষে যে সকল অর্থপ্রাপ্তির ভরসা ও সূচনা হইয়াছে,

তাহা সফল হইলে পরিষৎ নূতন উদ্যমে কর্ত্তব্যপথে অধিকতর অগ্রসর হইবার অবকাশ পাইবে। বঙ্গীয় রাজসরকারের দান, ঝাড়গ্রাম রাজের দান *, আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের দান, এবং 'চিত্রা' বায়স্কোপ কোম্পানীর প্রস্তাবিত সাহায্য-রজনী হইতে সাহায্য-প্রাপ্তি সত্বরই ঘটিবে, ইহা সাগ্রহে আশা করিতেছি। পরিষদের দেনা মিটাইবার উদ্দেশ্যে শেষোক্ত স্থানে সাহায্য রজনীর ব্যবস্থা করিবার জন্য শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয় বিশেষ পরিশ্রম ও চেষ্টা করিতেছেন এবং চিত্রার স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বি. এন. সরকার এ বিষয়ে বিশেষ ভরসা দিয়াছেন। পরিষদের সভাপতি মহাশয়, সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এবং শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় পূর্ব্বে পরিষদের দেনা মিটাইতে যে অর্থ ধার দিয়াছিলেন, আলোচ্য বর্ষে তাঁহারা তাঁহাদের সেই দাবী ত্যাগ করিয়া পরিষৎকে বিশেষ উপকৃত করিয়াছেন। সভাপতি মহাশয়, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রবাবু, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়গণ নগদ টাকা দান করিয়াও পরিষদের পরম উপকার করিয়াছেন। অন্যতম আয়ব্যয়-পরীক্ষক শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ কুণ্ডু মহাশয় বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত হিসাব পরীক্ষা করিয়া উহা নির্ভুল বলিয়াছেন।

উপসংহার

পরিশেষে আমরা পরিষদের প্রত্যেক সহৃদয় সদস্য, অনুগ্রাহক ও মঙ্গলকামীকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহারা পরিষদের প্রাণস্বরূপ—তাঁহাদের অনুকম্পাতেই পরিষৎ এতাবৎকাল যথাসম্ভব সুষ্ঠুরূপে নিজকার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিয়াছে। পরিষৎ এ প্রদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান—দেশবাসীর সহানুভূতির উপর অন্য কোন জাতীয় প্রতিষ্ঠান ইহা অপেক্ষা অধিক দাবী করিতে পারে না। ইহার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিলে আমাদের জাতীয়তার মূলেই কুঠারাঘাত করা হয়। শ্রীভগবানের ইচ্ছায় বৎসরের পর বৎসর ইহার কার্য্যক্ষেত্র বিস্তারলাভ করিয়াছে এবং ইহার দায়িত্বও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তদনুপাতে ইহার আয় বৃদ্ধি হয় নাই—এমন কি, অনেক সদস্য সময়মত তাঁহাদের দেয় চাঁদা পর্য্যন্ত প্রদান করিতে কার্পণ্য প্রকাশ করিয়াছেন। ফলে ইহা ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। আপনারা অনুগ্রহ করিয়া যাঁহাদের উপর ইহার পরিচালনার ভার অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই ইহার উন্নতিকল্পে পরিশ্রম করিতে কাতর নহেন। কিন্তু দেশবাসীর সহানুভূতি ও সহায়তা ব্যতিরেকে তাঁহাদের চেষ্টা ফলবতী হইবার সম্ভাবনা অল্প। সুখের বিষয়, কতিপয় দানশীল মহাত্মা এই সঙ্কটকালে ইহাকে অর্থাদি-দানে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহাদের কথা কার্য্যবিবরণীমধ্যে যথাস্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে।

* কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে, ঝাড়গ্রামরাজের দান বর্ত্তমান বর্ষে পাওয়া গিয়াছে।

ইহা শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রত্যেক দেশবাসীরই এ বিষয়ে যে কর্ত্তব্য আছে, তাহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। এই বৎসর আমরা সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের শতবার্ষিক জন্মোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন করিয়াছি। স্মরণ রাখিতে হইবে, তাঁহারই 'বঙ্গদর্শনে' মহামতি বীম্‌স্ সাহেব কর্ত্তৃক এই পরিষদের প্রথম পরিকল্পনা প্রকাশিত হয় এবং তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বেই ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। যদি সেই মহাপুরুষের স্মৃতি প্রকৃতরূপে রক্ষা করিতে চান, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার এই প্রিয় প্রতিষ্ঠানকে সর্ব্বতোভাবে সমৃদ্ধিশালী ও শক্তিমান্ করিয়া তুলুন—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষে
শ্রীমন্মথমোহন বসু
সম্পাদক

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ৭ই শ্রাবণ

শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৪৫শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা
১৩৪৫

মুঘল ভারতের ইতিহাস

স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার, এম-এ, ডি-লিট্

উপাদানের শ্রেণী-বিভাগ

মুঘল সাম্রাজ্যের শিল্প-কলা ও ধন-দৌলতের কথা আমরা সকলেই জানি; সে যুগের অট্টালিকা ও চিত্র আজিও জগতের চিত্ত বিমোহিত করিতেছে। কিন্তু আমার মনে হয় যে, ঐ যুগের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী গৌরবের, আমাদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা কাজের দান হইতেছে ঐতিহাসিক সাহিত্যের অজস্র ও বিচিত্র ধারা। এগুলির অনুগ্রহে মধ্যযুগের ভারতের অবস্থা, সমাজ ও সভ্যতা আমরা এখনও যেমন অতি সূক্ষ্ম, অতি স্পষ্ট রূপে দেখিতে পাই, অন্য যুগের পক্ষে তেমন সম্ভব নহে। এই সব ঐতিহাসিক উপাদান বিভিন্ন শ্রেণীর এবং সেগুলি একই ঘটনা বা রাজত্বকালের উপর নানা দিক্ হইতে আলোকপাত করে, একটি অপরটিকে সমালোচনা ও সংশোধন করিবার উপকরণ-স্বরূপ।

প্রথম শ্রেণী—আকবর হইতে বাহাদুর শাহ্ (অর্থাৎ প্রথম শাহ্ আলম) পর্য্যন্ত, ১৫৫৬ হইতে ১৭১০ পর্য্যন্ত, প্রত্যেক বাদশাহ্‌র দীর্ঘ ধারাবাহিক সরকারী ইতিহাস লিখিত হয়, যেমন 'আকবরনামা', 'পাদিশাহ্‌নামা', 'আলমগীরনামা' এবং 'বাহাদুরশাহ্‌নামা'। এই সঙ্গে জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনীকেও ধরিতে হইবে।

দ্বিতীয় শ্রেণী—বে-সরকারী ইতিহাস; এগুলি সরকারী কর্ম্মচারীদের দ্বারা লিখিত হইলেও, অফিশিয়াল্ হিষ্ট্রি অর্থাৎ সরকারী আজ্ঞায় দরবারে লিখিত এবং বাদশাহ্ বা উজীরের দ্বারা অনুমোদিত ইতিহাস হইতে ভিন্ন। এগুলির রচনা-প্রণালী স্বতন্ত্র এবং ঘটনা ও তারিখ অনেক কম। বড় কর্ম্মচারীদের জীবনচরিতও এই শ্রেণীতে আসে।

তৃতীয় শ্রেণী—এগুলিকে রীতিমত ইতিহাস বলা চলে না, খণ্ড ইতিহাস অথবা ইতিহাসের উপকরণ বলিলে অধিক সত্য হয়, যেমন দিন-লিপি (ডায়েরী), কোন সমর-অভিযানের সম্পূর্ণ রিপোর্ট, ইত্যাদি।

চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণী—ইতিহাসের কাঁচা মসলা, অথচ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিশ্বাসযোগ্য অমূল্য আধার, যেমন সমসাময়িক চিঠি এবং হাতে-লেখা খবরের কাগজ।

ষষ্ঠ শ্রেণী—শাসন সম্বন্ধে কাগজপত্র, চিঠি, আজ্ঞা, আয়ব্যয়ের বিবরণ, হিসাব ইত্যাদি। /

এখন এই বিভিন্ন ধরণের ইতিহাসগুলির স্বরূপ আলোচনা করা যাউক। আকবরের আজ্ঞায় শেখ আবুল্-ফজ্‌ল্ 'আকবরনামা' লিখিয়া যে একটি সাহিত্যিক নমুনা শিক্ষিত সমাজের সম্মুখে দিয়া যান, তাহাই দেড় শত বৎসর পর্য্যন্ত পরবর্ত্তী বাদশাহ্‌দের চরিতকারেরা অনুকরণ করেন। এই সরকারী ইতিহাসের এমন কয়েকটি চিহ্ন আছে, যাহা অন্য ধরণের ইতিহাসে নাই। (ক) এগুলি ঠিক বর্ষ ও তারিখ অনুসারে ঘটনা সাজাইয়া লিখিত, (খ) তারিখ, লোকের নাম ও স্থানের নাম এত বেশী দেওয়া হইয়াছে যে, অনেক স্থলে ঠিক আজকালকার পূজার ছুটির পূর্ব্বে কর্ম্মচারী-বদলের গেজেটের মত অপাঠ্য। (গ) কিন্তু প্রত্যেক ঘটনা অতি বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করায় আমরা অনেক বিষয়ে সংবাদ পাই, তাহা ইতিহাস ভিন্ন অন্য কাজেও লাগে, যেমন জাতিতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি। (ঘ) এই শ্রেণীর বইগুলির সর্ব্বাপেক্ষা বেশী মূল্য এই কারণে যে, ইহাদের ঘটনাবর্ণন ও তারিখগুলি একেবারে সত্য, এবং মূল আধার হইতে অবিকল উদ্ধৃত করা, অর্থাৎ মৌলিক ও সংগৃহীত গ্রন্থের মধ্যে যে পার্থক্য থাকে, তাহাই আমার বর্ণিত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পারসিক ইতিহাসের মধ্যে বিদ্যমান। এটা সহজে বুঝাইবার জন্য এই সরকারী ইতিহাসগুলি কিরূপে রচিত হইত, তাহার বিবরণ দিতেছি—

বাদশাহ্‌ কোন এক জন পারসিক ভাষায় সুলেখক বিখ্যাত পণ্ডিতকে বাছিয়া লইয়া তাঁহাকে সরকারী ঐতিহাসিক বা Historiographer Royal নিযুক্ত করিয়া আজ্ঞা দিতেন যে, আমার রাজ্যকালের একখানা চিরস্থায়ী ইতিহাস লেখ। সমস্ত সরকারী বিভাগের—বিশেষতঃ দপ্তরখানার কাগজপত্র তাঁহাকে দেখাইবার ও নকল করিবার অনুমতি দেওয়া হইত। প্রদেশে প্রদেশে আজ্ঞা যাইত যে, সেখানকার পুরাতন ইতিহাস, আর্থিক অবস্থা, প্রধান ঘটনা ইত্যাদি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়া রাজধানীতে এই লেখকের নিকট পাঠাইতে হইবে। ঠিক যেমন স্যর্ উইলিয়ম হাণ্টার কর্ত্তৃক *Imperial Gazetteer of India* রচনার সময় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বন্দোবস্ত করেন। এই নির্ব্বাচিত লেখক মহাশয়ের প্রধান সম্বল হইল সেনাপতি ও প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা (সুবাদার)-দের প্রেরিত রিপোর্ট এবং তাঁহাদের শিবির ও করদ রাজাদের দরবার হইতে প্রেরিত সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক সংবাদপত্র। এই শেষোক্ত কাগজগুলি প্রথমে 'ফর্দ্দ-এ-ওয়াকেয়া' এবং পরে 'পারচা-এ-আখ্‌বার' অথবা আখ্‌বারাৎ নামে পরিচিত। এগুলি বাদশাহী দপ্তরে (বস্তাখানা বা রেকর্ড অফিসে) যত্নে রক্ষিত হইত। এই মহাসমুদ্র মন্থন করিয়া লেখক মহাশয় মনোরম অথবা কাজের সংবাদগুলি তারিখসহ নকল করিয়া লইতেন। পরে তাহা হইতে ঘটনার কাঠামো বা অস্থিকঙ্কাল রচনা করিয়া অধ্যায়গুলি সাজাইয়া বই লিখিতে বসিতেন।

বাদশাহ্ নিজ কর্মচারীদের যে পত্র (ফর্মান্) পাঠাইতেন, বাদশাহের আজ্ঞায় উজীর অন্য লোককে যে সব হুকুম পাঠাইতেন (হস্‌ব্-উল্-হুকম্, অর্থাৎ ঠিক আমাদের গেজেটে By order ইস্তিহারের মত, কিন্তু ব্যক্তি-বিশেষের নামে প্রেরিত)—এগুলির নকল ঐ কেন্দ্রীয় রেকর্ড অফিসে থাকিত; রাজ-ঐতিহাসিক এগুলির মধ্যে কোন কোন দলিল হুবহু নিজ গ্রন্থে বসাইয়া দিতেন। এটা আমাদের পক্ষে বড়ই সুবিধাজনক হইয়াছে; কারণ, আমরা ইতিহাসের প্রথম শ্রেণীর উপকরণ অর্থাৎ সরকারী দলিল বা document এইরূপে অবিকৃত আকারে পাইয়াছি, আসল দলিলখানা হয়ত অনেক দিন হইল লোপ পাইয়াছে, এই নকল মাত্র রক্ষা পাইয়াছে। রাজ্যশাসন-পদ্ধতি, টেক্স, বিচার প্রভৃতি বিভাগ সম্বন্ধে অতি অমূল্য ফর্মান্ এইরূপে বাদশাহী সরকারী ইতিহাসের—বিশেষতঃ গুজরাতের শেষ মুঘল দেওয়ান-রচিত 'মিরাৎ-ই-আহমদী' নামক গ্রন্থের, মধ্যে প্রচুর পরিমাণে পাইয়া আমরা ধন্য হইয়াছি।

আবুল্-ফজ্‌ল্ এবং বাদাউনীর তুলনা

এই শ্রেণীর গ্রন্থের প্রবর্ত্তক শেখ আবুল-ফজ্‌ল্, তাঁহাকে এক জন পাদ্রী "আকবরের দ্বিতীয় আত্মা" নাম দিয়াছেন। আমরা আবুল-ফজলের ধর্ম্মমত, রাজসরকারে প্রতিপত্তি প্রভৃতির আলোচনা না করিয়া তাঁহার ঐতিহাসিক কীর্ত্তি অকীর্ত্তি আজ বিচার করিব। তাঁহার গ্রন্থগুলির মূল্য সকলেই স্বীকার করেন, কিন্তু অনেক সাহেব তাঁহাকে মিথ্যাবাদী চাটুকার বলিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছেন। কিন্তু বিচার করিয়া দেখা যাউক, আবুল-ফজল যে আকবরকে ভক্তি করিতেন, তাহা কি তাঁহার ভণ্ডামি, অথবা অযোগ্য রাজার প্রতি সম্মান দেখান? তাঁহার গ্রন্থগুলি ভাল করিয়া পড়িলে তিনি যে আকবরকে সত্য সত্যই মহাপুরুষ, দেবতুল্য সর্ব্বগুণে ভূষিত লোকপিতা বলিয়া ভক্তি করিতেন, এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ হইতে পারে না। আর যাঁহারা ভারত-ইতিহাস জানেন, তাঁহারাই স্বীকার করিবেন যে, আকবর দেবতুল্য রাজা ছিলেন, তিনি ভারতে এমন দুইটি জিনিষ দান করিয়াছিলেন, যাহা আর কোন মুসলমান রাজার সময়ে পাওয়া যাইত না এবং যাহা বর্ত্তমান সভ্য শাসন-প্রণালীর চিহ্ন। সে দুইটি হইতেছে, সর্ব্বধর্ম্মের নিরপেক্ষ প্রতিপালন (সুল্‌হ্-ই-কুল্) এবং সরকারী কাজে জাতিনির্ব্বিশেষে গুণীর নিয়োগ,—অর্থাৎ ইংরাজীতে বলিতে গেলে universal toleration এবং career open to talent. তাহার উপর পাঠান-যুগের শত শত বর্ষব্যাপী মারামারি, বিদ্রোহ, খুন ও অরাজকতার পর আকবর উত্তর-ভারতময় যে শান্তি স্থাপন করিলেন, তাহা অশোক ও সমুদ্রগুপ্তের পরবর্ত্তী হাজার বৎসরে দেখা যায় নাই। এই শান্তি ও সুশাসনের ফলে দেশময় ধন ও সুখ বাড়িতে লাগিল, সাহিত্য ও কলা, কি হিন্দুদের মধ্যে, কি মুসলমানদের সমাজে, দিন দিন বিকশিত হইতে থাকিল। যে রাজার এরূপ মহান্ কীর্ত্তি, তাঁহাকে 'নরদেব' বলিলে কি প্রাচ্য-দেশীয়

রাজস্তুতি হয়, না ইংরাজ জ্ঞানী কার্লাইলের প্রশংসিত হিরো-ওয়ার্শিপ হয়? আকবর কার্লাইলের বর্ণিত হিরোদের গুণে ভূষিত ছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে ভক্তি করা স্বাভাবিক এবং উচিত। ইসলাম ধর্ম্ম অনুসারে পাদিশাহ একাধারে পোপ এবং সম্রাটের পদস্থ, তিনি জীবন্ত খলিফা অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষের উত্তরাধিকারী, সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের পূজার যোগ্য। তাঁহার উপাধি কিব্‌লা ও কাবা, ঈশ্বরের ছায়া, পীর ও মুর্শিদ। তবে স্বীকার করি যে, অলঙ্কারের ছটায় এবং অত্যুক্তির ফলে স্থানে স্থানে আবুল-ফজলের লেখা পাঠকের বিতৃষ্ণা জন্মায়, এবং তিনি যে সব ভাল কাজই নিজ প্রভুর উপর আরোপ করিয়াছেন, তাহা কখন কখন অসত্য।

আবুল-ফজলের ইতিহাসের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর দোষ তাঁহার ভাষার ভঙ্গিমা। এক জন সাহেব রহস্য করিয়া বলিয়াছেন যে, মানবকে ভগবান্ ভাষা দিয়াছেন মনের ভাব গোপন করিবার জন্য। আবুল্-ফজল্ এমন রচনা-পদ্ধতি ও শব্দবিন্যাস অবলম্বন করিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার লেখার অর্থ বুঝা বিশেষ কষ্টকর। একটি মাত্র উপমা লইয়া তাহার শত বিভিন্ন আংশিক আকার ধরিয়া লম্বা লম্বা পৃষ্ঠা ভরিয়া একটি মাত্র বাক্য (sentence)। এই মুদ্রাদোষটি তিনি আমির খস্রুর রচনা হইতে পান; কিন্তু আমির খস্রু কবি ছিলেন, তাঁহার পক্ষে এটা তত দোষাবহ ছিল না। কিন্তু যখন এই অদ্ভুত অস্বাভাবিক লেখার ভঙ্গিমা শিহাবুদ্দীন তালিশ মিরজুমলার কুচবিহার ও আসাম জয় নামক গ্রন্থে অনুকরণ করিলেন, তখন সেটা পাঠকের অসহ্য কষ্টকর হইল। যাহা হউক, আবুল-ফজলের গ্রন্থে আমরা অমূল্য ঐতিহাসিক তথ্য পাই, ইহার ঘটনাগুলি অতি সত্য ও বিচিত্র।

এই সংশ্রবে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী লেখক আবদুল কাদির বাদাউনীর আলোচনা করা আবশ্যক। সাহেবেরা এই ঐতিহাসিকের গ্রন্থকে অযথা মাথায় তুলিয়াছেন, বোধ হয় আবুল-ফজলের প্রতি বিরাগের ফলে। প্রথমতঃ ঐতিহাসিক তথ্যের দিক্ দিয়া দেখিলে, বাদাউনীর গ্রন্থে ঘটনা অনেক কম এবং তিনি সরকারী দপ্তরখানার সাহায্য না পাওয়াতে অনেক ঘটনার গুজব ও মিথ্যা বর্ণনা লিখিয়াছেন। তিনি রাজদরবারে বড় কম সময় ছিলেন, সুতরাং বড় বড় কর্ম্মচারীর মুখে তাহাদের দৃষ্ট ঘটনার কাহিনী শুনিবার সুবিধাও পান নাই। তাহার পর তাঁহার চরিত্র আলোচনা করা যাউক। তাঁহার গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে আবুল-ফজলের এবং আবুল-ফজলের পিতা (বাদাউনীর শিক্ষক !!!) শেখ মুবারকের প্রতি ঈর্ষা ও দ্বেষ প্রকাশ পাইয়াছে। উহারা এত টাকা ও উচ্চ পদ পাইল, আমি পাইলাম না, হা খোদা, এই তোমার ন্যায়বিচার? এইরূপ কাঁদুনি পড়িয়া হাসিও আসে, কান্নাও পায়। আবুল-ফজল-পরিবার এবং আকবর সম্বন্ধে যেখানে যত নিন্দার গল্প-গুজব শুনিয়াছেন, বাদাউনী তাহা নির্ব্বিচারে নিজ গ্রন্থে স্থান দিয়াছেন। এইরূপ করিবার ফলে তাঁহার গ্রন্থ অনেক স্থলে আপনা হইতেই বিশ্বাসের অযোগ্য প্রতিপন্ন হয়। বইখানির উপর ধর্ম্মের নামাবলী চাপাইয়া দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে; পদে পদে কুরাণ হইতে বচন তোলা, ইসলাম নষ্ট হইল বলিয়া চীৎকার,

আমিই সাত্ত্বিক সুন্নী বলিয়া আস্ফালন, এই ভঙ্গিমাগুলি পড়িয়া বাদাউনীকে ধর্ম্মধ্বজী ভণ্ড বলিতে হয়। আর তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, মকনপুর গ্রামে শাহ্ মদার নামক পীরের পবিত্র সমাধি-মন্দিরে একটি স্ত্রীলোক-যাত্রীর ধর্ম্মনাশ করিবার চেষ্টা করেন এবং তাহার ফলে প্রেয়সীর আত্মীয়গণ তাঁহাকে মারিয়া মাথা ফাটাইয়া দেয়! অথচ তখন তিনি সেই জেলার দেওয়ানী জজের পদে প্রতিষ্ঠিত। (মূল, ২ ভা, ১৩৬-১৩৭ পৃষ্ঠা)। সুতরাং বাদাউনীর কথাগুলি চোখ বুজিয়া গ্রহণ করা যায় না; ইতিহাসের তত্ত্ব যে "নিহিতং গুহায়াং" এ ক্ষেত্রে সে কথা খাটে।

এই সরকারী ইতিহাসগুলি প্রায় আড়াই-শ বৎসরের ধারাবাহিক কাহিনী দেয়, কেহ কম, কেহ বেশী বিস্তৃত ভাবে। ইহার মধ্যে বাবর এবং জাহাঙ্গীর-লিখিত আত্মকাহিনী এবং হুমায়ুনের চাকর জৌহর-রচিত সেই বাদশাহের রাজত্ব-কাহিনীও ধরিতে হইবে। সুদীর্ঘ এবং রীতিমত সরকারী ইতিহাস আকবর হইতে আরম্ভ—

(১) 'আকবরনামা', ৩ খণ্ডে, আবুল-ফজল রচিত এবং তাঁহার খুনের পর সরহিন্দী কর্ত্তৃক শেষ চারি বৎসরের বৃত্তান্ত লিখিয়া সম্পূর্ণ করা হয়। (২) জাহাঙ্গীরের আত্মকাহিনী ও তাঁহার জীবনের শেষ দুই বৎসরের জন্য হাদি কর্ত্তৃক রচিত পরিশিষ্ট। (৩) শাহজাহানের ৩১ বৎসর রাজত্ব লিখিয়া গিয়াছেন, আবদুল হামিদ লাহোরী ১-২০ বৎসর, ওয়ারিস্ ২১-৩০ বৎসর এবং সালিহ্ কাম্বু ৩১ বৎসর ও কয়েক মাস। আওরংজীবের প্রথম দশ বৎসরের অতি বিস্তৃত ইতিহাস তাঁহার আজ্ঞায় কাজিম্ কর্ত্তৃক লিখিত, ১১০০ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত; এবং সমস্ত ৫১ বৎসরব্যাপী রাজত্বের সংক্ষিপ্ত, কিন্তু সরকারী কাগজ দেখিয়া লেখা 'মাসির-ই-আলমগীরী,' ৫৪১ পৃষ্ঠা (সাকী মুস্তাদ খাঁ-রচিত)। তাহার পর প্রথম-বাহাদুর শাহ্‌র অতি দীর্ঘ "নামা" দুই বৎসরের মাত্র (ন্যামৎ খাঁ আলীর রচনা)—ফর্‌রুখসিয়রের অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—মুহম্মদ শাহের (রাজত্ব ১৭১৯-১৭৪৮) ঐতিহাসিক তাঁহার "দুধ-ভাই" অর্থাৎ ধাত্রীপুত্র মুহম্মদ বখ্‌শ্ (ছদ্মনাম আশোব্), কিন্তু অনেক পরে, ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে, এক জন সাহেবের জন্য রচিত। এই বাদশাহের ঠিক পরবর্ত্তী দুই উত্তরাধিকারী আহমদ এবং দ্বিতীয় আলমগীর (১৭৪৮-১৭৫৯) সম্বন্ধে মাস, তারিখ দেওয়া ধারাবাহিক দুখানি "নামা" স্যর হেনরি এলিয়ট সংগ্রহ করেন, তাহা এক্ষণে ব্রিটিশ মিউজিয়মে স্থান পাইয়াছে; আর কোথাও পাওয়া যায় না। তার পর, দ্বিতীয় শাহ্ আলম পুত্তলিকা মাত্র ছিলেন, তাঁহার সাম্রাজ্য লোপ পাইয়াছিল, সুতরাং তাঁহার জন্য ঐরূপ ইতিহাস রচিত হয় নাই; তবে মুন্নালাল প্রভৃতি কেরাণীরা দুই তিনটি সংক্ষিপ্তসার লিখিয়া গিয়াছে, সেগুলি "নামা" নহে।

অপর সব শ্রেণীর ইতিহাস

দ্বিতীয় বিভাগের ইতিহাস। এই শ্রেণীতে তিন জন অতি উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক আছেন, বখ্‌শী নিজামুদ্দীন আহমদ, ফিরিশ্‌তা এবং খাফি খাঁ। ইহাদের যেমন বিষয়-বিন্যাসে দক্ষতা, সরল অথচ মনোরম ভাষা, অত্যুক্তি এবং বাজে কথা পরিত্যাগ, তেমনি নানা গ্রন্থ খুঁজিয়া এবং নানা কর্ম্মীকে জিজ্ঞাসা করিয়া ঘটনার সত্য মিথ্যা নির্দ্ধারণ করিবার অক্লান্ত চেষ্টা। আর এই তিনখানি গ্রন্থেই ভারতের মুসলমান-যুগের সমগ্র ইতিহাস দেওয়া হইয়াছে, দিল্লীর সুলতান ও বাদশাহ্‌দের কাহিনীর সহিত প্রাদেশিক মুসলমান রাজ্যগুলির ইতিহাস (সংক্ষেপে) লিখিত আছে। নিজামুদ্দীন এই দৃষ্টান্তটি দিয়া যান; পরবর্ত্তী পারসিক লেখকেরা তাঁহার অনুসরণ করিয়াছেন মাত্র, এবং নেহাবন্দী, বাদাউনী ও ফিরিশ্‌তা স্বীকার করিয়া তাঁহার কাহিনী হুবহু চুরি করিয়াছেন। ফলতঃ এই গ্রন্থখানি অমূল্য। তেমনি দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলি সম্বন্ধে ফিরিশ্‌তার ইতিহাস অমূল্য; কারণ, তিনি তথাকার লোক এবং নিজামুদ্দীনের বিশ বৎসর পরে লেখেন, তিনি অনেক দক্ষিণী ঐতিহাসিক উপকরণ পান, যাহা নিজামুদ্দীনের হাতে আসে নাই। ফিরিশ্‌তার ইতিহাস ১৬১৫ সালে শেষ হইয়াছে, খাফি খাঁর ১৭২৬ সালে (নামতঃ ১৭৩৪এ)। খাফি খাঁর দাক্ষিণাত্য সম্বন্ধে অংশটি (৩য় ভল্যুম) কোন কাজের নহে; তাঁহার গ্রন্থের ২য় ভল্যুম খুব মূল্যবান্; কারণ, ইহাতে আওরংজীব এবং তাঁহার বংশধরদের বিবরণ আছে, যাঁহারা খাফি খাঁর অনেকটা সমসাময়িক ছিলেন, অর্থাৎ ১৬৮০ হইতে ১৭২৬ পর্য্যন্ত প্রায় সব ঘটনাই এই লেখকের দৃষ্ট অথবা জ্ঞাত। তবে এখানে সাবধান করিয়া দেওয়া উচিত যে, এই শেষ অংশেও খাফি খাঁর কথা চোখ বুজিয়া বিশ্বাস করিলে চলিবে না; কারণ, তিনি সরকারী দলিল বা আখ্‌বারাৎ (সংবাদ-পত্র) একখানিও পান নাই, এমন কি, আওরংজীবের সরকারী সম্পূর্ণ ইতিহাস ('মাসির', ১৭১১তে লিখিত) পর্য্যন্ত দেখেন নাই। খাফি খাঁকে প্রায় সর্ব্বত্রই সংশোধন করাই ঐ যুগের বর্ত্তমান ঐতিহাসিক গবেষণার কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং এই সংশোধনের জন্য অপর পারসিক ও মারাঠী ভাষার উপকরণও প্রচুর পাওয়া যাইতেছে। ছোট ছোট অথবা সংকলন মাত্র গ্রন্থের নাম করিব না।

তৃতীয় বিভাগ—কর্ম্মচারীদের জীবনীর অংশ অথবা দিন-লিপি (ডায়েরী)। এগুলি অমূল্য প্রাথমিক মসলা, যদিও ইহাদের দৌড় বড় কম। এই শ্রেণীতে নেহাবন্দী-রচিত খাঁ-খানান্ আবদুর রহিম্-এর (সেনাপতি ও হিন্দী-ফারসী কবির) জীবনী, মির্জা নাথনের কীর্ত্তি-কাহিনী 'বহারিস্তান্-ই-ঘাইবী', কার্য্যতঃ বাঙ্গলা প্রদেশের জাহাঙ্গীরের রাজ্যকাল ব্যাপিয়া অতি বিস্তৃত মৌলিক এবং একমেবাদ্বিতীয়ম্ ইতিহাস, শিহাবুদ্দীন তালিশ-লিখিত মিরজুমলার কুচবিহার ও আসাম জয় এবং শায়েস্তা খাঁ কর্ত্তৃক চাটগাঁ অধিকার প্রভৃতি। যাঁহারা এগুলির অনুবাদ এবং সংক্ষিপ্তসার পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন, তাঁহারাই ইহার মূল্য বুঝেন, এগুলি বর্ত্তমানের আবিষ্কার।

সমসাময়িক পারসিক চিঠি এবং সংবাদপত্র

চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণী—চিঠি এবং হস্তলিখিত সংবাদ-পত্র (আখ্‌বারাৎ)। এগুলি তৃতীয় বিভাগের গ্রন্থগুলি অপেক্ষাও অধিকতর মৌলিক ও মূল্যবান্ উপকরণ, ফলতঃ আমি সর্ব্বদাই এগুলিকে ভারত-ইতিহাসের আদি মসলা (raw materials of Indian history) বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকি।

আকবরের রাজ্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রিটিশ অধিকার পর্য্যন্ত পারসিক ভাষায় অসংখ্য ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের চিঠি—রাজপুতানায় অতি কম হিন্দী বা রাজস্থানী ভাষায় পত্র, এবং মহারাষ্ট্রে মারাঠী ভাষায় লিখিত হাজার হাজার চিঠি ও রিপোর্ট (অধিকাংশ ১৭১৫ সালের পরবর্ত্তী) রক্ষা পাইয়াছে, এবং বোধ হয় তাহার পাঁচ ছয় গুণ সামগ্রী কালের প্রকোপে ধ্বংস হইয়াছে। আজ শুধু মুঘল যুগের প্রথম দেড়-শ বৎসরের (অর্থাৎ আওরংজীবের মৃত্যু পর্য্যন্ত) রচিত পারসিক ভাষার পত্রগুলির কথা বলিব। প্রত্যেক বাদশাহ্ এবং ছোট বড় কর্ম্মচারী ও রাজা-নবাব-জমিদারের পত্র লিখিবার জন্য মুন্‌শী অর্থাৎ সেক্রেটরী থাকিত। পত্রগুলি পারসিক ভাষায় রচিত হইত, এবং এই মুন্‌শীরা অধিকাংশই হিন্দু (কায়েৎ অথবা ক্ষেত্রী)। এমন কি, ডি বয়েঁ, পেরোঁ প্রভৃতি ফরাসী সেনাপতিও পারসিক মুন্‌শীর দ্বারা বাদশাহী দরবার ও দেশী রাজাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাইতেন। এই মুন্‌শীগুলি সযত্নে পারসিক রচনা শিখিয়া, যথাসাধ্য উৎকৃষ্ট, উপযুক্ত এবং 'ফুল্ল-কুসুমিত' শব্দ প্রয়োগ করিতেন, আর সেই সব পত্র-রচনার নকল রাখিতেন, যেমন আজকাল সব অফিসে ও জমিদারীতে লেটার-বুক থাকে। এই পত্রগুলি মুন্‌শী মহাশয়দের সাহিত্যিক রচনা হিসাবে গর্ব্বের বস্তু হইত; তাঁহারা (অথবা তাঁহাদের মৃত্যুর পর তাঁহাদের পুত্রগণ) ঐ পত্রগুলি একত্র গুছাইয়া সাজাইয়া, ভূমিকা যোগ করিয়া দিয়া শিক্ষিত জগতে প্রচারিত করিতেন, ইহা তাঁহাদের স্মৃতিচিহ্ন থাকিবে বলিয়া। এইরূপে অনেক সরকারী ও অন্য ঐতিহাসিক পত্র রক্ষা পাইয়াছে—নকলের দ্বারা; কারণ, আসল সীল-পাঞ্জা-মার্কা পত্রগুলি আলাহিদা থাকায় সব লোপ পাইয়াছে। পারসিক ভাষায় রচিত ঐতিহাসিক চিঠির ভাণ্ডার যে কত বিচিত্র ও বিপুল, তাহা আমার লিখিত *Studies in Aurangzib's Reign* নামক গ্রন্থের এক অধ্যায়ে এবং *Cambridge History of India*, Vol. IV, Chapters 8 & 10এর গ্রন্থপঞ্জী পড়িলে বুঝিতে পারিবেন।

আর, রাজদরবার, প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের কাছারি এবং সেনাপতিদের শিবির হইতে প্রতি সপ্তাহে বা মাসে হাতে-লেখা খবরের কাগজ প্রেরিত হইত; ইহার নাম ওয়াকেয়া, পরে আখ্‌বারাৎ। ১৬৫৮ সাল হইতে ইহার অনেকগুলি পাওয়া গিয়াছে, তাহার পূর্ব্বেকারগুলি সব ধ্বংস হইয়াছে। এগুলি অমূল্য এবং সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর মৌলিক উপাদান। ইহার সাহায্যে বড় বড় এবং প্রসিদ্ধ ইতিহাসও সংশোধন করা যায়, তাহার দৃষ্টান্ত আমার রচিত 'আওরংজীব', 'শিবাজী', 'মুঘল সাম্রাজ্যের পতন' প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিতে পাইবেন।

ইউরোপীয় ভ্রমণকারিগণ

এ-পর্য্যন্ত পারসিক ঐতিহাসিক গ্রন্থের ও মসলার কথা বলিলাম। এখন সপ্তম বিভাগ অর্থাৎ ইউরোপীয় ভাষায় রচিত তৎকালীন বিবরণ ও রিপোর্টের কথা বলিয়া শেষ করিব। এই শ্রেণীর উপাদানগুলিকে সাহেবেরা অযথা মূল্য দিয়া থাকেন। আমি স্বীকার করি যে, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, প্রজাদের সুখদুঃখ, রাস্তাঘাট, শিল্পবাণিজ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে এবং ভারতীয় শাসন-পদ্ধতি ও সমাজের সমালোচনায় এই বিদেশী সাক্ষীগুলির কথা আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্রে এক মহা অভাব পূরণ করে। কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনা ধরিলে এই ভ্রমণ-কাহিনী ও রিপোর্ট অনেক সময় বিশ্বাসের অযোগ্য, গুজবের উপর নির্ম্মিত অথবা ভাসাভাসা মামুলী কথামাত্র। সে যুগে বিদেশী ভ্রমণকারী ও পাদ্রীগণ পারসিক ভাষায় লেখাপড়া করিতে জানিতেন না, কোন রকমে উর্দ্দুর সাহায্যে কথাবার্ত্তা চালাইতেন, সুতরাং তাঁহারা পারসিক ভাষায় লিখিত সরকারী কাগজ বা গ্রন্থ ও পত্রাদির জ্ঞান হইতে বঞ্চিত ছিলেন। এজন্য ফাদার্ মন্‌সেরাট্ এবং মানুচী পর্য্যন্ত হাস্যকর ভুল করিয়া গিয়াছেন, যাহাতে বুঝা যায় যে, তাঁহাদের পারসিক ভাষার জ্ঞান কর্ণের দ্বারা প্রাপ্ত, চক্ষুর দ্বারা নহে। আবার এই সব সাহেবদের মধ্যে অনেকে ভারতে অতি অল্পদিন মাত্র কাটাইয়াছিলেন, আর কেহ কেহ ছোট নগণ্য মফস্বল শহরে বাস করিতেন; কাজে কাজেই সত্য সংবাদের মূল কেন্দ্র অর্থাৎ রাজসভা ও সেনাপতির শিবির হইতে দূরে থাকায় প্রকৃত তথ্য শুনিতে পান নাই।*

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে প্রদত্ত অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বক্তৃতামালার দ্বিতীয় বক্তৃতা

গোপাল ভট্ট

শ্রীসুশীলকুমার দে, এম-এ, ডি-লিট্

কিংবদন্তী ছাড়িয়া দিলে, চৈতন্যদেবের পার্ষদ ও ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম গোপাল ভট্টের যে-পরিচয় বঙ্গীয় বৈষ্ণবসংপ্রদায়ের গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়, তাহা অতি বিক্ষিপ্ত, সামান্য ও অনিশ্চিত। কথিত আছে, চৈতন্যদেবের আজ্ঞায় গোপাল ভট্ট শেষ জীবন রূপ-সনাতন প্রভৃতির সাহচর্য্যে বৃন্দাবনে অতিবাহিত করিয়াছিলেন এবং সেইখানেই তাঁহার পুস্তকগুলির রচনা করিয়াছিলেন। এই সূত্রে 'চৈতন্যচরিতামৃত'-প্রণেতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবনে নিশ্চয়ই তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলেন ; কারণ, উক্ত গ্রন্থে (আদি, ১।৩৭) বৃন্দাবন-গোস্বামীদের উল্লেখ করিয়া কবিরাজ গোস্বামী তাঁহাকে আপনার অন্যতম শিক্ষাগুরু বলিয়া নমস্কার করিয়াছেন। কিন্তু আরও কয়েক বার (আদি, ৯।৪, ১০।১০৫ ; মধ্য, ১৮।৪৯) তাঁহার নাম গ্রহণ করিলেও কৃষ্ণদাস গোপাল ভট্ট সম্বন্ধে কিছুই লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। উক্ত আছে, বৈষ্ণবোচিত দৈন্যের বশবর্ত্তী হইয়া গোপাল ভট্ট নিজের সম্বন্ধে কোনও বিবরণ লিখিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দের প্রথমার্দ্ধে, অর্থাৎ প্রায় দুই শতাব্দের অধিক কাল পরে, নরহরি চক্রবর্ত্তী এই প্রবাদের কথা বলিয়া[১], তাঁহার স্বরচিত 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে এই ত্রুটি-সংশোধন উপলক্ষ্যে মুখ্যতঃ জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই আপাতত গোপাল ভট্টের পরিচয়ের প্রধান অবলম্বন। নরহরির বিবরণ হইতে জানা যায়, চৈতন্যদেবের সহিত গোপাল ভট্টের প্রথম সাক্ষাৎ ও তদনুগ্রহলাভ হইয়াছিল দাক্ষিণাত্যে। গোপাল ভট্টের পিতা বেঙ্কট ভট্ট ছিলেন দক্ষিণদেশের এক জন শাস্ত্রজ্ঞ বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ, কিন্তু দাক্ষিণাত্যে কোথায় তাঁহার নিবাস ছিল, তাহা নরহরি স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। ত্রিমল্ল, বেঙ্কট ও প্রবোধানন্দ, এই তিন ভ্রাতা ছিলেন লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক ও শ্রীবৈষ্ণবসংপ্রদায়ভুক্ত, কিন্তু চৈতন্যদেবের কৃপায় তাঁহারা রাধাকৃষ্ণরসে মত্ত হইয়াছিলেন। এবং বেঙ্কটতনয় বালক গোপাল ভট্ট তাঁহার সেবক ও ভক্ত হইয়া, পরে রূপসনাতনের সহিত বৃন্দাবনে মিলিত হইবার স্বপ্নাদেশ সেই সময়ে লাভ করেন। দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের সময়ে চৈতন্যদেব ভট্টগৃহে চারি মাস বাস করিয়াছিলেন, এবং তাহার নাকি

চৈতন্যচরিতামৃতে বিশেষ বর্ণন।[২]

১। শ্রীগোপাল ভট্ট হৃষ্ট হৈয়া আজ্ঞা দিল। গ্রন্থে নিজ প্রসঙ্গ বর্ণিতে নিষেধিল।
কেনে নিষেধিল ইহা কে বুঝিতে পারে। নিরন্তর অতিদীন মানে আপনারে।
কবিরাজ তার আজ্ঞা নারে লঙ্ঘিবার। নামমাত্র লিখে অন্য না করে প্রচার।
('ভক্তিরত্নাকর', বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে মুদ্রিত, মুর্শিদাবাদ, সন ১৩৩২, পৃঃ ১৫)

২ 'ভক্তিরত্নাকর', পৃঃ ৭।

কিন্তু 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র উল্লেখ করিয়া নরহরি স্বীকার করিয়াছেন যে—

গোপাল ভট্টের নাম অব্যক্ত সেথায়।[২]

এবং স্বীয় উক্তির কৈফিয়ৎস্বরূপ পুনরায় বলিয়াছেন—

অন্যত্র ব্যক্ত গোপাল বেঙ্কটতনয়।[২]

'চৈতন্যচরিতামৃতে' এবং "অন্যত্র" এই প্রসঙ্গে যাহা পাওয়া যায়, তাহা সংক্ষেপে এইরূপ। কবিকর্ণপূর তাঁহার সংস্কৃত 'চৈতন্যচরিতামৃত' কাব্যে[৩] লিখিয়াছেন, দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের সময়ে চৈতন্যদেব শ্রীরঙ্গপুরীতে ত্রিমল্ল ভট্টের গৃহে চারি মাস অবস্থান করিয়াছিলেন, কিন্তু এই সূত্রে বেঙ্কট ভট্টের বা তৎপুত্র গোপাল ভট্টের কোনও উল্লেখ নাই। কবি-কর্ণপূরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকেও এ ঘটনার কোন কথা পাওয়া যায় না। যে সংস্কৃত 'চৈতন্যচরিতামৃত'[৪] মুরারি গুপ্তের নামে প্রচলিত আছে, তাহাতে ত্রিমল্ল ভট্টের গৃহে চারি মাস আতিথ্য গ্রহণের কথা আছে; কিন্তু এখানে গোপাল ভট্ট বেঙ্কট ভট্টের পুত্র নহে, ত্রিমল্লের স্বল্পবয়স্ক বালক পুত্র বলিয়া বর্ণিত! কৃষ্ণদাস কবিরাজের বিবরণে (মধ্য, ১।১০৮-১০ ও ৯।৮২-১৬৩) প্রকাশ পায় যে, চৈতন্যদেব ত্রিমল্ল ও বেঙ্কট ভট্টের গৃহে ক্রমান্বয়ে ছয় মাস ও চারি মাস বাস করিয়াছিলেন; উভয়েই শ্রীবৈষ্ণব ও শ্রীরঙ্গ-নিবাসী, কিন্তু তাঁহাদের পরস্পর সম্বন্ধের কোনও নির্দ্দেশ নাই, এবং গোপাল ভট্টের নামও অব্যক্ত! চৈতন্যদেবের অন্যান্য চরিতগ্রন্থে এ প্রসঙ্গ একেবারেই বর্ণিত হয় নাই।

তা হইলে, নরহরি চক্রবর্ত্তীর "অন্যত্র ব্যক্ত" এই কথার দ্বারা বোধ হয় বুঝিতে হয় যে, এই সকল পূর্ব্ববর্ত্তী প্রামাণিক চরিতগ্রন্থে কোনও বিবরণ না থাকিলেও, তিনি ইহা অন্য কোনও অর্ব্বাচীন পুস্তকে পাইয়াছিলেন। নিত্যানন্দ দাস-রচিত 'প্রেমবিলাসে'র বর্ণনা[৫] সংক্ষিপ্ত, কিন্তু অনুরূপ। ইহাতে পাওয়া যায়, শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে ত্রিমল্লের গৃহে চাতুর্মাস্য করিবার সময় চৈতন্যদেব ত্রিমল্লের ভ্রাতা প্রবোধানন্দের উপর বালক গোপাল ভট্টের শাস্ত্রশিক্ষার ভার দেন, যাহাতে পরে গোপাল ভট্ট সর্ব্ব-শাস্ত্রবিৎ হইয়া পিতামাতার বিয়োগান্তে বৃন্দাবনে গমন করেন। এখানে বেঙ্কটের নাম উল্লিখিত হয় নাই; তাহাতে মনে হয়, নিত্যানন্দ দাসের মতে গোপাল ভট্ট ত্রিমল্লের পুত্র। মনোহর দাস-রচিত 'অনুরাগবল্লী'[৬] গ্রন্থেও যে-বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহা নরহরির বর্ণনার

---

২ 'ভক্তিরত্নাকর', পৃঃ ৭।

৩ রাধারমণ যন্ত্রে মুদ্রিত, ১৩১৪।

৪ অমৃতবাজার পত্রিকা কার্য্যালয়ে মুদ্রিত (তৃতীয় মুদ্রাঙ্কণ, কলিকাতা, সন ১৩৩৭) ৩।১৫।১৪-১৬।

৫ রাধারমণ যন্ত্রে মুদ্রিত, বহরমপুর মুর্শিদাবাদ, সন ১৩১৮; অষ্টাদশ বিলাস দ্রষ্টব্য। ইহা ১৫২২ শকাব্দে রচিত বলিয়া কথিত আছে; কিন্তু এই তারিখ নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যায় না।

৬ অমৃতবাজার পত্রিকা কার্য্যালয়ে মুদ্রিত (কলিকাতা, ১৮৯৮), পৃঃ ৮-১২। ইহা বৃন্দাবনে ১৬১৮ শকে রচিত বলিয়া কথিত আছে; কিন্তু তাহার নিশ্চিত প্রমাণ নাই।

সহিত প্রায় মিলিয়া যায়। মনোহর দাসের মতে ত্রিমল্ল জ্যেষ্ঠ, বেঙ্কট মধ্যম ও প্রবোধানন্দ কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, এবং গোপাল ভট্ট বেঙ্কট ভট্টেরই পুত্র। যখন চৈতন্যদেব ইঁহাদের গৃহে চারি মাস অতিথি হইয়া ছিলেন, তখন গোপাল ভট্ট বালক নহেন, প্রাপ্তবয়স্ক। চৈতন্যদেবের আজ্ঞায় তিনি পরে বৃন্দাবনে আসিয়া রূপ ও সনাতনের সঙ্গে মিলিত হন। উপরোক্ত বিবরণগুলির মধ্যে সাদৃশ্য থাকিলেও যথেষ্ট অসংলগ্নতা ও অসঙ্গতি রহিয়াছে। নরহরিও যে এ-কথা জানিতেন না, তাহা নহে। তবে বিরোধ সত্ত্বেও মহাজনদিগের নিগূঢ় ও প্রাকৃত জনের দুর্বোধ্য বাক্যের উপর অশ্রদ্ধা করিতে নিষেধ করিয়াছেন (পৃঃ ১৪-১৫)—

শ্রীগোপাল ভট্টের এ সব বিবরণ। কেহ কিছু বর্ণে কেহ না করে বর্ণন॥
না বুঝিয়া মর্ম্ম ইথে কুতর্ক যে করে। অপরাধ-বীজ তার হৃদয়ে সঞ্চারে॥

তথাপি, ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী চরিতাখ্যায়কগণের কেহ কেহ গোপাল ভট্টের দাক্ষিণাত্যে উৎপত্তি স্বীকার করিলেও, তাঁহার পূর্ব্ব ইতিহাস সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য জানিতেন বলিয়া মনে হয় না; অন্তত এ-বিষয়ে তাঁহারা একমত নহেন। ইহা আরও লক্ষ্য করিবার বিষয়, গোপাল ভট্ট দাক্ষিণাত্যে যখন রূপ-সনাতনের সহিত মিলিত হইবার স্বপ্নাদেশ পান, তখনও কিন্তু চৈতন্যদেবের সহিত রূপ-সনাতনের সাক্ষাৎকার পর্য্যন্তও হয় নাই! এ-বিষয়ে নরহরির বিবরণের মধ্যেও সঙ্গতির অভাব রহিয়াছে। গোপাল ভট্টের সূচকে তিনি লিখিয়াছেন যে, রূপ-সনাতনের বৃন্দাবনে আগমনের পূর্ব্বে গোপাল ভট্ট সেখানে পৌছিয়াছিলেন। কিন্তু আবার অন্যত্র বলিয়াছেন— (পৃঃ ১১)

লিখিলেন পত্রীতে শ্রীরূপ সনাতন। গোপাল ভট্টের বৃন্দাবন আগমন॥

'প্রেমবিলাসে'র মতে গোপাল ভট্ট পরে আসিয়া রূপ ও সনাতনের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য-যাত্রার সময় কোনও বিশিষ্ট ভক্ত তাঁহার অনুগামী না হওয়ায়, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে যে, পরবর্ত্তী কালে যে সকল বর্ণনা লেখা হইয়াছিল, তাহা নানাবিধ কল্পনা ও জনশ্রুতির সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল। এ-সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস কবিরাজও তাঁহার নিজের সম্পূর্ণ তথ্যজ্ঞানের অভাব স্বীকার করিয়াছেন, এবং নরহরিও এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাসের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন (পৃঃ ১৫)—

প্রাচীন বৈষ্ণবমুখে এ সব শুনিল।

বর্ত্তমান কালেও এই বিষয়ে নানারূপ মতবাদের অভাব নাই। রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন ও তাঁহার অনুবর্ত্তিতায় জগদ্বন্ধু ভদ্র ও দীনেশচন্দ্র সেন প্রচার করিয়াছেন যে, গোপাল ভট্টের তথাকথিত পিতা বেঙ্কট ভট্ট এবং বেদান্তপরিভাষার রচয়িতা ধর্ম্মরাজাধ্বরির গুরু বেলগুণ্ডি-নিবাসী বেঙ্কট ভট্ট বা বেঙ্কটনাথ একই ব্যক্তি। কিন্তু নামের সাদৃশ্য ভিন্ন ইহার সপক্ষে বিন্দুমাত্র প্রমাণ নাই। বেঙ্কট এই নামটি দাক্ষিণাত্যে অসাধারণ নহে, সুতরাং অভিন্নতা প্রমাণ করিতে হইলে অন্য প্রমাণের প্রয়োজন। তাঁহারা আরও বলিয়াছেন যে, গোপাল ভট্টের আদি-নিবাস ছিল ভট্টমারি নামক কোনও গ্রামে; কিন্তু কবিরাজ গোস্বামীর গ্রন্থে (মধ্য, ১।১১২; ৯।২২৪, ২৩১-৩৩০ ইত্যাদি) ভট্টমারি (পাঠান্তর 'ভট্টথারি') কোনও স্থানের নাম নহে,

একদল ভণ্ড সাধুর নাম বলিয়া দেওয়া আছে, যাহাদের চৈতন্যদেব মল্লারদেশে (মালাবর ?) দেখিয়াছিলেন।

গোপাল ভট্টের পিতৃব্য বলিয়া প্রবোধানন্দের উল্লেখ আরও রহস্যজনক। ইহা কেবল মনোহর দাস ও নরহরির কল্পনা বা শোনা কথা বলিয়া মনে হয়। 'হরিভক্তিবিলাস' গ্রন্থের[৭] প্রথমেই গোপাল ভট্ট আপনাকে প্রবোধানন্দের শিষ্য বলিয়া খ্যাপন করিয়াছেন, কিন্তু নিজের বংশ-পরিচয় বা প্রবোধানন্দের সহিত আত্মীয়তার কোনও কথা বলেন নাই। তিনি প্রবোধানন্দকে 'ভগবৎপ্রিয়' এই বিশেষণের দ্বারা অভিহিত করিয়াছেন; টীকাকার এই সমস্ত পদটি বহুব্রীহি ও তৎপুরুষ, এই দুই ভাবেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যদি তৎপুরুষ হিসাবে লওয়া যায়, তাহা হইলে প্রবোধানন্দ চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন, এইরূপ অর্থ হয়; এবং তাহা যদি হয়, তবে গোপাল ভট্টকে এই ভাবে চৈতন্যদেবের প্রশিষ্য বলিয়া গণনা করিতে হয়। কিন্তু ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় যে, চৈতন্যদেবের কোনও চরিতগ্রন্থে বা মনোহর দাস ও নরহরির উল্লেখ ভিন্ন অন্য কোনও বৈষ্ণব-বিবরণে, গোপাল ভট্টের পিতৃব্য অথবা চৈতন্যদেবের ভক্ত হিসাবে প্রবোধানন্দের নাম পর্য্যন্তও পাওয়া যায় না। প্রবোধানন্দ বা প্রবোধানন্দ সরস্বতীর নামে কতকগুলি সংস্কৃত স্তোত্রকাব্য রহিয়াছে; তাহাতে তাঁহার বৈষ্ণবভাব ও চৈতন্যানুরক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার 'চৈতন্যচন্দ্রামৃত' অন্যান্য গ্রন্থগুলির অপেক্ষা অধিকতর সুপরিচিত[৮]; ইহাতে ১৪৩ শ্লোকে স্তুতি, প্রণাম, আশীর্ব্বাদ, অবতার প্রভৃতি দ্বাদশ বিভাগে চৈতন্যের বন্দনা ও গুণকীর্ত্তন রহিয়াছে। তাঁহার পঞ্চদশসর্গাত্মক 'সঙ্গীতমাধব'[৯] জয়দেবের অনুকরণে

---

৭ ভক্তেবিলাসাংশ্চিনুতে প্রবোধানন্দস্য শিষ্যো ভগবৎপ্রিয়স্য।
গোপালভট্টো রঘুনাথদাসং সংতোষয়ন্ রূপসনাতনৌ চ॥
(রাধারমণ প্রেসে মুদ্রিত, দ্বিতীয় সংস্করণ, দিগ্‌দর্শনী টীকা সমেত, মুর্শিদাবাদ, সন ১২৯৬, ১২৯৮।)

৮ আনন্দীরচিত টীকা সহিত রাধারমণ প্রেসে মুদ্রিত (মুর্শিদাবাদ, সন ১৩৩৪)। ইণ্ডিয়া অফিস, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ভাণ্ডারকর ইন্‌স্টিটিউট্ প্রভৃতি গ্রন্থাগারে রক্ষিত এই পুস্তকের শ্লোকসংখ্যার সহিত মুদ্রিত পুস্তকের শ্লোকসংখ্যার মিল নাই; পাঠভেদও আছে। ৩৮ শ্লোকের বর্ণনা হইতে অনুমান করা যায় যে, স্তোত্রকার চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন। ১৩২ শ্লোকে চৈতন্যদেবকে 'গৌরনাগরবর' বলা হইয়াছে। অনেকের মতে ইহা নরহরি সরকার ও লোচনদাসের বর্ণিত নাগরভাবের অনুরূপ এবং সকলের রুচিগ্রাহ্য হয় নাই; সেই জন্য প্রামাণিক বৈষ্ণবগ্রন্থে প্রবোধানন্দের নাম বাদ পড়িয়াছে। তাহা যদি হয়, তবে ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম গোপাল ভট্ট কিরূপে তাঁহাকে গুরু বলিয়া ব্যক্ত করিলেন ?

৯ ভক্তিপ্রভা-কার্য্যালয় হইতে মুদ্রিত (আলাটী, হুগলী, সন ১৩৪৩)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই গ্রন্থের যে পুঁথি আছে (নং ১৪০২), তাহাতে ১৫টি সর্গ আছে; মুদ্রিত পুস্তকের ষোড়শ সর্গের যে চারিটি অধিক শ্লোক আছে, তাহা পুঁথিতে পঞ্চদশ সর্গের পুষ্পিকার পরে পাওয়া যায়; পৃথক্ সর্গে নিবদ্ধ নহে। গীতিগুলির শ্লোকানুক্রম ছাড়িয়া দিলে পুথির শ্লোকসংখ্যা ১৪১।

গীতিবহুল এবং রাধাকৃষ্ণের লীলাবর্ণনায় পর্য্যবসিত। 'বৃন্দাবনমহিমামৃত'[১০] নামক আর একটি শতক-কাব্য তাঁহার নামে প্রচলিত আছে; ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়—নানাবিধ ছন্দে কৃষ্ণের লীলাভূমি বৃন্দাবনের বর্ণনা। ইহা নাকি এক শত শতকে লিখিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে ষোলটি মাত্র শতক পাওয়া গিয়াছে ও মুদ্রিত হইয়াছে; ইহাতেও প্রারম্ভে চৈতন্যদেবের নমস্ক্রিয়া রহিয়াছে।[১১] কিন্তু আত্মীয়তার কথা দূরে থাকুক, এই পরিব্রাজকাচার্য্য প্রবোধানন্দ সরস্বতী যে গোপাল ভট্টের গুরু ছিলেন, মনোহর দাস ও নরহরির উক্তি ভিন্ন তাহার কোনও প্রমাণ নাই।

দীনেশচন্দ্র সেন-প্রমুখ দু-এক জন লেখক গোপাল ভট্টের গুরু প্রবোধানন্দকে 'বেদান্তসিদ্ধান্তমুক্তাবলী'র রচয়িতা প্রকাশানন্দের সহিত অভিন্ন বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, প্রবোধানন্দের সহিত কাশীতে চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ হয় ও তাঁহার কৃপায় প্রবোধানন্দ এই নাম প্রকাশানন্দে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। কিন্তু এই উক্তির সপক্ষে কোনও প্রমাণ নাই। 'মুক্তাবলী'র প্রণেতা, পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য জ্ঞানানন্দের শিষ্য; এবং তিনি যে চৈতন্যমতাবলম্বী ছিলেন, তাহার কোনও পরিচয় উক্ত গ্রন্থে নাই। কাশীতে কোনও প্রবোধানন্দের সহিত চৈতন্যদেবের মিলন হয় নাই। যে মায়াবাদী সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসপরিপন্থী নৃত্যগীতাদির প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন, তিনি যে মুক্তাবলীকার প্রকাশানন্দ, তাহা কোনও চৈতন্যচরিতগ্রন্থে নাই। পরন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজের বর্ণনা হইতে ইহাই অনুমান হয় যে, চৈতন্যদেবের ভক্তির উৎস

১০ হরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী (হরিদাস বাবাজী), নগেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, দীনেশচরণ দাস প্রভৃতির সম্পাদনায় বৃন্দাবনে ১৩৪০-৪৫ সনে প্রকাশিত। শতকগুলি বাস্তবিক পৃথক্ পৃথক্ খণ্ড, এবং অনেক শতকে শতাধিক শ্লোকও রহিয়াছে। হেবর্লিন প্রকাশিত কাব্যসংগ্রহে (খ্রীঃ অঃ ১৮৪৭, পৃঃ ৪৩০) মুদ্রিত এবং জীবানন্দ বিদ্যাসাগর কর্ত্তৃক স্বীয় কাব্যসংগ্রহ দ্বিতীয় খণ্ডে (৩য় সং, কলিকাতা ১৮৪৪, পৃঃ ৩৩৩-৮৪) পুনর্মুদ্রিত ১২৬ শ্লোকাত্মক এবং একটি শতকে সমাপ্ত যে বৃন্দাবন-শতক পাওয়া যায় তাহাতে প্রবোধানন্দের নাম নাই, কিন্তু চৈতন্য-বন্দনা আছে। উপরোক্ত অধুনাতন ষোলটি শতকসংগ্রহে এই শতকটি নাই। অনেকগুলি পুথির তালিকায় বৃন্দাবনশতকের উল্লেখ আছে, তাহা বোধ হয় একটি শতকে সমাপ্ত এই গ্রন্থ।

১১ আরও দুইটি গ্রন্থ প্রবোধানন্দ সরস্বতীর নামে পাওয়া যায়, যথা—'বিবেকশতক' (রাজেন্দ্রলাল মিত্র, *Notices*, vii, p. 261, no. 2510) ও 'গোপালতাপনী'র টীকা (কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পুথির তালিকা, vol. x, pp. 158-59)। হুগলী ভক্তিপ্রভা কার্য্যালয় হইতে দুই খণ্ডে (২য় সং ১৩৩১, ১৩৪২) 'রাধারসসুধানিধি' নামক যে-গ্রন্থ প্রবোধানন্দের নামে মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা প্রবোধানন্দের রচিত নহে। ইণ্ডিয়া অফিস, বডলিয়ন্ ও কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে ইহার যে সকল পুথি আছে, তাহাতে ব্যাসপুত্র হিতহরিবংশ ইহার রচয়িতা বলিয়া বর্ণিত। হিতহরিবংশ রাধাবল্লভী সংপ্রদায়ভুক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ। মুদ্রিত পুস্তকে যে প্রথম ও শেষ শ্লোকে চৈতন্যবন্দনা আছে, তাহা উক্ত পুথিগুলিতে নাই! মুদ্রিত গ্রন্থের শ্লোকসংখ্যা ২৭২, কিন্তু পুথিগুলির শ্লোকসংখ্যা অন্যরূপ।

কাশীর মত জ্ঞানপ্রধান স্থানকে ভাসাইয়া লইতে পারে নাই। কারণ, চৈতন্যের মুখে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলাইয়াছেন (মধ্য, ২৫।১৬১-৬২)—

কাশীতে বেচিতে আমি আইলাম ভাবকালি। কাশীতে গ্রাহক নাই বস্তু না বিকায়॥

বৃন্দাবন দাস এই ঘটনার উল্লেখ করেন নাই; কিন্তু প্রকাশানন্দ যদি চৈতন্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে প্রকাশানন্দের সম্পর্কে বৃন্দাবন দাস যে রুক্ষ ভাষার প্রয়োগ করিয়াছেন (মধ্য, ৩ ও ২০), তাহা নিতান্ত অসমীচীন ও অবৈষ্ণবোচিত। মুরারি গুপ্ত বা কবিকর্ণপূর প্রকাশানন্দের নামও করেন নাই।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে যে, গোপাল ভট্টের যে-ইতিহাস বাঙ্গালা বৈষ্ণবগ্রন্থে পাওয়া যায়, তাহা একেবারেই পরিষ্কার বা সুসঙ্গত নহে। কিন্তু এইখানেই সমস্যার শেষ নহে। 'হরিভক্তিবিলাস' যে গোপাল ভট্টের সম্পূর্ণ নিজস্ব রচনা, তাহাতেও সন্দেহ রহিয়াছে; কিন্তু সে-কথা পরে বলিতেছি। 'হরিভক্তিবিলাস' ভিন্ন আর একটি রচনা যড়্‌গোস্বামীর অন্যতম গোপাল ভট্টের বলিয়া নরহরি চক্রবর্ত্তী ও মনোহর দাস কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে, কিন্তু ইহার সম্বন্ধেও যে সকল প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা বিপরীত। এই রচনাটি হইতেছে লীলাশুকরচিত 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' স্তোত্রকাব্যের কৃষ্ণবল্লভা নাম্নী টীকা। নরহরি চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন (পৃঃ ১৬)—

করিলেন কৃষ্ণকর্ণামৃতের টিপ্পনী। বৈষ্ণবের পরমানন্দ যাহা শুনি॥

ইহার পূর্ব্বে মনোহর দাস আরও বিস্তৃত করিয়া লিখিয়াছেন (পৃঃ ১১-১২)—

শ্রীভট্ট গোসাঞি কর্ণামৃতের টীকা কৈল। অশেষ বিশেষ ব্যাখ্যা তাহাতে লিখিল॥
যাহার দর্শনে ভক্ত পণ্ডিতে চমৎকার। রসপরিপাটী যাতে সিদ্ধান্তের সার॥
সে টীকার মঙ্গলাচরণ দুই শ্লোক। লিখিয়াছে যাহা দেখি শুনি সর্ব্বলোক॥
আপনা পাসরে রহে চকিত হইয়া। পুলকাদি অশ্রু বহে মুখ বুক বাঞা॥

ইহার পরে, 'তথাহি শ্লোকৌ' বলিয়া তিনি উক্ত গ্রন্থের দুই আদিশ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই দুইটি শ্লোক গোপাল ভট্টের রচিত কৃষ্ণবল্লভা টীকার সমস্ত পুথিতে[১২] প্রারম্ভে অবিকল পাওয়া যায়। ইহার প্রথম শ্লোকটি কৃষ্ণবন্দনা; দ্বিতীয় শ্লোকটিতে গ্রন্থকার নিজেকে দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন[১৩]; কিন্তু এই টীকায়

---

১২ কৃষ্ণকর্ণামৃতের মূল এবং চৈতন্যদাসের সুবোধনী ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের সারঙ্গরঙ্গদা টীকাদ্বয় সহিত কৃষ্ণবল্লভা টীকার একটি সংস্করণ বর্ত্তমান লেখক কর্ত্তৃক, পাঠভেদ, বিস্তৃত ভূমিকা, পরিশিষ্ট ও সূচী সমেত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আগামী সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই প্রকাশিত হইতেছে। কৃষ্ণবল্লভা টীকার জন্য কাশী সংস্কৃত গ্রন্থাগারে রক্ষিত ১৬৬২ সংবতে লিখিত প্রাচীন পুথি এবং কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির অন্য একখানি অপেক্ষাকৃত আধুনিক পুথি, এই দুইটি দেবনাগরাক্ষরে লিখিত সম্পূর্ণ পুথি ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একখানি বঙ্গাক্ষরে লিখিত খণ্ডিত পুথি, সর্ব্বসমেত তিনখানি পুথি অবলম্বিত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে যে সকল সমস্যার সূচনা করা হইয়াছে, তাহার বিস্তৃত আলোচনা এই সংস্করণের ভূমিকাদিতে দ্রষ্টব্য।

১৩ কৃষ্ণকর্ণামৃতস্যৈতাং টীকাং শ্রীকৃষ্ণবল্লভাম্। গোপালভট্টঃ কুরুতে দ্রাবিড়াবনিনির্জরঃ॥

চৈতন্যদেবের নমস্ক্রিয়া নাই ; এবং টীকার শেষে টীকাকার যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহা উল্লিখিত বঙ্গীয় বৈষ্ণবগ্রন্থোক্ত পরিচয় হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। শ্লোকটি এইরূপ—

শ্রীমদ্দ্রাবিড়নীবৃদ্দিবিধুঃ শ্রীমান্নৃসিংহোঽভব-
ভট্টঃ শ্রীহরিবংশ উত্তমগুণগ্রামৈকভূস্তৎসুতঃ।
তৎপুত্রস্য কৃতিস্ত্বিয়ং বিতনুতাং গোপালনাম্নো মুদং
গোপীনাথপদারবিন্দমকরন্দানন্দিচেতোলিনঃ ॥

ইহা হইতে জানা যায় যে, দ্রাবিড়বাসী হরিবংশ ভট্ট টীকাকার গোপাল ভট্টের পিতা এবং নৃসিংহ তাঁহার পিতামহ। টীকার পুষ্পিকার পাঠও তদনুরূপ, যথা : "ইতি শ্রীদ্রাবিড়-হরিবংশভট্টৈকচরণশরণগোপালভট্টবিরচিতা শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতটীকা শ্রীকৃষ্ণবল্লভা সমাপ্তা ॥"—বলা বাহুল্য, এরূপ কোন শ্লোক বা পুষ্পিকা 'হরিভক্তিবিলাসে' নাই। মনোহর ও নরহরির মতে যদি এই দুই গোপাল ভট্ট একই ব্যক্তি হন, তাহা হইলে বেঙ্কট-ত্রিমল্ল-প্রবোধানন্দের গল্প একেবারেই উড়িয়া যায়। কিন্তু কৃষ্ণবল্লভা টীকার কথা অন্য কোনও বাঙ্গালা বৈষ্ণব গ্রন্থে নাই।

হরিবংশ ভট্টের পুত্র ও কৃষ্ণবল্লভার রচয়িতা গোপাল ভট্টের আরও দুইটি পুস্তকের পুথির সন্ধান আমরা পাইতেছি, যাহাতে উল্লিখিত শ্লোক বা অনুরূপ পুষ্পিকা রহিয়াছে। ইহার প্রথমটি হইতেছে, ভানুদত্তের 'রসমঞ্জরী' গ্রন্থের রসিকরঞ্জনী টীকা।[১৪] ইহারও দ্বিতীয় শ্লোকের পরিচয়ে[১৫] তিনি দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ ছিলেন এইরূপ উক্ত হইয়াছে ; এবং ইহার একটি সমাপ্তি-শ্লোক কৃষ্ণবল্লভার উপরোদ্ধৃত শ্লোকের (শ্রীমদ্দ্রাবিড়°) সহিত অভিন্ন বলিয়া ইনিও যে হরিবংশ ভট্টের পুত্র ও নৃসিংহের পৌত্র, তাহাতে সন্দেহ থাকে না। ইহার পুষ্পিকাও কৃষ্ণবল্লভার পুষ্পিকার অনুরূপ।[১৬] গ্রন্থকার আলঙ্কারিক ও রসশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণবল্লভাতে যেরূপ রূপগোস্বামি-বিরচিত চৈতন্যসংপ্রদায়ের রসশাস্ত্র উল্লিখিত ও উদ্ধৃত হইয়াছে, ইহাতে তাহা নাই, এবং বৈষ্ণব ভাবের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। কৃষ্ণবল্লভার মত এ-টীকাতেও চৈতন্যবন্দনা নাই। ইহা আরও উল্লেখযোগ্য, এই টীকার বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত কোনও পুথি এ-পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই—সবই দেবনাগরাক্ষরে লিখিত।[১৭]

১৪ এই টীকা সম্বন্ধে মল্লিখিত *Sanskrit Poetics*, vol. i, p. 252 দ্রষ্টব্য।

১৫ শ্রীমদ্গোপালভট্টেন দ্রাবিড়ক্ষ্মাসুপর্বণা। ক্রিয়তে রসমঞ্জর্য্যাষ্টীকা রসিকরঞ্জনী ॥

১৬ ইতি হরিবংশভট্টৈকচরণশরণগোপালভট্টকৃতা রসমঞ্জরী টীকা রসিকরঞ্জনী সমাপ্তা ॥

১৭ যথা Mitra, *Notices*, iv, p. 294, no. 1712 ; Mitra, Catalogue of Skt. MSS. in the Library of the Maharaja of Bikaner (Calcutta 1880), p. 709, no. 1573 ; Eggeling, Descriptive Catalogue of Skt. MSS. in the India Office Library, iii, p. 357, no. 1228-29 ; Stein, Catalogue of Skt. MSS. in the Raghunath Temple Library of Jammu (Bombay 1894), p. 63, no. 748 ; Hultzsch, Report on the Search of Skt. MSS. in Southern India (Madras 1896), iii, p. 48, no. 1251 ; Peterson, Sixth Report, p. 92, no. 377 ; R. G. Bhandarkar, Report of

রাজেন্দ্রলাল মিত্র[১৮] এই গোপাল ভট্ট-রচিত 'সময়কৌমুদী' অথবা 'কালকৌমুদী' -নামক এক স্মৃতিগ্রন্থের বিবরণ দিয়াছেন। ইহার একটি প্রারম্ভ-শ্লোকও[১৯] কৃষ্ণবল্লভা ও রসিকরঞ্জনীর দ্বিতীয় শ্লোকের অনুরূপ; তাহাতে গোপাল ভট্ট গ্রন্থের রচয়িতা ও তিনি দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ, এই কথা পাওয়া যায়। ইহার পুষ্পিকাও[২০] বিভিন্নরূপ নহে। সংস্কৃত গদ্যে ও পদ্যে লিখিত এই পুস্তকের উদ্দেশ্য হইতেছে নিত্যনৈমিত্তিক আচার, সংস্কার, দীক্ষা, ব্রত, উৎসব (যথা জন্মাষ্টমী), ভগবৎ-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য উপযুক্ত শুভ মুহূর্ত্ত, দিন বা মাসের নির্দ্ধারণ। পুথিখানি ছাপা হয় নাই, কিন্তু বিবরণ হইতে জানা যায় যে, ইহাতে ১২৪টি পত্র (folio) আছে, পৃষ্ঠায় ৯ লাইন। সুতরাং বইটি খুব ছোট বা সামান্য ছিল না, এরূপ অনুমান অন্যায় হইবে না।

এই গোপাল ভট্ট যে চৈতন্যসংপ্রদায়ের গোপাল ভট্ট হইতে বিভিন্ন ব্যক্তি, এরূপ সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে। মনোহর দাস কৃষ্ণবল্লভার প্রথম দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু যে-অন্তিমশ্লোক ও পুষ্পিকায় টীকাকারের বংশপরিচয় রহিয়াছে, তাহার কথা বোধ হয় জানিতেন না। আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোপাল ভট্টকে স্বীয় শিক্ষাগুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। যদি 'কৃষ্ণবল্লভা' তাঁহার শিক্ষাগুরু গোপাল ভট্টের রচিত হয়, তবে ইহা বিস্ময়ের কথা যে, কৃষ্ণদাস স্বয়ং কৃষ্ণকর্ণামৃতের সারঙ্গরঙ্গদা নামক যে-টীকা লিখিয়াছেন, তাহাতে এই কৃষ্ণবল্লভা টীকা অভিহিত বা অনুসৃত হয় নাই; বরং কৃষ্ণদাস চৈতন্যদাসের প্রায় সমসাময়িক টীকাকে আত্মসাৎ করিয়া বিশদ ও বিস্তৃত ভাবে লিখিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

কিন্তু এই কৃষ্ণবল্লভা টীকা যে চৈতন্যসংপ্রদায়ের কোনও বৈষ্ণব কর্ত্তৃক লিখিত, তাহা অনুমান করিবার যথেষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে। দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণব মত বা মূলের দাক্ষিণাত্য পাঠ ইহাতে গৃহীত হয় নাই, বরং বঙ্গীয় পাঠ ও বঙ্গীয় বৈষ্ণব মত স্পষ্ট অনুসৃত হইয়াছে। কৃষ্ণ অবতার নহেন, অবতারী স্বয়ং ভগবান্, চৈতন্যসংপ্রদায়ের এই যে বিশিষ্ট মতবাদ, তাহা টীকায় উক্ত হইয়াছে। দ্বিভুজ নরাকৃতি, কিশোরমূর্ত্তি, বৃন্দাবনকেলিকার কৃষ্ণের উপাসনাতেও টীকাকার ভক্তিমান্। চৈতন্য-নমস্ক্রিয়ার অভাব সন্দেহজনক হইলেও,

1891-95, p. 46, no. 705. শেষোক্ত তালিকাদ্বয়ের দুইটি পুথি (no. 453 of 1887-91 and no. 705 of 1891-95) এবং স্বতন্ত্র সংগৃহীত আরও দুইটি পুথি (no. 244 of Visrambag i, and no. 207 of Visrambag i) পুনা ভাণ্ডারকর ইন্সটিটিউটে আমরা দেখিয়াছি।—বোম্বাই নির্ণয়সাগর মুদ্রাযন্ত্রের কাব্যমালা পর্য্যায়ে রুদ্রভট্টের শৃঙ্গারতিলকের যে সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার পাদটীকায় (গুচ্ছক ৩, পৃঃ ১১১) গ্রন্থের সম্পাদক শৃঙ্গারতিলকের গোপাল ভট্ট-রচিত রসতরঙ্গিণী নামক একটি টীকার নাম করিয়াছেন; কিন্তু ইহার অন্য কোনও বিবরণ বা পুথির সংবাদ পাওয়া যায় না।

১৮ *Notices*, vii, p. 254, no. 2501. পুথিখানি খুব প্রাচীন নহে, কিন্তু বঙ্গাক্ষরে লিখিত।

১৯ শ্রীমদ্গোপালভট্টেন দ্রাবিড়ক্ষ্মাসুপর্বণা। ক্রিয়তে বিদুষাং প্রীত্যৈ রম্যা সময়কৌমুদী।
ইতি হরিবংশভট্টচরণশরণগোপালভট্টকৃতা কালকৌমুদী সমাপ্তা

নিশ্চিত প্রমাণ নহে ; কারণ, রূপগোস্বামীর দুইটি দূতকাব্য ও 'দানকেলিকৌমুদী' নাটকেও এইরূপ নমস্ক্রিয়া নাই। টীকাকার যে বঙ্গীয় বৈষ্ণবমতের সহিত পরিচিত, তাহার আর একটি নিদর্শন এই যে, রূপগোস্বামীর 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্বলনীলমণি' এই দুইটি চৈতন্যসংপ্রদায়ের প্রামাণিক রসগ্রন্থ এই টীকাতে নামোল্লেখপূর্ব্বক উদ্ধৃত হইয়াছে। 'ভক্তিরসামৃতে'র রচনার তারিখ ১৪৬৩ শকাব্দ ; সুতরাং ইহার পূর্ব্বে এই টীকা লিখিত হয় নাই। যদি ত্রিমল্ল-বেঙ্কট-প্রবোধানন্দের উপাখ্যান বাদ দেওয়া যায়, তবে দুই গোপাল ভট্টের একাত্মতা স্বীকারে বিশেষ বাধা থাকে না।

অন্য দিকে ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম চৈতন্যসংপ্রদায়ের গোপাল ভট্টের নামে প্রচলিত 'হরিভক্তিবিলাসে', রচয়িতা তাঁহার পিতৃপিতামহের নাম উল্লেখ করেন নাই ; কেবল চৈতন্যনমস্ক্রিয়াপূর্ব্বক আপনাকে প্রবোধানন্দের শিষ্য এবং রূপ-সনাতন-রঘুনাথদাসের প্রীতিকামী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ইহার রচনাভঙ্গীও স্বতন্ত্র। ইহা বিশটি বিলাসে বিভক্ত সুবৃহৎ বৈষ্ণবস্মৃতির সংগ্রহ-গ্রন্থ। ইহাতে যুক্তিতর্ক নাই ; বৈধী ভক্তির অঙ্গস্বরূপ প্রায় সমস্ত বৈষ্ণবোচিত সদাচার, নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ, পূজাপদ্ধতি, মন্দিরসংস্কার, মূর্ত্তিগঠন ও মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা, ব্রতপার্ব্বণ প্রভৃতি ধর্ম্মকর্ম্মের বিধিনিষেধ নির্দ্ধারিত ও সুশৃঙ্খলভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে ; এবং প্রত্যেক বিধিনিষেধের প্রমাণস্বরূপ বহুসংখ্যক স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, সংহিতা ইত্যাদি হইতে বচন সঙ্গে সঙ্গে সংকলিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ইহাতে এমন কতকগুলি মত ব্যক্ত হইয়াছে, যাহা ঠিক চৈতন্যসংপ্রদায়ের অনুমোদিত বলা যায় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, ইহাতে চতুর্ভুজ বিষ্ণু এবং লক্ষ্মীনারায়ণের বীজমন্ত্র, জপ ও উপাসনার মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। শূদ্রের শালগ্রামশিলা উপাসনা নিষিদ্ধ হইয়াছে। লক্ষ্মীনারায়ণ, কৃষ্ণ-রুক্মিণীর মূর্ত্তিগঠনের ব্যবস্থা রহিয়াছে, কিন্তু রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি নির্ম্মাণের কথা নাই। এই কৃষ্ণ চক্রধররূপে বর্ণিত, দ্বিভুজ মুরলীধর নহেন। এমন কি, কৃষ্ণের ধ্যানে রাধার উল্লেখ নাই! বৈষ্ণব স্মৃতির নিবন্ধ হইলেও, ইহাতে বিবাহ প্রভৃতি সংস্কারাদির কথা নাই, যদিও প্রথমেই বৈষ্ণব দীক্ষার কথা আছে। গ্রন্থের উপর তন্ত্রের প্রভাব প্রচুর ও স্পষ্ট। উৎসব ও পার্ব্বণের মধ্যে, বৈষ্ণবগ্রাহ্য শিবরাত্রি উক্ত হইয়াছে, কিন্তু (রঘুনন্দনের যাত্রাতত্ত্বেও অযুক্ত) রাসযাত্রা বর্জ্জিত হইয়াছে।[২১]

২১ 'সংক্রিয়াসারদীপিকা' ও 'সংস্কারদীপিকা' নামক আরও দুইটি স্বল্পায়তন বৈষ্ণব স্মৃতিগ্রন্থ বর্ত্তমান কালে গোপাল ভট্টের নামে গৌড়ীয় মাধ্ব মঠ হইতে ছাপা হইয়াছে ; কিন্তু এগুলি উক্ত দুই গোপাল ভট্টের কাহারও রচিত বলিয়া মনে হয় না। প্রথমটিতে 'হরিভক্তিবিলাসে' অযুক্ত বিবাহাদি চতুর্দ্দশ সংস্কারের বিবরণ আছে ; দ্বিতীয়টিতে বেশাশ্রয়বিধি অর্থাৎ সন্ন্যাস আশ্রমের পালনীয় ধর্ম্মাদির কথা আছে। মনে হয়, 'হরিভক্তিবিলাসে' যে-যে বিষয় বিবৃত হয় নাই, তাহা সম্পূর্ণ করিবার জন্য পরবর্ত্তী কালে এই দুইটি স্মৃতিসংগ্রহ সংকলিত হইয়া গোপাল ভট্টের নামে প্রচলিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে প্রথম পুস্তকের পুথির সন্ধান হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-সংকলিত *Notices*, 2nd Series, i, p. 397, no. 395 ; ii, p. 209-10, no. 235, এই বিবরণে পাওয়া যায় ; কিন্তু দ্বিতীয় পুস্তকের কোনও পুথির খবর পাওয়া যায় না। 'সংক্রিয়াসার-

'হরিভক্তিবিলাস' যে চৈতন্যসংপ্রদায়ের গোপাল ভট্টের রচনা, তাহা গ্রন্থের আদিতে পরিষ্কার ভাবে ব্যক্ত আছে, এবং তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। রূপ গোস্বামী তাঁহার 'ভক্তিরসামৃতে' ইহার নামোল্লেখপূর্ব্বক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন; সুতরাং ইহা ভক্তিরসামৃতের রচনাকালের (শকাব্দ ১৪৬৩) পূর্ব্বেই সংকলিত হইয়াছে। 'হরিভক্তি-বিলাসে'র 'দিগ্‌দর্শনী' নামক একটি সংক্ষিপ্ত টীকাও আছে; তাহা সনাতন গোস্বামীর লিখিত বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিন্তু টীকাতে টীকাকারের নাম নাই। তথাপি মনোহর দাস ও নরহরি চক্রবর্ত্তীর মতে শুধু টীকা নহে, মূলগ্রন্থও গোপাল ভট্টের ব্যপদেশে মুখ্যত সনাতনের রচনা।[২২] নরহরি বলিতেছেন—

> করিতে বৈষ্ণবস্মৃতি হইল ভট্টমনে। সনাতন গোস্বামী জানিলা সেহ ক্ষণে॥
>
> গোপালের নামে শ্রীগোস্বামী সনাতন। করিলা শ্রীহরিভক্তিবিলাস বর্ণন॥

মনোহর দাস আরও বিস্তৃতভাবে লিখিয়াছেন যে, মূল গ্রন্থটি সনাতনের লেখা, কিন্তু গোপাল ভট্ট পুরাণের বাক্য সংকলন করিয়া ইহার বিস্তার রচনা করিয়াছিলেন—

> শ্রীসনাতন গোসাঞি গ্রন্থ করিল। সর্ব্বত্র আভোগ ভট্ট গোসাঞির দিল॥…
>
> শ্রীরূপ সনাতন রঘুনাথ দাস। ইহা সবায় সুখ দিতে হরিভক্তির বিলাস॥
>
> সংগ্রহ করিল শ্রীভাগবত প্রধান। সর্ব্ব পুরাণের বাক্য করিয়া সন্ধান॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজও (মধ্য, ১।৩৫; অন্ত্য, ৪।২২১) 'হরিভক্তিবিলাস' সনাতনের লেখা বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, এবং মধ্যলীলার চতুর্বিংশ অধ্যায়ে ইহার সমগ্র মর্ম্মার্থ সনাতনের শিক্ষাচ্ছলে চৈতন্যের মুখে বলাইয়াছেন। ইহা ছাড়া, ভাগবতের লঘু বৈষ্ণবতোষিণী টীকার অন্তে জীব গোস্বামী সনাতনের রচিত গ্রন্থগুলির যে তালিকা দিয়াছেন, তাহাতেও 'হরিভক্তিবিলাস' ও তাহার টীকা সনাতনের রচনা বলিয়া ধৃত হইয়াছে। কৃষ্ণদাস ও জীব গোস্বামীর সাক্ষ্য সহজে অগ্রাহ্য করা যায় না; কিন্তু গ্রন্থের মধ্যে কুত্রাপি সনাতনকে গ্রন্থকার বলা হয় নাই; বরং গোড়াতেই গোপাল ভট্ট স্বীয় নাম গ্রহণপূর্ব্বক বলিয়াছেন যে, তিনি এই গ্রন্থ রূপ, সনাতন ও রঘুনাথ দাসের সন্তোষার্থে লিখিতেছেন। এই বিরোধ পরিহারের কোনও উপায় নাই। ইহা সম্ভব যে, স্বসংপ্রদায়ের অগ্রণী সনাতন স্বীয় সহকর্ম্মী ও সুহৃৎ গোপাল ভট্টকে এই গ্রন্থরচনায় (টীকা লেখা ছাড়া অন্যরূপেও) বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার উল্লেখ ইহাতে কোথাও নাই; এরূপ সহায়তা যে গোপাল ভট্ট অনুক্ত রাখিয়া যাইবেন, তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। অবশ্য, এই সকল সংসারত্যাগী ভক্ত বৈষ্ণবগণ নিজ নাম প্রচারে উৎসাহী ছিলেন না; কিন্তু জীব গোস্বামী স্বীয় 'ষট্‌সন্দর্ভ', ভট্টলিখিত সংক্ষেপের উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়াছেন

দীপিকা' প্রথমে 'সজ্জনতোষিণী' পত্রিকায় (১৫-১৭ খণ্ডে) কেদারনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল; পরে, সংস্কারদীপিকা সমেত, দ্বিতীয় সংস্করণ গৌড়ীয় মাধ্ব মঠ কর্ত্তৃক সম্প্রতি (কলিকাতা, ১৯৩৫) মুদ্রিত হইয়াছে।

২২ নিত্যানন্দের মত পরিষ্কার নয়, তবে তাঁহার কথা হইতে এইটুকু বুঝা যায় যে, রূপ ও সনাতনের আজ্ঞায় গোপাল ভট্ট এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

বলিয়া ঋণ স্বীকার করিয়াছেন। অথচ সনাতনের ঋণ গোপাল ভট্ট স্বীকার না করিয়া আত্মনাম খ্যাপন করিলেন, ইহা আশ্চর্য্যের কথা বলিয়া মনে হয়। এই সম্পর্কে দীনেশ-চন্দ্র সেন লিখিয়াছেন,[২৩] সনাতনের নাম 'হরিভক্তিবিলাসে'র রচনার সঙ্গে স্পষ্টভাবে জড়িত করা হয় নাই। তাহার কারণ, তিনি যবনসংসর্গে আসিয়া জাতিচ্যুত হইয়াছিলেন এবং হয়ত সেই জন্য সনাতনের নামে বৈষ্ণব সদাচারের গ্রন্থ প্রচার করিলে ইহার প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ হইতে পারে, এই আশঙ্কায় গোপাল ভট্টের নামই গ্রন্থকার বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এরূপ কল্পনায় সর্ব্বপূজ্য বৈষ্ণব গোস্বামীদের উপর যে হীন চক্রান্ত বা বঞ্চনার অভিপ্রায় আরোপ করা হয়, তাহা ছাড়িয়া দিলেও, এই কল্পনার মূলে কোনও সন্তোষজনক প্রমাণ নাই। সনাতনের নাম যদি এরূপ বর্জ্জনীয় ছিল, তাহা হইলে তাঁহার ভাগবতের টীকা ও 'বৃহদ্‌ভাগবতামৃত' কিরূপে অশেষ শ্রদ্ধার সহিত সর্ব্ববৈষ্ণবগ্রাহ্য হইয়াছিল, তাহা বুঝা যায় না; এবং তাঁহার প্রসিদ্ধ নাম রূপ, জীব, কৃষ্ণদাস প্রভৃতির গ্রন্থের সহিত জড়িত হইয়া তাহাদের দূষিত করে নাই, বরং ভূষিত করিয়াছে। সনাতন ও রূপ যে ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া স্বধর্ম্ম ও স্বজাতিচ্যুত হইয়াছিলেন, এই গল্পের কোনও নিশ্চিত প্রমাণ নাই। ইহা সত্য যে, তাঁহারা মুসলমান দরবারে উচ্চ পদে নিযুক্ত ছিলেন, এবং চৈতন্যদেবের সহিত সাক্ষাৎকারের পূর্ব্বে মুসলমানী নাম বা খেতাবে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু ইহা হইতে ইহার অধিক কোনও অনুমান করা সঙ্গত হইবে না। জীব গোস্বামী রূপ-সনাতনের বংশ-পরিচয়ে তাঁহাদের কর্ণাট ব্রাহ্মণ-বংশ-সম্ভূত বলিয়াছেন। 'ভক্তিরত্নাকরে'র বাক্য (পৃঃ ৪২-৪৩) যদি সত্য হয়, তবে তাঁহারা মুসলমান দরবারে চাকুরী করিলেও, পরম্পরাগত পিতৃপিতামহের ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য রক্ষা বা শাস্ত্রালোচনায় পরাঙ্মুখ ছিলেন না, এবং সামাজিক সম্বন্ধ ও আচার-ব্যবহারের জন্য রামকেলির নিকট বহু কর্ণাট-দেশীয় ব্রাহ্মণ আনাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করাইয়াছিলেন। ইহা ছাড়িয়া দিলেও, চৈতন্যদেবের সহিত সাক্ষাৎ-কারের পূর্ব্বেও তাঁহারা যে নবদ্বীপের বিদ্যাবাচস্পতির শিষ্য, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও নানা শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ করা যায় না। এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজও বলিয়াছেন—

ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত বিশ ত্রিশ লইয়া। ভাগবত বিচার করে সভাতে বসিয়া॥

পূর্ব্ব হইতেই কৃষ্ণলীলা ও বৈষ্ণব মতের প্রতি প্রবণতা ছিল বলিয়াই চৈতন্যদেবের সহিত সাক্ষাৎকারের জন্য তাঁহাদের যে আগ্রহ ও ব্যাকুলতা, তাহা বুঝা যায়। এবং তাঁহাদের গ্রন্থাবলীতে যে অগাধ শাস্ত্রজ্ঞান, ধর্ম্মনিষ্ঠতা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় রহিয়াছে, তাহা দু-চারি দিনের শিক্ষায় আয়ত্ত হয় নাই, আজীবনের ব্যুৎপত্তি ও অভ্যাসের ফল বলিয়াই মনে হয়।

২৩ *Vaisnava Literature,* Calcutta University 1917, pp. 37-38 ; *Chaitanya and his Age,* Calcutta University 1922, p. 290. Kennedy, *Chaitanya Movement,* Oxford Univ. Press, 1925, p. 137-এ ইহার পুনরুক্তি করিয়াছেন।

উল্লিখিত সমালোচনা হইতে প্রতীয়মান হইবে, চৈতন্যসংপ্রদায়ের গোপাল ভট্টের সম্বন্ধে যে সকল প্রবাদ ও মতবাদ প্রচলিত আছে, তাহা তথ্যদর্শী ঐতিহাসিককে সাবধানতার সহিত গ্রহণ করিতে হইবে। প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থে ও অন্যান্য স্থান হইতে যাহা পাওয়া যায়, তাহা হইতে এইরূপ দাঁড়ায়—

(১) 'কৃষ্ণকর্ণামৃতে'র 'কৃষ্ণবল্লভা' টীকা, 'কালকৌমুদী' এবং 'রসমঞ্জরী'র 'রসিকরঞ্জনী' টীকা যে গোপাল ভট্ট লিখিয়াছেন, আত্মপরিচয় অনুসারে তিনি দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ, হরিবংশ ভট্টের পুত্র ও নৃসিংহ ভট্টের পৌত্র। চৈতন্যসংপ্রদায়ের সহিত তাঁহার কি সম্পর্ক ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই; তবে তিনি তাঁহার গ্রন্থগুলিতে এই সংপ্রদায়ের মতবাদ বা উহার রসশাস্ত্রের বিরুদ্ধ কোন কথা বলেন নাই। বরং তাহা স্বীকার করিয়াছেন, এবং 'কৃষ্ণকর্ণামৃতে'র দাক্ষিণাত্য পাঠ নহে, বঙ্গীয় পাঠই তাঁহার টীকায় গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং যদি নরহরি প্রভৃতি-কথিত বংশপরিচয় বর্জ্জন করা যায়, তবে ইঁহার সহিত পরবর্ত্তী গোপাল ভট্টের ঐক্য স্বীকার কঠিন নয়।

(২) তবে ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম যে গোপাল ভট্টের নামে 'হরিভক্তিবিলাস' প্রচলিত, তিনি উপরোক্ত গোপাল ভট্টের সহিত অভিন্ন, তাহারও কোন স্পষ্ট প্রমাণ নাই। তাঁহার পরিচয় অস্পষ্ট ও ইতিহাস জনশ্রুতিমূলক, এবং বিভিন্ন জনশ্রুতির মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব রহিয়াছে। তিনি দাক্ষিণাত্যোদ্ভব ছিলেন কি না, তাহাও অনিশ্চিত, এবং তাঁহার যে বংশপরিচয় ও বৃত্তান্ত বাঙ্গালা বৈষ্ণবগ্রন্থে পাওয়া যায়, তাহাতে যথেষ্ট অসঙ্গতি ও বিরোধ রহিয়াছে। 'হরিভক্তিবিলাসে' তিনি নিজেকে প্রবোধানন্দের শিষ্য বলিয়াছেন, কিন্তু বংশপরিচয় দেন নাই। এই প্রবোধানন্দের ইতিবৃত্ত অতি সামান্য এবং ইনি স্তোত্রকাব্য-লেখক পরিব্রাজকাচার্য্য প্রবোধানন্দ সরস্বতী কি না, তাহার নিশ্চয়তা নাই। ইনি গোপাল ভট্টের পিতৃব্য ছিলেন কি না, তাহাও নিশ্চিত নহে; এবং ত্রিমল্ল-বেঙ্কট-প্রবোধানন্দের যে উপাখ্যান নিত্যানন্দ দাস, মনোহর দাস ও নরহরি চক্রবর্ত্তী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, অন্যত্র তাহারও সন্তোষজনক প্রমাণ নাই।

সম্প্রতি আরও দুই-একটি, খুব সম্ভব চৈতন্যসংপ্রদায়ভুক্ত, গোপাল ভট্টের আবিষ্কারে এই সমস্যা জটিলতর হইয়াছে।[২৪] পুণা ভাণ্ডারকর প্রাচ্যবিদ্যামন্দিরে রক্ষিত 'কৃষ্ণকর্ণামৃতে'র আর একখানি টীকার পুথি[২৫] পাওয়া গিয়াছে, তাহাও গোপাল ভট্টের

২৪ সংস্কৃত সাহিত্যের বৃত্তান্তে আরও গোপাল ভট্ট আছেন। কিন্তু তাঁহাদের এখানে ধরা নিষ্প্রয়োজন। Aufrecht-এর *Catalogus Catalogorum*-এ (কেবল গোপাল নাম ছাড়া) অন্ততঃ বার জন গোপাল ভট্টের নাম পাওয়া যায়।

২৫ MS. no. 178 of 1879-80. এই পুথি শ্রীধর ভাণ্ডারকরের সংকলিত *Catalogue of the Collections of MSS. deposited in the Deccan College*, 1888, p. 135-এ তালিকাভুক্ত হইয়াছে; Deccan College-এর সমস্ত পুথি-সংগ্রহ এখন ভাণ্ডারকর ইন্সটিটিউটে রক্ষিত। এই পুস্তক Aufrecht-এর তালিকায় ধৃত হয় নাই।

রচিত। কিন্তু এই টীকা স্বতন্ত্র গ্রন্থ ; এবং এই গোপাল ভট্ট গৌড়ীয় বৈষ্ণব হইতে পারেন, কিন্তু উপরোক্ত দুই গোপাল ভট্ট হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি। পুথিখানি ১৪৫ পত্রে (folio) সমাপ্ত ; অপেক্ষাকৃত প্রাচীন পৃষ্ঠামাত্রাযুক্ত দেবনাগর অক্ষরে লিখিত ; মূল ও টীকা দুই পুথিতে রহিয়াছে। টীকার নাম 'শ্রবণাহ্লাদিনী'। শেষের যে শ্লোকে টীকাকারের পিতার নাম লিখিত আছে, তাহা অশুদ্ধ বলিয়া মনে হয়, যথা—

শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দভজনত্যক্তাখিলার্থত্র্যাহঃ (? রয়ঃ ?)
শ্রীমদ্ভাগবতার্থবিৎ সমভবদ্ ভদ্দন্ফণা (? উদ্যৎফণো ?) বিশ্রুতঃ।
শ্রীরাধারমণাঙ্ঘ্রিসক্তমনসা গোপালভট্টেন তৎ-
পুত্রেণ শ্রবণামৃতস্য রচিতা টীকাস্য সংপ্রীতয়ে ॥

ইহার পরবর্ত্তী শ্লোকে টীকাকার বলিতেছেন যে, তিনি নিজের ও আত্মসুহৃৎ বনমালী দাসের কর্ণদ্বয়ের এবং অনুজ লক্ষ্মীনারায়ণের কণ্ঠের ভূষণস্বরূপ তাঁহার টীকা রচনা করিয়াছেন—

তৈরর্থরত্নৈর্বনমালিদাসমিত্রস্য কর্ণদ্বয়মাত্মনশ্চ।
বিভূষয়ামীত তথৈব লক্ষ্মীনারায়ণস্যাপ্যনুজস্য কণ্ঠম্ ॥

টীকাকারের গুরুর নাম নারায়ণ। ইহা বঙ্গীয় পাঠ অনুসরণে লিখিত ; ইহাতে গীতগোবিন্দ (fol. 22b) এবং 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'র (fol. 16a, 19a) নামোল্লেখপূর্ব্বক শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, এবং চৈতন্যসংপ্রদায়ের মতবাদ স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু ইনি অপর গোপাল ভট্টের কৃষ্ণবল্লভা দেখিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

আরও একটি গোপাল ভট্টের নামোল্লেখ মাত্র পাওয়া যায়। চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী-সম্পাদিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সংস্কৃত পুথির তালিকার ভূমিকায় (p. xvii) রাধারমণ দাস-রচিত শ্রীধর স্বামীর 'ভাগবত-ভাবার্থ-দীপিকা' টীকার 'দীপিকা-দীপন' নামক একটি অনুটীকার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে রাধারমণ দাস আত্মপরিচয়ে বলিয়াছেন যে, তিনি শ্রীমদ্গোপাল ভট্টের দাস্যে সংসক্তমানস, রাধারমণ-(বিগ্রহ-)সেবী, এবং কৃষ্ণগোবিন্দের মিত্র। এই গোপাল ভট্ট কি 'হরিভক্তিবিলাস'-কার গোপাল ভট্ট হইতে বিভিন্ন ব্যক্তি ?

পরমানন্দমতসংগ্রহ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী, এম-এ

তান্ত্রিক উপাসনার বিভিন্ন প্রস্থানের মধ্যে পরমানন্দমত বা পারানন্দমতের সন্ধান পাওয়া যায়। অপরিচিত অথচ কৌতুককর এই প্রস্থান সম্বন্ধে এ পর্যন্ত বোধ হয় একখানি মাত্র গ্রন্থ পণ্ডিতসমাজে প্রচার লাভ করিয়াছে। এই গ্রন্থখানির নাম পারানন্দসূত্র।[১] কিছু দিন পূর্ব্বে ইহা বরোদা হইতে প্রচারিত গায়কোয়াড় ওরিয়েণ্টল সিরিজ নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থমালায় প্রকাশিত হইয়াছে। এশিয়াটিক সোসাইটীর পুথিশালায় লোকলোচনের অন্তরালে এই মত-বিষয়ক আর একখানি সংক্ষিপ্ত অথচ মনোরম গ্রন্থের এক খণ্ডিত পুথি বর্তমান রহিয়াছে। পুথিখানিতে কোনও পুষ্পিকা নাই এবং পুথিমধ্যে ইহার কোনও নাম দেখিতে পাওয়া যায় না। পুথির প্রথম পত্রের এক পৃষ্ঠে পুথির মালিক কাশীধামের রঘুনাথ মালবীয়ের নাম ও গ্রন্থের নাম অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন হস্তাক্ষরে নির্দিষ্ট হইয়াছে। তাহা হইতে জানা যায় যে, গ্রন্থের নাম 'পরমানন্দমতসংগ্রহ'। এই গ্রন্থের ও প্রসঙ্গক্রমে পারানন্দমতের পরিচয়-প্রদানই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

শ্রেষ্ঠ আনন্দ বা মহাসুখের দিকে লক্ষ্য স্থির থাকার জন্যই এই মতবাদ পরমানন্দ বা পরমানন্দমত নামে পরিচিত হইয়াছে, এরূপ মনে করিবার কোনও কারণ নাই। বস্তুতঃ এই মতবাদের প্রচারক আচার্য পরমানন্দের নামানুসারেই ইহার নামকরণ হইয়াছে।

পরমানন্দের সময় ও পরিচয় সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় না। আলোচ্য গ্রন্থে প্রসঙ্গতঃ ইহার এক মুখ্য (?) শিষ্য ও ভ্রাতার নাম উল্লিখিত হইয়াছে। এই শিষ্যের নাম দেবানন্দ ও ভ্রাতার নাম নিত্যানন্দ।[২] গ্রন্থারম্ভে ইঁহাদিগকে প্রণাম করা হইয়াছে। গ্রন্থমধ্যে কিন্তু পরমানন্দ শিবের নামান্তররূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বশিষ্ঠাদির সহিত কথোপকথনের প্রারম্ভে পরমানন্দের নাম পাওয়া যায়, তৎপরে সর্বত্র শিবের নাম। উপাস্য ও উপাসকের অভেদ সূচনার জন্যই এইরূপ করা হইয়াছে কি না, বলা যায় না। এই মতবাদে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে—হিংসানিষেধ।[৩] পশুবলি তান্ত্রিক

১ পরানন্দপুরাণ বা পরমানন্দতন্ত্র নামক গ্রন্থের যে পুথি এশিয়াটিক সোসাইটী বা মান্দ্রাজ ওরিয়েণ্টল লাইব্রেরীতে আছে, তাহাতে এই মতের প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায় না। পরানন্দপুরাণে শিবের মাহাত্ম্য-ব্যঞ্জক উপাখ্যান এবং পরমানন্দতন্ত্রে শ্রীবিদ্যার উপাসনাপদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে।

২ দেবানন্দং চ তচ্ছিষ্যং নিত্যানন্দং চ ভ্রাতরম্। (পত্র ১ক)

৩ ইয়ানেব বিশেষোঽস্তি মন্যতে মুনিসত্তমাঃ।
ন ন্যাসো ন চ হিংসাস্তি জঙ্গমস্য জড়স্য বা॥ (৬ক)
হিংসাং কুর্যাত্তু বিহিতাং জড়স্যৈব ন চান্যতঃ।
আলভেত ছাগবরং যত্র স্যাত্তত্র পৈষ্টকম্॥ (৭খ)

উপাসনার—বিশেষতঃ শক্তিপূজার এক অপরিহার্য অঙ্গ। সেই বলি এই মতে নিষিদ্ধ। অথচ এই মতে তান্ত্রিক বিধিগুলি উপেক্ষিত হয় নাই। তন্ত্রমতে যেখানে ছাগবলি বিহিত হইয়াছে, এই মতে সেখানে পিষ্টক-নির্মিত ছাগের বলির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তবে রাজাদের সম্বন্ধে এ বিষয়ে অন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে—তাহা গ্রন্থশেষে উল্লেখ করা হইয়াছে। পারানন্দমতে ন্যাস প্রভৃতি পূজার খুঁটিনাটি পরিত্যক্ত হইয়াছে। অথচ কোনও সঙ্কীর্ণতা এই মতে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই মতের যাঁহারা অনুবর্তী হইবেন, ন্যাস ও বলি ব্যতীত শ্রুতিস্মৃতিপুরাণোক্ত কোনও অনুষ্ঠানই তাঁহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ নহে।[৪] বস্তুতঃ অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি এই উদারতা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। পারানন্দমতে তিনটী আচার বা মার্গ স্বীকৃত হইয়াছে—বামাচার, দক্ষিণাচার ও উত্তরাচার। বামাচার আবার উত্তম ও মধ্যম, এই দুই প্রকারের। উত্তম বামাচারে পঞ্চ মকারের তিন মকার মাত্র সমাদৃত হইয়াছে—মৎস্য ও মাংস, এই দুই মকার বর্জিত হইয়াছে।[৫] সুতরাং ইঁহাদের মতে মৎস্যমাংস, মদ্যমৈথুন হইতেও নিকৃষ্ট। বামাচারী উপাসকের নামের শেষে "নাথ" শব্দ থাকিবে। উত্তরাচারের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এই যে, ইহাতে ভিক্ষা ও সেবা নিষিদ্ধ হইয়াছে। উত্তরাচারী উপাসকের নামের অন্তে "আনন্দ" শব্দ থাকিবে। নরপতি পারানন্দমত অবলম্বন করিলেও যুদ্ধাদি করিতে পারেন ; দণ্ডনীয়কে দণ্ড দিতে পারেন—মুনিঋষিদের তপোবিঘ্নকারী হিংস্র ব্যাঘ্রাদিকে বধ করিতে পারেন—কালীর সম্মুখে বলি দিতে পারেন।[৬]

পারানন্দমতের প্রাচীনতা প্রতিপাদনের জন্য প্রাচীন মুনিঋষিদের সহিত এই মতবাদের ঘনিষ্ঠতা বর্ণিত হইয়াছে। পারানন্দমতানুবর্তীদিগের মতে বশিষ্ঠ, নারদ, অগস্ত্য প্রভৃতি প্রসিদ্ধনামা ব্যক্তিগণ এই মতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তন্ত্রের অন্যান্য সম্প্রদায়ও এইরূপ চেষ্টা করিতে ত্রুটি করেন নাই। বশিষ্ঠ কৌলাচার অবলম্বন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, এ কথা তন্ত্রগ্রন্থে সুপরিচিত। লোপামুদ্রা, অগস্ত্য প্রভৃতির নামের সহিত কোন কোন তান্ত্রিক মন্ত্র জড়িত দেখিতে পাওয়া যায়।

ইতঃপূর্বে উল্লিখিত ও প্রকাশিত পারানন্দসূত্র সূত্রাকারে রচিত বিস্তৃত গ্রন্থ, কিন্তু মধ্যে মধ্যে অস্পষ্ট এবং অংশতঃ বিশৃঙ্খল। আলোচ্য গ্রন্থখানি সংক্ষিপ্ত হইলেও স্পষ্ট। ইহা হইতে পারানন্দমতের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সুন্দর ধারণা জন্মে। মুদ্রিত গ্রন্থ ও পুথিখানি

৪ শ্রুতিস্মৃতিপুরাণোক্তান্ ধর্মান্ কুরু বতানঘাঃ।
ন্যাসং সন্ত্যজ্য পূজাদি কার্যং বৈ মন্মতস্থিতৈঃ ॥
পরানন্দমতপ্রাপ্তির্যাবন্নৈবোপজায়তে।
তাবন্ন্যাসো যজ্ঞবিধৌ জঙ্গমস্য চ হিংসনম্ ॥৬২
পরানন্দমতে প্রাপ্তে ন [হি] কুর্য্যাদ্বিদং দ্বয়ম্।

৫ বামাচারো দ্বিপ্রকারো মধ্যমোত্তমভেদতঃ।
উত্তমস্ত্রিপ্রকারো বৈ মধ্যমঃ পঞ্চভির্যুতঃ ॥ (১২খ)

৬ বানপ্রস্থোপদ্রবকর্তৄন্ বন্যান্ হিংস্রান্ জন্তূন্ ব্যাঘ্রাদীন্ হন্যাদেব রাজা ॥ (১৮খ)

মিলাইয়া পড়িলে অনেক সন্দেহ দূরীভূত হয়। গ্রন্থখানি প্রধানতঃ ছন্দোবদ্ধ—মাঝে মাঝে গদ্য আছে। ইহার আয়তন প্রায় শতাধিক শ্লোক। তবে দুঃখের বিষয়, পুঁথিতে ইহার সকল অংশ রক্ষিত হয় নাই। ইহা মাঝে মাঝে খণ্ডিত। গ্রন্থের অধিকাংশ শিব (পরমানন্দ) ও অগস্ত্যাদির কথোপকথনরূপে নিবদ্ধ।

আলোচ্য গ্রন্থের সহিত মুদ্রিত গ্রন্থের ভাষাগত সাদৃশ্য অনেক স্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয়। তাহা ছাড়া, উভয় গ্রন্থে কতকগুলি শ্লোকের হুবহু মিল আছে। এই প্রসঙ্গে পারানন্দসূত্রের কতকগুলি অংশের (৮।৭৪-৫, ৮।৭৯-৮০, ১৩।৮৯-৯০, ১৩।৯৬, ১৯।৩৯-৪০) সহিত আলোচ্য গ্রন্থের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। মনে হয়, এগুলি উভয়ত্র প্রাচীনতর গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

গ্রন্থপ্রারম্ভে গণেশ, ভৈরব, শক্তি, বিষ্ণু, সূর্য ও মহেশ্বর, এই ছয় দেবতা এবং মত-প্রবর্তক পরমানন্দ, তদীয় শিষ্য দেবানন্দ ও ভ্রাতা নিত্যানন্দ, এবং পারানন্দমতদীক্ষিত অগস্ত্য, নারদ, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিবর্গকে প্রণাম করা হইয়াছে। উপোদ্‌ঘাত প্রকরণে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও মতবাদের উল্লেখ করা হইয়াছে। তৎপরে পারানন্দমতানুমোদিত পদার্থত্রয়ের নাম (পরমাত্মা, ঈশ্বর ও জীব) এবং লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে। ঈশ্বরগণও জীবের ন্যায় পরমাত্মার উপাসনা করিয়া থাকেন। পরমাত্মলোকই ইঁহাদের সকলের জীবনের চরম লক্ষ্য। প্রলয়কালে কিন্তু জীবগণ সানন্দলোকে নীত ও রক্ষিত হন।[৭] সৃষ্টি-প্রকরণে পরমাত্মকর্তৃক জগৎসৃষ্টির পৌর্বাপর্য সূচিত হইয়াছে। ব্রহ্মা-প্রভৃতি দেবগণ পরমাত্মকর্তৃক সৃষ্ট হইয়া ব্রহ্মলোক প্রভৃতি বিভিন্ন লোক সৃষ্টি করিতে আদিষ্ট হইলেন এবং একে একে স্বতন্ত্র অধিকারে নিযুক্ত হইলেন। নারদ, অগস্ত্য, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণ কিরূপে শিবের নিকট সমাগত হইয়া দক্ষিণ, উত্তর ও বামাচারে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, অতঃপর তাহার অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। বশিষ্ঠ প্রভৃতি দক্ষিণাচারে, নারদ ও অগস্ত্য প্রভৃতি বামাচারে এবং দেব ও দেবদেব নামক দুই ঋষি উত্তরাচারে দীক্ষালাভ করিয়াছিলেন। বশিষ্ঠ প্রভৃতি শিষ্য হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে শিব তাঁহাদিগের নিকট নিজ মতের বৈশিষ্ট্য বিবৃত করেন এবং দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করেন। বিনা দীক্ষায় শিষ্য হইবার অধিকার জন্মে না, এ কথা তাঁহাদিগকে স্পষ্ট বুঝাইয়া দেওয়া হয়।[৮] তাঁহারা যথানিয়মে দীক্ষিত হন এবং কয়েক দিন দীক্ষাব্রত গ্রহণ করিয়া সংযতভাবে যাপন করেন। পরে তাঁহারা প্রার্থিত মন্ত্র প্রাপ্ত হন। সাদি সান্ত, সাদ্যনন্ত, অনাদ্যনন্ত—পদার্থের এই বিভাগত্রয় তাঁহাদিগকে এই

৭ তত্র লোকো মহান্ দিব্যঃ পরমানন্দসংজ্ঞকঃ। যত্র গত্বা ন যাত্যত্র পুনঃ সংসারমণ্ডলে।
মুক্তাশ্চ চেশ্বরা যত্র রমন্তে চ যথাসুখম্। যত্র ধ্যানাসক্তচিত্তা অনির্দেশ্যপ্রিয়া যুতাঃ॥
পরানন্দৈকদেশস্তু সানন্দশ্চেত্যুদাহৃতঃ। কৃতপাপান্ দুরাচারান্ কৃতপুণ্যাংস্তথৈব চ।
আগতে প্রলয়ে হ্যেতান্ সানন্দে স্থাপয়ত্যসৌ॥

৮ ন দীক্ষয়া বিনা মাগং দদ্যাৎ কশ্চিৎ কচিচ্ছুভম্ ॥৫৬॥
তস্মাদ্ য়ং মুনিশ্রেষ্ঠা ভবধ্বং দীক্ষয়া যুতাঃ।

প্রসঙ্গেবুঝাইয়া দেওয়া হয়। এই জগৎ সাদি সান্ত; পরমাত্মা, জীব, ঈশ্বর, পরমানন্দলোক সেই স্থানের গাছপালা ও জল—এই সমস্ত অনাদ্যনন্ত; দিব্য দেহ সাদ্যনন্ত। আকাশ পরিচ্ছিন্ন, অপর ভূতগণের (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ) প্রতি অণু পরস্পর ভিন্ন।

নারদ অগস্ত্য প্রভৃতি ঋষিগণ বামাচারে দীক্ষিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাঁহাদিগকে যথানিয়মে দীক্ষা দেওয়া হয় এবং বামাচারের প্রকারভেদ ও বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা হয়।

দেব ও দেবদেব নামক ঋষিদ্বয় উত্তরমার্গে দীক্ষিত হইবার জন্য প্রার্থনা করিলে তাঁহাদিগের প্রার্থনা পূর্ণ করা হয়। এই মার্গের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ প্রসঙ্গে বলা হয়[৯]—এই মার্গ অবলম্বন করিলে মানুষের নিকট অর্থের আকাঙ্ক্ষা করিবে না—সেবাবৃত্তি আচরণ করিবে না—দুষ্কর্মকারী ব্যক্তির নিকট হইতেও অযাচিত দ্রব্য গ্রহণ করা যাইতে পারে। উত্তরমার্গে দীক্ষিত ব্যক্তির নাম আনন্দান্ত করিতে হইবে।

পারানন্দমতাবলম্বী রাজা দণ্ডনীয়কে দণ্ড দিবেন—যথানিয়মে প্রজাপালন করিবেন—স্বরাষ্ট্র রক্ষা ও পররাষ্ট্র বশীভূত করিবেন এবং প্রয়োজনানুসারে যুদ্ধাদি করিবেন—আশ্রমের বিঘ্নকারী হিংস্র পশুদিগকে বধ করিবেন—কালীর সম্মুখে বলি দিবেন। ইহাতে তাঁহার পাপ হওয়া দূরে থাকুক, পুণ্য বৃদ্ধি হইবে।[১০] হিংসাবিরোধী পারানন্দমতে এ বিধান আপাততঃ বিসদৃশ বলিয়া মনে হইতে পারে। তাই এ সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মুদ্রিত 'পারানন্দসূত্রে' (পৃঃ ৯২।৩১-২) এই প্রসঙ্গে একটী সুন্দর উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। অযোধ্যারাজ সুদর্শন বশিষ্ঠ কর্তৃক শাক্ত পারানন্দমতে দীক্ষিত হইলে সমীপবর্তী প্রদেশের রাজবর্গ তাঁহাকে অহিংসক মনে করিয়া আক্রমণ করিলেন—সুদর্শনও যুদ্ধ করা উচিত কি না, বুঝিতে না পারিয়া বশিষ্ঠের নিকট সংশয় নিরাসার্থ উপস্থিত হইলেন। বশিষ্ঠ তাঁহাকে লইয়া পরমানন্দের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া বলিলেন,—"ন্যায়যুদ্ধ পরমানন্দমতাবলম্বীর পরম ধর্ম।" আলোচ্য পুথিতে এই উপাখ্যানের প্রথমাংশ খণ্ডিত—তাই বুঝিতে একটু অসুবিধা হয়। "বশিষ্ঠ ও সুদর্শন প্রণাম করিলে শিব অন্তর্হিত হইলেন" যুদ্ধাদিবিধানের পর এই কথা এ পুথিতে রহিয়াছে। এই জন্য মনে হয়, খণ্ডিত অংশে উপাখ্যানের পূর্বভাগ ছিল।

অদীক্ষিতায় যো দদ্যান্মন্ত্রং বা মার্গমুত্তমম্।
স পতেন্নরকে ঘোরে বর্ষাণাময়ুতং সমাঃ ॥৫৭॥
যথা হ্য নুপনীতায় কন্যাং দদ্যাদ্ বিমূঢ়ধীঃ।
তথা হ্য দীক্ষিতায়ৈনং দদন্মার্গং পতেদ্ গুরুঃ ॥৫৮॥

৯ নেচ্ছেদ্ধনং মনুষ্যেভ্যঃ সেবাবৃত্তিং চরেন্ন চ।
অযাচিতাহৃতং গ্রাহ্যমপি দুষ্কৃতকর্মণঃ ॥৮৩॥

মুদ্রিত গ্রন্থে "অযাচিতাহৃতং" স্থলে "অযাচিতাদ্‌ব্রতং" এই পাঠ আছে। তাহা শোভন বলিয়া মনে হয় না।

১০ যো দণ্ড্যান্ দণ্ডয়েদ্ রাজা সম্যগ্ বধ্যাংশ্চ ঘাতয়েৎ।
ইষ্টং স্যাৎ ক্রতুভিস্তেন সমাপ্তবরদক্ষিণৈঃ ॥

বঙ্কিমচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বেদান্তরত্ন

বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের 'ঐকান্তী' ভক্ত ছিলেন—ভক্তেষৈকান্তিনো মুখ্যাঃ। তিনি 'ধর্মতত্ত্বে'র চতুর্থ অধ্যায়ে লিখিতেছেন :—

যিনি বাহুবলে দুষ্টের দমন করিয়াছেন, বুদ্ধিবলে ভারতবর্ষ একীভূত করিয়াছেন, জ্ঞানবলে অপূর্ব্ব নিষ্কাম ধর্মের প্রচার করিয়াছেন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। যিনি কেবল প্রেমময় বলিয়া, নিষ্কাম হইয়া এই সকল মনুষ্যের দুষ্কর কাজ করিয়াছেন, যিনি বাহুবলে সর্বজয়ী এবং পরের সাম্রাজ্যস্থাপনের কর্ত্তা হইয়াও আপনি সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই, যিনি শিশুপালের শত অপরাধ ক্ষমা করিয়া, ক্ষমাগুণ প্রচার করিয়া, তার পর কেবল দণ্ডপ্রণেতৃত্বপ্রযুক্তই তাহার দণ্ড করিয়াছেন, যিনি সেই বেদপ্রবল দেশে, বেদপ্রবল সময়ে বলিয়াছিলেন,—"বেদে ধর্ম নহে—ধর্ম লোকহিতে"—তিনি ঈশ্বর হউন বা না হউন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। যিনি একাধারে শাক্যসিংহ, যিশুখৃষ্ট, মহম্মদ ও রামচন্দ্র; যিনি সর্ববলাধার, সর্বগুণাধার, সর্বধর্মবেত্তা, সর্বত্র প্রেমময়, তিনি ঈশ্বর হউন বা না হউন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি।

নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥

এই মহনীয় কৃষ্ণস্তুতিতে বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, "শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর হউন বা না হউন" কিন্তু তিনি নিজে বিশ্বাস করিতেন—শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার। 'কৃষ্ণচরিত্রে'র দ্বিতীয় বারের "বিজ্ঞাপনে" তিনি লিখিতেছেন, "আমি নিজে তাঁহার ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করি;—সে বিশ্বাস আমি লুকাই নাই।" পুনশ্চ—"আমি নিজেও কৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করি; পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিণাম আমার এই হইয়াছে যে, আমার সে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়াছে"* ('কৃষ্ণচরিত্র'—উপক্রমণিকা)। এমন কি, বঙ্কিমচন্দ্র অকুণ্ঠ ভাবে বলিয়াছেন, "প্রকৃত বিচারে শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কাহাকেও ঈশ্বরের অবতার বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না।" ('কৃষ্ণচরিত্র'—প্রথম খণ্ড, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ)।

'কৃষ্ণচরিত্রে' বঙ্কিমচন্দ্র বেশ নিপুণভাবে বিচার করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ঐতিহাসিক ব্যক্তি—কবি-ভক্ত-ভাবুকের কল্পনাপ্রসূত রূপক মাত্র নহেন।† তিনি গৌরদাস বাবাজির মুখে ('প্রচার' ১২৯২, আষাঢ়) বলিতেছেন :—"আমার

* অন্যত্র বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন :—"মহাভারতের অনেক স্থলে শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণু, ঈশ্বরের অবতার—এ কথা বলা হইয়াছে সত্য বটে। কিন্তু কৃষ্ণচরিত্রে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি, মহাভারতের সকল অংশ এক সময়ের নহে এবং যে সকল অংশে কৃষ্ণে অবতারত্ব আরোপিত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক।" —গীতাভাষ্য, পৃ. ২২৩।

† ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যায় "প্রত্নতাত্ত্বিক বঙ্কিমচন্দ্র" প্রবন্ধে আমি এ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি। কৌতূহলী পাঠক তাহা পাঠ করিতে পারেন।

দৃঢ় বিশ্বাস যে, জগদীশ্বর সশরীরে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া জগতে ধর্মস্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি রূপক নহেন।”

বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্রে' খাণ্ডবদাহের পর যুধিষ্ঠিরের সভানির্মাণ লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

কৃষ্ণ স্বজীবনে দুইটি কার্য্য উদ্দিষ্ট করিয়াছিলেন—ধর্মপ্রচার এবং ধর্মরাজ্য সংস্থাপন। ধর্ম-প্রচারের কথা এখনও বড় উঠে নাই। এই সভা নির্মাণ ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনের প্রথম সূত্র। এইখানেই তাঁহার এই অভিসন্ধির প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। যুধিষ্ঠিরের সভানির্মাণ হইতে যে সকল ঘটনাবলী হইল, শেষে তাহা ধর্মরাজ্য সংস্থাপনে পরিণত হইল।* ধর্মরাজ্য সংস্থাপন জগতের কাজ; কিন্তু যখন তাহা কৃষ্ণের উদ্দেশ্য, তখন এ সভা সংস্থাপন তাঁহার নিজের কাজ।

বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্মতত্ত্বে' প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, মনুষ্যত্বই মনুষ্যের ধর্ম। মনুষ্যত্বের উপাদান আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তি বা বৃত্তিগুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতা। ঐ বৃত্তিগুলিকে বঙ্কিমচন্দ্র চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—শারীরিকী, জ্ঞানার্জনী, কার্য্যকারিণী ও চিত্তরঞ্জিনী। মনুষ্যত্বের জন্য ঐ বৃত্তিগুলিকে সম্পূর্ণ স্ফূর্ত করিতে হইবে, কিন্তু তৎসঙ্গে তাহারা সমঞ্জস হওয়া চাই। তিনি 'কৃষ্ণচরিত্রে' বলিতেছেন :—

সকল বৃত্তির সর্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি, সামঞ্জস্য ও চরিতার্থতা-সাধন অতি দুরূহ। যাহা দুরূহ, তাহার শিক্ষা কেবল উপদেশে হয় না—আদর্শ চাই। সম্পূর্ণ ধর্মের সম্পূর্ণ আদর্শ ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ নাই। কিন্তু নিরাকার ঈশ্বর আমাদের আদর্শ হইতে পারেন না। কেন না, তিনি প্রথমতঃ অশরীরী; আমরা শরীরী। দ্বিতীয়তঃ তিনি অনন্ত; আমরা সান্ত, অতি ক্ষুদ্র। অতএব যদি ঈশ্বর স্বয়ং সান্ত ও শরীরী হইয়া লোকালয়ে দর্শন দেন, তবে সেই আদর্শের আলোচনায় যথার্থ ধর্মের উন্নতি হইতে পারে। এই জন্যই ঈশ্বরাবতারের প্রয়োজন।—১ম খণ্ড, ১৩শ পরিচ্ছেদ।

এই সম্পূর্ণ আদর্শ প্রদর্শন জন্যই ঈশ্বরের শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতার গ্রহণ। আমি কৃষ্ণচরিত্র-বিষয়ক গ্রন্থে এইরূপ বুঝাইয়াছি যে, মনুষ্যত্বের আদর্শ-প্রচারের জন্য ভগবানের মানবদেহ ধারণ। অন্য উদ্দেশ্য সম্ভবে না। আদর্শ মনুষ্য আদর্শকর্মী।—গীতাভাষ্য, পৃ. ২২৭।

'কৃষ্ণচরিত্রে' বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন :—

কেবল একটা কংস বা শিশুপাল মারিবার জন্য যে স্বয়ং ঈশ্বরকে ভূতলে মানবরূপে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা অসম্ভব কথা বটে। যিনি অনন্ত শক্তিমান্, তাঁহার কাছে কংস-শিশুপালও যে, এক ক্ষুদ্র পতঙ্গও সে। বাস্তবিক যাহারা হিন্দু ধর্মের প্রকৃত মর্ম গ্রহণ করিতে না পারে, তাহারাই মনে করে যে, অবতারের উদ্দেশ্য দৈত্য বা দুরাত্মাবিশেষের নিধন। আসল কথা, 'ধর্মসংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে'।

এই ধর্মসংরক্ষণ কেবল সম্পূর্ণ আদর্শ প্রদর্শন দ্বারাই হইতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শ পুরুষ বলিয়া ভাবিলে, মনুষ্যত্বের আদর্শের বিকাশ জন্যই অবতীর্ণ, ইহা ভাবিলে তাঁহার সকল কার্য্যই বিশদরূপে বুঝা যায়। কৃষ্ণচরিত্র-স্বরূপ রত্ন-ভাণ্ডার খুলিবার চাবি এই আদর্শ পুরুষতত্ত্ব।—'কৃষ্ণচরিত্র', ৪র্থ খণ্ড, দশম পরিচ্ছেদ।

* যুধিষ্ঠিরকে কেন্দ্রস্থিত করিয়া ধর্মরাজ্য সংস্থাপন করা কৃষ্ণের এক্ষণে জীবনের উদ্দেশ্য। অতএব প্রতি পদে তিনি তাহার উদ্যোগ করিতেছেন।—'কৃষ্ণচরিত্র', চতুর্থ খণ্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে শ্রীকৃষ্ণই আদর্শ মানব। কারণ, সমস্ত মানবিক বৃত্তি তাঁহাতে সম্পূর্ণ স্ফূর্ত অথচ সমঞ্জস।* 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রকাশের পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র 'নবজীবনে' অনুশীলন ধর্ম্মের আলোচনা করিয়াছিলেন। 'কৃষ্ণচরিত্রে'র প্রথম বারের "বিজ্ঞাপনে" তিনি লিখিতেছেন :—

অনুশীলন ধর্মে যাহা তত্ত্বমাত্র, কৃষ্ণচরিত্রে তাহা দেহবিশিষ্ট। অনুশীলনে যে আদর্শে উপস্থিত হইতে হয়, কৃষ্ণচরিত্র কর্মক্ষেত্রস্থ সেই আদর্শ। আগে তত্ত্ব বুঝাইয়া, তার পর উদাহরণ দ্বারা তাহা স্পষ্টীকৃত করিতে হয়। কৃষ্ণচরিত্র সেই উদাহরণ।

অন্যত্র বঙ্কিমচন্দ্র এই আদর্শ সম্বন্ধে বলিতেছেন :—

মনুষ্যে প্রকৃত মনুষ্যত্বের অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন স্বভাবের আদর্শ নাই, এ জন্য ঈশ্বরকে ধ্যান করিতে হইবে। কিন্তু ঈশ্বর অনন্তপ্রকৃতি। আমরা ক্ষুদ্রপ্রকৃতি। তাঁহার গুণগুলি সংখ্যায় অনন্ত, বিস্তারেও অনন্ত। যে ক্ষুদ্র, অনন্ত তাহার আদর্শ হইবে কি প্রকারে? সমুদ্রের আদর্শে কি পুকুর কাটা যায়, না আকাশের অনুকরণে চাঁদোয়া খাটান যায়।

এই জন্য ধর্মেতিহাসের প্রয়োজন। ধর্মেতিহাসে (Religious History-তে) প্রকৃত ধার্মিকদিগের চরিত্র ব্যাখ্যাত থাকে। অনন্তপ্রকৃতি ঈশ্বর উপাসকের প্রথমাবস্থায় তাহার আদর্শ হইতে পারেন না, ইহা সত্য; কিন্তু ঈশ্বরের অনুকারী মনুষ্যেরা, অর্থাৎ যাঁহাদিগের গুণাধিক্য দেখিয়া ঈশ্বরাংশ বিবেচনা করা যায়, অথবা যাঁহাদিগকে মানবদেহধারী ঈশ্বর মনে করা যায়, তাঁহারাই সেখানে বাঞ্ছনীয় আদর্শ হইতে পারেন। এই জন্য যিশুখৃষ্ট খৃষ্টিয়ানের আদর্শ এক কালে ছিলেন শাক্যসিংহ বৌদ্ধের আদর্শ ছিলেন। কিন্তু এরূপ ধর্মপরিবর্দ্ধক আদর্শ যেমন হিন্দুশাস্ত্রে আছে, এমন আর পৃথিবীর কোন ধর্মপুস্তকেই নাই, কোন জাতির মধ্যে প্রসিদ্ধ নাই। জনকাদি রাজর্ষি, নারদাদি দেবর্ষি, বশিষ্ঠাদি ব্রহ্মর্ষি, সকলেই অনুশীলনের চরমাদর্শ। তাহার উপর শ্রীরামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, অর্জুন, লক্ষ্মণ, দেবব্রত ভীষ্ম প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ আরও সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত আদর্শ। খৃষ্ট ও শাক্যসিংহ কেবল উদাসীন কৌপীনধারী নির্ম্মম ধর্মবেত্তা। কিন্তু ইঁহারা তা নয়। ইঁহারা সর্বগুণবিশিষ্ট—ইঁহাদিগেতেই সর্ববৃত্তি সর্বাঙ্গসম্পন্ন স্ফূর্তি পাইয়াছে। ইঁহারা সিংহাসনে বসিয়াও উদাসীন; কার্মুকহস্তেও ধর্মবেত্তা; রাজা হইয়াও পণ্ডিত; শক্তিমান্ হইয়াও সর্বজনে প্রেমময়। কিন্তু এই সকল আদর্শের উপর হিন্দুর আর এক আদর্শ আছেন, যাঁহার কাছে আর সকল আদর্শ খাটো হইয়া যায়—যুধিষ্ঠির যাঁহার কাছে ধর্মশিক্ষা করেন, স্বয়ং অর্জুন যাঁহার শিষ্য, রাম ও লক্ষ্মণ যাঁহার অংশ মাত্র, যাঁহার তুল্য মহামহিমাময় চরিত্র কখনও মনুষ্য-ভাষায় কীর্তিত হয় নাই। আইস, আজ তোমাকে কৃষ্ণোপাসনায় দীক্ষিত করি।...

তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) শারীরিক বৃত্তিসকল সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্তি প্রাপ্ত হইয়া অননুভবনীয় সৌন্দর্যে এবং অপরিমেয় বলে পরিণত; তাঁহার মানসিক বৃত্তিসকল সেইরূপ স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হইয়া সর্বলোকাতীত বিদ্যা, শিক্ষা, বীর্য এবং জ্ঞানে পরিণত এবং প্রীতিবৃত্তির তদনুরূপ পরিণতিতে তিনি সর্বলোকের সর্বহিতে রত। —'ধর্মতত্ত্ব', চতুর্থ অধ্যায়।

* কৃষ্ণ যখন আদর্শ মনুষ্য, তখন তাঁহার কোন বৃত্তিই অননুশীলিত বা স্ফূর্তিহীন থাকিবার সম্ভাবনা নাই (কি শারীরিকী, কি জ্ঞানার্জনী, কি কার্য্যকারিণী, কি চিত্তরঞ্জিনী)।...এই রাসলীলা কৃষ্ণ ও গোপীগণকৃত সেই চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি অনুশীলনের উদাহরণ। কৃষ্ণপক্ষে ইহা উপভোগ মাত্র, কিন্তু গোপীপক্ষে ইহা ঈশ্বরোপাসনা। ('কৃষ্ণচরিত্র', ২য় খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ)।

কংসবধের প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন :—

এই কংসবধেই দেখি—কৃষ্ণ পরম বলশালী, পরম কার্য্যদক্ষ, পরম ন্যায়পর, পরম ধর্মাত্মা, পরহিতে রত এবং পরের জন্য কাতর। এইখান হইতে দেখিতে পাই যে, তিনি আদর্শ মনুষ্য।—'কৃষ্ণচরিত্র', তৃতীয় খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ।

…যিশু বা শাক্যসিংহ যদি গৃহী হইয়া জগতের ধর্ম-প্রবর্তক হইতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের ধার্মিকতা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইত সন্দেহ নাই। আদর্শ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ গৃহী। যিশু বা শাক্যসিংহ সন্ন্যাসী—আদর্শ পুরুষ নহেন।

পুনশ্চ—যিশু অশিক্ষিত, কৃষ্ণ সর্বশাস্ত্রবিৎ। অন্যান্য গুণ সম্বন্ধেও ঐরূপ। উভয়েই শ্রেষ্ঠ ধার্মিক ও ধর্মজ্ঞ। অতএব কৃষ্ণই আদর্শ মনুষ্য।—'কৃষ্ণচরিত্র', ৪র্থ খণ্ড, সপ্তম পরিচ্ছেদ।

শ্রীকৃষ্ণ যে আদর্শ মানব, বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্রে' এ কথা ভূয়ঃ ভূয়ঃ প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

কৃষ্ণ সংসারী, গৃহী, রাজনীতিজ্ঞ, যোদ্ধা, দণ্ডপ্রণেতা, তপস্বী এবং ধর্মপ্রচারক। সংসারী ও গৃহীদিগের, রাজাদিগের, যোদ্ধাদিগের, রাজপুরুষদিগের, তপস্বীদিগের, ধর্মবেত্তাদিগের এবং একাধারে সর্বাঙ্গীন মনুষ্যত্বের আদর্শ।…যিনি এইরূপে পরাক্রমে ও পাণ্ডিত্যে, বীর্যে ও শিক্ষায়, কর্মে ও জ্ঞানে, নীতিতে ও ধর্মে, দয়ায় ও ক্ষমায়, তুল্যরূপেই সর্বশ্রেষ্ঠ—তিনিই আদর্শ পুরুষ।

'কৃষ্ণচরিত্রে'র উপসংহারে বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন :—

বাল্যে কৃষ্ণ শারীরিক বলে আদর্শ-বলবান্। তাঁহার অশিক্ষিত বলপ্রভাবে বৃন্দাবন সুরক্ষিত… কংসের মল্ল প্রভৃতি নিহত হইয়াছিল। এই বল শিক্ষিত হইলে, তিনি সে সময়ের ক্ষত্রিয়সমাজে সর্বপ্রধান অস্ত্রবিৎ বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। কেহ কখনও তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারে নাই… সৈনাপত্যই যোদ্ধার প্রকৃত গুণ। সৈনাপত্যে সে সময়ের যোদ্ধাগণ পটু ছিলেন না … কৃষ্ণের সৈনাপত্যের বিশেষ কিছু পরিচয় পাওয়া যায়—জরাসন্ধ-যুদ্ধে এবং রৈবতক পর্বতমালায় দুর্ভেদ্য দুর্গশ্রেণী-নির্মাণে। সেরূপ পরিচয় পুরাণেতিহাসে কোন ক্ষত্রিয়েরই পাওয়া যায় না…

শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানার্জনী বৃত্তিসকল যে চরমোৎকর্ষপ্রাপ্ত, কৃষ্ণপ্রচারিত ধর্ম (বিশেষতঃ ভগবদ্গীতায়) ইহার তীব্রোজ্জ্বল প্রমাণ। তিনি অদ্বিতীয় বেদজ্ঞ … রাজধর্মে বা রাজনীতি সম্বন্ধেও দেখিতে পাই যে, কৃষ্ণের জ্ঞানার্জনী বৃত্তিসকল চরম স্ফূর্তিপ্রাপ্ত … তাঁহার বুদ্ধি সর্বব্যাপিনী, সর্বদর্শিনী, সকল প্রকার উপায়ের উদ্ভাবিনী। মনুষ্যশরীর ধারণ করিয়া যতদূর সর্বজ্ঞ হওয়া যায়, কৃষ্ণ ততদূর সর্বজ্ঞ …

কৃষ্ণের কার্য্যকারিণী বৃত্তিসকলও চরম স্ফূর্তিপ্রাপ্ত। তাঁহার সাহস, ক্ষিপ্রকারিতা এবং সর্ব কর্মে তৎপরতার অনেক পরিচয় দিয়াছি। তাঁহার ধর্ম ও সত্য যে অবিচলিত, এ গ্রন্থে তাহার প্রমাণ পরিপূর্ণ। সর্বজনে দয়া ও প্রীতিও এই ইতিহাসে পরিস্ফুট হইয়াছে। …

এই সকল শ্রেষ্ঠ বৃত্তি কৃষ্ণে চরম স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলনে তিনি পরাঙ্মুখ ছিলেন না—কেন না, তিনি আদর্শ মনুষ্য …

উপসংহারে বক্তব্য, কৃষ্ণ সর্বত্র সর্বসময়ে সর্বগুণের অভিব্যক্তিতে উজ্জ্বল। তিনি অপরাজেয়, অপরাজিত, বিশুদ্ধ, পুণ্যময়, প্রীতিময়, দয়াময়, অনুষ্ঠেয় কর্মে অপরাঙ্মুখ—ধর্মাত্মা, বেদজ্ঞ, নীতিজ্ঞ, ধর্মজ্ঞ, লোক-হিতৈষী, ন্যায়নিষ্ঠ, ক্ষমাশীল, নিরপেক্ষ, শাস্তা, নির্মম, নিরহংকার, যোগযুক্ত, তপস্বী। …

যিনি মীমাংসা করিবেন যে, কৃষ্ণ মনুষ্যমাত্র ছিলেন—তিনি অন্ততঃ বলিবেন, কৃষ্ণ was "the wisest

and greatest of the Hindus"—আর যিনি বুঝিবেন যে, এই কৃষ্ণচরিত্রে ঈশ্বরের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি যুক্তকরে বিনীত ভাবে আমার সঙ্গে বলুন—

নাকারণাং কারণাদ্ বা কারণাকারণাং ন চ।
শরীরগ্রহণং বাপি ধর্মত্রাণায় তে পরম্॥

এ সকল কথার সহিত আমি সম্পূর্ণ একমত। আমার বিশ্বাস, যিনিই নিবিষ্ট ভাবে 'কৃষ্ণচরিত্র' অধ্যয়ন করিবেন, তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত স্বর মিলাইয়া বলিবেন—কৃষ্ণচরিত্র আদর্শ চরিত্র বটে, শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ মানব—সর্বগুণাধার, সর্বজ্ঞানাধার, সর্ববলাধার, সর্বরসাধার—তাঁহাতে সমস্ত বৃত্তি ও শক্তি সম্পূর্ণ স্ফূর্ত অথচ সু-সমঞ্জস। কিন্তু তাহাতে কি সিদ্ধ হইল যে, শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার? সত্য বটে, বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, "সম্পূর্ণ ধর্মের সম্পূর্ণ আদর্শ ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ নাই।" এবং "মনুষ্যত্বের আদর্শ প্রচার জন্য তিনি অবতীর্ণ হন"—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে যখন সম্পূর্ণ আদর্শ মূর্তিবিশিষ্ট, তখন শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার। বঙ্কিমচন্দ্র ইহা লক্ষ্য করেন নাই যে, যাঁহারা ঈশ্বরের সারূপ্য-প্রাপ্ত—গীতায় ভগবান্ যাঁহাদের 'মম সাধর্ম্যমাগতাঃ' বলিয়াছেন, তাঁহারাও প্রয়োজনবশে উর্দ্ধলোক হইতে পৃথিবীর মাটিতে অবতীর্ণ হইতে পারেন। বলা বাহুল্য, যাঁরা 'মম সাধর্ম্যম্ আগতাঃ,' তাঁরা ঈশ্বর না হইলেও আদর্শ পুরুষ—কারণ, তাঁহারা 'পূর্ণম্ অদঃ পূর্ণম্ ইদং'—তাঁহারা যিশু-খৃষ্টের ভাষায় "are perfect as our Father in Heaven is perfect"—পরব্যোমে পরমপিতা যেমন পূর্ণ, তেমনি সম্পূর্ণ।

পরব্যোমে পরমপিতা—সেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষ সম্পূর্ণ - পূর্ণম্ অদঃ! এ কথার অর্থ কি? অর্থ এই যে, সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম একাধারে সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী শক্তির উচ্ছল প্রস্রবণ—যুগপৎ অখণ্ড প্রতাপ, অতর্ক্য প্রজ্ঞা ও অজস্র প্রেমের অফুরন্ত উৎস—"is the glorious Trinity of Power, Wisdom and Bliss."

জীব যখন ব্রহ্মখণ্ড—মমৈবাংশঃ, "made in the image of God," ব্রহ্ম-অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ, ব্রহ্মসিন্ধুর বিন্দু—তখন জীবে নিশ্চয়ই "অস্তীহ ব্রহ্মলক্ষণম্"। কিন্তু ব্রহ্মে যাহা প্রকট, জীবে তাহা প্রচ্ছন্ন,—ব্রহ্মে যাহা বিকশিত, জীবে তাহা বীজাবস্থ। এ ভাবে ব্রহ্ম জীব হইতে অধিক—অধিকন্তু ভেদ-নির্দেশাৎ (ব্রহ্মসূত্র, ২।১।২২)। কিন্তু জীবের নিয়তি এই যে, কালক্রমে ঐ বীজ বৃক্ষে পরিণত হইবে—ঐ সকল অব্যক্ত শক্তি ও সম্ভাবনা সুব্যক্ত হইবে—ঐ সুপ্ত সৎ-ভাব, চিৎ-ভাব ও আনন্দ-ভাব প্রবুদ্ধ হইয়া জীব শিব হইবে। ইহারই নাম ব্রহ্মসারূপ্য—খৃষ্টানী ভাষায় Deification ("The wonder of wonders is the human made Divine.")। ইহাই গীতার "মম সাধর্ম্যম্ আগতাঃ"। তখন স্ফুলিঙ্গ সমিদ্ধ হইয়া অগ্নি হয়, বিন্দু সম্প্রসারিত হইয়া সিন্ধু হয়। যাঁহাদের আমরা অবতার বলি—তাঁহারা কেহ কেহ ঈশ্বরের অবতার বটেন, কিন্তু অপরে এইরূপ আদর্শ পুরুষ—Deified Men—ব্রহ্মের সারূপ্যপ্রাপ্ত মুক্তাত্মা।

শ্রীকৃষ্ণ কি ঈশ্বরের অবতার অথবা ঐরূপ সারূপ্যপ্রাপ্ত মুক্ত পুরুষের অবতার? আমরা দেখিলাম, বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে তিনি ঈশ্বরের অবতার। কিন্তু ঈশ্বরাবতার হইলেও শ্রীকৃষ্ণ

(বঙ্কিমচন্দ্রের মতে) "মানুষী শক্তি ভিন্ন অন্য শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতেন না এবং মানুষী শক্তির দ্বারাই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতেন।"* 'কৃষ্ণচরিত্রে' বঙ্কিমচন্দ্র ইহাই প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস করিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ অতিপ্রাকৃত কার্য্য দ্বারা বা নৈসর্গিক নিয়মের বিলঙ্ঘন দ্বারা কোন কার্য্য সম্পন্ন করেন নাই। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বিষ্ণুপুরাণ হইতে নিম্নোক্ত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

মনুষ্যধর্ম্মশীলস্য লীলা সা জগতঃ পতেঃ।
...মনসৈব জগৎসৃষ্টিং সংহারঞ্চ করোতি যঃ।
তস্যারিপক্ষক্ষপণে কোঽয়ম্ উদ্যমবিস্তরঃ।
মনুষ্যদেহিনাং চেষ্টাম্ ইত্যেবম্ অনুবর্ত্ততঃ।

—বিষ্ণুপুরাণ, ৫।২২।১৪-৭

"জগদীশ্বর হইলেও শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্যধর্ম্মশীল বলিয়া তাঁহার এইরূপ লীলা। যিনি সংকল্পমাত্রে জগতের সৃষ্টি সংহার সম্পন্ন করেন, অরি-ক্ষয় তাঁহার তুচ্ছ কার্য্য। তথাপি লীলাবশে মনুষ্যদেহধারীর অনুরূপ তাঁহার ক্রিয়া।"

এবং সমাদরের সহিত অধ্যাপক ল্যাসেনের ও উইল্সনের মত উপন্যস্ত করিয়াছেন :—

It is true that in the epic poems, both Rama and Krisna appear as incarnations of Visnu but they at the same time come before us as human heroes ... acting according to human motives and taking no advantage of their divine superiority. Lassen.

He [Krisna] exercises no superhuman faculties in defence of himself or his friends or in the defeat and destruction of his foes.—Wilson.

ইহার পর বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন :—

ভরসা করি, ইহার পর কোন পাঠক বিশ্বাস করিবেন না যে, কৃষ্ণ মনুষ্যদেহে অতিমানুষ শক্তিদ্বারা কোন কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।

আমি বঙ্কিমচন্দ্রের এক জন নিবিষ্ট পাঠক। কিন্তু আমি বলিতে বাধ্য যে, আমার বিশ্বাস, মনুষ্যদেহে অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণ প্রয়োজন হইলে অতিমানুষ শক্তির প্রয়োগ করিতেন এবং তথাকথিত প্রাকৃতিক নিয়ম বিলঙ্ঘন করিতেন। গীতায় উল্লিখিত বিশ্বরূপ-প্রদর্শন ইহার জাজ্বল্য উদাহরণ। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে অর্জুনের কশ্মল অপনোদন জন্য শ্রীকৃষ্ণ নিজ শরীরে বিশ্বরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন—ইহাকে আমি ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি—

যদাশ্রৌষং কশ্মলেনাভিপন্নে
রথোপস্থে সীদমানেঽর্জুনে বৈ।
কৃষ্ণং লোকান্ দর্শয়ানং শরীরে
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়।

* "প্রকৃত ও অতিপ্রকৃত" প্রবন্ধেও বঙ্কিমচন্দ্র ঐ কথাই বলিয়াছেন—"শ্রীকৃষ্ণ জগদীশ্বরের আংশিক বা সম্পূর্ণ অবতাররূপে কল্পিত হইলেও মানুষের ন্যায় মানবধর্ম্মাবলম্বী। মানবচরিত্রগত এমন একটি উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি নাই যে, তাহা ভাগবতকারকৃত শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে অঙ্কিত হয় নাই।"

'যোগেশ্বর' কৃষ্ণের ইহা অতিমানুষ কার্য্য নহে কি? কথাটা একটু বুঝাইয়া বলি। ঈশ্বর ও মনুষ্যের মধ্যে যে বিরাট্ ব্যবধান, ঐ ব্যবধান বিবিধ দৈবশক্তির দ্বারা অধিষ্ঠিত।* ঐ দৈবশক্তি পরস্পর বিবদমান। ঐ বিরুদ্ধ শক্তিদ্বয়কে আমরা এ দেশে দেবাসুর বলি—খৃষ্টানের Good and Evil Angels। সয়তান বা Ahriman কবিকল্পনা নহে—বস্তুতঃ ঈশ্বরের অভিপ্রেত বিবর্ত্তনের ঋতমার্গের পরিপন্থী নিঋতি বা Dark Powers আছে। পুরাণ-ইতিহাসে দেখিতে পাই, যখন ঐ বামমার্গী অসুরশক্তি অবতীর্ণ হইয়া বিবর্তনের প্রতিরোধ করিয়া ধরাকে ভারাক্রান্ত করে, তখন ধরিত্রীর আকুল আহ্বানে ভগবান্ অবতার গ্রহণ করেন—

ভূমেঃ সুরেতরবরূথ-বিমর্দিতায়াঃ
ক্লেশব্যয়ায় কলয়া সিতকৃষ্ণকেশঃ।

—ভাগবত, ২।৭।২৬

ইহাই গীতার "বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্"। কৃষ্ণ অবতারের পূর্বেও ঠিক ঐরূপ ঘটিয়াছিল। কয়েক জন প্রবলপরাক্রান্ত অসুর কংস, জরাসন্ধ, শিশুপালরূপে অবতীর্ণ হইয়া উন্নতির পথ অর্গলবদ্ধ করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের বিরোধিতা করিতে তাহারা যে মনুষ্যশক্তির অতিরিক্ত কিছু করে নাই—ইহা সম্ভব নহে। তাহাদের কৃত বাধা অপনোদন করিয়া ধরার ভার লাঘব করিতে যদি শ্রীকৃষ্ণ সময়ে সময়ে দৈবশক্তির প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহাতে অবিশ্বাসের কি আছে? বিশেষতঃ যখন বঙ্কিমচন্দ্র অতিপ্রকৃতে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাঁহার রচনার নানা স্থানে তাহার পরিচয় দিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত পাঠককে শুনাইলাম। এইবার আমার বক্তব্য বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করি।

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ধর্মজগতের প্রধান প্রহেলিকা—greatest mystery, অত্যদ্ভুত রহস্য। বঙ্কিমচন্দ্র যে এই জটিল সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান করিয়াছেন, এমন আমার বোধ হয় না। কথাটার একটু বিস্তার করি।

হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, ঋষিরা বিষ্ণু, মহাবিষ্ণু ও মহেশ্বর—এই Triple Logos-এর প্রকাশগত প্রভেদের উপদেশ করিয়াছেন। বিষ্ণু কে? বিষ্ণু "ক্ষৌণীভর্ত্তা"—অর্থাৎ আমাদের ভূমণ্ডলের অধিদেবতা (Planetary Logos),—বৈষ্ণব পরিভাষায় ক্ষীরোদশায়ী বা শ্বেতদ্বীপপতি। আমাদের পৃথিবীর যেমন ভর্ত্তা (Planetary Logos) আছেন, সৌরমণ্ডলভুক্ত মঙ্গল বুধ প্রভৃতি অন্যান্য গ্রহেরও সেইরূপ অধিপতি আছেন। তাঁহারা সেই সেই গ্রহের অধিদেবতা (Planetary Logos)।

তাঁহাদের সকলের উপরে সৌরমণ্ডলের অধিপতি মহাবিষ্ণু বা সূর্য্যনারায়ণ—যোঽসৌ আদিত্যে পুরুষঃ (উপনিষদ্)—Solar Logos—যিনি

ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী
নারায়ণঃ সরসিজাসন-সন্নিবিষ্টঃ।

বৈষ্ণব পরিভাষায় ইনি গর্ভোদশায়ী বা চতুর্ভুজ নারায়ণ।

---

* এই সম্পর্কে আমার *Philosophy of the Gods* গ্রন্থে সবিস্তার আলোচনা আছে।

কিন্তু সৌরমণ্ডল (Solar system) ত' একটি নয়—অগণ্য। আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের মত কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড আকাশে বিলম্বিত রহিয়াছে—কারণ, প্রত্যেক তারা এক একটি সৌরমণ্ডলের কেন্দ্র—"Each star is a sun and as such the centre of a solar system."

কোটিকোট্যযুতানীশে চাণ্ডানি কথিতানি বৈ।

বরং সমুদ্রসৈকতের বালুকণা গণিয়া শেষ করা যায়—কিন্তু অগণ্য ব্রহ্মাণ্ডের গণনার শেষ হয় না—

সংখ্যা চেৎ রজসাম্ অস্তি বিশ্বেষাং ন কদাচন।

ঋষিরা বলেন, প্রত্যেক সৌরমণ্ডলের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ঈশ্বর বা Solar Logos আছেন—ইঁহারা প্রত্যেকে ত্রিমূর্তি বা Trinity—তিনেই এক, একেই তিন।

প্রতিবিশ্বেষু সন্ত্যেব ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ।

কিন্তু এই সমস্ত ঈশ্বরের উপর এক জন মহেশ্বর পরমেশ্বর আছেন—তিনিই Central বা Supreme Logos—অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর—জগদণ্ডচয়া যদন্তঃ—তিনি অগণ্য ঈশ্বরের একমাত্র ঈশ্বর—এক এব মহেশ্বরঃ।

তম্ ঈশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্—শ্বেতাশ্বতর

ইনিই বেদান্তের পরব্রহ্ম—একমেবাদ্বিতীয়ম্—বৈষ্ণব পরিভাষায় কারণার্ণবশায়ী বা গোলোকপতি।

এখন প্রশ্ন এই—শ্রীকৃষ্ণ যদি অবতার, তবে কাঁহার অবতার—বিষ্ণুর, মহাবিষ্ণুর, না মহেশ্বরের? এ সম্পর্কে শাস্ত্রগ্রন্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বিভ্রান্ত হইতে হয়।

আমরা দেখি, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ নিজের পরিচয় দিতে বলিয়াছেন :—

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদ্ অস্তি ধনঞ্জয়!
ময়ি সর্বম্ ইদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥—৭।৭

"আমা হতে পরতর নাহি কিছু ধনঞ্জয়!
আমাতে গ্রথিত বিশ্ব সূত্রে যথা মণিচয়।"

সভাপর্বে ভীষ্মদেবের মুখে শুনি—

কৃষ্ণ এব হি লোকানাম্ উৎপত্তিরপি চাব্যয়ঃ।
কৃষ্ণস্য হি কৃতে বিশ্বম্ ইদং ভূতং চরাচরম্ ॥—২৮।২৩

"শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত লোকের অব্যয় উৎস—তাঁহা হইতেই এই চরাচর বিশ্ব।"

ভীষ্মপর্বে ব্রহ্মার উক্তি এই :—

এতৎ পরমকং ব্রহ্ম এতৎ পরমকং যশঃ।
এতদ্ অক্ষরম্ অব্যক্তম্ এতদ্ বৈ শাশ্বতং মহঃ ॥—৬৬।৬

"কৃষ্ণই পরম ব্রহ্ম, কৃষ্ণই পরম যশঃ (glory), কৃষ্ণই অব্যক্ত অক্ষর, কৃষ্ণই সনাতন তেজঃ।"

এক কথায়, শ্রীকৃষ্ণ মহেশ্বর, পরমেশ্বর—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।

আবার দেখিতে পাই, শ্রীকৃষ্ণকে সূর্য-নারায়ণ বা Solar Logos-এর সহিত অভিন্ন বলা হইতেছে—

যশ্চ নারায়ণো নাম দেবদেবঃ সনাতনঃ।
তস্যাংশো মানুষেষ্বাসীৎ বাসুদেবঃ প্রতাপবান্॥

—মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ৬৭।৭১

—'যিনি দেবদেব সনাতন নারায়ণ, তাঁহারই অংশ নরলোকে প্রতাপশালী বাসুদেব হইলেন।'

অর্থাৎ এ মতে শ্রীকৃষ্ণ মহাবিষ্ণু—সূর্য-নারায়ণ (Solar Logos)।

অন্যত্র দেখিতে পাই, শ্রীকৃষ্ণকে বিষ্ণু বা Planetary Logos বলা হইতেছে—

তথৈব ভৃগুশাপাদ্ বৈ ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ।
অংশেন ভবিতা তত্র বসুদেবসুতো হরিঃ॥—দেবীভাগবত।

—'ভগবান্ অব্যয় বিষ্ণু ভৃগুশাপে অংশের দ্বারা বসুদেবপুত্র হইবেন।'

সে জন্যই প্রশ্ন করিতেছিলাম—শ্রীকৃষ্ণ কাঁহার অবতার—বিষ্ণুর, মহাবিষ্ণুর, না মহেশ্বরের?

সমস্যা আরও ঘনীভূত হয়—যখন শাস্ত্রগ্রন্থের অনেক স্থলে দেখি, শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণ-ঋষির সহিত অভিন্ন বলা হইতেছে—সেই নারায়ণ-ঋষি, যিনি সত্য যুগে সখা নর-ঋষির সহিত বদরিকাশ্রমে দশ সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন।

নরস্ত্বং পূর্বদেহে বৈ নারায়ণসহায়বান্।
বদর্য্যাং তপ্তবান্ উগ্রং তপো বর্ষাযুতান্ বহূন্॥

—মহাভারত, বনপর্ব, ৪০।১

বঙ্কিমচন্দ্র এ বিষয় লক্ষ্য করেন নাই, কিন্তু পাঠককে লক্ষ্য করিতে বলি।

ভীষ্মপর্বে দেখা যায়, ভীষ্মদেব শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

নরনারায়ণৌ যৌ তৌ পুরাণৌ পুরুষোত্তমৌ।
সহিতৌ মানুষে লোকে সংভূতাবমিতদ্যুতী॥—ভীষ্মপর্ব্ব, ৬৬।১১

—'সেই পুরাতন অমিততেজাঃ ঋষিশ্রেষ্ঠ নরনারায়ণ সম্প্রতি (দুষ্ট বধের জন্য) মনুষ্যলোকে (কৃষ্ণার্জুন-রূপে) আবির্ভূত হইয়াছেন।'

উদ্যোগপর্বেও এই কথার উল্লেখ আছে—

বাসুদেবার্জুনৌ বীরৌ সমবেতৌ মহারথৌ।
নরনারায়ণৌ দেবৌ পূর্বদেবাবিতি শ্রুতিঃ॥
অজেয়ৌ মানুষে লোকে সেন্দ্রৈরপি সুরাসুরৈঃ।
এষ নারায়ণঃ কৃষ্ণঃ ফাল্গুনশ্চ নরঃ স্মৃতঃ।

—'মহারথ বীর কৃষ্ণার্জুন সেই পূর্ব-দেব নরনারায়ণ। তাঁহারা সংযুক্ত হইলে ইন্দ্রের সহিত সমস্ত দেবাসুরেরও অজেয়। সেই নারায়ণ ঋষি শ্রীকৃষ্ণ এবং নরঋষি অর্জুন।'

নরনারায়ণৌ যৌ তৌ তাবেবার্জুনকেশবৌ।
বিজানীহি মহারাজ! প্রবীরৌ পুরুষর্ষভৌ।—উদ্‌যোগ পর্ব্ব, ৯৬।৪৬

—'এই যে বীরোত্তম পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ, ইঁহারা সেই নর ও নারায়ণ ঋষি।'

ঐ উদ্‌যোগ পর্ব্বের অন্যত্র শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন :—

নরস্ত্বমসি দুর্দ্ধর্ষো হরির্নারায়ণো হ্যহম্।
কালে লোকমিমং প্রাপ্তৌ নরনারায়ণাবৃষী॥

—'হে অর্জুন! তুমি দুর্দ্ধর্ষ নর, আমি নারায়ণ হরি। আমরা সেই নারায়ণ ঋষি, কালক্রমে এই ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছি।'

এই সকল উক্তি হইতে জানা যায় যে, যুগ-প্রয়োজনে নর-ঋষি অর্জুনের দেহে আবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং নারায়ণ-ঋষি শ্রীকৃষ্ণরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাই যদি হয়, তবে শ্রীকৃষ্ণ অবতার হইলেন কিরূপে?

এ সকল আপাত-বিরোধী মতের সমন্বয় কি? শ্রীকৃষ্ণকে একই নিশ্বাসে যে বিষ্ণু, মহাবিষ্ণু ও মহেশ্বর বলা হইল, তাহারই বা সমাধান কি? এ প্রশ্নের আমি আমার 'অবতারতত্ত্ব' গ্রন্থে যথাসাধ্য আলোচনা করিয়াছি এবং আদরের সহিত, বৈকুণ্ঠগত পূর্ণেন্দু-নারায়ণ সিংহের 'চৈতন্যকথা' হইতে ঐ ভক্তপ্রবরের মত উদ্ধৃত করিয়াছি :—

কোথায় গোলোকপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, আর কোথায় আমাদের এই মর্ত্ত্যলোক। এই মর্ত্ত্যলোকে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ কি সহজ কথা?...তাই ঋষির মধ্যে মহাঋষি, জগতের হিতাকাঙ্ক্ষী, ত্রিজগতের গুরু অর্দ্ধ-মনুষ্য, অর্দ্ধ-দেবতা নারায়ণ ঋষির অপেক্ষা। শ্রীকৃষ্ণের অন্নময় কোষ (physical vehicle) নারায়ণ-ঋষি। জন্মের সময়েও তিনি নারায়ণ-ঋষি এবং অন্তর্ধানের সময়েও তিনি নারায়ণ-ঋষি। বৃন্দাবনলীলায় তিনি গোলোকপতি শ্রীকৃষ্ণ। মথুরালীলায় তিনি শ্বেতদ্বীপপতি বিষ্ণু এবং দ্বারকালীলায় তিনি শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ নারায়ণ।

পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহের এই কথাগুলি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি, শ্রীকৃষ্ণরূপধারী নারায়ণ-ঋষির শরীরে যে ঐশ তেজের আবেশ হইত, তাহারও তারতম্য ছিল। মোটামুটি, মথুরালীলায় তিনি যে তেজঃ ধারণ করিতেন, তাহা বিষ্ণুর তেজঃ; দ্বারকালীলায় তিনি যে তেজঃ ধারণ করিতেন, তাহা মহাবিষ্ণুর তেজঃ, এবং বৃন্দাবনলীলায় তিনি যে তেজঃ ধারণ করিতেন, তাহা মহেশ্বরের তেজঃ। অধিকন্তু ঐ তেজেরও আবির্ভাব তিরোভাব ঘটিত—'যোগো হি প্রভবাপ্যয়ৌ।'

এই যে আবেশ—ইহার পাশ্চাত্য নাম control বা possession।*

বলা বাহুল্য, নারায়ণ ঋষি—যিনি শ্রীকৃষ্ণ অবতারের পার্থিব উপাধি—তিনি ভগবানের 'সাধর্ম্যম্ আগতঃ' সিদ্ধ পুরুষ—"Perfect as our Father in Heaven is perfect" :—

* এই আবেশ কিরূপে সিদ্ধ হয়, "বঙ্কিমচন্দ্রের অবতারতত্ত্ব" প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিব

তাঁহাতে ভগবানের সৎ-ভাব, চিৎভাব ও আনন্দ ভাব, তাঁহার সন্ধিনী, হ্লাদিনী ও সম্বিৎ-শক্তি, তাঁহার প্রতাপ, প্রজ্ঞা ও প্রেম পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত—বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় তাঁহার সমস্ত মানবিক বৃত্তি—কি শারীরিকী, কি জ্ঞানার্জনী, কি কার্য্যকারিণী, কি চিত্তরঞ্জিনী—সম্পূর্ণ স্ফূর্ত অথচ সমঞ্জস—এক কথায় তিনি আদর্শ মানব—শুদ্ধ, পূত, অপাপবিদ্ধ। সে জন্যই তিনি কৃষ্ণাবতারে ঐশ তেজের বাহন হইতে পারিয়াছিলেন। অন্যথা শৌণ্ডিকের ভাণ্ড কি স্বর্গসুধার ভাজন হইতে পারে?

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব এই ভাবে বুঝিলে সকল দ্বন্দ্ব মিটিয়া যায় এবং আমরা বুঝিতে পারি, কেন ভীষ্মপর্বে ব্রহ্মা কৃষ্ণ সম্পর্কে বলিতেছেন—

তং যোগিনং মহাত্মানং প্রবিষ্টং মানুষীং তনুম্।*
অবমন্যেৎ বাসুদেবং তম্ আহুঃ তামসং জনাঃ। —৬৬।২০

আরও বুঝিতে পারি, কেন শাস্ত্রগ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণকে এক নিশ্বাসে নারায়ণ-ঋষি এবং বিষ্ণু, মহাবিষ্ণু ও মহেশ্বর বলা হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র ঠিকই বলিয়াছেন, সাধারণতঃ (ordinarily) শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্য বটেন, তবে আদর্শ মানব—কারণ, সচরাচর তিনি নারায়ণ ঋষি এবং মনুষ্যভাবে কার্য্য করেন—কিন্তু সময় সময় যখন ঐ 'মানুষী তনু'তে বিষ্ণু, মহাবিষ্ণু বা মহেশ্বরের তেজঃ প্রবিষ্ট হয়—যেমন গীতায় বিশ্বরূপ প্রদর্শনের সময় কিংবা ভাগবতে ব্রহ্মমোহনের সময়—তখন তিনি ভগবান্—কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।

এ কথা হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য অবতারতত্ত্ব বোঝা প্রয়োজন। অতএব আগামী বারে অবতারতত্ত্বের আলোচনা করিব।

* রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের প্রসঙ্গেও আমরা শুনিতে পাই :—
বধার্থং রাবণস্যেহ প্রবিষ্টো মানুষীং তনুম্।—যুদ্ধকাণ্ড, ১১৯।২৭

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

খ্যাতনামা স্মার্ত্ত, ব্রাহ্মসমাজের প্রথম আচার্য্য, এবং বাঙালীদের মধ্যে প্রথম বাংলা অভিধানকার হিসাবে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নাম আমাদের নিকট স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে এখনও কেহ বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। সেকালের সাময়িক-পত্রাদি ও কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পুরাতন নথিপত্র হইতে তাঁহার কথা যেটুকু জানিতে পারিয়াছি, এখানে তাহারই আলোচনা করিব।

বাল্য ও ছাত্রজীবন

বিদ্যাবাগীশের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে—১৮৪৫ সনের এপ্রিল মাসে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় তাঁহার একটি সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়। তাহাতে তাঁহার বাল্য ও ছাত্রজীবন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণটি পাওয়া যায়ঃ—

> মহাত্মা শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ১৭০৭ শকের ২৯ মাঘ বুধবারে পালপাড়া* নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ তর্কভূষণের চারি পুত্র; জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার, তিনি গার্হস্থ্য আশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিলে হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী কুলাবধৌতা নামে খ্যাত ছিলেন; মধ্যম পুত্রের নাম রামধন বিদ্যালঙ্কার, তিনি স্মৃতি শাস্ত্রে উৎকৃষ্ট রূপে ব্যুৎপন্ন ছিলেন, এবং আপন গৃহেতেই অধ্যাপনা করিতেন; তৃতীয় পুত্রের নাম রামপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য; এবং শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় সর্ব্ব কনিষ্ঠ ছিলেন।
>
> বিদ্যাবাগীশ মহাশয় ব্যাকরণাদি ব্যুৎপত্তি শাস্ত্র স্বীয় গ্রামেই অধ্যয়ন পূর্ব্বক কাশী প্রভৃতি পশ্চিমাঞ্চলের নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। পরন্ত প্রত্যাগমনানন্তর প্রায় পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমে শান্তিপুরস্থ রামমোহন বিদ্যাবাচস্পতি গোস্বামি ভট্টাচার্য্যের নিকটে স্মৃত্যাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।
>
> পরন্ত হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী† দেশ পর্য্যটন করত রঙ্গপুরে উপস্থিত হইয়া তত্রস্থ কালেক্টরির দেওয়ান রাজা রামমোহন রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলে রাজা তাঁহার শাস্ত্র চর্চ্চা বিষয়ে অত্যন্ত আমোদ প্রযুক্ত তীর্থস্বামিকে মহা সমাদর পূর্ব্বক আহ্বান করিলেন।···রামমোহন রায়··· তীর্থস্বামিকে সমভিব্যাহারি করিয়া ১৭৩৪ শকে [১৮১৪ ?] কলিকাতা নগরে আগমন করিলেন। এই কালে বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের অন্য অন্য ভ্রাতারা তাঁহার প্রতি অনেক প্রকার বিরাগ প্রকাশ করাতে, এবং তাঁহাকে পৃথক্ করিয়া দেওয়াতে, তিনি অত্যন্ত বিপদ্‌গ্রস্ত হয়েন, এ প্রযুক্ত তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উক্ত তীর্থস্বামী রাজার নিকটে তাঁহাকে আনয়ন পূর্ব্বক সাক্ষাৎ করাইয়া দিলেন।

* শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ভুলক্রমে "মালপাড়া" লিখিয়াছেন।

† হরিহরানন্দ সম্বন্ধে ১৯৩৪ সনের 'মডার্ণ রিভিয়ু' পত্রে প্রকাশিত আমার 'Hariharananda-Nath Tirthaswami Kulabadhuta" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

বিদ্যাবাগীশ মহাশয় অতিশয় বুদ্ধিমান, এবং সংস্কৃত ভাষাতে শব্দালঙ্কারাদি ব্যুৎপত্তি শাস্ত্রে ও ধর্ম্ম শাস্ত্রে অত্যন্ত ব্যুৎপন্ন প্রযুক্ত রাজা তাঁহাকে মহা সম্ভ্রম পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। তিনি ঐ রাজার ইচ্ছানুসারে তাঁহার সমভিব্যাহারি শিবপ্রসাদ মিশ্র নামক এক জন বুৎপন্ন পণ্ডিতের নিকটে উপনিষৎ ও বেদান্ত দর্শনাদি মোক্ষ প্রয়োজক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং তাঁহার স্বাভাবিক উজ্জ্বল মেধা বশতঃ অত্যল্প কাল মধ্যে উক্ত শাস্ত্রে অসাধারণ সংস্কারাপন্ন হইলেন। প্রথমতঃ তিনি বঙ্গভাষাতে এক অভিধান* ও জ্যোতিঃ শাস্ত্রের একখণ্ড প্রকাশ করেন, এবং তাহা বিক্রয় দ্বারা কিঞ্চিৎ ধন সংগ্রহ পূর্ব্বক পরিবারের বাসের জন্য শিমুলিয়াস্থ হেদুয়া পুষ্করিণীর উত্তরে এক বাটী ক্রয় করেন। পরন্তু তিনি রাজার নিকটে ক্রমশঃ অতিশয় প্রতিপন্ন হইয়া তাঁহার বিশেষ আনুকূল্য দ্বারা হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণে এক চতুষ্পাঠী সংস্থাপন পূর্ব্বক কয়েক জন ছাত্রকে বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান এপ্রকার উজ্জ্বল হইল, যে সাকার উপাসকদিগের সহিত রাজার যে সকল শাস্ত্রীয় বিচার উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে তিনিই প্রধান সহযোগী ছিলেন—রাজা তাঁহার পরামর্শ ব্যতীত কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতেন না। এবম্প্রকার ধর্ম্ম চর্চা জন্য তিনি ক্রমশঃ অত্যন্ত মান্য ও বিখ্যাত হইয়া উঠিলেন।—'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা,' ১ বৈশাখ ১৭৬৭ শক।

ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণটি পাওয়া যায়:—

রাজা রামমোহন রায়ের বিশেষ যত্ন দ্বারা মাণিকতলাতে ব্রহ্মোপাসনা জন্য ক্ষুদ্র আকারে আত্মীয় সভা নাম্নী এক সভা সংস্থাপিতা হয়, তাহাতে বিদ্যাবাগীশ মহাশয় ব্রহ্ম জ্ঞান বিষয়ক ব্যাখ্যান করিতেন। পরে যখন ১৭৫১ শকের ১১ মাঘ দিবসে ব্রাহ্মসমাজ যোড়াসাঁকোস্থ বর্ত্তমান গৃহে স্থাপিত হইল, তখন তিনি তাহার এক জন অধ্যক্ষ হইলেন, এবং তত্ত্ববিদ্যা বিষয়ক ব্যাখ্যান দ্বারা স্বদেশস্থ লোকদিগকে ব্রহ্মোপাসনার উপদেশ প্রদান করিতে নিযুক্ত হইলেন।†…বিদ্যাবাগীশ মহাশয় যদিও তাঁহার তাবৎ জীবন পর্য্যন্ত সাধারণ রূপে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের জন্য যত্নশীল ছিলেন, কিন্তু তাঁহার চিত্তে ইহা সর্ব্বদা জাগ্রৎ ছিল, যে বিধিবৎ প্রতিজ্ঞার সহিত ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ না করিলে সে ধর্ম্মের স্থৈর্য্য হইতে পারে না, এবং তদনুসারে পূর্ব্বে একবার রাজা রামমোহন রায়ের সহযোগী হইয়া এই রূপ বিধিবৎ ব্রহ্মোপাসনা লোকদিগকে উপদেশ করিবার জন্য উদ্যোগ

* ১৮২০ সনে 'বঙ্গভাষাভিধান' নামে বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের অভিধান বর্দ্ধিত আকারে দ্বিতীয় বার প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণের স্বত্ব তিনি কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটিকে তিন শত টাকায় বিক্রয় করিয়াছিলেন। সোসাইটির চতুর্থ বর্ষের (১৮২০-২১) কার্য্যবিবরণের শেষে মুদ্রিত আয়ব্যয়ের হিসাবে ব্যয়-বিভাগের একটি দফা এই:—

Ram Chundro's Remuneration,
(including 120 Copies of his Obhidhan) ··· 300 0 0

এই অভিধান-প্রসঙ্গে পাদরী লং তাঁহার বাংলা পুস্তকের তালিকায় লিখিয়াছেন, "The author was a Pandit connected with the Calcutta School Book Society."

† আত্মীয় সভা ও ব্রহ্মসভা সম্বন্ধে যাঁহারা জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা ১৯৩৫ সনের 'মডার্ণ রিভিয়ু'তে প্রকাশিত আমার "Societies founded by Rammohun Roy for Religious Reform" প্রবন্ধ পাঠ করিতে পারেন।

করিয়াছিলেন ; কিন্তু তৎকালে অজ্ঞানের প্রাবল্য ও দ্বেষের আধিক্য প্রযুক্ত কেহ তদ্বিষয়ে সাহসী হইলেন না। সম্প্রতি যখন জ্ঞান বলে লোকের মন সত্য ধর্ম্ম গ্রহণের উপযুক্ত হইতেছে, তখন তিনি তাঁহার মানস সফল হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া আচার্য্য রূপে বেদান্ত শাস্ত্রের সারার্থানুসারে বিধি পূর্ব্বক এই ব্রাহ্মধর্ম্ম এদেশে প্রচার করিবার জন্য ১৭৬৫ শকের ৭ পৌষ বৃহস্পতিবার দিবা দুই প্রহর তিন ঘণ্টার সময়ে প্রথমতঃ একবিংশতি ব্যক্তিকে উক্ত ধর্ম্মে প্রবিষ্ট করিলেন, এবং তজ্জন্য ব্রাহ্মদিগের সম্মুখে যে মহানন্দ ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহা অনেক ব্রাহ্মেরই হৃদয়ঙ্গম আছে।—'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', ১ বৈশাখ ১৭৬৭ শক।

বিদ্যাবাগীশ মহাশয় উদারমতাবলম্বী ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূর্ব্বেই তিনি বিধবা-বিবাহের সপক্ষে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। বিদ্যাবাগীশের মৃত্যুর পর এক জন পত্রলেখক ১১ মার্চ ১৮৪৫ তারিখের *Bengal Harkaru and India Gazette* পত্রে লেখেন :—

> The liberal *viavustha* which he recently gave regarding the re-marriage of Hindoo widows, on the application of the Bengal British India Society, should rank him at the head of Hindoo reformers.

কিন্তু বিদ্যাবাগীশ মহাশয় সহমরণ-প্রথাকে শাস্ত্রীয় বলিয়া সমর্থন করিয়াছিলেন। ১৮২৯ সনের ডিসেম্বর মাসে গবর্ণর-জেনারেল বেণ্টিঙ্ক সহমরণ-প্রথার বিরুদ্ধে আইন জারি করিলে ঐ আইন রহিত করিবার জন্য যে আবেদনপত্র রাজদরবারে প্রেরিত হয়, তাহাতে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ লোকভয়প্রযুক্ত তিনি এরূপ করিয়া থাকিবেন ;—বিশেষতঃ এই সময় তিনি সংস্কৃত কলেজের স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক, তাঁহার সহকর্ম্মী অধ্যাপকদের অনেকেই সহমরণ-প্রথার অনুকূলে ছিলেন। ইহার ফলে তাঁহাকে রামমোহনের বিরাগভাজন হইতে হইয়াছিল।

কর্ম্মজীবন

কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজ

১৮২৭ সনের এপ্রিল মাসে পণ্ডিত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ২৪-পরগণা জিলা-আদালতের জজ-পণ্ডিত নিযুক্ত হওয়ায়, কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। এই পদে এক জন যোগ্য অধ্যাপক নিযুক্ত করিবার জন্য কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষ বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ এই পদের জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। পনর জন প্রার্থীর মধ্যে তিনিই পরীক্ষায় সর্ব্বাংশে উপযুক্ত বিবেচিত হন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয় ১৪ মে ১৮২৭* তারিখ হইতে মাসিক ৮০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁহার নিয়োগ-সম্পর্কে সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন সেক্রেটরী উইলিয়ম প্রাইসের নিম্নলিখিত মন্তব্যটি উদ্ধৃত করিবার যোগ্য :—

*'Abstract of Salaries and Establishment of the Calcutta Government Sanscrit College on 1st May 1835. ইহাতে "Date of Appointment" স্থলে রামচন্দ্রের নিয়োগের এই তারিখ দেওয়া আছে।

...a public notification was issued, inviting the attendance of candidates at the Sanscrit College, for the purpose of undergoing an examination as to their respective qualifications for the office, as well as for obtaining certificates of proficiency as Pundit of the Court, the examination to be conducted by the Commitee appointed by Government to determine the fitness of candidates for public appointment. Fifteen individuals accordingly came forward on the occasion and they were duly examined by Mr. Wilson and myself orally and wrote written answers to Law questions in our presence. These exercises having been circulated to the other members of the Commitee, and compared with the result of the oral examination, the Members concur in considering Ramchandra Vidyavageesha as eminently qualified for the situation and the Secretary begs therefore to recommend him as a fit person to succeed to the appointment of Smriti Professor in the Sanscrit College, vacated by the resignation of Kasinatha. 16th May 1827.

বিদ্যাবাগীশের পদচ্যুতি

রামচন্দ্র দশ বৎসর সংস্কৃত কলেজে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। তাহার পর একটি অভাবনীয় ব্যাপারে তিনি পদচ্যুত হন। ব্যাপারটি সংক্ষেপে এই :—

কাশীর বিশ্বম্ভর পণ্ডিতের জমিদারী-সংক্রান্ত একটি মামলায়, গবর্মেণ্ট ১৮৩৬ সনের ১লা আগষ্ট দুইটি প্রশ্ন পাঠাইয়া তৎসম্বন্ধে সংস্কৃত কলেজের স্মৃতিশাস্ত্রাধ্যাপকের অভিমত বা ব্যবস্থাপত্র চাহিয়া পাঠান। পরবর্ত্তী ১৫ই আগষ্ট তারিখে রামচন্দ্র যথারীতি ব্যবস্থাপত্র দেন; এই ব্যবস্থাপত্রে সংস্কৃত কলেজের অন্যান্য পণ্ডিতবর্গেরও স্বাক্ষর ছিল।

এই ব্যবস্থাপত্র সকৌন্সিল গবর্ণর-জেনারেলের নিকট ভ্রমাত্মক বিবেচিত হওয়ায়, বিদ্যাবাগীশকে স্মৃতিশাস্ত্রাধ্যাপকের পদ হইতে অপসারিত করাই সাব্যস্ত হয়। তদনুসারে ১৩ মার্চ ১৮৩৭ তারিখে ভারত-গবর্মেণ্টের সেক্রেটরী ম্যাকনটেন (*W. H. Macnaghten*) বাংলা-সরকারের সেক্রেটরীকে যাহা লিখিয়া পাঠান, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা হইল :—

In the opinion of the Governor General of India in Council the whole of the Pundits of the Sanscrit College who had signed the Vyavastah deserved to be removed from the College, but as they are not professors of the science of Law and as their offence may have amounted to nothing more than carelessness in testifying the accuracy of the opinion which has since been proved to be erroneous, it may be sufficient as an example that the professor of Law, Ramchandar Surmona be expelled, and that the rest be admonished as to the impropriety of their conduct.

কর্ত্তৃপক্ষের এই আদেশ যথাসময়ে বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে বিজ্ঞাপিত করিয়া তাঁহাকে কর্ম্ম হইতে বরখাস্ত করা হয়। সংস্কৃত কলেজের কর্ম্মচারীদের মাহিনার খাতায় প্রকাশ, বিদ্যাবাগীশ মহাশয় ১৮৩৭ সনের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত মাহিনা পাইয়াছিলেন।

১৮ মে ১৮৩৭ তারিখে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ইংরেজীতে একখানি সুদীর্ঘ আবেদনপত্র গবর্ণর-জেনারেলের কাউন্সিলে পেশ করিয়াছিলেন; ইহাতে তিনি নিজের ব্যবস্থাপত্র যে নির্ভুল, তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্য পূর্ব্বগামী বহু পণ্ডিতের—এমন কি, উইলসন সাহেবের নজীরের উল্লেখ করেন। তিনি আরও জানাইয়াছিলেন :—

That this order in Council was carried into effect on the 1st instant, and copies of the correspondence forwarded to your memorialist on the 12th instant by the College Secretary, and that your memorialist was thus expelled from the Institution, thrown out of employ, and degraded in the estimation of Society, without the erroneousness of his opinion having been pointed out to him or an opportunity afforded for his conviction, or for enabling him to justify himself before the Supreme authority by furnishing such explanations as might have been required.

এই আবেদনপত্রে কোন ফল হয় নাই। এ-সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত উদ্ধৃত করিতেছি :—

READ an extract from the General Dept. No. 74 dated the 21 June last transferring for consideration Petitions of the Dismissed Pundits of the Benares and Sanscrit Colleges praying restoration to office.

RESOLUTION : On a full and careful reconsideration of all the opinions which have been delivered in this case the Right Honble the Governor General of India in Council is of opinion that they afford a strong preponderating evidence, amounting to presumptive proof that the dismissed Pundits were actuated by corrupt motives in the exposition of the Law on the point submitted for their opinion. His Lordship in Council accordingly resolves that their petitions be rejected.—Extract from the Proceedings of the Rt. Honble the Governor General in Council in the Revenue Dept. under date the 25 Septr. 1837.

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের পদচ্যুতির কারণ সম্বন্ধে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' বলেন :—

রাজা রামমোহন রায়ের সহিত কোন কোন ইংরাজের অপ্রণয় থাকাতে তিনি এক ব্যবস্থা উপলক্ষে রাজার সহযোগি বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের প্রতি অনর্থক অপবাদ প্রদান করিয়া তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করাইলেন।—'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা,' ১ বৈশাখ ১৭৭১ শক।

দুইটি কারণে এই মন্তব্য ভিত্তিহীন বলিয়াই মনে হয়। প্রথমতঃ, রামচন্দ্রের পদচ্যুতির সাত বৎসর পূর্ব্বে রামমোহন বিলাত যাত্রা করেন এবং তথায় ১৮৩৩ সনে তাঁহার মৃত্যু হয়। দ্বিতীয়তঃ, পণ্ডিতদের ব্যবস্থাপত্র-সম্পর্কে কেবলমাত্র রামচন্দ্রই পদচ্যুত হন নাই—পরন্তু কাশী সংস্কৃত কলেজের কয়েক জন পণ্ডিতেরও চাকরি গিয়াছিল।

এই সংক্রান্ত নথিপত্র পড়িয়া আমার ধারণা হইয়াছে, বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের প্রতি গবর্মেণ্ট সুবিচার করেন নাই। তাঁহার অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁহার ব্যবস্থাপত্রের ত্রুটি তাঁহাকে দেখাইয়া দেওয়া হয় নাই;—তাঁহাকে আত্মপক্ষ-সমর্থনের সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল।

রামচন্দ্র শেষ-পর্য্যন্ত সুবিচার লাভের আশায় বিলাতে কোর্ট অব ডিরেক্টর্সের নিকট

আবেদন করিয়াছিলেন। বিলাতের কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় তিনি নিরপরাধী সাব্যস্ত হন। কিন্তু পূর্ব্বপদ* আর তিনি ফিরিয়া পান নাই; তাঁহাকে জানান হইয়াছিল যে, ভবিষ্যতে কোন পদ শূন্য হইলে অগ্রে তাঁহার বিষয় বিবেচনা করা হইবে।†

যে-ব্যবস্থাপত্র লইয়া এত কাণ্ড, তাহা পাঠ করিবার জন্য অনেক পণ্ডিতের কৌতূহল হইতে পারে। এই প্রবন্ধের পরিশিষ্টে প্রশ্ন দুইটি-সমেত ব্যবস্থাপত্রখানি মুদ্রিত হইল।

হিন্দুকলেজ পাঠশালা

১৮৩৯ সনের জুন মাসে হিন্দুকলেজ-সংলগ্ন বাংলা পাঠশালার ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপিত হয়। হিন্দুকলেজের অধ্যক্ষগণ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশকে এই পাঠশালার প্রধান অধ্যাপকের পদে নির্ব্বাচিত করেন। ১৮ জানুয়ারি ১৮৪০ তারিখে এই পাঠশালার পাঠারম্ভকালে বিদ্যাবাগীশ মহাশয় বাংলায় একটি বক্তৃতা করেন। ইহা পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল, কিন্তু এদেশে কুত্রাপি ইহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়মে ইহার একটি খণ্ড রক্ষিত আছে। তাহার সম্পূর্ণ ফোটো-প্রতিলিপি সম্প্রতি আনাইয়াছি; স্থানাভাবে বক্তৃতাটির কিয়দংশ মাত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

> সভাস্থ মহাশয়দিগের মধ্যে যাঁহাদিগকে উপস্থিত দেখিতেছি তাঁহারা অনেকে পাঠশালার শিলারোপণের দিবস উপস্থিত ছিলেন, অদ্য পাঠারম্ভকালেও তাঁহারা এবং অন্যান্য মান্য বিজ্ঞ ধনাঢ্য বহুতর মহাশয়রা অধিষ্ঠিত আছেন এবং অস্মদ্দেশাধিপতি ইংলণ্ডীয় রাজকর্ম্মকারকেরা ও অন্যান্য ইংলণ্ডীয় মহানুভব মহাশয়রা এই সভাতে উপস্থিত থাকাতে অস্মদ্দেশীয় লোকদিগের বিশেষ আহ্লাদ জন্মিতেছে, যেহেতু ইংলণ্ডাধিকৃত ভারতবর্ষীয় লোকদিগের মধ্যে কতিপয় লোকের এরূপ সংস্কার ছিল, যে রাজ্যাধিপতির স্বজাতীয় ভাষা প্রচারে যাদৃশ উদ্যোগ অনুরাগ এবং রাজস্বব্যয়, গৌড়ীয়-ভাষার প্রতি তাদৃশ নাই কিন্তু এইক্ষণে হিন্দুকালেজের অন্তঃপাতি এতৎ পাঠশালাসংস্থাপনে তাঁহাদিগের উৎসাহ এবং সাহায্য প্রদান দর্শনে ঐ ব্যক্তিদিগের পূর্ব্বসংস্কারের নিবৃত্তির সম্ভাবনা, যেহেতু তাহারদিগের এইক্ষণে অবশ্যই প্রতীতি হইবেক যে মহানুভব ইংলণ্ডীয় মহাশয়দিগের কদাচ এমত অভিপ্রায় নহে যে লোকোপকারিবিদ্যা কেবল তাঁহাদিগের স্বদেশীয় ভাষার অধীনে রাখেন, কারণ বিদ্যা এবং তৎসম্বন্ধি সংস্কার অন্তঃকরণের ধর্ম্ম, ভাষা সেই বিদ্যার বাহকস্বরূপ হইয়া মনেতে সংস্কার জন্মাইবার সাধন মাত্র, অতএব যে কোন ভাষা উক্ত সংস্কারজননে সক্ষম অথচ

* রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ পদচ্যুত হইলে তাঁহার স্থলে সংস্কৃত কলেজের প্রথম ব্যাকরণ-শ্রেণীর অধ্যাপক হরনাথ তর্কভূষণ ১৮৪০ সনের নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত অস্থায়ী ভাবে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী ডিসেম্বর মাস হইতে ভরতচন্দ্র শিরোমণি মাসিক ৮০৲ বেতনে স্মৃতিশাস্ত্রাধ্যাপক নিযুক্ত হন। ভরতচন্দ্র ১৮৩০-৩৭ সন পর্য্যন্ত হিন্দু আইন পরীক্ষা কমীটির পণ্ডিত, ১১ ডিসেম্বর ১৮৩৭ হইতে ২ নবেম্বর ১৮৩৯ পর্য্যন্ত সারণ জিলা-কোর্টের জজপণ্ডিত, এবং তৎপরে বর্দ্ধমান জিলা-কোর্টের জজপণ্ডিত ছিলেন।

† রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের পদচ্যুতি সম্পর্কে সমস্ত নথিপত্র কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে আছে। এ-সম্বন্ধে বিলাতের কর্তৃপক্ষের আদেশাদি ভারত-গবর্মেণ্টের দপ্তরে দেখিয়াছি (Public Dept. Procdgs. 5 Aug. 1840, Nos. 17, 18, 20; 19 Aug. 1840.)

অনায়াসলভ্য তাহাই লোকের বিদ্যার্জনের কারণ হইতে পারে, বিশেষত প্রাচীন ইতিহাস ও লৌকিকপ্রত্যক্ষ যুক্তি সাহায্যে বিবেচনা করিলে এমৎ কদাচ সম্ভব হয় না যে ইংলণ্ডাধিকৃত ভারতবর্ষ যাহার পরিমাণ প্রায় দুই লক্ষ ছাব্বিশ হাজার চতুরস্রক্রোশ, এবং যাহাতে প্রায় দশকোটি মনুষ্য বাস করিতেছে, এবং যদ্দেশীয়ব্যক্তিরা স্ব২ ভাষাতে লৌকিককর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছে, এতাদৃশ প্রশস্ত রাজ্যের উক্তসংখ্যক লোকেরা কেবল ইংলণ্ডীয়ভাষাবলম্বনে বিদ্যোপার্জ্জন করিয়া সভ্যতা প্রাপ্তি পূর্ব্বক কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হইবেক।

* * *

সংস্কৃতভাষাবলম্বন না করিয়া গৌড়ীয়ভাষাতে বিদ্যা এবং দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা দেওনের প্রয়োজন এই যে সংস্কৃত প্রচলিত লৌকিকভাষা নহে, কিন্তু শাস্ত্রীয়ভাষা এবং অতিশয় কঠিন, ও তদুপার্জ্জন বহুকাল ও বহুপরিশ্রমসাধ্য, অতএব দেশান্তরীয়ভাষাতে সাধারণের বিদ্যা উপার্জ্জনে যেরূপ ব্যাঘাত এবং তজ্জন্য দোষ, তাহা সকল সংস্কৃতভাষার অবলম্বনে বর্ত্তিবার সম্ভাবনা, একারণ দেশস্থ-সাধারণের বিজ্ঞতাকাঙ্ক্ষী হইলে প্রচলিত ভাষার অবলম্বন ব্যতিরেকে অভীষ্টসিদ্ধি হইতে পারে না, এইহেতু এতৎপাঠশালাস্থ ছাত্রদিগকে গৌড়ীয়ভাষাদ্বারা বিদ্যোপার্জ্জন করান যাইবেক, অর্থাৎ যে ভাষা তাহারা মাতৃক্রোড়াবধি লালন পালনদ্বারা অভ্যাস করিয়া তদ্দারা জ্ঞাত পদার্থে সংস্কার প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে, অতএব ইহাতে তাহাদিগের অপ্রাপ্ত সংস্কার যে ভাষান্তর তদভ্যাসের শ্রমনিবৃত্তি হওয়াতে অনায়াসে প্রয়োজনোপযোগি বিদ্যা অভ্যাস করিবেক।

* * *

এতৎ পাঠশালাতে যে২ বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া যাইবেক তাহা কথিত হইল, এবং বালকেরা ঐ সকল বিদ্যাতে পারগ হইলে যেরূপ বিদ্বান্ হইতে পারিবেক তাহা সভাস্থ মহাশয়দিগের অবশ্য অনুভূত হইতেছে। এই গুরুতর প্রার্থনীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহের নিমিত্তে যেসকল শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন তন্মধ্যে প্রধানকর্ম্মের ভার হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা আমার প্রতি অর্পণ করিয়াছেন এবং উপযুক্ত সহকারীও দিয়াছেন আমিও আহ্লাদ পূর্ব্বক এই মহোপকারি বিষয়ের ভারগ্রহণ করিয়াছি···।

এক্ষণে আমি আশ্বাস করি যে আমার অধ্যাপকতাবস্থায় এতন্মহোপকারি আদি পাঠশালাস্থ কতিপয় ছাত্র শৈশবাবস্থায় মাতৃক্রোড়রূপ সুখশয্যাতে উপদেশব্যতিরেকে শ্রবণানুসারে যে ভাষা অভ্যাস করিয়াছে সেই ভাষাদ্বারা উৎকৃষ্ট বিজ্ঞ হয় এবং অস্মৎ শুভাদৃষ্ট বশত এই আকাঙ্ক্ষিত বিষয় সুসম্পন্ন হইলে এমত প্রত্যাশা করি যে ভারতবর্ষীয় ইতিহাসবেত্তারা স্বস্ব গ্রন্থে উক্ত বৃত্তান্ত-সম্বলিত মদীয় নাম সংকলন করিবেন।

অপর, বোধ হয় যে এতন্মহোপকারি কর্ম্ম সমাধার ভার পরমেশ্বর কর্ত্তৃক অস্মৎপ্রতি নির্দ্ধারিত ছিল এবং ইহাও তাঁহার মানস ছিল যে এতদ্দেশের পুনঃসভ্যাবস্থা মহাশয়দিগের দৃষ্টি গোচর হইবেক।

এই অভীষ্ট বিষয়ের সিদ্ধি তৎকালে হইবেক যৎকালে এতৎপ্রধান পাঠশালাহইতে সুশিক্ষিত ছাত্র ইংলণ্ডাধিকৃত ভারতবর্ষের দেশে, নগরে, গ্রামে, এবং কুটীরদ্বারে শিক্ষকরূপে প্রেরিত হইতে পারিবেক, সম্প্রতি এই সকল বাক্য মনঃকল্পিত প্রায় বোধ হইলেও ভবিষ্যদ্বাক্য যদি বিশ্বাস যোগ্য হয় তবে মদুক্ত ভবিষ্যদ্বাক্য এতৎ শকাব্দীয় শতাঙ্ক পরিবর্ত্ত হওনের পূর্ব্বে অবশ্য সুসিদ্ধ হইবেক

এবং তৎকালে ইংলণ্ডাধিকৃত ভারতবর্ষস্থ ব্যক্তিদিগের লৌকিক ও পারমার্থিক স্বাধীনতা স্বয়ং দেদীপ্যমানা হইবেক।

এক্ষণে দেশনিয়মানুসারে প্রসিদ্ধ শ্লোকের আবৃত্তি পূর্ব্বক জগদীশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতেছি।

যস্তয়াদ্বাতি বাতোহয়ং সূর্য্যস্তপতি যস্তয়াৎ।
যস্মাদ্ধিয়ঃ প্রবর্ত্তন্তে স তে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি।

যাঁহার নিয়মে বায়ু সর্ব্বদা বহিতেছেন ও যাঁহার ভয়ে সূর্য্য যথাযোগ্যকালে উত্তাপ দিতেছেন, এবং যিনি অন্তর্যামী হইয়া বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রেরণ করেন, তিনি তাবতের প্রতিপালক হউন।

কলিকাতা।
৬ মাঘ সন ১২৪৬ সাল।

শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মণঃ।
সংস্কৃত এবং গৌড়ীয়ভাষাধ্যাপকস্য
হিন্দুকালেজ পাঠশালা।

সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক

১৮৪১ সনের শেষাশেষি সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী মধুসূদন তর্কালঙ্কারের মৃত্যু হয়। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ এই শূন্য পদের জন্য আবেদন করিলে কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকেই নির্ব্বাচিত করেন।

বিদ্যাবাগীশ ১ জানুয়ারি ১৮৪২ তারিখ হইতে মাসিক ৫০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজের সহ-সম্পাদকের কর্ম্মে যোগদান করেন। এই পদে তিনি মৃত্যুকাল (২ মার্চ ১৮৪৫) পর্য্যন্ত নিযুক্ত ছিলেন।

মৃত্যু

কিছু দিন সংস্কৃত কলেজে কার্য্য করিবার পর বিদ্যাবাগীশ পীড়াগ্রস্ত হন এবং দীর্ঘকাল রোগভোগের পর তাঁহার মৃত্যু হয়। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশ :—

> তিনি ১৭৬৫ শকের মাঘ মাসে পক্ষাঘাত রোগে পীড়িত হইলেন। তদবধি ইংরাজ ও বাঙ্গালি চিকিৎসক দ্বারা অনেক প্রকার চিকিৎসা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে উপশম না হইয়া শরীর ক্রমশঃ অবসন্ন হইতে লাগিল। ইহাতে তিনি অনুভব করিলেন, যে কাশী অঞ্চলের জল বায়ু সুস্থতাদায়ক, এবং তথায় উত্তম উত্তম মোসলমান চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা হইবারও সম্ভাবনা, অতএব তিনি ১৭৬৬ শকের ৯ ফাল্গুণ বুধবার দিবা নয় ঘণ্টার সময়ে কাশী যাত্রা করিলেন। কিন্তু তথায় উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বে পরমেশ্বর তাঁহাকে পীড়ার যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিলেন, এবং তিনি ছয় কন্যা মাত্র বর্ত্তমান রাখিয়া গত ২০ ফাল্গুণ রবিবার [২ মার্চ ১৮৪৫] দিবা অষ্ট ঘণ্টার সময়ে মুরশিদাবাদে ৫৯ বৎসর ২১ দিন বয়ঃক্রমে ইহ লোক হইতে অবসৃত হইলেন।

সংস্কৃত কলেজের কর্ম্মচারিবর্গের বেতনের খাতায় দেখিতেছি, ১৮৪৪ সনের সেপ্টেম্বর

হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ছয় মাস বিদ্যাবাগীশ ছুটি লইয়াছিলেন এবং তাঁহার স্থলে কুমারহট্ট-নিবাসী গঙ্গাধর তর্কবাগীশের পুত্র গোবিন্দ শিরোমণি অস্থায়ী ভাবে কার্য্য করিয়াছিলেন।

মৃত্যুকালে বিদ্যাবাগীশ ব্রাহ্মসমাজকে পাঁচ শত টাকা দান করিয়া যান। ১ বৈশাখ ১৭৬৮ শকের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র গোড়ায় নিম্নোদ্ধৃত অংশটি মুদ্রিত হইয়াছে :—

> বিজ্ঞাপন।—ব্রাহ্মসমাজের গত আচার্য্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় পরলোক গমন কালে ব্রাহ্মসমাজের জন্য যে ৫০০ পঞ্চ শত টাকা দান করিয়াছিলেন তাহা শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ সিংহ মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীশ্রীধর শর্ম্মা। প্রধান উপাচার্য্য।

বিদ্যাবাগীশের মৃত্যু-তারিখ লইয়া বিতর্ক

বিদ্যাবাগীশের মৃত্যু-তারিখ লইয়া সম্প্রতি রায়-বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ ('প্রবাসী', শ্রাবণ ১৩৪৩, পৃ. ৫৮৬) বিতর্কের সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি বলেন, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রচারিত বিদ্যাবাগীশের মৃত্যুর তারিখ ২ মার্চ ১৮৪৫ "ঠিক নহে"—উহা ২৩ ফেব্রুয়ারি হইবে ; কারণ, ১১ মার্চ ১৮৪৫ তারিখের 'বেঙ্গল হারকরা'য় এক জন পত্রলেখক এই তারিখের উল্লেখ করিয়াছেন।* বিদ্যাবাগীশ তত্ত্ববোধিনী সভার প্রাণস্বরূপ ছিলেন ; সেই সভার মুখপত্রে প্রচারিত তাঁহার মৃত্যুর তারিখ ভুল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবার পূর্ব্বে চন্দ-মহাশয়ের উচিত ছিল—পূর্ব্বে এ-বিষয়ে আরও অনুসন্ধান করা। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রচারিত বিদ্যাবাগীশের মৃত্যু-তারিখ যে নির্ভুল, তাহার প্রমাণ দিতেছি।

বিদ্যাবাগীশ মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সংস্কৃত কলেজের সহিত সহ-সম্পাদক রূপে যুক্ত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর, সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন সেক্রেটরী রসময় দত্ত ৫ এপ্রিল ১৮৪৫ তারিখে কাউন্সিল অব এডুকেশনকে যে পত্র লেখেন, তাহাতে বিদ্যাবাগীশের মৃত্যুর সঠিক তারিখ দেওয়া আছে। পত্রখানি এইরূপ :—

> With reference to my letter dated 26th February last submitting for sanction a Bill for a moiety of salary of Ramchandar Bidyabageesha Assistant Secretary to this Institution retrenched by the Civil Auditor for the month of January last and order of Government dated 26th ultimo I have the honor to submit for sanction the enclosed Bill for a similiar retrenchment for February last.
>
> 2. Ramchandar Bidyabageesha died on the 2nd March last.

ইহা ছাড়া কলেজের কর্ম্মচারিবর্গের বেতনের হিসাবেও দেখিতেছি, বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি (১৮৪৫) মাসের পুরা মাহিনা তাঁহার হইয়া "শ্রীমতি পূণ্যু দেব্যাঃ" সহি করিয়া লইয়াছেন। মার্চ মাস হইতে বিদ্যাবাগীশের স্থলে অস্থায়ী ভাবে নিযুক্ত গোবিন্দ শিরোমণি পুরা মাহিনা ৫০৲ টাকা লইয়াছেন।

* 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'ও ১৩ মার্চ ১৮৪৫ তারিখে এই পত্রলেখকের প্রদত্ত তারিখের পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন।

গ্রন্থাবলী

পণ্ডিত ও সুবক্তা হিসাবে বিদ্যাবাগীশের খ্যাতি ছিল। গ্রন্থরচনাতেও তাঁহার নৈপুণ্য কম ছিল না। তাঁহার রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি :—

১। **জ্যোতিষসংগ্রহসার**। ১০ মাঘ ১২২৩ সাল=১৮১৭, জানুয়ারি। পৃ. ১৫৫।

গ্রন্থের প্রারম্ভে মুদ্রিত নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে গ্রন্থকারের নাম ও নিবাস পাওয়া যায় :—

সেই সত্য পরাৎপরে বাক্যমন অগোচরে বিশ্বব্যাপি বিশ্বের কারণে।
দ্বিজরামচন্দ্র নাম বাস পালপাড়া গ্রাম নতিস্তুতি করি কায়মনে।
বারতিথিরাশিলগ্ন শুনিতে সকলে মগ্ন গৃহস্থের সদা প্রয়োজন।
সবিশেষ জানিবারে জ্যোতিষ অপেক্ষা করে এইহেতু করিয়া যতন।
শকে সপ্তদশশতে আটত্রিশ দিয়া তাতে সাধারণ বোধের কারণ।
জ্যোতিষসংগ্রহসার যথাশক্তি আপনার করিলাম ভাষাবিবরণ।
প্রথম সংগ্রহ এই মনে বড় ভয় সেই যদি ক্রটি থাকে কোনস্থানে।
শুধিবেন সাধুজনে কৃপা করি নিজগুণে দোষনাশে সাধু সন্নিধানে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাগারে ও রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে 'জ্যোতিষ-সংগ্রহসার' আছে।

২। **অভিধান**। মূল্য ১৲। ১৮১৮ (?)

কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির প্রথম বার্ষিক বিবরণের (১৮১৭-১৮) ৮ম পৃষ্ঠায় এই অভিধান সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বর্ণনা পাওয়া যায় :—

> A small volume has recently appeared, the design and contents of which are stated in an English and Bengalee advertisement prefixed. The author, Ramchundur Surma, there remarks that he has constantly had occasion to observe in private correspondence and public documents written in Bengalee the deficiency of his countrymen (Pundits only excepted) in orthography ; which has induced him to collect as many Bengalee words as are derived from the Sunscrit, and are in most common use, and to publish them, with their definitions or synonymous words, in the form of a pocket volume. This little work therefore, under the name of *Obhidhan*, (vocabulary) is intended to instruct the natives both in the spelling and the meaning of terms.

ইহাই বাঙালী-রচিত প্রথম বাংলা অভিধান। ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরিতে এই অভিধানের এক খণ্ড আছে, কিন্তু তাহার আখ্যাপত্র নাই।

এই অভিধানের বর্দ্ধিত সংস্করণ ১৮২০ সনে প্রকাশিত হয়। বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে এই সংস্করণের এক খণ্ড পুস্তক আছে ; তালিকায় এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় :—

"বঙ্গভাষাভিধান pp. iv. 516. Cal. 1820. 12°"

রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাগারে আখ্যাপত্রহীন এক এক খণ্ড 'বঙ্গভাষাভিধান' আছে। তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৫১৬ নয়, কলম্-সংখ্যা ৫১৬, প্রত্যেক পৃষ্ঠায় দুই কলম্।

(৩) **পরমেশ্বরের। উপাসনা বিষয়ে প্রথম ব্যাখ্যান। শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মা কর্তৃক। ব্রাহ্ম সমাজ। কলিকাতা। বুধবার ৬ ভাদ্র। শকাব্দা। ১৭৫০।** [পৃ. ৭]

২য় ব্যাখ্যান (১৩ ভাদ্র), ৩য় (২০ ভাদ্র), ৪র্থ ('শনিবার ৩০ ভাদ্র") ৫ম (৭ আশ্বিন), ৬ষ্ঠ (১৩ আশ্বিন), ৭ম (২০ আশ্বিন), ৮ম (২৭ আশ্বিন), ৯ম (১০ কার্ত্তিক), ১০ম (১৭ কার্ত্তিক), ১২শ (১লা অগ্রহায়ণ), উনসপ্ততি (১১ মাঘ শনিবার শকাব্দা ১৭৫১)।

এই ব্যাখ্যানগুলি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাগারে আছে। ব্রিটিশ মিউজিয়মে 'পরমেশ্বরের উপাসনা বিষয়ে প্রথমাবধি সপ্তদশ ব্যাখ্যান', ২য় সংস্করণ, পৃ. ৬৩, কলিকাতা ১৭৫৮, আছে।

(৪) **বিবাদচিন্তামণিঃ।** ১৮৩৭। পৃ. ১৭৩।

বিদ্যাবাগীশ মহাশয় বাচস্পতিমিশ্রের 'বিবাদচিন্তামণি'র একটি "শোধিত" সংস্করণ দেবনাগর অক্ষরে প্রকাশ করিয়াছিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে বিদ্যাসাগর-গ্রন্থসংগ্রহে ও কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে এই পুস্তক আছে।

(৫) **হিন্দুকালেজ পাঠশালার পাঠারম্ভকালে বক্তৃতা।** ৬ মাঘ ১২৪৬ (=১৮ জানুয়ারি ১৮৪০)। পৃ. ১৬।

বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের এই বক্তৃতা পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। রামচন্দ্র মিত্র-কৃত ইহার ইংরেজী অনুবাদও এই পুস্তিকার সহিত মুদ্রিত হইয়াছিল। এই অনুবাদে প্রকাশ, বিদ্যাবাগীশ ইংরেজী জানিতেন না।

ব্রিটিশ মিউজিয়মে এই পুস্তিকা আছে।

(৬) **নীতিদর্শন।** ১৮৪১।

(ক) নীতিদর্শন। উপদেশ। ১ সংখ্যা। হিন্দুকালেজান্তর্গত বাঙ্গালা পাঠশালার ছাত্রদিগের হিতার্থে অধ্যাপক শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ কর্ত্তৃক বিবৃত। ২১ মাঘ ১২৪৭ সাল। হিন্দু কালেজ মৃজাপুরস্থ শ্রীব্রজমোহন চক্রবর্ত্তির প্রজ্ঞাযন্ত্রে মুদ্রিত। [পৃ. ৯]

(খ) নীতিদর্শন। পিতাপুত্রের পরস্পর কর্ত্তব্য। উপদেশ। ২ সংখ্যা। হিন্দু কালেজান্তর্গত বাঙ্গালা পাঠশালার ছাত্রদিগের হিতার্থে অধ্যাপক শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ কর্ত্তৃক বিবৃত। ২৯ ফাল্গুণ ১২৪৭ সাল। হিন্দুকালেজ মৃজাপুরস্থ শ্রীব্রজমোহন চক্রবর্ত্তির প্রজ্ঞাযন্ত্রে মুদ্রিত। [পৃ. ১১]

'নীতিদর্শন' পুস্তিকার এই দুইটি সংখ্যা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে আছে। ব্রিটিশ মিউজিয়মে 'নীতিদর্শনে'র ৩য়-৫ম সংখ্যা (একত্রে মুদ্রিত) আছে।

পরিশিষ্ট

কোন ব্যক্তির দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র আপন শ্রমের দ্বারা কএক গ্রাম লাভ করিল তাহার পর দ্বিতীয় পুত্র নিঃসন্তান এক স্ত্রী রাখিয়া মরিল তৃতীয় পুত্রের পুত্রও নিঃসন্তান এক স্ত্রী রাখিয়া মরিল এবং ঐ স্ত্রী এখন পর্য্যন্ত নিঃসন্তানা বর্ত্তমানা আছে ইহাতে জিজ্ঞাসা করা যায় ১ প্রথম সওয়াল এই যে ঐ দ্বিতীয় পুত্রের বিধবা স্ত্রী এবং তৃতীয় পুত্রের পুত্রবধূর ঐ কএক গ্রামে অধিকার আছে কি না যদি থাকে তবে কি পর্য্যন্ত থাকে।

২ দ্বিতীয় সওয়াল এই যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্রের ভগিনী পৌত্রের ঐ কএক গ্রামে অধিকার থাকে কি না ॥—

এই ব্যবস্থা বারাণস দেশের চলিত শাস্ত্রানুসারে দেওয়া যায় ইতি ॥—

১। কুরচীনামা ॥

পুত্র নং ১	পুত্র নং ২	স্ত্রী	পুত্র নং ৩	স্বামী নং ৪	কন্যা নং ৪
নিঃসন্তান মৃত	নিঃসন্তান মৃত স্ত্রী রাখিয়া	বর্ত্তমানা	মৃত	মৃত	মৃতা
	|		|		|
	স্ত্রী বর্ত্তমানা		৩ পুত্রের পুত্র নিঃসন্তান মৃত		৪ কন্যার পুত্র মৃত
					|
					কন্যার পৌত্র বর্ত্তমান

এতৎপ্রশ্নদর্শনেন যাদৃশবোধো জাতস্তদনুসারেণোত্তরং লিখ্যতে ।

প্রথমপ্রশ্নস্যোত্তরং ।

তৃতীয়ভ্রাতৃতৎপুত্রমরণসময়ে দ্বিতীয়ভ্রাতা জীবতি বা দ্বিতীয়ভ্রাতুরুপরমকালে তৃতীয়ভ্রাতৃতৎপুত্রৌ জীবত ইতি বিশেষঃ প্রশ্নদর্শনেন ন জ্ঞায়তে। তথাপ্যাদ্যকল্পে জীবতো দ্বিতীয়ভ্রাতুরবিভক্তগ্রামেঽধিকার ইত্যতস্তন্মরণানন্তরং বিভাগাৰ্হসম্বন্ধিবিরহাৎ ভ্রাত্রাদিরহিতপতিধনে দ্বিতীয়ভ্রাতৃপত্ন্যা এব তত্রাধিকারস্তয়া তৃতীয়ভ্রাতৃস্নুষায়ৈ গ্রাসাচ্ছাদনং দেয়ং । দ্বিতীয়কল্পেঽপি অবিভক্তেষু তেষু গ্রামেষু তৃতীয়ভ্রাতৃতৎপুত্রয়োঃ ক্রমেণাধিকারস্ততস্তৃতীয়ভ্রাতৃমরণানন্তরং তৎপুত্রে মৃতে সম্বন্ধ্যন্তরাভাবাৎ তৎপত্ন্যা এব তত্রাধিকারঃ। দ্বিতীয়ভ্রাতৃপত্ন্যৈ তৃতীয়ভ্রাতৃস্নুষা ভক্তাচ্ছাদনং দদ্যাৎ ইতি পরন্তু স্ত্রীণামস্বাতন্ত্র্যাৎ যাবজ্জীবং তদ্ধনমুপভোক্তব্যং আবশ্যকপতৌর্দ্ধদেহিকক্রিয়াদ্যর্থং দানাদিকঞ্চ কর্ত্তব্যং নতু নটনর্ত্তকাদিদানবিক্রয়াদিকমিতি বারাণস্যাদিদেশপ্রচলিতমিতাক্ষরাবীরমিত্রোদয়বিবাদচিন্তামণিপ্রভৃতিগ্রন্থসম্মতা ব্যবস্থেতি ।

অত্র প্রমাণং ।

অপুত্রধনাধিকারে, পত্নীদুহিতরশ্চেতি, পত্ন্যেব দদ্যাৎ তৎপিণ্ডং কৃৎস্নমংশং লভেতেচেতি, অপুত্রধনং পত্ন্যভিগামীতি পত্নী ভর্ত্তুর্ধনহরীতি, অসুতস্য প্রমীতস্য পত্নী তদ্ভাগহারিণীতি, যাজ্ঞবল্ক্যবৃদ্ধমনুবৃদ্ধবিষ্ণুকাত্যায়নবৃহস্পতিবচনেষু প্রথমং পত্ন্যা ধনগ্রহণমুক্তং। ভ্রাতৃণামপ্রজাঃ প্রেয়াদিতি, পিতা হরেদপুত্রস্যেতি অনপত্যস্য পুত্রস্যেতি স্বর্যাতস্য হ্যপুত্রস্য ভ্রাতৃগামি দ্রব্যমিতি বিভক্তে সংস্থিতে দ্রব্যমিতি নারদমনুশঙ্খকাত্যানবচনেষু প্রথমং ভ্রাতৃপিতৃমাতৃপিতামহীপত্নীনামন্যতমস্য ধনসম্বন্ধো দর্শিতঃ। তত্র বচনানাং বিরোধপরিহারায় বিভক্তাসংসৃষ্টিন্যপুত্রে স্বর্যাতে পত্নী প্রথমং ধনং গৃহ্নতীত্যয়মর্থোসিদ্ধো ভবতীতি তথা তস্মাদপুত্রস্য স্বর্যাতস্য বিভক্তাসংসৃষ্টিনঃ পরিণীতা স্ত্রী সংযতা সকলমেব ধনং গৃহ্নতীতি স্থিতং। ইতি মিতাক্ষরালিখনাৎ ভ্রাতৃপিতৃমাতৃপিতামহীনামভাবে বিভাগানর্হমৃতপতিধনে পত্ন্যা অধিকারঃ প্রতীয়তে ইতি। পিতৃব্যগুরুদৌহিত্রান্ ভর্ত্তুঃ স্বস্রীয়মাতুলান্। পূজয়েৎ কব্যপূর্ত্তাভ্যাং বৃদ্ধানাথাতিথীংস্ত্রিয় ইতি বীরমিত্রোদয়ধৃতপ্রজাপতিবচনং। ভরণঞ্চাস্য কুর্ব্বীরন্ স্ত্রীণামাজীবনক্ষয়াদিতি নারদবচনঞ্চ। যত্তু পারতন্ত্র্যবচনং ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতীত্যাদি তদস্তু পারতন্ত্র্যং ধনগ্রহণে তু কো বিরোধ ইতি মিতাক্ষরালিখনেন ধনগ্রহণেঽধিকারো বোধ্যতে ন তু দানবিক্রয়াদাবিতি। যত্তু গৃহীতধনায়াঃ পত্ন্যাস্তদ্ধনেন জীবনমাত্রং দানাধীকরণবিক্রয়েষু তু নাধিকার ইতি। মৃতে ভর্ত্তরি ভর্ত্রংশং লভেত কুলপালিকা। যাবজ্জীবং নহি স্বাম্যং দানাধমনবিক্রয়ে ইতি কাত্যায়নবচনাৎ প্রতীয়ত ইতি তদপি দৃষ্টার্থনটনর্ত্তকাদিদানাস্বাতন্ত্র্যপরং অদৃষ্টার্থদানে তদুপযোগিনো রাধীকরণবিক্রয়োশ্চ তেনৈবাধিকারাভিধানাদিতি বীরমিত্রোদয়লিখনমিতি মহাভারতে স্ত্রীণাং স্বপতিদায়স্তু উপভোগফলঃ স্মৃতঃ। নাপহারং স্ত্রিয়ঃ কুর্য্যুঃ পতিদায়াৎ কথঞ্চন। অপহারং ঐচ্ছিকদানবিক্রয়াদিকমিতি বিবাদচিন্তামণিলিখনঞ্চেতি ।

দ্বিতীয়প্রশ্নস্যোত্তরং ।

প্রথমপ্রশ্নোত্তরলিখিতেদৃশস্ত্রীসংক্রান্তধনস্য স্ত্রীধনত্বাত্তয়োরন্যতরাধিকারিণ্যাঃ স্ত্রিয়া উপরমে ব্রাহ্মাদিবিবাহেন পত্নীত্বং প্রাপ্তায়াস্তদ্ধনে ভর্তৃসন্নিহিততরসপিণ্ডাভাবে ভর্তৃভগিনীপৌত্রত্বেন পতিপিতৃস্বস্রীয়পুত্রত্বেন বা ভর্তৃসন্নিহিতসপিণ্ডস্য প্রশ্নলিখিতদ্বিতীয়তৃতীয়ভ্রাতৃভগিনীপৌত্রস্যাধিকারঃ। আসুরাদিবিবাহেষু ভার্য্যাত্বং প্রাপ্তায়াস্ত যদ্যপি মাতৃপিতৃতৎসপিণ্ডানামধিকারস্তথাপ্যত্র তেষামভাবাৎ ভর্তৃসন্নিহিতসপিণ্ডস্য সপিণ্ডীকরণান্তশ্রাদ্ধকর্ত্তুস্তস্যৈবাধিকার ইতি বারাণস্যাদিদেশপ্রচলিতমিতাক্ষরাবীরমিত্রোদয়নির্ণয়সিন্ধুপ্রভৃতিগ্রন্থসম্মতা ব্যবস্থা।

অত্র প্রমাণং।

আধিবেদনিকাদ্যঞ্চ স্ত্রীধনং পরিকীর্ত্তিতমিতি যাজ্ঞবল্ক্যবচনব্যাখ্যায়াং আদ্যশব্দেন রিকৃথক্রয়সংবিভাগপরিগ্রহাধিগমপ্রাপ্তমেতৎ স্ত্রীধনং মন্বাদিভিরুক্তং। স্ত্রীধনশব্দশ্চ যৌগিকো ন পারিভাষিকঃ যোগসম্ভবে পরিভাষায়া অযুক্তত্বাদিতি মিতাক্ষরালিখনেন সংবিভাগপদবাচ্যসংক্রান্তধনস্যাপি স্ত্রীধনত্বমুপপাদ্য অপ্রজঃ স্ত্রীধনং ভর্ত্তুঃ ব্রাহ্মাদিষু চতুর্ষ্বপীতি যোগীশ্বরবচনবিবরণে অপ্রজসঃ স্ত্রিয়াঃ পূর্ব্বোক্তায়াঃ ব্রাহ্মদৈবার্ষপ্রাজাপত্যেষু চতুর্ষু বিবাহেষু ভার্য্যাত্বং প্রাপ্তায়া অতীতায়াঃ পূর্ব্বোক্তং ধনং প্রথমং ভর্ত্তুর্ভবতি তদভাবে তৎপ্রত্যাসন্নানাং সপিণ্ডানাং ভবতি শেষেষু আসুরগান্ধর্ব্বরাক্ষসপৈশাচেষু তদপ্রজঃ স্ত্রীধনং পিতৃগামীতি মিতাক্ষরালিখনং। সপিণ্ডতা চৈকশরীরাবয়বান্বয়েন ভবতি। তথাহি পুত্রস্য পিতৃশরীরাবয়বান্বয়েন পিত্রা সহৈকপিণ্ডতা এবং পিতামহাদিভিরপি পিতৃদ্বারেণ তচ্ছরীরাবয়বান্বয়াৎ। এবং মাতৃশরীরাবয়বান্বয়েন মাত্রা তথা মাতামহাদিভিরপি মাতৃদ্বারেণ ইত্যাদ্যাচারাধ্যায়ে মিতাক্ষরালিখনেন মাতাপিতৃদ্বারেণ একশরীরাবয়বান্বয়ো ভগিনীপৌত্রেণ পিতৃস্বস্রীয়পুত্রেণ বা সহাস্তীতি। সপিণ্ডতা তু পুরুষে সপ্তমে বিনিবর্ত্ততে ইতি মিতাক্ষরাধৃতবৃহন্মনুবচনেন তস্যাপি সপ্তমান্তর্গতত্বাৎ সপিণ্ডত্বসিদ্ধিরিতি। পিতামহ্যাশ্চাভাবে সমানগোত্রজাঃ সপিণ্ডাঃ পিতামহাদয়ো ধনভাজঃ ভিন্নগোত্রাণাং সপিণ্ডানাং বন্ধুশব্দেনোপাত্তত্বাদিতি মিতাক্ষরালিখনে ভিন্নগোত্রাণাং সপিণ্ডানামিতি সামান্যনির্দ্দেশাৎ বন্ধুপদস্যোপলক্ষণতয়া সর্ব্বেষাং ভিন্নগোত্রসপিণ্ডানাং গ্রহণমবশ্যং বক্তব্যং বক্ষ্যমাণমাতৃস্বস্রীয়াদিমাত্রপরত্বে তদেব নির্দ্দিশেৎ ব্যবহিতসপিণ্ডমাতামহীভগিনীপুত্রাণামধিকারঃ সন্নিহিততরস্বভাগিনেয়স্য চানধিকার আপদ্যেত অতএব সম্বন্ধসমুত্থানে বিজ্ঞানেশ্বরেণৈব "দেশান্তরে গতে প্রেতে দ্রব্যং দায়াদবান্ধবাঃ।" ইতি যাজ্ঞবল্ক্যবচনব্যাখ্যানে বান্ধবা মাতৃপক্ষীয়া মাতুলাদ্যা ইত্যনেন ভিন্নগোত্রসপিণ্ডানাং মাতুলাদীনামধিকারঃ স্বহস্তিতঃ। ন চ সম্বন্ধসমুত্থান এব বান্ধবপদবাচ্যমাতুলাদীনামধিকারো বাচনিক ইতি বাচ্যং। পৌর্ব্বাপর্য্যনিয়মশ্চ পত্নীদুহিতর ইত্যাদিপ্রতিপাদিত এবাত্রাপি জ্ঞেয়ঃ। শিষ্যসব্রহ্মচারিব্রাহ্মণনিষেধো বণিক্প্রাপ্তিশ্চ বচনপ্রয়োজনং ইতি তত্রত্যলিখনাসঙ্গতেরিতি যোগীশ্বরবচনেঽপি বন্ধুপদেন মাতুলাদ্যুপলক্ষণমন্যথা মাতুলাদীনামগ্রহণমেব প্রসজ্যেতেতি তৎপুত্রাণাং ধনাধিকারস্ততঃ প্রত্যাসন্নানাং তেষামেব স নেতি মহদনৌচিত্যমাপদ্যেত। ইতি বীরমিত্রোদয়ঃ স্নুষা স্বস্রীয়তৎপুত্রা জ্ঞাতিসম্বন্ধিবান্ধবাঃ। পুত্রাভাবে তু কুর্ব্বীরন্ সপিণ্ডান্তং যথাবিধি ইতি নির্ণয়সিন্ধুধৃতবৃহদ্যমবচনং। পুত্রঃ পৌত্রঃ প্রপৌত্রো বা ভ্রাতা বা ভ্রাতৃসন্ততিঃ। সপিণ্ডসন্ততির্ব্বাপি ক্রিয়ার্হো নৃপ জায়তে ইতি চ তদ্ধৃতবিষ্ণুপুরাণবচনং উপকারকত্বেন ধনসম্বন্ধস্য পুত্রাদীনাং ত্রয়াণাং পিত্রাদিত্রিকমহোপকারকারিত্বাৎ পুত্রাদিভির্গৃহীতং ধনং স্বামিন এবোপকারকং উপকারপ্রত্যাসত্ত্যা তদীয়মেবোপকারপ্রত্যাসত্তিশ্চাভ্যর্হিতা ইত্যাদি বীরমিত্রোদয়ে প্রসিদ্ধতর ইত্যলং প্রপঞ্চেন।

বিদ্যামন্দিরস্থপণ্ডিতানাং সম্মতেয়ং ব্যবস্থা

ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপকশ্রীরামচন্দ্রশর্ম্মণাং শ্রীশম্ভুচন্দ্রশর্ম্মণাং শ্রীহরনাথশর্ম্মণাং শ্রীগঙ্গাধরশর্ম্মণাং শ্রীপ্রেমচন্দ্রশর্ম্মণাং শ্রীনিমাইচন্দ্রশর্ম্মণাং শ্রীজয়গোপালশর্ম্মণাং শ্রীহরিপ্রসাদশর্ম্মণাং শ্রীযোগধ্যানশর্ম্মণাং।

[এই ব্যবস্থাপত্র-সম্পর্কে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ছাড়া আরও দুই জন পণ্ডিতের কর্ম্মচ্যুতি ঘটিয়াছিল। তাঁহাদের এক জন ঈশ্বর দত্ত পাণ্ডে; অপর জন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের সদর দেওয়ানী আদালতের পণ্ডিত হীরানন্দ মিশ্র। বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষের নির্দেশ-অনুযায়ী, এই সকল পণ্ডিত পুনরায় সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারিবেন—২৭ জুলাই ১৮৪০ তারিখে বঙ্গীয় গবর্মেণ্ট এই মর্ম্মে সিদ্ধান্ত করেন।]

মাণিক দত্ত ও মুকুন্দরাম

শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী তাঁহার কবিকঙ্কণ চণ্ডীর বন্দনা অংশে মাণিক দত্ত নামক এক ব্যক্তির প্রতি বিনয় প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন যে, মাণিক দত্তের নিকট হইতে তিনি "গীত-পথের পরিচয়" লাভ করেন।[১] মালদহ-জাতীয় শিক্ষা সমিতিতে মাণিক দত্ত-রচিত একখানি চণ্ডীমঙ্গলের পুথি সংগৃহীত আছে। উক্ত সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয় এই পুথির একটি পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন।[২] কিন্তু তন্মধ্যে মাণিক দত্তের সহিত মুকুন্দ চক্রবর্ত্তীর পরিচয় বা সাক্ষাৎকার সূচক কোন কথা পাওয়া যায় না। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় সংপ্রতি মাণিক দত্ত-কৃত একখানি চণ্ডীমঙ্গলের খণ্ডিত পুথি সংগৃহীত হইয়াছে।[৩] ইহার মধ্যে এমন একটি অংশ পাওয়া যাইতেছে, যাহা দেখিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, আলোচ্য মাণিক দত্তের প্রতিই মুকুন্দরাম বিনয় প্রকাশ করিয়া থাকিবেন। এমন কি, হয়ত বা মাণিক দত্ত-রচিত চণ্ডীমঙ্গল দেখিয়া ও পাঠ করিয়াই মুকুন্দরাম তাঁহার বিখ্যাত কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই বর্ণনাটি যথার্থ হইলে বলিতে হয় যে, মাণিক দত্ত মুকুন্দের পূর্ব্বে চণ্ডীর গান রচনা করেন এবং তাহা দেখিয়া মুকুন্দ স্বীয় গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্তি লাভ করেন বলিয়া মাণিক দত্তের প্রতি তাঁহার বিনয় প্রকাশ স্বাভাবিক। উক্ত অংশটি এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

গীতের পুথি নিল দুর্গা বগলে দাবিআ।
মাণিক দত্তের শিয়রে দুর্গা বসিল চাপিআ॥

মাণিক দত্তের শিয়রে মারে নাথিকের ঘা।
তার কালা ছানি দূরে গেল দিব্য হৈল গা॥
চিআও বাছা মাণিক দত্ত গায়ে কর বল।
তোর ঘরে আইলাঙ দুর্গা সর্ব্বমঙ্গল॥
হের দেখ গীতের পুথি দিলাঙ তোমার তরে।
তুমি জাঞা গান কর কলিঙ্গ নগরে॥

জেখানে জাইআ ঘট করিবে স্থাপন।
সেই ঘটে আমি থাকিব সর্ব্বক্ষণ॥
রজনী প্রভাতে দত্ত⋯গ্য পাইল।
ভবানীর মঙ্গল পোথা পড়িতে লাগিল॥
বিস্তর পুথি দেখি দত্ত ভাবিল বিশেষে।
কেমতে গাইব এত গীত অষ্ট দিবসে॥
বিস্তর পুথি দেখি দত্ত অন্তরে ডরিল।
তিন শত বত্তিশ লাচাড়ি ভাবিআ রচিল॥
তিন শত বত্তিশ লাচাড়ি করিলেন গান।

দিশা পাঁচালি কৈল পদ মূর্ত্তিমান॥
রঘু রাঘব আর মুকুন্দ ব্রাহ্মণ।

মাণিক দত্তের সঙ্গে হইল দরশন॥
মাণিক দত্ত কহিল পুথির বিবরণ।
শুনিঞা চমৎকার হইল তিন জন॥
রঘুয়ে রচিআ পুথি অদভুত করিল।
রাঘবে রচিআ পুথি বিদেশি করিল॥
মুকুন্দে রচিআ পুথি কবিকঙ্কণ কৈল।

আপনি মাণিক দত্ত মাণিকদত্তি কৈল॥
মধ্যে চারি পদে দুর্গার গান হইল।
সংপ্রদা কারণে দত্ত ভাবিতে লাগিল॥
সংপ্রদা করিল দত্ত আপনার মনে।
প্রথমে আরম্ভ গীত কলিঙ্গ ভুবনে॥
কার না লয় অর্থ বিত্ত কার না লয় ধন।
ঘরে ঘরে পূজিছে মঙ্গলচণ্ডী গান॥ ইত্যাদি

—২২ পত্র।

১ মাণিক দত্তেরে আমি করিয়ে বিনয়।
যাহা হৈতে হৈল গীতপথ পরিচয়॥—কবিকঙ্কণ চণ্ডী, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ৬ পৃঃ।

২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১৭, ৪র্থ সংখ্যা, ২৪৭ পৃঃ।

৩ দিনাজপুর, বালুরঘাটনিবাসী স্কুল সাব ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বনমালী ঘোষ মহাশয় কর্ত্তৃক উপহার প্রদত্ত।

বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ (২)

শ্রীসজনীকান্ত দাস

ভারতবর্ষে মুদ্রাযন্ত্র

এখন পর্য্যন্ত যত দূর জানা যায়, ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম ছাপাখানার প্রবর্ত্তন করেন পোর্ত্তুগীসেরা। ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে তাঁহারা প্রথম আসেন এবং দক্ষিণ-ভারতের গোয়া অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করেন। ইহার অত্যল্প কাল মধ্যেই তাঁহারা ইউরোপ হইতে দুইটি মুদ্রাযন্ত্র আনাইয়া সেখানে স্থাপন করেন। ইহারই একটিতে ১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টধর্ম্মবিষয়ক একটি গ্রন্থ পোর্ত্তুগীস ভাষায় রোমান হরফে মুদ্রিত হয়। ইহাই ভারতবর্ষে মুদ্রিত সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থ।

ভারতীয় ভাষা প্রথম ছাপার হরফে উঠে কোচীনে। ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্ গোন্‌সালভেস্ নামক এক জন স্পেনদেশীয় পাদ্‌রি মালায়ালাম-তামিল অক্ষর প্রস্তুত করিয়া সেণ্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার-প্রণীত 'ক্রিশ্চিয়ান ডক্‌ট্রিন' নামক পুস্তকের অনুবাদ 'ক্রীষ্ট্য বন্নকনম্' মুদ্রিত করেন। ইহাই ভারতীয় ভাষায় সর্ব্বপ্রথম ছাপা বই। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর সংখ্যা 'দি নিউ রিভিউ' পত্রিকায় লিও প্রসারপিও-লিখিত "The First Printing Presses in India" প্রবন্ধে ভারতবর্ষে মুদ্রাযন্ত্র প্রবর্ত্তনের বিশদ ইতিহাস দেওয়া আছে।

বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দ

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দ স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসরে বাংলা দেশের হুগলি শহরে ছেনি-কাটা বাংলা হরফে মুদ্রণ আরম্ভ হয়। অর্থাৎ এই বৎসর হইতে বাংলা অক্ষরে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে মুদ্রিত প্রমাণ বর্ত্তমান; কেবল সন্দেহজনক ব্যক্তিগত পুথি, নথি ও দলিলের উপর আমাদের নির্ভর নয়। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে রোমান অক্ষরে মুদ্রিত চারিটি (কাহারও কাহারও মতে পাঁচটি) গ্রন্থ প্রাচীন বাংলা-গদ্যের নমুনা হিসাবে বর্ত্তমান থাকার প্রসিদ্ধি থাকিলেও আমরা এখন পর্য্যন্ত একটি ধর্ম্মগ্রন্থ ও একটি সম্মিলিত ব্যাকরণ-অভিধানেরই সন্ধান পাইয়াছি। এই দুইটিও একটি বিশেষ প্রাদেশিক কথিত ভাষা সম্পর্কিত—সমগ্র বাংলা দেশের লিখিত ভাষার সহিত ইহাদের সম্বন্ধ অল্প। সুতরাং ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দকেই আমরা বাংলা-গদ্যের ঐতিহাসিক যুগের আরম্ভ বৎসর বলিব। এই বৎসরেই হুগলি শহরে প্রতিষ্ঠিত মুদ্রাযন্ত্রে নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড প্রণীত *A Grammar of the Bengal Language* পুস্তক ছাপা হয় এবং ইংরেজীতে লিখিত এই ব্যাকরণখানিতে দৃষ্টান্তস্বরূপ কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত ও ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর হইতে অংশ-বিশেষ বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত হয়। এই পুস্তক ও ইহার মুদ্রণ সম্বন্ধে

কিছু বলিবার পূর্ব্বে ইংলণ্ডীয়গণ কর্ত্তৃক ভারতবর্ষীয় ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনার একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দেওয়া প্রয়োজন।

ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যচর্চ্চায় ইংরেজ

মুর্শিদাবাদ জিলায় কাশিমবাজারের কুঠীতে জে. মার্শাল (J. Marshall) নামক এক জন ইংরেজ নিযুক্ত ছিলেন। ১৬৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চা সুরু করেন ও শ্রীমদ্ভাগবতের ইংরেজী অনুবাদ করেন।* পরবর্ত্তী প্রায় শতাব্দীকাল ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোনও কর্ম্মচারী আর এ বিষয়ে উৎসাহ প্রকাশ করেন নাই। ইহার পরেই গবর্মেন্টের অপ্রকাশিত রেকর্ডে (No. 355—Consultations, July 3) দেখা যায় যে ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে দেশীয় ভাষা না জানার দরুন কটকের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট মিঃ ব্রিষ্টোকে (Mr. Bristow) অপসারিত করা হইয়াছিল।† সুতরাং বুঝা যাইতেছে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় হইতেই কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি কর্ম্মচারীদিগের দেশীয় ভাষা শিক্ষার প্রতি নিবদ্ধ হইয়াছিল। ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাস হইতেই শহরের বাজারে বাজারে বিভিন্ন দেশীয় ভাষায় লিখিত ঘোষণাপত্র লটকাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে ক্লাইব কোর্ট অব ডিরেক্টরদের নিকট একটি পত্রে লিখিয়াছিলেন—

> Mr. Watts still accompanies me in this campaign, and I cannot omit the opportunity of remarking of what great service he is to your affairs by his thorough knowledge of the language and people of this country.

অষ্টাদশ শতাব্দীর সপ্তম দশক হইতে ফ্রান্সিস গ্ল্যাডউইন, হালহেড, চার্লস উইলকিন্স, জোন্‌স প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে পণ্ডিতজনোচিত উৎসাহ ও কৌতূহল লইয়া গবেষণা সুরু করেন। ফ্রান্সিস গ্ল্যাডউইন ইহাদের অগ্রণী। ওয়ারেন হেষ্টিংস তাঁহাকে প্রাচ্য ভাষাতত্ত্বালোচনায় যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর তারিখে কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়ম এলাকা হইতে গ্ল্যাডউইন হেষ্টিংসকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসের কিছু উপকরণ আছে। গ্ল্যাডউইন তৎপূর্ব্বেই *A Compendious Vocabulary, English and Persian, Compiled for the East India Company* নামক শব্দসংগ্রহ রচনা শেষ করিয়াছিলেন। গ্ল্যাডউইন লিখিয়াছিলেন,

> ...I have placed the Languages in the Order you see them, Gentlemen, to shew in what Manner the Arabic is incorporated with the Persic, and to exhibit how the Persic is inflicted in the Hindouse, as well as to endeavour to discover some Traces of the Shanskerit Language in the Bengal Dialect.........

---

* "He made a translation of the *Sanskrit Book entitled Serebaugabut Pooran* in the English language which was transmitted to England and was deposited in the British Museum." (B. M. Harl. MS. 4253-55).—*The Calcutta Review*, No. CCLXX, p. 397.

† *Selections from Unpublished Records of Government*, Vol. I, p. 146.

ধ্যান ভাঙ্গি সোমদত্ত দেখিল মহেশ ।
বিভুতি ভুসন অঙ্গ জটা ভার কেশ ॥

আনন্দিত সোমদত্ত দেখিয়া চান্দরে ।
বিবিধ প্রকারে রাজা অতি স্তুতি করে ॥

সোমদত্ত বলে যদি হইলা কৃপাবান ।
এক নিবেদন আমি করি তোর স্থান ॥

সভা মধ্যে সেনী মোরে অপমান কৈল ।
জতেক ভুপাতি গন বসিয়া দেখিল ॥

অগ্নিবত অঙ্গে দহে সেই অপমান ।
এই নিবেদন আমি করি তোর স্থান ॥

যদি মোরে বর দিবা দেব পসুপতি ।
মহা ধনুর্দ্ধর হউক আমার সন্ততি ॥

তার পুত্রে মোর পুত্র জিনুক সমরে ।
রাজা গন মধ্যে জেন অপমান করে ॥

ইহা বিনু অন্য বর নাহি চাহি আমি ।
এই বর মোরে দেব আজ্ঞা কর তুমি ॥

নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড রচিত *A Grammar of the Bengal Language* (১৭৭৮ খ্রীঃ) পুস্তকের একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি। এই পুস্তকে বাংলা ছাপার অক্ষর সর্ব্বপ্রথম ব্যবহার হয়

বাস্তাবন্দীর কমিসন সাহেবের
সকললোককে জ্ঞাতো কারণ খবর
দেন অদ্দী কেহ টেক্সের কোন বাবুদী
বেয়াত্ত কারণ আরজী দেন তাহার
যে কারণের নিমিত্তে আরজী দিবেন
সেই কারণের তিন মাসের মধ্যে
আরজী দেন এবং টেক্সের কমিটের
সাহেবের রসিদ দেখাবেন যে তাহার
উপর টেক্সের বাবদী দাওয়ানাই
তবে সাহেবেরা আরজী লইবেন
এবং আরজী বিমজীমে তজবিজ
করিয়া অদি টেক্সের টাকা ফিরিয়া
দিতে হয়ে তাহা ফিরিয়া দেয়াবেন
কিম্বা যে বিহিত হয়ে তাহা করিবেণ

২রা সেপ্টেম্বর ১৭৮৪ তারিখের *Calcutta Gazette*
পত্রে মুদ্রিত বিজ্ঞাপনের প্রতিলিপি

গ্ল্যাডউইনের শব্দকোষ ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে মালদহ হইতে প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষা সম্বন্ধে এই সর্ব্বপ্রথম এক জন ইংরেজের দৃষ্টি আকর্ষিত হইল।

১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড এদেশীয় ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন; তাঁহার হিন্দু আইনের বিখ্যাত অনুবাদ-পুস্তক *A Code of Gentoo Laws* লণ্ডন হইতে ঐ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের একটি অধ্যায়ে শব্দসংগ্রহের তালিকায় অনেকগুলি বাংলা শব্দ স্থান পাইয়াছে; বেনা, বেত, বহেড়া, ব্যাপারী, ভেড়ুয়া, ভাণ্ডারা, বাঁধ, কাহন, চণ্ডাল, চৈত, চৌকী, কুলী, কোল, পছাড়ি, ডাল, ঘি, ঘড়ি, গোমস্তা, গণ্ডা, হাট, হরকরা, হাওলা, কাঁসা, নালা, পান, পিপুল, ফটিক, পেয়াদা, পুথি, সাধ, শাক, ঠাকুর, তরকারী, টুকরি, তোলা, উকীল প্রভৃতি শব্দ তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

বাংলা দেশে মুদ্রাযন্ত্র ও বাংলা ছাপার হরফ

A Code of Gentoo Laws পুস্তকে যাহার সূত্রপাত, *A Grammar of the Bengal Language* পুস্তকে তাহারই পরিণতি দেখিতে পাই। কোম্পানীর ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগকে বাংলা ভাষায় অভিজ্ঞ করিয়া তুলিবার জন্য হালহেড সাহেব উক্ত ব্যাকরণ রচনা করিয়া তদানীন্তন গবর্ণর-জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসকে উহার মুদ্রণের ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করেন। হালহেডের ব্যাকরণ মুদ্রণের কাজে বাংলা হরফ অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে। তখন পর্য্যন্ত বাংলা হরফ প্রস্তুতের কোনও ব্যবস্থা হয় নাই। বোল্টস নামক কোম্পানীর এক জন ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী লণ্ডনে বসিয়া একবার এ বিষয়ে চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হন নাই। ওয়ারেন হেষ্টিংস বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত (এবং পরে শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার সুবিখ্যাত অনুবাদক) চার্লস উইলকিন্সকে স্মরণ করিলেন। হেষ্টিংস জানিতেন উইলকিন্স একবার নিতান্ত অবসরবিনোদনের জন্য ছেনি কাটিয়া দুই একটি বাংলা হরফ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। বন্ধু হালহেডের পুস্তক-মুদ্রণে সহায়তা করিবার জন্য উইলকিন্স উৎসাহিত হইয়া কাজে লাগিলেন। হালহেড ও উইলকিন্স উভয়েই তখন হুগলীর কুঠীতে কর্ম্মচারী। উইলকিন্স হরফ-প্রস্তুতের কাজে পঞ্চানন কর্ম্মকার নামক স্থানীয় এক জন কামারের সাহায্য গ্রহণ করেন। পরবর্ত্তী কালে পঞ্চানন এই কাজে দক্ষ হইয়াছিলেন এবং এই পঞ্চানন ও তাঁহার জামাতা মনোহর শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশনের সাহায্যে এদেশীয় বহু ভাষার অক্ষর প্রস্তুত করিয়াছিলেন; এখন পর্য্যন্ত বাংলা দেশে যে অক্ষর প্রচলিত আছে তাহা পঞ্চানন ও মনোহর নির্ম্মিত অক্ষরের আদর্শেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। এ বিষয়ে যাঁহারা বিস্তৃত বিবরণ জানিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত "বাংলা ছাপার হরফের জন্মকথা" প্রবন্ধ পড়িতে বলি।

বাংলা ছাপার হরফ সম্বন্ধে এখানে একটি কথার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। যেদিন হইতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস রচনার সূত্রপাত (১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে) হইয়াছে, সেই দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত এক দল পণ্ডিত একটা মোটা ভুল করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের ধারণা, গোড়ার দিকে কাঠের অক্ষরে বাংলা বই ছাপা হইয়াছিল। এই ধারণা সম্পূর্ণ

অমূলক। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা মুদ্রিত পুস্তক ও সেই সম্পর্কে ইতিহাসাদি আলোচনা করিয়া আমরা নিঃসংশয় হইয়াছি যে, সেকালে বাংলা ভাষার একটি পুস্তকও কাঠের অক্ষরে মুদ্রিত হয় নাই। প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ *A Grammar of the Bengal Language* হইতে সুরু করিয়া যাবতীয় বাংলা অক্ষর সম্বলিত পুস্তক ছেনি-কাটা ছাঁচে ধাতুদ্রব্যে ঢালাই-করা অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছিল। কাটা হরফগুলি সমান ও সুদৃশ্য না হওয়াতেই ঐরূপ একটা ভ্রান্ত ধারণা আজও পর্য্যন্ত গল্পপ্রবণ গবেষকদের দ্বারা প্রচারিত হয়। আমাদের উক্তির প্রমাণ নিম্নলিখিত পুস্তক ও প্রবন্ধে মিলিবে :—

১। *A Grammar of the Bengal Language*—N. B. Halhed, 1778, Preface pp. xxii—xxiv.

২। *The Friend of India*, July 1818, pp. 61-62, 64; "Progress of Indian Literature."

৩। *The Life and Times of Carey, Marshman and Ward* by John Clark Marshman, 1859; Vol. I, p. 70; "First Printing in Bengalee."

উইলকিন্স-কৃত হরফে হালহেডের ব্যাকরণ হুগলির যে ছাপাখানায় মুদ্রিত হইয়াছিল সেই ছাপাখানার বিষয়ে কিছুই জানা যায় না। নিম্নলিখিত দরখাস্তটি হইতে বুঝা যায় যে, ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে চার্লস উইলকিন্সের তত্ত্বাবধানে গবর্ণর-জেনারেল ও কাউনসিল কলিকাতাতে একটি মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

To J. P. Auriol, Esq., Secretary to the General Department.

Sir, The Hon'ble the Governor-General and Council having thought proper to establish a Printing Office under the Superintendence of Mr. Charles Wilkins, I am directed to transmit you the enclosed Copy of the Rates of Printing and to desire that you will prepare and furnish Mr. Wilkins with Copies of all such papers in your office as will admit of being printed, whether in the Persian, Bengal or Roman Character, leaving Blanks for Names, Dates and other occurrences as are liable to alter, and specifying the Number of each Form usually issued in the course of a year.

Revenue Department,
Fort William, *the 8th January 1779.*

I am, Sir,
Your most obedient Servant,
(Sd.) Geo. Hodgson,
Secretary.

Copy.
Rates of Printing.
For English Impressions.

For every Quire of Folio Post, Paper included.
If Printed on One Side.··· ··· ··· Sa. Rs. 3
If Printed on both sides ··· ··· „ 5

For Persian and Bengali
For every Quire of Folio Post Printed on one side ··· „ 5
Do Do „ 7

Revenue Dept.
A true copy.

(Sd.) W. Webber,
Sub-Secretary.

১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে জেমস অগাষ্টাস হিকী তাঁহার 'বেঙ্গল গেজেট' মুদ্রণের জন্য কলিকাতায় সর্ব্বপ্রথম মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সিস গ্ল্যাডউইন 'দি ক্যালকাটা গেজেট' প্রেস স্থাপন করেন। গবর্মেণ্টের যাবতীয় ছাপার কাজ এই ছাপাখানায় হইত।

মুদ্রাযন্ত্র-প্রতিষ্ঠার যুগে বাংলা গদ্য

সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত বাংলা-গদ্যের যে নমুনাটুকু ইতিপূর্ব্বে (জগতধির রায়ের দরখাস্ত) উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা হইতেই বাংলা-গদ্যের তৎকালীন প্রকৃতি ধরা পড়িবে; সেই গদ্যই কি ভাবে পরিবর্ত্তিত, পরিবর্জ্জিত ও রূপান্তরিত হইতে হইতে বর্ত্তমান অবস্থায় পৌছিল, তাহার ইতিহাস আজও পর্য্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে লিখিত হয় নাই। এক হিসাবে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে যে ভাষার প্রামাণিক আত্মপ্রকাশ দেখিতেছি, তাহা বাংলা দেশে মুসলমান-প্রভাবের ফল। ধর্ম্ম ও সমাজ জীবনে দীর্ঘ ছয় শত বৎসরের বৈদেশিক শাসন নানা ভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, সেই চাপে বাংলা ভাষার অন্তঃ ও বহিঃ প্রকৃতিও অব্যাহত থাকে নাই। কবিতায় ইহা তেমন প্রকট হয় নাই। একমাত্র ভারতচন্দ্র 'যাবনীমিশাল' ভাষা ইচ্ছা করিয়া প্রয়োগ করিয়াছিলেন; এমন কি, মুসলমান কবি আলাওলের ভাষাও সংস্কৃত-ঘেঁষা। কিন্তু ব্যাবহারিক জীবনে প্রাত্যহিক প্রয়োজন সাধনে গদ্যের প্রয়োগ; সুতরাং আরবী ও পারসী শব্দকোষের দ্বারা বাংলা দেশের মৌখিক ও বৈষয়িক ভাষা প্রবলভাবে আক্রান্ত হইয়াছিল। এখন পর্য্যন্ত সে যুগের ভাষার নমুনা হিসাবে যত চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ ইত্যাদি দাখিল করা হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটিতেই এই আক্রমণের আঘাত সুস্পষ্ট। বাংলা দেশে যদি ইংরেজের আগমন না ঘটিত তাহা হইলে আজিও আমাদিগকে বাংলা ভাষা লিখিতে বসিয়া "গরিবনেওাজ শেলামত" বলিয়া সুরু করিয়া "ফিদবি" বলিয়া শেষ করিতে হইত। তাহা মঙ্গলের হইত কি অমঙ্গলের হইত, আজ সে বিচার করিয়া লাভ নাই।

সংস্কৃতীকরণ

১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হালহেড এবং পরবর্ত্তী কালে হেন্‌রি পিট্‌স ফরষ্টার ও উইলিয়ম কেরী বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতজননীর সন্তান ধরিয়া আরবী পারসীর অনধিকারপ্রবেশের বিরুদ্ধে রীতিমত ওকালতি করিয়াছেন এবং প্রকৃতপক্ষে এই তিন ইংলণ্ডীয় পণ্ডিতের যত্ন ও চেষ্টায় অতি অল্প দিনের মধ্যে বাংলা ভাষা সংস্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে এই আরবী-পারসী-নিসূদন-যজ্ঞের সূত্রপাত এবং ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে আইনের সাহায্যে কোম্পানীর সদর মফস্বল আদালতসমূহে আরবী পারসীর পরিবর্ত্তে বাংলা ও ইংরেজী প্রবর্ত্তনে এই যজ্ঞের পূর্ণাহুতি। বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মও এই বৎসরে। এই যজ্ঞের ইতিহাস অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক; আরবী পারসীকে অশুদ্ধ ধরিয়া শুদ্ধ পদ প্রচারের জন্য সেকালে কয়েকটি ব্যাকরণ-অভিধানও রচিত ও প্রচারিত হইয়াছিল; সাহেবেরা সুবিধা পাইলেই আরবী-পারসীর বিরোধিতা করিয়া বাংলা ও সংস্কৃতকে প্রাধান্য দিতেন; ফলে দশ পনর বৎসরের মধ্যেই বাংলা-

গদ্যের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর অষ্টম ও নবম দশকে স্বয়ং হালহেড এবং বাংলার ক্যাক্‌স্টন অদ্বিতীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ভগবদ্‌গীতার অনুবাদক চার্লস উইলকিন্স সংস্কৃত ও বাংলা শব্দসংগ্রহে* মনোনিবেশ করিয়া সংস্কৃত রীতিতে বাংলার শব্দকোষ সমৃদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৭৭৮ সালে লিখিত হালহেড সাহেবের মন্তব্যপাঠে এই সকল বৈদেশিক পণ্ডিতের মনোভাব সুস্পষ্ট ধরা পড়িবে। তিনি লিখিয়াছিলেন—

Hitherto we have seen the formation and construction of the Bengal language in all its genuine simplicity; when it could borrow Shanscrit terms for every circumstance without the danger of becoming unintelligble, and when tyranny had not yet attempted to impose its fetters on the freedom of composition·········how far the Modern Bengalese have been forced to debase the purity of their native dialect, by the necessity of addressing themselves to their Mahommedan Rulers······[who] obliged the natives to procure a Persian translation to all the papers which they might have occasion to present. This practice familiarised to their ears such of the Persian terms as more immediately concerned their several affairs; and by long habit they learnt to assimilate them to their own language, by applying the Bengal inflexions and terminations. †

অর্থাৎ, বাংলা-গদ্যের আবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাংলা লিখিত ভাষা প্রয়োজনমত সংস্কৃত শব্দভাণ্ডার হইতে শব্দসম্ভার আহরণ করিত বলিয়াই ভাষার রীতি ও প্রকৃতি অকৃত্রিম ও সরল ছিল। কিন্তু মুসলমান-শাসনকর্ত্তাদের অত্যাচারে সকল ব্যাপারে পারসী-ব্যবহার বাধ্যতামূলক হওয়াতে চলিত ভাষার শুদ্ধতা নষ্ট হইয়াছে এবং কেবল মাত্র অভ্যাসের দোষে বহু পারসী শব্দ বাংলা ভাষার অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে।

হালহেড তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকায় আরও বলিয়াছেন যে, খাঁটি বাংলা ভাষার ব্যাকরণ দ্বারা অধুনা বাংলা দেশে ব্যবহৃত ভাষার সম্যক্ হালচাল উপলব্ধি সম্ভব নয়। যে বহুসংখ্যক রাজনৈতিক আন্দোলনের দ্বারা বাংলা দেশ পীড়িত হইয়াছে সেগুলি দেশের ভাষার সারল্যও নষ্ট করিয়াছে এবং ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী, ভিন্নদেশবাসী ও পৃথক্ রীতিনীতিসম্পন্ন লোকদের সহিত দীর্ঘকালব্যাপী লেনদেনের ফলে বাঙালীর কানে বৈদেশিক শব্দ আর অপরিচিত ঠেকে না। মুসলমান, পোর্ত্তুগীজ ও ইংরেজ পর-পর সকলেই ধর্ম্ম, আইন, কারুশিল্প ও বিজ্ঞান সম্পর্কিত বহু শব্দসম্ভার বাংলা ভাষার কাঁধে চাপাইয়া দিয়াছে।‡

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে হেন্‌রি পিট্‌স্ ফরষ্টার তাঁহার সুবিখ্যাত ইংরেজী-বাংলা অভিধান সঙ্কলন করিতে গিয়া বাংলা ভাষা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

it [তাঁহার শব্দসংগ্রহ] will nevertheless assist in forming an idea of the richness of the language, and tend to show its capability of being applied

* N. B. Halhed প্রণীত *A Code of Gentoo Laws* (১৭৭৬ খ্রীঃ) ও হটন সাহেবের বাংলা-ইংরেজী অভিধানের (লণ্ডন ১৮৩৩) ভূমিকায় স্যর চার্ল্‌স উইলকিন্সের শব্দসংগ্রহের উল্লেখ দ্রষ্টব্য।

† N. B. Halhed : *A Grammar of the Bengal Language*, pp. 207-8.

‡ Halhed : *A Grammar of the Bengal Language*, pp. xx-xxi.

to every species of composition, and of expressing every idea of the mind, without the use of Persian or Arabick pedantisms :—which, as far as my limited knowledge has enabled me, I have studiously endeavoured to avoid, while I have been solicitous to restore to their proper rank, the pure Bongalee terms, whose places they had usurped.······—Introduction, i.

······Exclusive of a stock of original words, more copious than the Greek itself, the polite Bongalee possesses a very great variety of modifying particles, which add much to the beauty and energy of the Tongue—*Ibid*, ii.

It must surely then appear a glaring inconsistency, that we should continue to use the Persian, with which the natives are as little acquainted as ourselves, as the official language; and daily experience proves the disadvantages of our not being able to hold a general personal intercourse, with the people committed to our superintendence, except through the medium of a third person, too frequently interested in imposing on both parties —*Ibid*, iv.

ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝাইবার জন্ম ফরষ্টার সাহেব আদালতের একটি বিচারের দৃষ্টান্ত দ্বারা এই ভাষা-বিভ্রাট প্রকট করিয়াছেন।

সম্পূর্ণ বর্ণজ্ঞানহীন সর্ব্বনিম্ন ডোম-শ্রেণীর এক জন ফরিয়াদী প্রথমতঃ থানার দারোগার নিকট কাহারও বিরুদ্ধে সামান্ত নালিশ জানাইল। পারসী ভাষায় তোতাকাহিনী পর্য্যন্ত দারোগা সাহেবের বিদ্যা। ডোমের আরজি দারোগা সাহেব পারসী অথবা বাংলাতে লিখিয়া লইলেন; যদি পারসীতে লেখেন তাহা হইলে এই পারসীবিশারদ পারসী হরফে কুৎসিত বাংলা লিখিবেন, মধ্যে মধ্যে পারসী বাক্যবিন্যাস থাকিবে; আর যদি বাংলায় লেখেন তাহা হইলে ফরিয়াদীর নালিশ তিনি এই শ্রেণীর পারসীতেই অনুবাদ করিয়া লইবেন!—সাক্ষীদের বক্তব্যও এই সঙ্গে এই পদ্ধতিতে লিখিয়া লইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠান হইল; সেখানেও আর এক দফা পারসীতে বাংলাতে তালগোল পাকাইল এবং শেষ পর্য্যন্ত নিজামৎ আদালতের নিকট ঘটনার বিবরণ বিচারার্থ প্রেরিত হইল। সেখানে এই অদ্ভুত বিবরণের ইংরেজী অনুবাদ যাহা দাঁড়াইল তাহাতে আসামীর দীর্ঘ কারাবাস, দ্বীপান্তর অথবা ফাঁসি পর্য্যন্ত হওয়া বিচিত্র নয়।

উইলিয়ম কেরীরও বিশ্বাস ছিল—

The Bengalee language is superior in point of intrinsic merit to every language spoken in India and in point of real utility yields to none.

এই আন্দোলনের ফলে ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের দিকে বাংলা ভাষা যে রূপ লইয়াছিল W. S. Seton-Karr সে সম্বন্ধে ঐ সালে লিখিয়াছিলেন—

Closely dependant on the parent Sanskrit, it possesses many of the advantages, and few of the blemishes, which characterize that first of Indo-Germanic tongues. Though not without a few dialectical variations, it preserves mainly an unbroken regularity, from the banks of the Subhanrika [সুবর্ণরেখা], to the frontiers of Assam. It is simple in its structure, lucid in its syntax, and vigorous in its expressions, and above all, it is in-

separably connected in our mind with those pleasing recollections, which the progress of education, and the first dawning of enlightened opinions in the Lower Provinces, cannot fail to excite…It has frequently been remarked that Bengali more closely resembles Sanskrit than Italian does Latin. We might go further, and almost say that it has altered very little more from the original, than modern Greek has from the language of Thucydides and Plato. Bengali has experienced but a moderate change from the vicissitudes of conquest, and the successive sway of Mussulman or Affghan dynasties. It is true that the influx of Persian and Arabic substantives, into the spoken and even the written dialect, has been very considerable : but the great landmarks of the language have remained fixed and unalterable.

এরূপ বিস্তৃতভাবে বাংলা ভাষা সম্পর্কে তৎকালীন ইংরেজ পণ্ডিতদের মতামত উদ্ধৃত করিবার কারণ এই যে, বর্ত্তমানে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বলিয়া যাহা খ্যাত, অষ্টাদশ শতাব্দীর নীহারিকা-অবস্থা হইতে তাঁহাদের সম্মিলিত চেষ্টাতেই তাহা প্রথম নির্দ্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করে। এ বিষয়ে বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতি সম্পূর্ণভাবে তাঁহাদের কাছেই ঋণী ; অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাসে বাঙালীর দান নাই বলিলেই হয়। যে এক জন মাত্র বাঙালীর নাম অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে পাই, তিনিও ইঁহাদের সহিতই সম্বন্ধযুক্ত, ইঁহাদের উৎসাহ ও যত্নে প্রতিপালিত; স্বাধীনভাবে বাংলা-সাহিত্য সম্পর্কে ইঁহার কোনও কীর্ত্তিই নাই। এই একক বাঙালীর নাম রামরাম বসু। জন টমাস ও উইলিয়ম কেরী প্রবর্ত্তিত শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশন সম্পর্কে ইঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে যাহার সূত্রপাত, ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাহার একুশ বৎসরের ইতিহাস খুব বিরাট ও বিচিত্র হইবার কথা নয়, কিন্তু তথাপি সেগুলিই গোড়ার কথা এবং সত্য ও কৃতজ্ঞতার খাতিরে এই ইতিহাস আমাদিগকে জানিতেই হইবে। সত্য বটে কোনও মৌলিক রচনা এই কালে রচিত হয় নাই, সত্য বটে লেখক ও সংগ্রাহক মাত্রেই বৈদেশিক, তথাপি একথা আমাদের আজ অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে ইঁহাদের সমবেত চেষ্টাতেই বাংলা লিখিত-গদ্য একটা রূপ ধারণ করিতেছিল—যাহা বাঙালী-লেখকের লেখনীমুখে সর্ব্ব-প্রথম 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া রাজা রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমে পরিণতি লাভ করিয়াছে।

১৭৭৮—১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দ

এই একুশ বৎসরের ইতিহাসে আমরা মাত্র ছয় জন বৈদেশিক কর্ম্মীর নাম পাইতেছি ; ইঁহাদের কীর্ত্তি ব্যাকরণ, অভিধান ও শব্দশিক্ষা প্রণয়নে এবং কয়েকটি আইনের বহির অনুবাদ রচনায় মাত্র পর্য্যবসিত। কিন্তু এই সকল মহানুভব ব্যক্তির অমানুষিক অধ্যবসায় ব্যতিরেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের দুর্গম পথ দুর্গমই থাকিয়া যাইত ; আয়াসপ্রিয় ও শিথিলমনা বাঙালীর দ্বারা এই দুর্গম দুরারোহ ভূখণ্ডে ব্যাকরণ-অভিধানের খোন্তা-কোদাল

চালাইয়া একটা পথ গড়িয়া তোলা কঠিন হইত। এই বৈদেশিক ছয় জনের নাম আমরা শ্রদ্ধার সহিত উচ্চারণ করিতেছি।

প্রথম—নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড, ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজী ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ *A Grammar of the Bengal Language* রচনা করিয়া চার্লস উইলকিন্স-নির্ম্মিত সীসার বাংলা হরফ ব্যবহার করিয়া তাহা মুদ্রিত করেন। মুদ্রণস্থল হুগলী।

দ্বিতীয়—জোনাথান ডানকান, ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে *Regulations for the Administration of Justice, in the Courts of Dewannee Adaulut* অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। মুদ্রণস্থল কলিকাতা, The Honorable Company's Press.

তৃতীয়—এন. বি. এডমনষ্টোন ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে *Bengal Translation of Regulations for the Administration of Justice, in the Fouzdarry, or Criminal Courts; in Bengal, Behar and Orissa* অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। মুদ্রণস্থল কলিকাতা, The Honorable Company's Press.

ইনি ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে *Bengal Translation of Regulations for the guidance of the Magistrates. Passed by the Governor General in Council in the Revenue Department, on the 18th of May, 1792* [with some snpplementary enactments] অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। মুদ্রণস্থল কলিকাতা, The Honorable Company's Press.

চতুর্থ—হেন্‌রি পিট্‌স্ ফরষ্টার "১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত নবাব গবর্ণর জেনারল বাহাদুরের হজুর কৌনসেলের ১৭৯৩ সালের তাবৎ আইন। তাহা নবাব গবর্ণর জেনারল বাহাদুরের হজুর কৌনসেলের আজ্ঞাতে মুদ্রাঙ্কিত" করেন। মুদ্রণস্থল কলিকাতা।

এই হেন্‌রি ফরষ্টারই ছয় বৎসর পরে অর্থাৎ ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তাঁহার সুবিখ্যাত *A Vocabulary in two parts, English and Bongalee, and vice versa* পুস্তকের প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন। ইহার দ্বিতীয় খণ্ড ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে বাহির হয়। মুদ্রণস্থল কলিকাতা, ফেরিস এণ্ড কোম্পানীর প্রেস।

পঞ্চম—এ. আপজন্, ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার 'ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালি বোকেবিলরি' প্রকাশ করেন। মুদ্রণস্থল কলিকাতা, দি ক্রনিকল প্রেস।

এবং ষষ্ঠ—জন্ মিলার ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে *The Tutor* বা 'সিক্ষ্যা গুরু' পুস্তক প্রকাশ করেন। মুদ্রণস্থল অনির্দ্দিষ্ট, সম্ভবতঃ কলিকাতা।

বাংলা-গদ্যের ভিত্তিপত্তনে এই ছয় জন ইংরেজের ব্যক্তিগত চেষ্টা ও অধ্যবসায় সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তাঁহাদের কালে লোকের মুখে মুখে প্রচলিত বিশৃঙ্খল বাংলা ভাষাকে তাঁহারাই ব্যাকরণ-অভিধানের গণ্ডীর মধ্যে বাঁধিয়া সাধারণের ব্যবহারের উপযোগী করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। বাংলা ভাষা ও তাহার উন্নতিসাধনে হালহেড ও

ফরষ্টারের দান সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ প্রাচ্যভাষাবিৎ এইচ. টি. কোলব্রুক ১৮০১ 'এশিয়াটিক রিসার্চেস' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

Gaura, or, as it is commonly called, *Bengalah* or Bengali is the language spoken in the provinces, of which the ancient city of *Gaur* was once the capital. It still prevails in all the provinces of Bengal, excepting perhaps some frontier districts ; but is said to be spoken in its greatest purity in the eastern parts only ; and, as there spoken, contains few words which are not evidently derived from *Sanscrit*. This dialect has not been neglected by learned men. Many *Sanscrit* poems have been translated, and some original poems have been composed in it. Learned *Hindus* in Bengal speak it almost exclusively : verbal instruction in sciences is communicated through this medium, and even publick disputations are conducted in this dialect. Instead of writing it in the *Devanagari*, as the *Pracrit* and *Hinderi* are written, the inhabitants of Bengal have adopted a peculiar character, which is nothing else but *Dera-nagari* difformed for the sake of expeditious writing. Even the learned amongst them employ this character for the *Sanscrit* language, the pronunciation of which too they in like manner degrade to the Bengali standard. The labours of Mr. Halhed and Mr. Forster have already rendered a knowledge of the *Bengali* dialect accessible ; and Mr. Forster's further exertions will still more facilitate the acquisition of a language, which cannot but be deemed greatly useful, since it prevails throughout the richest and most valuable portion of the British possessions in India.
—Vol. VII, pp. 223-4.

হালহেড ও তাঁহার ব্যাকরণ, ফরষ্টার ও তাঁহার অভিধান সম্পর্কে ইতিপূর্ব্বে অনেকে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন ; তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মহাশয়ের আলোচনা উল্লেখযোগ্য। আপজনের অভিধান সম্পর্কে আমি ৪৩শ ভাগ 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র ৪র্থ সংখ্যায় যথাসম্ভব আলোচনা করিয়াছি। বাংলা-গদ্যের ইতিহাসে এগুলির বিস্তৃততর পরিচয় অনাবশ্যক।

জোনাথান ডান্‌কান

১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত জোনাথান ডানকান সাহেবের আইন-বহির অনুবাদটি বাংলা ভাষার ইতিহাসে একখানি মহামূল্য গ্রন্থ। বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত ইহাই সর্ব্বপ্রথম সম্পূর্ণ গদ্যগ্রন্থ। ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২১৫+৩১। যে-সকল আইন নন্দকুমার-মামলার বিচারপতি বিখ্যাত স্যর ইলাইজা ইম্পে কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া 'ইম্পে কোড' নামে প্রসিদ্ধ ছিল, এই গ্রন্থ তাহারই অনুবাদ। এদেশের কুত্রাপি এই পুস্তকের সন্ধান পাওয়া যায় নাই ; লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ম ও ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরীতে ইহার এক খণ্ড আছে।

জোনাথান ডানকান ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মে জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সিবিলিয়ান রূপে কলিকাতায় পদার্পণ করেন এবং ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এখানে অবস্থান করেন। তৎকালীন বাংলা ভাষায় ইহার অসাধারণ দখল দেখিয়া ওয়ারেন হেষ্টিংস ইহাকে 'ইম্পে কোড' অনুবাদে নিযুক্ত করেন। ১৭৮৮ সালে ইনি

মপস্বল দেওয়ানি আদালত সকলের ও সদর দেওয়ানি আদালতের
বিচার ও ইনসাফ চলন হইবার কারণ ধারা ও নিয়ম ——

শ্রীযুত বড়সাহেব ও কৌন্সলের সাহেবলোক বিচারের যে নিয়ম ও ধারা
ইঙ্গরেজি ১৭৭২ সনের ২১ আগস্ত মাসে বাঙ্গলা ১১৭৯ সনের ৮
ভাদ্রে নিরুপণ করিয়া দিলেন তাহাতে পাটনা ও মুরসিদাবাদ ও ঢাকা ও
দিনাজপুর কিম্বা পুরনিয়া ও বর্দ্ধমান ও কলিকাতা এই সকল স্থানেতে
মপস্বলের দেওয়ানি আদালতের ও সহর কলিকাতায় সদর দেওয়ানি
আদালত আপিলের কচহরি স্থৈর্য্য হইয়াছিল তাহার পর ইঙ্গ ১৭৭৩
সন লাগাএদ ১৭৭৯ সন ইঙ্গরেজি সেই সদর আদালত স্থগিত ছিল
পরে ১৭৮০ সনে শ্রীযুত বড়সাহেব ও কৌন্সলি সাহেব লোকের
আজ্ঞামতে পুনশ্চ স্থৈর্য্য হইল কিন্তু শ্রীযুত বড় সাহেব ও কৌন্সলি
সাহেব লোক অনবকাস জন্যে কখন সেই সদর আদালতে বসিতে
পারেন নাই একারণ সেই সনের অক্টোবর মাসের ২৪ বাঙ্গলা সন
১১৮৭। ১১ কার্ত্তিক তারিখে আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে সদর আদালতে

একজন

জোনাথান ডানকান্-অনূদিত ও ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত *Regulations for the Administration of Justice in the Courts of Dewannee Adaulut* পুস্তকের একটি পৃষ্ঠা

ওয়ারহ দুষ্টলোক দিগকে গ্রেপ্তার করিয়া নিচের লিখা হুকুম মাফিক
মোকদ্দমা তজবিজ করিয়া আদালতে দায়ের ও সায়েরের নিবিস্তায় রহিয়াথাকিবার
জন্যে ঐ সকল দুষ্টলোকের হাজির জামিন লইবেন ——

৪ ধারা ——

জখন নালিসা আরজি কাহারনামে খুনি ও ডকাতি ও দিগর তক্সীর জায়ের
জন্যতে ফৌজদারির সাহেবের নিকট পঁউছে সাহেব মজকুর ফৈরাদির প্রকৃত
নালিশের উপর মুচুলিকা লওনের পর আসামী ধরিবা আনার জন্যে একজবিন
ফৈরাদির ও মতের তক্সীন তাহাতে লিখিয়া আপন মোহর ও দস্তখতে জারি
করিবেন আর জখন সাহেব মজকুরের সাক্ষাতে আসামী পঁউছে তাহার উপর
তক্সীর তজবিজ তদারক করিয়া জবানবন্দি বিনা মুচুলিকা লেখাইয়া লইবেন [illegible]
ফৈরাদী ও মোকদ্দমার ওকিফকার লোক দিগের জবানবন্দি মুচুলিকা করা[illegible]
লেখাইবেন যে সুরতে এইমত তহকিক ও তজবিজের পর সাহেব মজকুর
নিশ্চয় হয় যে তক্সীর মজকুর প্রকৃত হয়নাই কিম্বা সে উহমত আসামীর
উপর নিরর্থক কিম্বা সেইদণ্ডে আসামী মজকুরকে খালাস দিবেন কিন্তু যে সুরতে
এমত নিশ্চিত হয় যে তক্সীর মজকুর প্রকৃত বটে ও ঐ তক্সীর আসামী মজকুর
করিয়াছে সাহেব মজকুর তক্সীরের উপযুক্ত মাফিক কিম্বা তাহাকে বন্দ[illegible] করিবেন
কিম্বা আদালতে দায়েরের ও সায়েরের সে মোকদ্দমার তজবিজের জন্যে তাহার
হাজির জামিন লইবেন ও ফৈরাদী ও ইস্তাদ লোক দিগেরের জামিন লইবেন
[illegible] তজবিজের কালে হাজির থাকেন ——

৫ ধারা

এন. বি. এডমন্‌ষ্টোন-অনূদিত ও ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত *Bengal Translation of Regulations for the Administration of Justice in the Fouzdarry, or Criminal Courts in Bengal, Behar and Orissa* পুস্তকের একটি পৃষ্ঠা

বারাণসীর রেসিডেন্ট সুপারিন্টেনডেন্ট হইয়া যান। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস হইতে ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দের ১১ আগষ্ট তারিখে মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি বোম্বাইয়ের গবর্ণর ছিলেন। টিপু সুলতানের সহিত যুদ্ধ ও মারাঠা-যুদ্ধ তাঁহার সময়েই সংঘটিত হয়।

জোনাথান ডানকানের ভাষার কিছু নমুনা দিতেছি—

মপস্বল দেওয়ানি আদালত সকলের ও সদর দেওয়ানি আদালতের বিচার ও ইনসাফ চলন হইবার কারণ ধারা ও নিয়ম—

শ্রীযুত বড়সাহেব ও কৌসলের সাহেবলোক বিচারের যে নিয়ম ও ধারা ইঙ্গরেজি ১৭৭২ সনের ২১ আগস্ত মাসে বাঙ্গলা ১১৭৯ সনের ৮ ভাদ্রে নিরুপণ করিয়াছিলেন তাহাতে পাটনা ও মুরসিদাবাদ ও ঢাকা ও দিনাজপুর কিম্বা পূরনিয়া ও বর্দ্ধমান ও কলিকাতা এই সকল স্থানেতে মপস্বলের দেওয়ানি আদালতের ও সহর কলিকাতায় সদর দেওয়ানি আদালত আপিলের কচহরি স্থৈর্য্য হইয়াছিল তাহার পর ইস্তক ১৭৭৪ সন লাগায়দ ১৭৭৯ সন ইঙ্গরেজি সেই সদর আদালত স্থগিত ছিল পরে ১৭৮০ সনে শ্রীযুত বড়সাহেব ও কৌসলি সাহেব লোকের আজ্ঞামতে পুনশ্চ স্থৈর্য্য হইল কিন্তু শ্রীযুত বড়সাহেব ও কৌসলি সাহেব লোক অনবকাশ জন্যে কখন সেই সদর আদালতে বসিতে পারেন নাই একারণ সেই সনের অক্তোবর মাসের ২৪ বাঙ্গলা সন ১১৮৭।১১ কার্ত্তিক তারিখে আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে সদর আদালতে এক জন হাকিম তাঁহারদিগের অভিপ্রায় মতে নিযুক্ত হবেন তিনি সেই আদালতে বসিয়া বিচার করিবেণ সংপতি তাহা অন্যথা হইয়া এই স্থির হইল যে সাহেবেরা আপনা হইতে অথবা আপনারদিগের প্রস্থে যাহারদিগকে নিযুক্ত করেণ তাঁহারা সেই কার্য্য করিবেণ আর মপস্বল দেওয়ানি আদালতের জিলাসকল বিস্তীর্ন্ন জন্যে লোকের ব্যামোহ হইত ইহা জানিয়া ও বিচার শীঘ্র ও ভাল মতে হয় একারণ ১৭৮১ সনের ৬ ছয়ক্রি আপরিল বাঙ্গলা ১১৮৭ সনের ২৭ চৈত্রমাসে মপস্বলে আর কয়েক স্থানে নূতন দেওয়ানি আদালতের কচহরি মেদিনীপুর ও রঘুনাথপুর ও রঙ্গপুর ও চাতরা ও লোয়া ও দরভাঙ্গা ও ভাগলপুর ও নাটোর ও আজমিরিগঞ্জ ও বাকরগঞ্জ ও ইসলামাবাদ ও মূড়লিতে নিরুপিত হইয়াছে এবং পূর্ব্বে লোকের আয়াস ও ব্যামোহ না হয় এ জন্যে পুরনিয়ার আদালত তাজপুরে নিরুপিত হইয়াছিল এখনও সেই হেতু লোয়ার আদালত মিছুইতে ও রঘুনাথপুরের আদালত রাজহাট ও আজমিরিগঞ্জের আদালত সুলতান্নুইতে স্থৈর্য্য হইল আর ইহার পূর্ব্বে কোন ২ সময় কোন ২ কার্য্যের নিমিত্তে মপস্বলের সকল আদালত ও সদর আদালতের বিচারের কারণ অনেক প্রকার আজ্ঞা হইয়াছে কিন্তু তাহার মধ্যে অনেক কথা এমত আছে যে নূতন আদালত সকলের কার্য্যে আইসে না…

১৭৭৮ সনে মুদ্রিত যে পত্র পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, এই গ্রন্থের ভাষা তাহা অপেক্ষা কতখানি সংস্কৃত হইয়াছে তুলনা করিয়া দেখিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

এন. বি. এডমনষ্টোন

নীল বেঞ্জামিন এডমনষ্টোনও সিবিলিয়ান ছিলেন। পার্লামেন্টের সদস্য স্যর আর্চিবল্ড এডমনষ্টোনের এই পুত্র ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সিবিলিয়ান

হইয়া কলিকাতায় আসেন ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে; সেক্রেটারিয়েট হইতে তিনি গবর্মেণ্টের পার্সী-অনুবাদক পদে উন্নীত হন। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গবর্ণর-জেনারেলের প্রাইভেট সেক্রেটরী নিযুক্ত হন। তিনি ১৮১২ সাল হইতে ১৮১৮ সাল পর্য্যন্ত সুপ্রীম কাউন্সিলের মেম্বর ছিলেন ও ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এক জন ডিরেক্টর হইয়াছিলেন। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে তাঁহার মৃত্যু হয়।

এডমনষ্টোনের ভাষা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল ও পার্সীঘেঁষা। দৃষ্টান্ত দিতেছি—

সেওয়ায় মহালাত মুতালুকে সহর মুরসিদাবাদ ও আজিমাবাদ ও জাহাঁগির নগর জে এই তিন মোকামে আদালতের সিরিস্তা আলাহিদা মোকরর হইল আর এই তিন আদালতের এলাকার সরঈ সাহেব জিলাদিগের তজবিজমতে হইবে মঞ্জুর হইল এবং সেওায় সহর কলিকাতা জেবড় আদালতের তাবে আছে জারি থাকিবেক—

[অন্যত্র]—সকল ফেরকার লোককে রক্ষা করা হাকিমের কত্তর্ব্ব কর্ম্ম বিশেসত তাহাদিগে জাহারা সহজেই অত্যন্ত দুস্থ পেটার তালুকদারান ও রায়ত লোক ও আর খেত আবাদ করণওালা দিগের ভালর নিমিথ্যে ও রক্ষা করিবার নিমিথ্যে নবাব গবনর জানরেল বাহাদুর জখন মনাছেব বুঝেন আইন করিবেন…

হেন্‌রি পিট্‌স্‌ ফরষ্টার

হেন্‌রি পিট্‌স্‌ ফরষ্টারের জীবনী অনেকে আলোচনা করিয়াছেন।* তাঁহার বাংলা ও সংস্কৃত জ্ঞান ছিল অসাধারণ এবং প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে বাংলা ভাষা কিঞ্চিৎ মর্য্যাদা অর্জ্জন করিয়াছিল। সি. ই. বাক্‌ল্যাণ্ড তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

…largely through his efforts, Bengali became the official as well as the literary language of Bengal. . . .

তাঁহার বিখ্যাত কর্ণওয়ালিস কোডের অনুবাদের একটু পরিচয় দিতেছি—

হাকীমের উচিত জে ছোট বড় সকল লোকের বিশেষতো দুস্থ ও গরিবদিগের রক্ষা নিয়ত করেণ অতয়েব ঐ শ্রীযুত সকল মফস্বলী তলুকদার ও প্রজা প্রভৃতি চাসী লোকদিগের কল্যাণ ও কুশলের নিমিত্ত যে কালে যে আইন করণ উচিত জানেন সেকালে তাহাই নির্দ্দিষ্ট করেণ কিন্তু এমত সকল আইন নির্দ্দিষ্ট হইবাতে কোনো প্রকারে জমীদার ও হজুরী তালুকদার প্রভৃতি ভূম্যধিকারীদিগের শিরে যে মোকররী জমার ধার্য্য রহে তাহা দিবার বিষয়ে তাহারদিগের কিছু আপত্য ও ওজর হইবেক না।

জন্‌ মিলার

এখন পর্য্যন্ত মিলারের নাম বাংলা-ইংরেজী অভিধান সম্পর্কে লণ্ডের ক্যাটালগে, 'বিশ্বকোষে' ও ডক্টর সুশীলকুমার দের *History of Bengali Literature* পুস্তকে উল্লিখিত

* S. K. De: *Bengali Literature in the Nineteenth Century*, pp. 89-92.

দেখিয়াছি, কিন্তু তাঁহার অভিধান কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাগারে আখ্যাপত্রহীন যে পুস্তকখানিকে মিলারের অভিধান বলিয়া সুশীলবাবু উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা পরে আপ্‌জনের 'বোকেবুলরি' বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং এত দিন মিলারের নামটাই ছিল—তাঁহার কীর্ত্তির কোনও পরিচয় পাওয়া যায় নাই। রামকমল সেনের *A Dictionary in English anl Bengalee* (1834) পুস্তকের ভূমিকায় লিখিত আছে—

> In 1801 a *Mr. Miller* compiled a work in English and Bengalee, containing in a thin folio volume about a hundred and forty pages, in which were given the alphabet, a few syllables, the names of a few of the productions, some elementary rules of Grammar and some stories not equal however to forty pages of the English Reader lately published by the School Book Society. He printed no fewer than 1000 copies of this work and the whole impression was subscribed for at 32 Rupees the copy, before the work issued from the press.—Pp. 17-18.

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস-লেখকগণ সম্ভবতঃ রামকমলের এই বিবৃতিটুকু ভাল করিয়া দেখেন নাই, দেখিলে মিলারের ওয়ার্ডবুকটি 'অভিধান'-খ্যাতি লাভ করিত না। আমরা সম্প্রতি এই পুস্তকের একটি খণ্ডের সন্ধান পাইয়াছি ও পুস্তকের কয়েক পৃষ্ঠার ফোটোগ্রাফ আনাইয়াছি। জন মিলারের গ্রন্থের নাম—

> The Tutor or a New English and Bengalee Work, well adapted to teach the Natives English in three parts.
>
> সিক্ষ্যাগুরু কিম্বা এক নৈতন ইংরাজি আর বাঙ্গালা বহি ভালো উপযুক্ত আছে বাঙ্গালি দিগেরকে ইংরাজি সিক্ষা করাইতে তিন খণ্ডে Compiled Translated and Printed By John Miller 1797.

যে ক্যাটালগে এই পুস্তকের উল্লেখ দেখি তাহাতে ইহা 'শ্রীরামপুরে' মুদ্রিত বলিয়া উল্লেখ আছে। পুস্তকের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৬+১৬৪। কিন্তু শ্রীরামপুরে ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে কোনও মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া আমাদের জানা নাই। সেখানে উইলিয়ম কেরীর যত্নে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি তারিখে প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া আমরা জানি। সুতরাং সম্ভবতঃ পুস্তকটি কলিকাতার কোনও ছাপাখানায় মুদ্রিত হইয়া থাকিবে।

জন মিলারের কোনও পরিচয় সংগ্রহ করা দুরূহ। সেই সময় একাধিক 'জন মিলার' কোম্পানীর রাইটার রূপে নিযুক্ত ছিলেন; অন্য কোনও জন মিলারের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। এই পুস্তকের ভূমিকার ভাষা এত অদ্ভুত যে তাহা পড়িলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, জন্ মিলার বাংলা ভাষা সম্পর্কে নিরঙ্কুশ ছিলেন। ভূমিকাটি অংশতঃ এইরূপ—

বাঙ্গালিদিগেরকে

আমি এই অবধি বুঝিয়াছি বিশয়ের সহিত। জে কোনো কেতাব না অদ্যাবধি প্রকাশ পাইয়াছে সিখাইতে তোমাদিগেরকে ইঙ্গরাজি কথা সহজে আর অনাআসে। তাহাতে লউয়েছে আমারে সাংগ্রহ করিয়া তরজমা করিতে এই কেতাব। এই উমেদ করো জে এ তোমাদিগের সাহবের দ্বারায় মঞ্জুর হয়।

আমার মনস্ত ছিলো সংপরোধ করিতে এই কেতাব সমস্কৃততে। কিন্তু আমি এক্ষেনে দেখিলাম জে অতি অল্প লোক আছে জে আমার এ বিশয় বুঝে। অতয়েব আমি বিবেচনা করিয়া এ তরজমা করিয়াছি চলতি কথার দ্বারায়।

বাংলা-গদ্যের সহিত এই পুস্তকের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ না হইলেও বাংলা ভাষায় লিখিত প্রথম ইংরেজী ব্যাকরণ হিসাবে এই পুস্তক ইতিহাসে অতিশয় মূল্যবান্‌। প্লেটে মুদ্রিত সূচীপত্র হইতে এই পুস্তকের বিষয়বস্তুর ধারণা পাওয়া যাইবে। মিলার সাহেব ইংরেজী হইতে বাংলা অনুবাদের যে সহজ পদ্ধতি সেই যুগে আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক তাহা কিছুকাল অনুসৃত হইয়াছিল বলিয়া ফিরিঙ্গি বাংলার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল।

ইহার পরেই আমরা শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত বাংলা-গদ্যের সম্পর্কের কথা বলিব।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৪৫শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা
১৩৪৫

বাংলা 'ভাষাপরিচয়ে'র ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভাষার আশ্চর্য রহস্য চিন্তা ক'রে বিস্মিত হই। আজ যে বাংলা ভাষা বহু লক্ষ মানুষের মন-চলাচলের হাজার হাজার রাস্তায় গলিতে আলো ফেলে' সহজ করেছে পরস্পরের প্রতি-মুহূর্তের বোঝা পড়া, আলাপ পরিচয়, এর দীপ্তির পথরেখা অনুসরণ ক'রে চলে কালের কোন্ দুর্গম দিগন্তে গিয়ে পৌছব। তারা কোন্ যাযাবর মানুষ, যারা অজানা অভিজ্ঞতার তীর্থযাত্রায় দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ের পথিক ছিল, যারা এই ভাষার প্রথম কম্পমান অস্পষ্ট শিখার প্রদীপ হাতে নিয়ে বেরিয়েছিল অখ্যাত জন্মভূমি থেকে সুদীর্ঘ বন্ধুর বাধাজটিল পথে। সেই আদিম দীপালোক এক যুগের থেকে আর এক যুগের বাতির মুখে জ্ব'লতে জ্ব'লতে আজ আমার এই কলমের আগায় আপন আত্মীয়তার পরিচয় নিয়ে এল। ইতিহাসের যে বিপুল পরিবর্তনের শাখা-প্রশাখার মধ্য দিয়ে আদি যাত্রীরা চ'লে এসেছে তারি প্রভাবে সেই শ্বেতকায় পিঙ্গলকেশ বিপুলশক্তি আরণ্যকদের সঙ্গে এই শ্যামলবর্ণ ক্ষীণ আয়ু শহরবাসী ইংরেজ রাজত্বের প্রজার সাদৃশ্য ধূসর হয়েছে কালের ধূলিক্ষেপে। কেবল মিল চ'লে এসেছে একটি নিরবচ্ছিন্ন ভাষার প্রাচীন সূত্রে। সে ভাষায় মাঝে মাঝে নতুন সূত্রের জোড় লেগেছে, কোথাও কোথাও ছিন্ন হ'য়ে তাতে বেঁধেছে পরবর্তী কালের গ্রন্থি, কোথাও কোথাও অনার্য হাতের ব্যবহারে তার সাদা রং মলিন হয়েছে, কিন্তু তার ধারায় ছেদ পড়ে নি। এই ভাষা আজো আপন অঙ্গুলি নির্দেশ করছে বহুদূর পশ্চিমের সেই এক আদি জন্মভূমির দিকে যার নিশ্চিত ঠিকানা কেউ জানে না।

প্রাচীন ভারতবর্ষে অস্পষ্ট ইতিবৃত্তের প্রাকৃত লোকেরা যে ভাষায় কথা কইত, দুই প্রধান শাখায় তা বিভক্ত ছিল—শৌরসেনী ও মাগধী। শৌরসেনী ছিল পাশ্চাত্য হিন্দির মূলে, মাগধী অথবা প্রাচ্যা ছিল প্রাচ্য হিন্দির আদিতে। আর ছিল ওড্রী, উড়িয়া, গৌড়ী, বাংলা। আসামীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু অনতিপ্রাচীন যুগে আসামীতে গদ্য ভাষার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, এত বাংলায় পাই নে। সেই সব দৃষ্টান্তে যে ভাষার পরিচয় পাই তার সঙ্গে বাংলার প্রভেদ নেই ব'ললেই হয়।

মাগধী এবং শৌরসেনীর মধ্যে মাগধীই প্রাচীনতর। হর্ন্‌লে সাহেবের মতে এক সময়ে ভারতবর্ষে মাগধীই একমাত্র প্রাকৃত ভাষা ছিল। এই ভাষা পশ্চিম থেকে ক্রমে

পূর্বের দিকে এসেছে। আর দ্বিতীয় ভাষা প্রবাহ শৌরসেনী ভারতবর্ষে প্রবেশ ক'রে পশ্চিম দেশ অধিকার করেছিল। হর্ন্‌লের মতে আর্যরা ভারতবর্ষে এসেছিল দুইবার পরে পরে। উভয়ের ভাষায় মূলগত ঐক্য থাকলেও কিছু কিছু প্রভেদ আছে।

নদী যেমন অতি দূর পর্বতের শিখর থেকে ঝরনায় ঝরনায় ঝ'রে ঝ'রে নানা দেশের ভিতর দিয়ে নানা শাখায় বিভক্ত হ'য়ে সমুদ্রে গিয়ে পৌছয় তেমনি এই দূর কালের মাগধী ভাষা আর্য জনসাধারণের বাণীধারায় ব'য়ে এসে সুদূর যুগান্তরে ভারতের সুদূর প্রান্তে বাংলা-দেশের হৃদয়কে আজ ধ্বনিত করেছে, উর্বরা করেছে তার চিত্তভূমিকে। আজও শেষ হ'ল না তার প্রকাশ লীলা। সমুদ্রের কাছাকাছি এসে সে বিস্তৃত হয়েছে, মিশ্রিত হয়েছে, গভীর হয়েছে তার প্রবাহ, দেশের সীমা ছাড়িয়ে সর্বদেশের আবেষ্টনের সঙ্গে এসে মিলেছে। সেই দূর কালের সঙ্গে আর আমাদের এই বর্তমান কালের, বহু দেশের অজানা চিত্তের সঙ্গে আর বাংলাদেশের নবজাগ্রত চিত্তের মিলনের দৌত্য নিয়ে চলেছে এই অতি পুরাতন এবং এই অতি আধুনিক বাক্যস্রোত এই কথা ভেবে এর রহস্যে বিস্মিত হ'য়ে আছি। সেই বিস্ময়ের প্রকাশ আমার এই বইটিতে।

ভাষা জিনিসটা আমরা অত্যন্ত সহজে ব্যবহার করি, কিন্তু তার নাড়ীনক্ষত্রের খবর রাখা একটুও সহজ নয়। যে নিয়মের ঐক্য ধ'রে পরিচয় সহজ হয় ভাষার ইতিহাসে একটা তার অবিচ্ছিন্ন সূত্রও থাকে আবার তার বদলও চলে পদে পদে। কেন বদল হয় তার কৈফিয়ৎ সব সময়ে পাওয়া যায় না। সে সমস্ত কঠিন সমস্যার বিচার নিয়ে এ বই লিখছি নে। ভাষার ক্ষেত্রে চ'লতে চ'লতে যাতে আমাকে খুশি করেছে, ভাবিয়েছে, আশ্চর্য করেছে তারই কৌতুকের ভাগ সকলকে দেব ব'লেই লেখবার ইচ্ছে হ'ল। বিষয়টাকে যাঁরা ফলাও ক'রে দেখছেন ও তলিয়ে বুঝেছেন, এ লেখায় তাঁদের কাছে দুটো চারটে খুঁত বেরবেই। কিন্তু তা নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত হবার দরকার নেই।

আমাকে কোনো ভাষাতাত্ত্বিক অনুরোধ করেছিলেন আমার এই প্রকাশোন্মুখ বইখানিতে আমি যেন ভাষাবিজ্ঞানের ভূমিকা ক'রে কাজ আরম্ভ করি। তার যে উত্তর দিয়েছিলুম নিয়ে তা উদ্ধৃত ক'রে দিই। সেটা পড়লে পাঠকেরা বুঝবেন আমার এ বইখানি তত্ত্বের পরিচয় নিয়ে নয় রূপের পরিচয় নিয়ে।—

> আমার পক্ষে যা সব চেয়ে দুঃসাধ্য তাই তুমি আমাকে ফরমাস করেছ। অর্থাৎ মানুষের মূর্তির ব্যাখ্যা করবার ভার যে নিয়েছে তাকে তুমি মানুষের শারীর বিজ্ঞানের উপদেষ্টার মঞ্চে চড়াতে চাও। অহংকারে মানুষকে নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে অন্ধ করে—মধুসূদনের কাছে আমার প্রার্থনা এই যে দর্পহরণ করবার প্রয়োজন ঘটাবার পূর্বেই তিনি আমাকে যেন কৃপা করেন। আমার এ গ্রন্থে ব্যাকরণের বন্ধুর পথ একেবারেই এড়াতে পারি নি—প্রতি মুহূর্তে পদস্খলনের আশঙ্কায় কম্পান্বিত আছি—ভয় আছে পাছে আমার স্পর্ধা দেখে তাত্ত্বিকেরা "হায় কৃষ্টি," "হায় কৃষ্টি" ব'লে বক্ষে করাঘাত করতে থাকেন। কোনো কোনো বিখ্যাত রূপশিল্পী

শরীর তত্ত্বের যাথাতথ্যে ভুল ক'রেও চিত্রকলায় প্রশংসিত হয়েছেন, আমার বইখানি যদি সেই সৌভাগ্য লাভ করে তাহলেই ধন্য হব। ইতি ১৬।১১।৩৮

ভাষাতত্ত্বে প্রবীণ সুনীতিকুমারের সঙ্গে আমার তফাৎ এই,—তিনি যেন ভাষা সম্বন্ধে ভূগোল-বিজ্ঞানী আর আমি যেন পায়ে চলা পথের ভ্রমণকারী। নানা দেশের শব্দমহলের এমন কি তার প্রেতলোকের হাট হদ্দ জানেন তিনি, প্রমাণে অনুমানে মিলিয়ে তার খবর দিতে পারেন সুসম্বদ্ধ প্রণালীতে। চ'লতে চ'লতে যা আমার চোখে পড়েছে এবং যে ভাবনা উঠেছে আমার মনে, সেই খাপছাড়া দৃষ্টির অভিজ্ঞতা নিয়ে যখন যা মনে এসেছে আমি লিখেছি। তাতে ক'রে পাঠকেরাও সেই চ'লে বেড়াবার স্বাদটা পাবে। তারও দাম আছে। বিশ্বপরিচয় বইখানা লিখেছিলুম এই ভাবেই। বিজ্ঞানের রাজ্যে স্থায়ী বাসিন্দাদের মতো সঞ্চয় জমা হয় নি ভাণ্ডারে, রাস্তায় বাউলদের মতো খুশি হ'য়ে ফিরেছি, খবরের ঝুলিটাতে দিন ভিক্ষে যা জুটেছে তার সঙ্গে দিয়েছি আমার খুশির ভাষা মিলিয়ে। ছোটোখাটো অপরাধ যদি ঘ'টে থাকে সেই খুশির ভোগে অনেকটা তার খণ্ডন হ'তে পারে। জ্ঞানের দেশে ভ্রমণের শখ ছিল ব'লেই বেঁচে গেছি, বিশেষ সাধনা না থাকলেও। সেই শখটা পাঠকদের মনে যদি জাগাতে পারি তাহ'লে আমার যতটুকু শক্তি সেই অনুসারে ফল পাওয়া গেল মনে ক'রে আশ্বস্ত হব।

মানুষের মনোভব ভাষাজগতের যে অদ্ভুত রহস্য আমার মনকে বিস্ময়ে অভিভূত করে তারি ব্যাখ্যা ক'রে এই বইটি আরম্ভ করেছি। তারপরে, এই বইয়ে যে ভাষার রূপ আমি দেখাতে চেষ্টা করেছি, তাকে বলে বাংলার চলিত ভাষা। আমি তাকে বলি প্রাকৃত বাংলা। সংস্কৃতের যুগে যেমন ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃত প্রচলিত ছিল, তেমনি প্রাকৃত বাংলারও নানা রূপ আছে বাংলার ভিন্ন ভিন্ন অংশে। এদেরই মধ্যে একটা বিশেষ প্রাকৃত চলেছে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে। এই প্রাকৃতেরই স্বভাব বিচার করেছি এই বইয়ে। লেখকের পক্ষে একটা মুশকিল আছে। চলতি বাংলা চলতি ব'লেই সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট নিয়মে বাঁধা নয়। হয়তো উচ্চারণে এবং বাক্য-ব্যবহারে একজনের সঙ্গে আরএকজনের সকল বিষয়ে মিল এখনো পাকা হ'তে পারে নি। কিন্তু যে ভাষা সাহিত্যে আশ্রয় নিয়েছে তাকে নিয়ে এলো-মেলো ব্যবহারে ক্ষতি হবার আশঙ্কা আছে। এখন থেকে বিক্ষিপ্ত পথগুলিকে একটি পথে মিলিয়ে নেবার কাজ শুরু করা চাই। এই গ্রন্থে রইল তার প্রথম চেষ্টা। ক্রমে ক্রমে নানা লোকের অধ্যবসায়ে এই ভাষার দ্বিধাগ্রস্ত প্রথাগুলি বিধিবদ্ধ হ'তে পারবে।*

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন, ইহা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহা পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশের অনুমতি দিয়াছেন।—সম্পাদক।

বৈদিক কৃষ্টির কাল-নির্ণয়

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

ঋগ্‌বেদ এবং উহাতে বর্ণিত কৃষ্টির বয়স কত? ভারতের ঐতিহ্য অনুসারে উহা এত পুরাতন যে কেহ বলিতে পারে না। উহা স্বতঃ উদ্ভূত। অন্যান্য প্রাকৃতিক ব্যাপারের ন্যায় উহারও আদি নাই বলা যাইতে পারে। বেদ অর্থে জ্ঞান—ইহার সৃষ্টি বা আরম্ভের শক আমাদের জ্ঞানের বহির্ভূত। প্রতিভাবান্‌ কবি যাহা দেখিয়াছিলেন এবং অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা স্তোত্র আকারে গান করিয়াছিলেন। তাঁহারা দ্রষ্টা, তাঁহারা ঋষি নামে পরিচিত।

স্তোত্রগুলি ঋষিদের নানা বংশে বিভক্ত ও বিক্ষিপ্ত ছিল। কালে অনেক লোপ পাইয়াছিল। বায়ু এবং মৎস্য পুরাণের মতে ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে, অর্থাৎ ন্যূন গণনায় খ্রিষ্টজন্মের সাড়ে তিন সহস্র বৎসর পূর্বে তৎকালে প্রাপ্ত স্তোত্রগুলি প্রথম সংগৃহীত হইয়াছিল।

বেদের অতিপ্রাচীনত্ব সম্বন্ধে এই মত যে ভ্রান্ত নহে, তাহা নিম্নলিখিত তথ্যগুলি হইতে অনুমিত হয়। এইরূপ তথ্য আরও আছে।

(১) বেদচর্চা কখনও বন্ধ হয় নাই; তথাপি যে সকল দেবতার উপাসনা করা হইত, কালে তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য লুপ্ত হইয়া আসিয়াছিল। তাঁহারা খ্রিষ্টের বহু শতাব্দী পূর্বেই বিতর্কের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। বৈদিক নিঘণ্টুতে মেঘের মতন সামান্য ও সকলের পরিচিত বস্তুর ত্রিশটি নাম পাওয়া যায়। এত অধিক নামের হেতু কি? সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য নামটি, বৃত্র। অহি বা সর্পের নাম বৃত্র ঋগ্‌বেদেই আছে। কিন্তু মানুষের উদ্দাম কল্পনাতেও আকাশের মেঘকে কখনও দীর্ঘ সর্প মনে হয় না। ইন্দ্র প্রথমে জীবন্ত দেবতা ছিলেন, পরবর্তী কালে ঋগ্‌বেদে কেহ কেহ তাঁহার অস্তিত্বে সন্দেহ করেন, ক্রমে তিনি অরূপ পরম দেবতা পরিগণিত হইলেন। এই সকল উদাহরণ হইতে বুঝা যায়, ঋগ্‌বেদ অল্পকালে গড়িয়া উঠে নাই, ইহার নির্মাণে বহুকাল লাগিয়াছিল। ভারতীয় ভাষ্যকার প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারায় পুষ্ট ছিলেন, তথাপি তাঁহারা বেদের নিঃসন্দিগ্ধ ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই। এক এক দেবের বহুবিধ ব্যাখ্যা কল্পিত হইয়াছিল। ইহার দুই কারণ ছিল। এক, বহু কালান্তরে বহু দেবের স্বরূপের ধারণা পরিবর্তিত হইয়াছিল। দুই, বেদের কাল হইতে ভাষ্যকার বহু দূরে আসিয়া পড়িয়াছিলেন।

(২) ভাষাতত্ত্ব এবং অলৌকিকতত্ত্বে ব্যুৎপন্ন হইয়াও পাশ্চাত্য বেদপাঠী পণ্ডিতগণের যত্নও বিফল হইয়াছে। পাশ্চাত্য মতের আধুনিক ব্যাখ্যাতা প্রোফেসার

উইন্‌টারনিৎস্ তাঁহার ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস পুস্তকের প্রথম খণ্ডে (৭৬-৭৮ পৃঃ) স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "কোনও অন্বেষকের নিকট ইন্দ্র ঝড়ের দেব, অন্যের নিকট পুরাতন সূর্যদেব। মরুদ্‌গণের জনক বলিয়া রুদ্রকে সাধারণতঃ ঝড়ের দেবতা বলা হয়, কিন্তু হিলেব্রাণ্টের মতে তিনি "গ্রীষ্মদেশের আবহের ভীমমূর্তির দেবতা।" কাহারও মতে অদিতি বিস্তীর্ণ আকাশ, কাহারও মতে অদিতি অনন্ত সুবিস্তীর্ণ ভূমি। যাস্কের পূর্বে প্রাচীন ভারতের টীকাকারেরা অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে লইয়া ফাঁপরে পড়িয়াছিলেন। কেহ কেহ ভাবিতেন, তাঁহারা আকাশ ও ধরণী, কেহ বা দিবা ও রাত্রি। অদ্যাপি কোনও কোনও পণ্ডিত মনে করেন, তাঁহারা প্রাতঃ ও সায়ং সন্ধ্যা। কাহারও মতে তাঁহারা চন্দ্র ও সূর্য। কেহ বা মনে করেন প্রভাতী ও সন্ধ্যাতারা, কেহ বা মিথুন নক্ষত্র।" এই প্রসঙ্গে আরও বলা যাইতে পারে, অল্পদিন পূর্বেও পণ্ডিতেরা সোম বলিতে ঐ নামের বৃক্ষ বুঝিতেন, আকাশে সোম দেখিতে পান নাই, আর্যগণের মাস-গণনার চন্দ্রও পান নাই। মিত্র ও বরুণ, সবিতা ও বিষ্ণু, এই সব প্রধান প্রধান দেব সম্বন্ধে বিতর্কের শেষ নাই। কিন্তু যদি বেদের দেবতা অজ্ঞাত রহিয়া গেলেন, দুইটা শব্দের অর্থ জানিয়া বেদবিদ্যার্জনের সার্থকতা কি ?

(৩) বেদের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে ধারণা করিতে হইলে আরও অনেক তথ্য ভাবিবার আছে। ঋগ্‌বেদে ইক্ষুর উল্লেখ আছে (৯।৮৬।১৮)। প্রসঙ্গ হইতে বুঝা যায়, তখন উহার চাষ হইত। সম্ভবতঃ তখন শুধু চিবাইয়া রস পান করা হইত। ইক্ষুদণ্ড পেষণ করিয়া রস বাহির করিয়া শুখাইয়া পিণ্ড করিয়া মধুর পরিবর্তে ভোজনের কথা আর্যদের মনে হয় নাই। আমাদের পূজা-অর্চনার কাজে আখের রসে প্রস্তুত দ্রব্যের পরিবর্তে কেবল মধুর ব্যবস্থা দেখিয়া এই অনুমানই সম্ভব বলিয়া মনে হয়। এই প্রসঙ্গে চরকে উল্লিখিত দুই জাতের ইক্ষু এবং ইক্ষুরসের উৎপন্ন পাঁচ প্রকার দ্রব্যের কথা তুলনা করিয়া দেখুন। চরক পঞ্জাবের লোক ছিলেন, চরকসংহিতার বর্তমান সংস্করণ খ্রিষ্টের দুই শত বৎসরের মধ্যের। পঞ্জাব আখের চাষের অনুকূল নহে, আখের চাষের জন্য উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ু আবশ্যক। সুশ্রুত বিহারের অধিবাসী ছিলেন, পাঁচ শত খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে। তিনি চরকে বর্ণিত দুই জাত ব্যতীত আরও দশ জাতের ইক্ষুর উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে একটি বন্য। ইক্ষুর দ্বাদশ জাত উৎপন্ন হইতে কত কাল লাগিয়াছিল ?

অথবা, গোধূম ধরুন। গোধূম ঋগ্‌বেদের আর্যদের অজ্ঞাত ছিল। বেদে ইহার উল্লেখ নাই বলিয়া একথা বলিতেছি না, পূজার নৈবেদ্যে পিতৃপুরুষের তর্পণে গোধূমের বিধান নাই। আর্যেরা যে ভোজ্য গ্রহণ করিতেন, আমরা সেই ভোজ্য তর্পণে উৎসর্গ করি। যেমন যব ও তিল। কিন্তু শুক্ল যজুর্বেদে (৬।৩) গোধূম ও মসূর এই দুইটি বিদেশাগত শস্য সাধারণ খাদ্যদ্রব্য গণ্য হইয়াছে। সিন্ধুদেশে মহেঞ্জোদারোর ভগ্নাবশেষ খ্রিঃ পূঃ ৩০০০ বৎসরের বলিয়া স্থির হইয়াছে। সেই মহেঞ্জোদারো খননে

গোধূম পাওয়া গিয়াছে—ইহা বিবেচনা করিবার বিষয়। ঋগ্‌বেদের ঋষিগণ নিজেদের দেশ এবং সমুদ্র দেখিয়াছিলেন। সরস্বতী সমুদ্রে পড়িত, সরস্বতীর মোহানা হইতে মহেঞ্জোদারো অধিক দূরে ছিল না। সম্ভবতঃ তাঁহারা গোধূম জানিতেন না; জানিলে তাঁহাদের স্বল্পসংখ্যক আহার্যদ্রব্যের মধ্যে উহাও স্থান পাইত। অতএব বলিতে পারা যায়, ঋগ্‌বেদ এবং যজুর্বেদ এই দুইয়ের মধ্যবর্তী কালে সিন্ধুর আবিষ্কৃত কৃষ্টির উদ্ভব হইয়াছিল। যজুর্বেদ খ্রিষ্টের প্রায় ২,৫০০ বৎসর পূর্বের। ইহার দৃঢ় জ্যোতিষিক প্রমাণ আছে। যজুর্বেদে বৈদিক আচার-পদ্ধতির জটিলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। অলৌকিকত্বের বিকাশ এবং জ্যোতিষ জ্ঞানের উন্নতি হইয়াছে। এই সকল বিষয় চিন্তা করিলে নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় যে, ঋগ্‌বেদ এবং যজুর্বেদের কালের মধ্যে শত শত বর্ষ কালগর্ভে লীন হইয়াছিল।

পুরাণে ও মহাকাব্যে প্রসিদ্ধ ইক্ষ্বাকু বংশের প্রতিষ্ঠাতা ইক্ষ্বাকুর ও তাঁহার বংশের কয়েক জনের নাম ঋগ্‌বেদে (১০।৬০।৪) পাওয়া যায়। বায়ু ও বিষ্ণু পুরাণে দেখা যায়, ইক্ষ্বাকু হইতে বৃহদ্বল পর্যন্ত এই বংশের ৯৫ জন রাজা পরে পরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। অধিকাংশের মধ্যে পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ ছিল। বৃহদ্বল কুরুপাণ্ডব-যুদ্ধে নিহত হন। খ্রিঃ পূঃ ১৪৫০ অব্দের নিকটবর্তী কালে এই যুদ্ধ হইয়াছিল। যদি এক শতাব্দে পাঁচ জন রাজা ধরা যায়, তাহা হইলে এই ৯৫ জন রাজার রাজত্বকাল ১৯০০ বৎসর ধরা যাইতে পারে। তাহার সহিত ১৪৫০ বৎসর যোগ করিলে ইক্ষ্বাকুকে খ্রিষ্টের ৩৩৫০ বৎসর পূর্বে লইতে হয়। অবশ্য ইহা স্থূল অনুমান। ইক্ষ্বাকুর পিতা নামে পরিচিত বৈবস্বত মনুর কাল সম্ভবতঃ খ্রিঃ পূঃ ৩,৫০০ অব্দের নিকটবর্তী, ইহা উপরের অনুমানের সমর্থক। খ্রিঃ পূঃ ৩,৫০০ হইতে ৩২৫০ অব্দের মধ্যে নক্ষত্র-বিদ্যার আরম্ভ হইয়াছিল। চন্দ্রের গতিপথ সাতাইশ নক্ষত্র দ্বারা বিভক্ত হইয়াছিল।

আরও দেখি, ঋগ্‌বেদে (১০।৯৮।১) কুরু-বংশীয় ভীষ্মের পিতা শান্তনুর উল্লেখ আছে। পরাশর-পুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সর্বশেষে বেদের স্তোত্রগুলি সাজাইয়াছিলেন, তিনি শেষ ব্যাস। তিনি কুরুপাণ্ডব-যুদ্ধের সময় বর্তমান ছিলেন। সুতরাং বেদের শেষ সংস্কার খ্রিঃ পূঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর পরে হইতে পারে নাই।

ঋগ্‌বেদ ইতিহাস নহে, ইহাতে ঘটনাপরম্পরা লিপিবদ্ধ নাই। স্তোত্রগুলি এক স্থানে বা একই কালে রচিত হয় নাই। ইহাতে সমসাময়িক ঘটনার উল্লেখ আছে, অতীত কাহিনীরও আছে। কতকগুলি স্তোত্র অন্যগুলির বহু পরে রচিত হইয়াছিল।

কোনও সাহিত্যরচনার বয়স নির্ধারণ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের সঙ্গে আমাদের বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। তাঁহারা ব্যাকরণের নূতনতম বিভক্তির প্রয়োগ, সংস্কৃতির নূতনতম রূপ দ্বারা উহার বয়স নির্ধারণ করেন। তাঁহারা মন্দিরের শেষ স্থাপিত ইষ্টক দ্বারা, সর্বশেষে নির্মিত পুত্তলিকা দ্বারা মন্দিরের কাল নির্ণয় করেন। ভারতের সনাতন রীতি অন্যবিধ। অনিবার্য, আগন্তুক, বহিঃপৃষ্ঠের উপাদান উপেক্ষা করিয়া ভারতীয় পণ্ডিত

মন্দিরটিকে সমগ্রভাবে দেখিয়া তাহার ভিত্তিস্থাপনের কাল নিরূপণে যত্নবান হন। সেই জন্য তাঁহাদের মত, বেদের কাল কেহ ঠিক বলিতে পারে না,—ইহা এতই পুরাতন।

আধুনিক কালের লোক আমরা এই উত্তরে সন্তুষ্ট হইতে পারি না। ঋষিরা বেদগান করিবার পর কত কাল উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, আমরা তাহার আভাস পাইতে চাই; মন্দিরের বয়স নহে, মন্দিরের দেবতার প্রতিষ্ঠাকাল। বর্ত্তমান বেদগ্রন্থ খ্রিঃ পূঃ পঞ্চদশ শতাব্দের হউক,—আমাদের সে প্রশ্ন নয়। আমরা জানিতে চাই, ইহার প্রধান প্রধান দেবতা কতকাল পূর্বে প্রথম স্তুত হইয়াছিলেন।

বেদ কখনও প্রস্তর বা ধাতুপাত্রে উৎকীর্ণ হয় নাই। সুতরাং ভাষাবিচারের সার্থকতা নাই। বেদের স্তোত্র পুরুষপরম্পরায় মুখে মুখে চলিয়া আসিয়াছে। আর, যে গান এত মুখে মুখে চলিয়া আসিয়াছে তাহার মূল ভাষা একেবারে পরিবর্তিত না হইলেই আশ্চর্যের কথা। বেদেই আছে, কোন কোন পুরাতন স্তোত্র মার্জিত হইয়াছে। তথাপি ভাষা আলোচনার প্রয়োজন আছে। বেদবিদ্যায় প্রবেশের প্রথম সোপান এই। কিন্তু ইহার প্রয়োজন-সীমা ভুলিয়া গেলে দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে। ফলে অন্য উপায়ে যে সকল বিশ্বাস-যোগ্য তথ্য পাওয়া গিয়াছে সে সকলকে ঐ সঙ্কীর্ণ স্থানে বসাইতে গেলে বিমূঢ় হইতে হয়। দূরবর্তী বনানীর বৃক্ষসমূহের মত বেদের সকল বিষয়বস্তু তখন গবেষকের চক্ষে ঘনসন্নিবিষ্ট দেখায়, তাহাদের মধ্যে যে অবকাশ ও অন্তরাল আছে, পটভূমির অভাবে তাহা বুঝিতে পারা যায় না। অপিচ, ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্তরের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা সহজ, কিন্তু এক একটি স্তর নির্মাণে কত সহস্র বৎসর লাগিয়াছে তাহা বলা সহজ নহে। সেইরূপ, সংহিতা, ব্রাহ্মণ, সূত্র—ইহাদের পারম্পর্য হইতে বৈদিক সাহিত্যের তিন শাখার কোনটির কাল অভ্রান্ত ভাবে নিরূপণ আমাদের সাধ্যাতীত। প্রাচীন কালে উন্নতির গতি মৃদু ছিল, এক পদ অগ্রসর হইতে বহু শতাব্দ কাটিয়া যাইত। বৈদিক সাহিত্য পবিত্র ও গুহ্য; আর এরূপ শাস্ত্রের পরিবর্তন আদৌ হয় না বলিলে চলে। যে কালে ও কারণে ধর্মবিধির প্রচলন হয়, সেই কাল ও কারণ লোপ পাওয়ার পরও বহুদিন ধরিয়া সে বিধান বলবৎ থাকে। অনুরূপ ঘটনার সুপরিজ্ঞাত সময়পঞ্জীর সঙ্গে না মিলাইয়া বয়স সম্বন্ধে মোটামুটি অনুমানেরও কোনও অর্থ থাকে না। পার্শ্ব, মহাবীর, বুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া ভূত কাল পরিমাণের চেষ্টা হইয়াছে। এ যেন পথের প্রান্তে দাঁড়াইয়া উহার আরম্ভ ও দৈর্ঘ্য অনুমান! এবম্বিধ উৎপ্রেক্ষা মাত্রই কাল্পনিক, এই হেতু কল্পকের স্বভাব, শিক্ষা ও মতি অনুযায়ী বিভিন্ন রূপের হইয়া থাকে।

প্রোফেসার কীথ লিখিতেছেন, "সংস্কৃতি এবং সাহিত্যের বিকাশ, মোটামুটি ইহাই শ্রেষ্ঠ মাপকাঠি। ব্রাহ্মণ রচনার যুগ খ্রিঃ পূঃ ৮০০ অব্দের পরে হওয়া সম্ভব নহে, এবং উষার বন্দনার তুল্য সুপ্রাচীন স্তোত্র খ্রিঃ পূঃ দ্বাদশ শতাব্দীর হইতে পারে"।[১] অর্থাৎ ইহাই ঋগ্‌বেদের প্রাচীনত্বের সীমা। ইঁহার মতে যজুর্বেদের বয়স খ্রিঃ পূঃ ৮০০—৬০০ অব্দ। ইহা ভারতের ইতিহাস নামক এক বৃহৎ গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে।

---

১ A. B. Keith: The Cambridge History of India. Vol. I. Ch. IV. 1922.

এই উৎপ্রেক্ষায় প্রোফেসার উইন্টারনিৎস সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তিনি বলেন, "খ্রিঃ পূঃ ১২০০ কিম্বা ১৫০০ অব্দ আরম্ভ ধরিলে এই সুবৃহৎ সাহিত্যের সর্বাঙ্গীন বিকাশ কি করিয়া হইল তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। বোধ হয়, এই বিশাল সাহিত্যের আরম্ভ খ্রিঃ পূঃ ২,০০০ বা ২,৫০০ অব্দ এবং শেষ খ্রিঃ পূঃ ৭৫০-৫০০ অব্দ ধরিতে হইবে।[২] কিন্তু বোধ হওয়ার হেতু সুস্পষ্ট ব্যক্ত করিতে না পারিলে এবং পরীক্ষিত না হইলে তাহা জনে জনের 'বোধ' হইয়া দাঁড়ায়। আর্য সংস্কৃতির ও সাহিত্যের অনুরূপ আর কোথাও পাওয়া যায় নাই, তুলনা দ্বারা কালনির্দেশের সুযোগও নাই।

জ্যোতিষের সাক্ষ্যই পুরাকাল-নির্ণয়ে একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ। ইহা দেশ, জাতি, সংস্কৃতি, কিসেরও অপেক্ষা রাখে না। ইহার পক্ষপাত নাই, মতপরিবর্তন নাই। ইহাই প্রাচীন জাতিসমূহের ইতিহাসের কাল সংশোধন করিবার সর্বাপেক্ষা নিশ্চিত উপায়। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে বেদের মধ্যে কালসমুদ্রে দিগ্‌দর্শন-স্বরূপ দ্বীপ আছে। পঞ্জিকা না থাকিলে হিন্দুর চলে না, কেন চলে না তাহা হিন্দুমাত্রেই জানেন। আমাদের যাবতীয় ধর্ম-কৃত্যের দিন নির্দিষ্ট আছে। এই লক্ষণ ঋগ্‌বেদের যুগেও দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের আর্য পূর্বপুরুষগণ যে সকল যাগযজ্ঞ করিতেন তাহাদের দিন নির্দিষ্ট থাকিত। সংহিতা এবং ব্রাহ্মণের মধ্যে ঐ সকল দিনের কিছু কিছু উল্লেখ আছে। পঞ্জিকার প্রাচীন নাম কালজ্ঞান। বেদের কালের কালজ্ঞান যতই সংক্ষিপ্ত, অশুদ্ধ বা অপরিণত হউক, ধর্মানুষ্ঠানে তাহা মানিয়া চলিতে হইত।

পঞ্জিকার কয়েকটি পৃথক্ পৃথক্ বিষয় বহু পূর্বেই পণ্ডিতদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। যেমন, তৈত্তিরীয় সংহিতায় কৃত্তিকাপ্রমুখ সাতাইশটি নক্ষত্রের নাম আছে। কৃত্তিকা নামটি বহুবচনে আছে, সুতরাং তারাপুঞ্জ কৃত্তিকাকেই বুঝাইতেছে। এখন এই প্রশ্ন স্বভাবতঃ উঠে, যে,—প্রথম স্থান কৃত্তিকাকে কেন দেওয়া হইল, অশ্বিনী বা অন্য নক্ষত্রকে কেন দেওয়া হইল না? এখন যে পর্যায় প্রচলিত আছে, তাহাতে অশ্বিনীর নাম সর্বপ্রথমে, কারণ অশ্বিনীতে বিষুবপাত হইত। ইহা দেখিয়া আমরা বলি যে উক্ত সংহিতার সময় কৃত্তিকায় বিষুবপাত হইয়াছিল। ইহা খ্রিঃ পূঃ ২২০০ অব্দের ঘটনা।

১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে বালগঙ্গাধর তিলক তাঁহার *Orion* নামক গ্রন্থে আরও কতকগুলি জ্যোতিষিক প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছিলেন, তিনি কৃত্তিকায় বিষুবপাত কালের পূর্ববর্তী ফাল্গুনী পূর্ণিমায় ও চিত্রা পূর্ণিমায় উত্তরায়ণ আরম্ভ নির্দেশ করেন। প্রথমটি আমাদিগকে খ্রিঃ পূঃ চারি সহস্র অব্দে লইয়া যায়, দ্বিতীয়টি খ্রিঃ পূঃ ছয় সহস্র অব্দে।

তিলক যখন তাঁহার বই লেখেন তখন প্রোফেসার জাকোবি বেদের প্রাচীনত্বের অনুরূপ প্রমাণ প্রদর্শন করেন।[৩] উভয়ে স্বতন্ত্রভাবে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন।

---

২ M. Winternitz: A History of Indian Lit. Vol. I. p. 309. 1927.

৩ H. Jacobi. "On the date of the Rigveda." English Translation. *Indian Antiquary*, Vol. 23. June, 1894. Also, "On the Antiquity of Vedic Literature," *Journal of the Royal Asiatic Society*, 1909.

প্রোফেসার জাকোবি ফাল্গুনী পূর্ণিমায় ভর দিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে ঋগ্‌বেদের সংস্কৃতির কাল খ্রিঃ পূঃ ৪৫০০ হইতে খ্রিঃ পূঃ ২,৫০০ অব্দ পর্যন্ত। তিনি তিলকের মতন অধিক দূর যান নাই।

বলা বাহুল্য, যে সকল পণ্ডিত ভাষার চর্চা করিয়া বেদের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ঘোরতর আপত্তি তুলিলেন। তিলক ও জাকোবির সিদ্ধান্ত যে ভ্রান্ত তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রোফেসার হুইট্‌নি, থিব. ও ওল্ডেন্‌বার্গ লেখনী সঞ্চালন করিলেন।৪ প্রমাণগুলি উড়াইয়া দিবার জন্য তাঁহারা অলীক কষ্টকল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন, কোনও কোনও স্থানে প্রসঙ্গ এড়াইয়া গিয়াছেন। কোথাও বা বিভিন্ন গ্রন্থের কাল-ব্যবধান অগ্রাহ্য করিয়াছেন। এই চারি পণ্ডিতের মধ্যে প্রোফেসার হুইট্‌নি কালনির্ণয়ে যোগ্যতম ছিলেন। তিনি বেদে প্রবীণ ছিলেন, জ্যোতির্বিদ্যাতেও ছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতীয়দের ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার বিলক্ষণ বিদ্বেষ ছিল। তিনি ধীরভাবে এ সকল বিষয় আলোচনা করিতে পারেন নাই। ব্রাহ্মণেরা যে নক্ষত্রচক্র নির্মাণ করিতে বা কোনও জ্যোতিষিক ঘটনা নির্ভুলভাবে পর্যবেক্ষণ করিতে পারিতেন, তাহা তিনি বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহার মতে, নক্ষত্রমালা কোনও উন্নত জাতির নিকট হইতে নিশ্চয় ব্রাহ্মণগণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রোফেসার কীথের মতন যাঁহারা প্রাচীন বেবিলনের ধ্বংস হইতে কৃত্তিকাশ্রেণী ভবিষ্যৎ কালে বহিষ্কৃত হইবে, এই আশা পোষণ করিতেছেন, তাঁহারা হুইট্‌নির এই মত পড়িয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। অবশ্য এ পর্য্যন্ত সেদিক্ হইতে তাঁহাদের আশা পূর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় নাই।

গ্রীকদের সংস্পর্শে আসিবার পূর্বে হিন্দুদের নিকট বিষুবদিনের প্রয়োজন ছিল না। এই অলীক যুক্তি দিয়া ডক্টর থিব. কৃত্তিকার প্রমাণ খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার নিজের মতের সমর্থনে তিনি বলেন যে, "বৈদিক সাহিত্যে মুখ্য বা গৌণভাবে বিষুবদিনের বা তৎসম্পর্কিত ব্যাপারের কোনও উল্লেখ নাই।" কিন্তু এই যে দেখা যাইতেছে, তৈত্তিরীয় সংহিতায় কৃত্তিকায় বিষুবসংক্রান্তির উল্লেখ রহিয়াছে। এই তর্ক তিনি এই বলিয়া খণ্ডন করিলেন যে, কৃত্তিকার উল্লেখ বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের ভ্রান্ত পাঠ! অর্থাৎ তৈত্তিরীয় সংহিতা ও উক্ত জ্যোতিষ একই কালের রচনা। তিনি একটু গণনা করিলেই দেখিতে পাইতেন যে, সংহিতায় কৃত্তিকা $0°$ অংশে, আর বেদাঙ্গ-জ্যোতিষে $১২°$ অংশ দূরে। অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে আট শত বৎসর কালেরও অধিক ব্যবধান। তাঁহার আলোচনায় তিনি আরও আশ্চর্য আশ্চর্য যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। তথাপি প্রোফেসার কীথ মন্তব্য করিয়াছেন, "হুইট্‌নি, থিব. এবং

৪ W. D. Whitney. "On a recent attempt by Jacobi & Tilak to determine on astronomical evidence the date of the earliest Vedic period as 4,000 B. C." *Indian Antiquary*, Vol. 24, April 1895.

G. Thibaut. "On some recent attempts to determine the antiquity of Vedic Civilisation." *Indian Antiquary*, Vol. 24, April 1895. ওল্ডেনবার্গের সমালোচনাটি আমি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। Vedic Indexএ উদ্ধৃত অংশ হইতে মনে হইতেছে উহা থিবর মতেরই প্রতিধ্বনি।

ওল্ডেন্‌বার্গের প্রচণ্ড আক্রমণের সম্মুখে জাকোবির কালমূলক সিদ্ধান্ত টিকিতে পারে না।” তিনি ইচ্ছা করিয়াই ভুলিয়া গিয়াছেন, ব্যুলার, বার্থ ও উইন্‌টারনিৎস্‌ এই সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত বলেন নাই। জাকোবি স্বয়ং ইহা দেখাইয়া দিয়াছেন।

ঋগ্‌বেদে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সময় খ্রিঃ পূঃ নয় সহস্র বৎসর পাই। তখন অঙ্গিরস্‌, অর্থবন্‌, ভৃগু প্রভৃতি পরবর্তী কালে পিতৃনামধেয় পূর্বপুরুষগণ পঞ্চনদের উত্তরপশ্চিম প্রান্তে প্রথম যজ্ঞাগ্নি প্রজ্জ্বালিত করেন। তখন হইতেই পর পর জ্যোতিষিক প্রমাণ ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া আসিয়াছে। খ্রিঃ পূঃ সাড়ে ছয় সহস্র হইতে আরম্ভ করিয়া খিঃ পূঃ সাড়ে চারি সহস্র অব্দ উত্তীর্ণ হইয়া শেষে খ্রিঃ পূঃ সাড়ে তিন সহস্র অব্দ পর্যন্ত আসিয়া থামিয়াছে। এইখানেই ঋগ্‌বেদের যুগ শেষ বলিতে পারা যায়। বসিষ্ঠ ও অগস্ত্যের জন্ম এবং অন্য দুই একটি ছোটখাট ঘটনা ভিন্ন জ্যোতিষ বিষয়ে কোনও প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ আর তেমন পাওয়া যায় না। নূতন কোনও দেবতার আবির্ভাব হয় নাই, পরন্তু পুরাতন দেবতাগণ পুরাতন বৈদিক স্বরূপ বর্জিত হইয়া এখন ভাবময় বিগ্রহ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। ইতিহাসের দৃষ্টিতে ঋগ্‌বেদ খণ্ডিত। ইহাতে কোন বিশেষ যুগের আর্য কৃষ্টির রূপ পাওয়া যায় না। তথাপি মহেঞ্জোদারোর অনুসন্ধানের ফলে প্রকাশিত তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া স্যর জন মার্শেল যে সব প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন তাহার কয়েকটির উত্তর দিতে পারা যায়। তিনি আবিষ্কৃত সিন্ধুর কৃষ্টিকে খ্রিঃ পূঃ সাড়ে বত্রিশ শত ও সাড়ে সাতাশ শত অব্দের মধ্যবর্তী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে ভারতের মাটিতেই এই কৃষ্টির বহুদিনের পূর্ব ইতিহাস নিশ্চয়ই আছে। তাঁহার মতে ইহা দ্রাবিড় কিম্বা সুমেরীয় জাতির কীর্তি নহে। সিন্ধুরা শিব, লিঙ্গ ও মাতৃদেবীর উপাসক ছিলেন। আমরা ঋগ্‌বেদ হইতে জানি যে ভগবান্‌ রুদ্র খ্রিঃ পূঃ সাড়ে চারি সহস্র অব্দের কালে প্রাধান্য লাভ করিয়া ঋগ্‌বেদের দেবমণ্ডলীতে স্থান পাইয়াছিলেন। যজুর্বেদে (খ্রিঃ পূঃ ২৫০০ অব্দে) তাঁহার উপাসনার সুস্পষ্ট বহুল প্রমাণ পাওয়া যায়। খ্রিঃ পূঃ ৪,০০০ অব্দে বিষ্ণু ও ইন্দ্র অভিন্ন হইয়াছিলেন। বিষ্ণু শিব ও মাতৃদেবী শিবাণী অদ্যাপি গ্রামে গ্রামে প্রধান দেবতারূপে পূজা পাইয়া আসিতেছেন। অতএব দেখা যাইতেছে, সিন্ধুরা বিদেশী ছিলেন না; তাঁহাদের বংশধরেরা ভারত ত্যাগ করেন নাই। প্রাচীনপন্থী ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে আর্যেরা খ্রিঃ পূঃ ১৫০০ অব্দে ভারতে প্রবেশ করেন। স্যর জন মার্শেল এই মতে চালিত হইয়া বিভ্রান্ত হইয়াছেন। সিন্ধুরাও যে আর্য, তাহা তিনি ভাবিতে পারেন নাই। বোধ হয় এইটুকু বলিতে পারা যায়, তাঁহারা ঋগ্‌বেদীয় আর্য ছিলেন না। পরে কিন্তু উভয় সম্প্রদায় অভিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই হেতু সিন্ধুদের আর পৃথক্‌ অস্তিত্ব ছিল না।

প্রাচীন সম্প্রদায়ের ভাষাবিদ্‌গণ না বুঝিয়া ভারত ইতিহাসের প্রাচীনতা সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানের ব্যাঘাত জন্মাইয়া কি ক্ষতি করিয়াছেন, ইহা তাহার একটি দৃষ্টান্ত। সকলেই জানেন, ভাষাবিদ্‌গণ নানা কল্পনা করিতে পারেন, কিন্তু একটিও প্রমাণ করিতে পারেন না।

বঙ্কিমচন্দ্রের অবতারতত্ত্ব

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বেদান্তরত্ন

আমরা পূর্বপ্রবন্ধে দেখিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন—কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং। এমন কি, বঙ্কিমচন্দ্র অকুণ্ঠভাবে প্রকাশ করিয়াছেন যে, প্রকৃত বিচারে শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কাহাকেও ঈশ্বরের অবতার বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। ধর্ম ও দর্শনের এক প্রধান সমস্যা এই অবতারবাদ।

অশরীরী পরমেশ্বরের মনুষ্যশরীর ধারণ সম্ভব কি না? 'কৃষ্ণচরিত্রে' বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছেন। উত্তরে তিনি প্রতিপ্রশ্ন করিতেছেন—

'যিনি ইচ্ছাময় ও সর্বশক্তিমান্, তিনি ইচ্ছা করিলে নিরাকার হইলেও আকার ধারণ করিতে পারেন না কেন? * তাঁহার সর্বশক্তিমত্তার এ সীমা নির্দেশ কর কেন?' ঈশ্বর ইচ্ছাময় ও সর্বশক্তিমান্— 'তিনি অবতীর্ণ হইতে পারেন না' এমন কথা বলিলে তাঁহার শক্তির সীমানির্দেশ করা হয় (গীতাভাষ্য)। অবশ্য যাঁহার কটাক্ষমাত্রে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি লয় সাধিত হয়, কেবল একটা কংস বা শিশুপাল মারিবার জন্য যে তাঁহাকে ভূতলে মানবরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, ইহা অসম্ভব কথা বটে।

তবে অবতার কেন? ঈশ্বরের অবতীর্ণ হইবার প্রয়োজন কি?

পূর্ণ আদর্শ ভিন্ন প্রকৃত ধর্মসংস্থাপন সম্পন্ন করা অসম্ভব। জীবের সমক্ষে এই পূর্ণ আদর্শ প্রদর্শনের জন্যই অবতার স্বীকার করিয়া ভগবানের সান্ত ও সীমাবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের কথায় বলি—

'সম্পূর্ণ ধর্মের সম্পূর্ণ আদর্শ ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ নাই। কিন্তু নিরাকার ঈশ্বর আমাদের আদর্শ হইতে পারেন না। ··· অতএব যদি ঈশ্বর স্বয়ং সান্ত ও শরীরী হইয়া লোকালয়ে দর্শন দেন, তবে সেই আদর্শের আলোচনায় যথার্থ ধর্মের উন্নতি হইতে পারে। এই জন্যই ঈশ্বরাবতারের প্রয়োজন। ··· এমত স্থলে ঈশ্বর জীবের প্রতি করুণা করিয়া শরীর ধারণ করিবেন, ইহার অসম্ভাবনা কি? (কৃষ্ণচরিত্র)

পুনশ্চ—

'শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শ পুরুষ বলিয়া ভাবিলে, মনুষ্যত্বের আদর্শের বিকাশ জন্যই অবতীর্ণ ইহা ভাবিলে, তাঁহার সকল কার্যই বিশদরূপে বুঝা যায়। কৃষ্ণচরিত্ররূপ রত্নভাণ্ডার খুলিবার চাবি এই আদর্শ-পুরুষতত্ত্ব।'

* নিপট অদ্বৈতী শ্রীশঙ্করাচার্য ও বলিয়াছেন—স্যাৎ পরমেশ্বরস্যাপি ইচ্ছাবশাৎ মায়াময়ং রূপং সাধকানুগ্রহার্থম্—১।১।২০ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য।
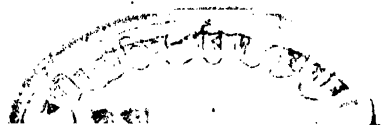
অতএব বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ঈশ্বরের অবতার গ্রহণের প্রয়োজন সম্পূর্ণ আদর্শ প্রদর্শন দ্বারা ধর্ম-সংস্থাপন। বৈজ্ঞানিকপ্রবর স্যর অলিভার লজ্ ভগবানের অবতার-স্বীকারের প্রয়োজন অন্য ভাবে সিদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলেন, ভগবানের ঐশ্বর্য এতই বিরাট্, তাঁহার প্রভাব এতই প্রচণ্ড যে, তিনি যদি অবতাররূপে নিজেকে সঙ্কুচিত ও সঙ্কীর্ণ না করেন, তবে কেহই তাঁহার অনাবৃত মুখ দর্শন করিতে পারে না। এই জন্যই খ্রীষ্টানেরা বলেন, "No man can see My face and live." দৃষ্টান্তস্বরূপ স্যর অলিভার লজ্ রবি ও রশ্মির উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, সূর্য সমস্ত পৃথিবীর প্রাণ—সূর্যরশ্মি দ্বারাই পৃথিবী পুষ্ট, বর্ধিত ও সঞ্জীবিত আছে; কিন্তু কোন দিন যদি সূর্য নিজের প্রচণ্ড মার্তণ্ড মূর্তিতে প্রকটিত হয়েন, তাহার ফলে কি হয়? সমস্ত পৃথিবী মুহূর্তমধ্যে ভস্মীভূত হইয়া পরমাণুপুঞ্জে পরিণত হয়। সাগর, নদী, পর্বত, প্রস্তর, প্রান্তর, তরু, লতা, পশু, পক্ষী, কীটপতঙ্গ—কেহই ক্ষণার্ধ তিষ্ঠিতে পারে না। সেই জন্য সূর্যের তেজঃ বায়ুস্তরের দ্বারা প্রশমিত হইয়া সংবৃত মূর্তিতে রশ্মিরূপে আমাদের গোচর হয়। এই সংবৃতির ফলেই সূর্যের উপকারিতা। ভগবানের সম্বন্ধেও ঠিক্ ঐ কথা। সাধারণ মানুষের ত কথাই নাই, বোধ হয় অত্যুত্তম সাধকেরাও তাঁহার অনাবৃত ঐশ্বর্য, তাঁহার প্রকটিত মহিমা ধারণ করিতে পারেন না। সেই জন্যই তিনি অবতারের রূপে নিজেকে সংবৃত করিয়া, সেই আবরণের মধ্যে নিজের তেজঃ প্রশমিত করিয়া, জীবের নিকট প্রকাশিত হয়েন।

স্যর অলিভার লজের কথাগুলি বেশ সঙ্গত। আমাদের দেশে গঙ্গাবতরণের যে কাহিনী পুরাণের মধ্যে রক্ষিত আছে, তদ্দ্বারা ঐ কথার সমর্থন হয়। গঙ্গাকে বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা বলে। এক দিন সাধকপ্রবর ভগীরথের আবাহনে ভগবানের আধ্যাত্মিক শক্তি ভূমণ্ডলে গঙ্গারূপে অবতরণ করিয়াছিল। কিন্তু সেই শক্তিকে মনুষ্যের ধারণ-উপযোগী করিবার জন্য প্রথমতঃ মহাদেবকে জটার মধ্যে সংবৃত করিতে হইয়াছিল এবং পরে জহ্নুমুনির শরীরের মধ্যে সংগোপিত করিতে হইয়াছিল। সেই জন্য গঙ্গার নাম জাহ্নবী। এইরূপে দ্বিধা-শিথিলিত বিষ্ণুতেজঃ ধরাধামে অবতীর্ণ হইলে, তবে গঙ্গা আমাদের ধারণ-উপযোগী হইয়া পতিতপাবনী হইয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রও 'ধর্মতত্ত্বে' এ বিষয়ের ইঙ্গিত করিয়াছেন—

"ঈশ্বর অনন্তপ্রকৃতি—আমরা ক্ষুদ্রপ্রকৃতি। তাঁহার গুণগুলি সংখ্যায় অনন্ত, বিস্তারেও অনন্ত। যে ক্ষুদ্র, অনন্ত তাহার আদর্শ হইবে কি প্রকারে? সমুদ্রের আদর্শে কি পুকুর কাটা যায়, না আকাশের অনুকরণে চাঁদোয়া খাটান যায়? অনন্তপ্রকৃতি ঈশ্বর উপাসকের প্রথমাবস্থায় তাহার আদর্শ হইতে পারেন না, ইহা সত্য; কিন্তু ঈশ্বরের অনুকারী মনুষ্যেরা, অর্থাৎ যাঁহাদিগের গুণাধিক্য দেখিয়া ঈশ্বরাংশ বিবেচনা করা যায়, অথবা যাঁহাদিগকে মানবদেহধারী ঈশ্বর মনে করা যায়, তাঁহারাই সেখানে বাঞ্ছনীয় আদর্শ হইতে পারেন।"

'দেবী চৌধুরাণী'তে একথা আরও স্পষ্ট করা হইয়াছে—

"ঈশ্বর অনন্ত—কিন্তু অনন্তকে ক্ষুদ্র হৃদয়পিঞ্জরে পুরিতে পারি না—সান্তকে পারি। তাই অনন্ত জগদীশ্বর—হিন্দুর হৃৎপিঞ্জরে সান্ত শ্রীকৃষ্ণ।"

ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে কুন্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিতে অবতারের প্রয়োজন যে ভাবে বিবৃত করিয়াছেন, তৎপ্রতি লক্ষ্য দেওয়া আবশ্যক। তিনি বলিতেছেন, শ্রবণ ও স্মরণযোগ্য লীলাপ্রকাশ দ্বারা বদ্ধ জীবকে আকর্ষণ ও ভবকূপ হইতে উত্তোলনই অবতারের মুখ্য প্রয়োজন।

ভবেঽস্মিন্ ক্লিশ্যমানানাম্ অবিদ্যাকামকর্মভিঃ।
শ্রবণস্মরণার্হাণি করিষ্যন্ ইতি কেচন॥—১.৮।৩৫

—'অজ্ঞান, কাম ও কর্ম দ্বারা নিপীড়িত নরনারীকে শ্রবণ ও স্মরণযোগ্য লীলা-প্রকাশ দ্বারা এই ভবকূপ হইতে উদ্ধরণই—হে কৃষ্ণ! তোমার অবতারগ্রহণের উদ্দেশ্য।'

ভাগবতের অন্যত্রও এ কথা আছে—

অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাস্থিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥—১০।৩৩।৬৫

এ সম্পর্কে অ্যানি বেসান্ট্ অতি সুন্দরভাবে বলিয়াছেন—

When, He Who is beauty and love and bliss, shews a little portion of Himself on earth, enclosed in human form, the weary eyes of men light up, the tired hearts of men expand with a new hope and a new vigour. They are irresistably attracted to Him. Devotion spontaneously springs up.

ভগবান্ কিরূপে অবতীর্ণ হন, তাঁহার অবতার-গ্রহণের প্রণালী (*modus operandi*) কি? বঙ্কিমচন্দ্র এ প্রসঙ্গের বিশেষ আলোচনা করেন নাই। তবে গীতার প্রখ্যাত শ্লোক—

অজোপি সন্ অব্যয়াত্মা ভূতানাম্ ঈশ্বরোপি সন্।
প্রকৃতিং স্বাম্ অধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।—৪।৬

—এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শঙ্করও শ্রীধরের ভাষ্য উদ্ধৃত করিয়াছেন।

'সম্ভবামি আত্মমায়য়া'—শ্রীশঙ্করাচার্য্য ইহার ভাষ্যে বলেন,—

স চ ভগবান্জ্ঞানৈশ্বর্যশক্তিবলবীর্যতেজোভিঃ সদাসম্পন্নঃ ত্রিগুণাত্মিকাং বৈষ্ণবীং স্বাং মায়াং প্রকৃতিং বশীকৃত্য অজোঽব্যয়ো ভূতানাম্ ঈশ্বরো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবোঽপি সন্ স্বমায়য়া দেহবান্ ইব জাত ইব।

—অর্থাৎ, সেই ষড়ৈশ্বর্যশালী ভগবান্ নিজের ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে স্ববশে আনিয়া—অজ অব্যয় মহেশ্বর শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব হইলেও নিজ মায়া দ্বারা যেন দেহী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীধর স্বামী এ সম্পর্কে কিছু ভিন্ন-মত। তিনি বলেন—

ঈশ্বরোঽপি কর্মপারতন্ত্র্যরহিতোঽপি সন্ স্বমায়য়া সম্ভবামি * * স্বাং শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকাং প্রকৃতিমধিষ্ঠায় স্বীকৃত্য বিশুদ্ধোর্জ্জিতসত্ত্বমূর্ত্ত্যা স্বেচ্ছয়া অবতরামি।

—অর্থাৎ, ভগবান্ কর্মরহিত; তিনি কর্মের অধীন নহেন। তথাপি নিজ মায়া দ্বারা উৎপন্ন হন। তিনি আপনার শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া বিশুদ্ধ উর্জিত সত্ত্বমূর্তিতে স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হন।

অতএব, শ্রীধর স্বামীর মতে অবতারকালে ভগবান্ মূর্তি পরিগ্রহ করেন, কিন্তু সে মূর্তি শুদ্ধসত্ত্বনির্মিত। গীতার অন্যতর টীকাকার মধুসূদন সরস্বতী এ সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলেন, "কেহ কেহ নিত্য নিরবয়ব নির্বিকার পরমানন্দময় ভগবানের অবতারকালে বাস্তব দেহসম্বন্ধ মনে করেন; তাহা সঙ্গত নহে। ভগবান্ নিত্য বিভূ সচ্চিদানন্দঘন নির্গুণ পরমাত্মা—তাঁহার কি ভৌতিক, কি মায়িক, কোনরূপ দেহই সম্ভবে না। তবে যে অবতারকালে তাঁহার দেহিত্ব প্রতীত হয়, তাঁহাকে মূর্তিধারী বলিয়া মনে হয়—তাহা মায়া মাত্র।" অর্থাৎ, সচ্চিদানন্দের সে মূর্তি—পারমার্থিক ত নহেই, প্রাকৃতিকও নহে—তাহা প্রাতিভাসিক মাত্র।

এইরূপ কোন কোন খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় বলিয়া থাকেন যে, যিশুর যে অবতার-শরীর, তাহা অপ্রাকৃত শরীর—তাহা শরীরই নয়—একটা প্রতিভাস (appearance or simulacrum) মাত্র। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র, যিশুখ্রীষ্ট বা শ্রীচৈতন্যের শরীরের যে পরিচয় আমরা প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে পাই, তাহাতে দেখি, তাঁহাদের অধিষ্ঠিত দেহও আমাদেরই দেহের মত—হ্রাসবৃদ্ধির অধীন, জন্মমৃত্যুর অধিকৃত ছিল। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্রের দেহত্যাগের পর সেই সেই দেহের সৎকার করা হইয়াছিল। যিশুখ্রীষ্টের দেহ ক্রুশে শলাকাবিদ্ধ হইলে তাঁহার সেই ক্ষত হইতে রক্তপাত হইয়াছিল। পিতৃশ্রাদ্ধের জন্য গয়া গমনকালে চৈতন্যদেবের দেহ প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছিল। অতএব এই সকল অবতারের দেহকে প্রতিভাস বা simulacrum মনে করা কোন মতেই সঙ্গত নয়।

এখন প্রশ্ন উঠিবে, অবতারের দেহ যদি আমাদেরই মত রক্তমাংসের দেহ হয়, তবে অবতার-গ্রহণের প্রণালী কি? বঙ্কিমচন্দ্র এ প্রশ্নের কোন মীমাংসা করেন নাই। আমার 'অবতারতত্ত্ব' গ্রন্থের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে আমি যথাসাধ্য এ প্রশ্নের সমাধান করিবার চেষ্টা করিয়াছি। অতএব এস্থলে বিস্তার না করিয়া সংক্ষেপে আমার সিদ্ধান্তের বিবৃতি করিব।

বাদ দ্বিবিধ—দ্বৈত ও অদ্বৈত। দ্বৈত-দৃষ্টিতে অবতার গ্রহণের প্রণালী একরূপ—অদ্বৈত-দৃষ্টিতে অন্যরূপ। প্রথম অদ্বৈত-দৃষ্টি বুঝিবার চেষ্টা করি।

এ দেশে আমরা যাহাকে সংবিৎ বলি—পাশ্চাত্ত্য দর্শনে তাহার নাম consciousness. এই সংবিৎ সাধারণতঃ আমাদের মস্তিষ্ক-দ্বার দিয়াই প্রকাশিত হয়। কিন্তু লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, সংবিৎ একটা ব্যাপক বস্তু—মস্তিষ্ক-দ্বারে তাহার ভগ্নাংশ মাত্র ব্যক্ত হয়—অধিকাংশই অব্যক্ত বা subliminal থাকে। সংবিতের এই তথ্য বুঝাইতে তত্ত্বদর্শী মায়ার সাহেব ব্যক্ত সংবিৎকে সাগরে ভাসমান তুষার-স্তূপের সহিত তুলিত করিয়াছেন। সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, জলপূর্ণ কাচের গেলাসে এক টুকরা বরফ ছাড়িয়া দিলে ঐ বরফের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র (বোধ হয়, সাত ভাগের এক ভাগ) জলের উপরে ভাসে—বাকি অংশ জলের নীচে ডুবিয়া থাকে। তুষারস্তূপের সম্বন্ধেও ঐরূপই দেখা যায়। শীতপ্রধান উত্তর-সমুদ্রে গ্রীষ্মঋতুর আরম্ভে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বরফের পাহাড় ভাসিয়া

আসে। ঐ সকল পাহাড়ের দশ হাত যদি জলের উপরে ভাসে, তবে অন্ততঃ ৭০ হাত জলের মধ্যে ডুবিয়া থাকে। পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ববিদেরা এখন বলিতেছেন, জীব-সংবিৎও ঐরূপ। ইহা একটা প্রকাণ্ড বস্তু, কিয়দংশ মাত্র মস্তিষ্কের দ্বারা প্রকাশিত হয়—যাহাকে brain consciousness বলে। ইহাই যেন বরফস্তূপের জলের উপরিভাগে ভাসমান ভগ্নাংশ; কিন্তু ইহার অধিকাংশ subliminal অর্থাৎ, জাগ্রৎ অবস্থায় অব্যক্ত থাকে—ইহাই যেন বরফস্তূপের জলমগ্ন অবশিষ্টাংশ। দিব্যদৃষ্টি, প্রাগ্‌দৃষ্টি, সাইকোমেটরি, সফল স্বপ্ন, ধ্যান, সমাধি প্রভৃতি ব্যাপারে ঐ subliminal সংবিৎ (যাহা জাগ্রদ্দশায় অব্যক্ত বা subliminal ছিল) সেই সংবিৎ উপরে কতকটা ভাসিয়া উঠে এবং আমরা ঐ ব্যাপকতর সংবিতের (larger consciousness-এর) ব্যাপার দেখিয়া চমৎকৃত হই। এই Subliminal consciousness সম্বন্ধে স্যর অলিভার লজ লিখিয়াছেন—

> The doctrine is roughly that we are each of us larger than we know; that each of us is only a partial incarnation of a larger self. The individual, as we know him, is an incomplete fraction. ··· The incarnate fraction varies in different individuals, from something almost insignificant to something rather magnificent and striking, but in no case is the whole self manifested in any given individual.—*Making of Man.*

অর্থাৎ মস্তিষ্কের দ্বার দিয়া আমাদের যেটুকু প্রকাশিত হয়, আমরা প্রত্যেকে তাহা অপেক্ষা অনেক বৃহৎ। এই ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ দ্বারা আমাদের ব্যাপকতর সংবিতের পরিমাণ করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র; কারণ, brain consciousness (যাহাকে এদেশের ভাষায় জাগ্রৎ-সংবিৎ বলা হয়) সমস্ত জীবের কতটুকু?

সেই জন্য হিন্দু দার্শনিকেরা জাগ্রৎ-সংবিতের উপর স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এবং যোগসিদ্ধের পক্ষে তুরীয় ও নির্বাণ সংবিতের উল্লেখ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, নির্বাণ অবস্থাতেই সংবিতের সম্পূর্ণ সম্প্রসারণ হয়। স্যর অলিভার লজও বলিতেছেন, সংবিতের ব্যাপকতার ইয়ত্তা করা যায় না। কোনও কোনও ক্ষেত্রে 'শারীর' সংবিৎ এত বৃহৎ ভাবে ব্যক্ত হয় যে, আমরা তাহার মহীয়সী প্রতিভায় বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া সমাদর করি।*

এই যে ব্যাপক সম্বিৎ, অদ্বৈতবাদীর মতে উহাই ব্রহ্ম—উহার উদয়াস্ত নাই, অপচয়-উপচয় নাই, উহা অখণ্ড অব্যয় অদ্বয়। কেবল উপাধির ভেদে ঐ ব্রহ্ম-জ্যোতির

* How large a subliminal self may be, one does not know. ··· In some cases it may happen that the portion incarnate is so great that the embodied personality exhibits the phenomenon of transcendent genius and is by universal consent accounted 'a great man.'—*Making of Man.* Ch. ix.

প্রকাশের তারতম্য—বস্তুতঃ তাহার প্রভেদ বা পরিচ্ছেদ নাই—উপাধির্ভিদ্যতে ন তদ্বান্ এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া উপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন—

যথা হ্যয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বান্
আপো ভিন্না বহুধৈকোঽনুগচ্ছন্

—'এক সূর্য যেমন বিভিন্ন জলাধারে বহুরূপে প্রতীয়মান হন—ইহাও তদ্রূপ।'

একটি উদাহরণ দ্বারা বিষয়টি বিশদ হইতে পারে। ধরুন, একটা প্রকাণ্ড ডোমের মধ্যে একটি মহোজ্জল তাড়িতবর্তি রাখা গেল। ডোমটি কতকগুলি পরকলা দ্বারা গঠিত—কেহ অস্বচ্ছ, কেহ অর্দ্ধ-স্বচ্ছ, কেহ স্বচ্ছ—কয়েকটি পরকলা রঙীন, দুই একটি শ্বেত-শুভ্র। এরূপ স্থলে ডোমের অভ্যন্তরস্থ জ্যোতির প্রকাশে তারতম্য ঘটিবে না কি ?

যে পরকলাগুলি অস্বচ্ছ (opaque)—তাহাদের মধ্য দিয়া ঐ জ্যোতিঃ প্রায় অপ্রকাশই থাকিবে। যে পরকলাগুলি অর্দ্ধ-স্বচ্ছ, তাহাদের মধ্য দিয়া জ্যোতির আংশিক প্রকাশ হইবে মাত্র। আর যেগুলি প্রায় স্বচ্ছ, যদি মাজিয়া ঘষিয়া তাহাদিগকে বেশ স্বচ্ছ করা যায়—তবে তন্মধ্য দিয়া জ্যোতির পূর্ণ প্রকাশ হইবে। এইরূপ রঙীন পরকলাগুলি জ্যোতির সহজ শুভ্রতাকে রঞ্জিত করিবে। কিন্তু যে পরকলা শ্বেতশুভ্র, তাহার মধ্য দিয়া যে জ্যোতিঃ বহির্গত হইবে, তাহার প্রকাশ অবিকৃত থাকিবে।

অদ্বৈতবাদী বলেন, আমরা প্রত্যেকে ঐরূপ এক একটি পরকলা। যে অখণ্ড ব্রহ্মজ্যোতিঃ অপ্রাকৃত ধামে চির জ্যোতিষ্মান্—সেই জ্যোতিঃ প্রপঞ্চে ভিন্ন ভিন্ন জীব-পরকলার উপাধিযোগে বিচিত্র আকারে ও বিবিধ বর্ণে অনুরঞ্জিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু যদি কোন উপাধি সম্পূর্ণ স্বচ্ছ হয়, যদি কোন পরকলার সমস্ত মলা মলিনতা বিধৌত হইয়া সে একেবারে অনাবিল, একান্ত শ্বেতশুভ্র হয়—তবে সেই দ্বার দিয়া ব্রহ্ম-জ্যোতির যে অবাধ মহিমা ও অপার ঐশ্বর্য প্রকটিত হইবে, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে ? আমরা যাঁহাদের অবতার বলি, তাঁহারা ঐরূপ একান্ত অনাবিল শ্বেতস্বচ্ছ পরকলা—সে জন্য তাঁহাদের মধ্য দিয়া ব্রহ্মজ্যোতির যে প্রকাশ হয়, তাহার সাক্ষাৎ পাইয়া লোক আনন্দে উৎফুল্ল ও ভক্তিতে উদ্বেল হইয়া উঠে। অদ্বৈত-দৃষ্টিতে ইহাই অবতার-তত্ত্ব।

এইবার দ্বৈত-দৃষ্টির কথা বলি। অদ্বৈত মতে জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন—অদ্বৈতবাদের মহাবাক্য—সোঽহং, তত্ত্বমসি।

এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ —উপনিষদ্

দ্বৈতবাদে কিন্তু জীব ও ব্রহ্মের নিত্যভেদ স্বীকৃত—

জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বৌ ঈশানীশৌ—শ্বেতাশ্বতর

'জীব ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্ন—জীব অজ্ঞ অনীশ্বর, ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ ঈশ্বর।' কেবল তাহাই নয়—বিভিন্ন শরীরের অধিষ্ঠাতা বা চালক জীব ভিন্ন ভিন্ন। আমার দেহপুরীর স্বামী আমি—আপনার দেহপুরীর স্বামী আপনি। আপনি ও আমি স্বতন্ত্র।

কিন্তু তাহা হইলেও এরূপ ঘটনা বিরল নয় যে, কখন কখনও এক জীব অন্য জীবের

দেহে অনধিকার প্রবেশ করিয়া প্রকৃত মালিককে স্থানচ্যুত বা বেদখল করে। এ ব্যাপারকে আমরা এদেশে 'আবেশ' বলি—পশ্চিমে ইহার নাম Control বা Possession.

> What is meant is that the human body may become separate from its ordinary tenant and another tenant may step into it.—Annie Beasant.

এই আবেশ সম্পর্কে মায়ার সাহেব তাঁহার *Human Personality* গ্রন্থে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন—কৌতূহলী পাঠক তাহা পাঠ করিতে পারেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার সিদ্ধান্ত এই :—

> If we analyse our observations of possession, we find two main factors—the central operation, which is the control by a spirit of the sensitive's organism and the indispensable pre-requisite which is the partial and temporary desertion of that organism by the percipient's own spirit.

অর্থাৎ, আবেশস্থলে পর পর দুইটি ব্যাপার ঘটিতে দেখা যায় :—প্রথমতঃ যিনি আবেশের পাত্র হইবেন, তাঁহার সংবিৎ বা আত্মা স্বীয় দেহ ছাড়িয়া সাময়িক ভাবে বাহিরে অবস্থান করে এবং সেই সুযোগে আগন্তুক আবেশকারীর সংবিৎ বা আত্মা (spirit) সেই শূন্য পুরীতে প্রবেশ করিয়া ঐ আবিষ্টের শরীর দখল করিয়া বসে। ভূতাবেশস্থলে আরও দেখা যায় যে, কখন কখন দুষ্ট ভূত বা প্রেত বলপূর্ব্বক মালিককে বেদখল করিবার উদ্‌যোগ করিতেছে এবং মালিক নিজের দখল বজায় রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। তখন উভয়ের মধ্যে যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তাহারই ফলে আবিষ্টের দেহে হিষ্টিরিয়ার লক্ষণ-সকল ফুটিয়া উঠে।

প্রেততত্ত্ববাদী বা স্পিরিচুয়ালিষ্টদিগের বৈঠকে (seanceএ) 'মিডিয়মে'র দেহে আগন্তুক প্রেতের আবেশ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। ঐ অবস্থায় প্রায়ই মিডিয়ম অচৈতন্য হইয়া পড়ে এবং তাহার মধ্যে ঐ আগন্তুক প্রেত আংশিক বা পূর্ণ ভাবে প্রবেশ করে। কেহ কেহ আবেষ্টা যে আবিষ্ট হইতে ভিন্ন ব্যক্তি—এ কথা স্বীকার করিতে চান না--তাঁহারা বলেন, ঐ ঐ স্থলে আবিষ্টের Personalityর একাংশই আবেষ্টারূপে প্রতীয়মান হয়। মায়ার্স এ কথার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন—আবেশস্থলে আবিষ্টের আত্মা অন্ততঃ আংশিক ভাবে তাহার স্থূল শরীর ত্যাগ করিলে কোন আগন্তুক আত্মা তাহার দেহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ঐ শরীরের চালনা করে।

> The automatist (আবিষ্ট), in the first place, falls into a trance, in which his spirit partially quits his body ··· so as to leave room for an invading spirit to use it in somewhat the same fashion as its owner is accustomed to use it.

এ কথার প্রমাণে মায়ার্স বলেন—আবেশকারী যে ভিন্ন ব্যক্তি, তাহার লেখার ছাঁদে,

কথার স্বরে, বাক্যের ভঙ্গিতে তাহা প্রমাণিত হয়। কখনও বা আবিষ্টের সম্পূর্ণ অজানা সংবাদ তাহার বচনে বা লিখনে প্রকাশিত হয়।

The controlling spirit proves his identity mainly by reproducing in speech or writing, facts which belong to his memory and not to the automatist's memory. He may also give evidence of supernormal perceptions of other kinds.

পাশ্চাত্ত্য প্রেততাত্ত্বিকেরা প্রেতের সমস্যা লইয়া এতই ব্যস্ত যে, প্রেত ভিন্ন অন্য জীবের যে আবিষ্টের দেহে আবেশ ঘটিতে পারে, একথা তাঁহারা আলোচনা করিবার বা লক্ষ্য করিবার অবসর পান না। কিন্তু ভূতাবেশ যেমন প্রমাণসিদ্ধ, দেবাবেশও সেইরূপ প্রমাণসিদ্ধ। অনেক স্থলে উন্নত পুরুষ, কখনও বা মুক্ত পুরুষ—কোন কোন শুদ্ধ আধারে আবিষ্ট হয়েন। এ সম্বন্ধে এদেশের ও বিদেশের ধর্ম-সাহিত্য বহু প্রামাণিক কাহিনীতে পরিপূর্ণ।

'শঙ্কর-দিগ্বিজয়ে' দেখা যায়, শঙ্করাচার্য্য কামকলা শিক্ষার জন্য অমরু রাজার দেহে প্রবেশ করিয়া কয়েক মাস অবস্থান করিয়াছিলেন। চৈতন্যচরিতে তাঁহার অগ্রজ বিশ্বরূপ সম্বন্ধে এই ধরণের ঘটনার উল্লেখ আছে। বিশ্বরূপ বেশ উন্নত সাধক ছিলেন।

প্রভুর অগ্রজ বিশ্বরূপ ভগবান্।
আজন্ম বিরক্ত সর্ব্ব গুণের নিদান।
নিরবধি থাকে সর্ব্ব বৈষ্ণবের সঙ্গে।
কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণকথা রঙ্গে।—চৈতন্যভাগবত

এই বিশ্বরূপ যৌবনে বিরাগী হইয়া নবদ্বীপ পরিত্যাগ করেন এবং কয়েক বৎসর মধ্যে পুণার সন্নিহিত পান্‌ঢারপুরে দেহরক্ষা করেন। বৈষ্ণবগ্রন্থের বর্ণনায় জানা যায়, বিশ্বরূপের তিরোধানের পর যখন শ্রীনিত্যানন্দ আসিয়া মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইলেন, তখন তাঁহার লীলার সহায়তা করিবার জন্য বিশ্বরূপ নিত্যানন্দের শরীরে প্রবেশ করিলেন।

মূর্ত্তিভেদে জন্মিলা আপনি নিত্যানন্দ।—চৈতন্যভাগবত

এই আবেশের ফলে নিত্যানন্দের আকৃতি এমনভাবে পরিবর্ত্তিত হইত যে, শচীমাতা অনেক সময় নিত্যানন্দকে বিশ্বরূপ বলিয়া ভ্রম করিতেন।

হেনমতে বিশ্বরূপ হইলা বাহির।
নিত্যানন্দ স্বরূপের অভেদ শরীর।—চৈতন্যভাগবত

যখন মহাপ্রভু সন্ন্যাসের পর নীলাচলে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন এবং নিত্যানন্দকে বাংলা দেশে প্রচারকার্য্যে নিয়োজিত করিলেন, তখন দুই জনের মধ্যে বিচ্ছেদ হইল। তখন বিশ্বরূপ কি করিলেন? তিনি নিত্যানন্দের শরীর ছাড়িয়া পরমানন্দপুরীর দেহে আবিষ্ট হইলেন। সেই জন্য দেখিতে পাই, চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে মহাপ্রভু বলিতেছেন :—

অহো পরমানন্দপুরীশ্বরঃ তাবন্মুনীন্দ্রমাধবপুরীশ্বরস্য শিষ্যঃ, যত্র খলু অগ্রজস্য বিশ্বরূপস্য সমগ্রম্‌, ঐশ্বরং তেজঃ প্রবিষ্টম্‌।

খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে যে নষ্টিক্ (gnostic) সম্প্রদায় আছে, সেই সম্প্রদায়ের লোক-দিগের পূর্বাপর বিশ্বাস যে, যিশু ও খ্রীষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তি এবং মেরীর পুত্র যিশুর প্রাকৃত দেহে অপ্রাকৃত তত্ত্ব ক্রাইষ্টের আবির্ভাব হইয়াছিল। ক্রাইষ্ট যিশুর দেহে তিন বৎসর মাত্র বসতি করিয়া লীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। ম্যাথ্ ও জনের কাহিনীতে দেখা যায়, যিশু যখন যৌবনের মধ্যসীমায় উপনীত, তখন জন্ দি ব্যাপটিষ্ট তাঁহাকে দীক্ষিত করেন। জন্ যিশুকে দীক্ষাদান করিলে আকাশ বিদীর্ণ হইয়া ঐশ তেজঃ (Spirit of God) স্থপর্ণের রূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবতরণ করিল এবং যিশুর উপর আপতিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে দৈববাণী হইল, "এই আমার প্রিয় পুত্র, আমার অশেষ প্রীতিভাজন।"

> Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John, to be baptised of him. ··· And Jesus, when he was baptised, went up straitway out of the water : and, lo, the heavens were opened unto him and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting upon him.
>
> And lo ! a voice from heaven saying, 'This is my beloved Son, in whom I am well pleased.'—Matthew, Ch. III, 14, 16-7.

যাহাকে আমরা অবতার বলি, সেও এইরূপ আবেশের ব্যাপার। যিনি অবতীর্ণ হন—তা তিনি পুরুষোত্তম ভগবান্ই হউন অথবা ভগবানের সাধর্ম্যপ্রাপ্ত মুক্ত পুরুষই হউন—তিনি ব্যক্তিবিশেষের দেহে আবিষ্ট হন। অর্থাৎ, ঐ দেহ তাঁহার সাময়িক বাহন বা উপাধি হয়। অবশ্য ঐ দেহ শুদ্ধ, পূত, অপাপবিদ্ধ হওয়া চাই। ভূতাবেশ স্থলে আগন্তুকের অনধিকার প্রবেশ, কিন্তু অবতার স্থলে নির্বাচিত বাহন স্বেচ্ছায় স্বদেহ সাময়িক ভাবে নিবেদন করেন এবং অবতার সেই দেহে আংশিক বা পূর্ণরূপে প্রবেশ করিয়া নিজের মহিমা ও মাধুর্য প্রকাশিত করেন। দ্বৈতদৃষ্টিতে ইহাই অবতারগ্রহণের প্রণালী।

আমার 'অবতার-তত্ত্বে' আমি যিশুখ্রীষ্ট, চৈতন্যদেব, পরশুরাম, রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ-সম্পর্কিত প্রামাণিক গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া এই আবেশতত্ত্ব বিশদিত ও প্রমাণিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করিব না।

অবতার সম্পর্কে আরও অনেক বক্তব্য আছে, কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে তাহা আলোচ্য নয়।

ভারতচন্দ্রের একখানি পুঁথি

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, ডি-লিট্, এফ্-আর্-এ-এস্-বি

কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' বাঙ্গালা সাহিত্যের একখানি প্রধান কাব্যগ্রন্থ, এবং ইহার রচনার কাল হইতে আরম্ভ করিয়া ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্কিম মধুসূদন রঙ্গলাল প্রমুখ সাহিত্যিক ও কবিগণের রচনায় বাঙ্গালা সাহিত্যের আধুনিক ধারা সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত, এক শত বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া 'অন্নদামঙ্গল'-কে বাঙ্গালা ভাষার সর্বাপেক্ষা লোকপ্রিয় কাব্যগ্রন্থ বলিয়া ধরিতে পারা যায়। অবশ্য, রামায়ণ মহাভারত চণ্ডীকাব্য প্রভৃতি বাঙ্গালার জনসমাজে আদৃত হইত, কিন্তু মুখ্যতঃ পৌরাণিক আখ্যান হিসাবে লোকের কাছে ঐ পুস্তকগুলির আদর ছিল—কাব্যরসের আস্বাদনের জন্য, সুকুমার সাহিত্য হিসাবে, 'অন্নদামঙ্গল'-ই প্রথম ও প্রধান কাব্যগ্রন্থ ছিল। বৈষ্ণব পদাবলীর সাহিত্যসৌন্দর্য সম্বন্ধে আমরা, অর্থাৎ বৈষ্ণব-সম্প্রদায় বহির্ভূত সাধারণ বাঙ্গালী, অতি অল্পকাল হইল, মাত্র উপস্থিত দুই এক পুরুষের মধ্যে, সচেতন হইতে আরম্ভ করিয়াছি। কোনও লেখকের লোকপ্রিয়তার একটী বড় প্রমাণ এই যে, তাঁহার রচনা হইতে বহু বচন বা ভাব সাধারণ্যে প্রচার লাভ করিয়া থাকে, অনেক সময়ে তাঁহার রচিত বচন ভাষায় প্রবাদের মতন সকলের মুখে মুখে ফিরে। আমরা এখন বৈষ্ণব পদকার "চণ্ডীদাস"-কে গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে পুনরাবিষ্কার করিয়াছি—চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত পদের সংগ্রহের প্রকাশ দ্বারা, সাহিত্যিক আলোচনা দ্বারা, শিক্ষিত সমাজে কীর্তন-সঙ্গীতের পুনঃপ্রচারের দ্বারা, বাঙ্গালার বৈষ্ণব ধর্মমত শ্রদ্ধার সহিত বাঙ্গালী শিক্ষিতজন কর্তৃক আলোচনার ফলে, এবং ইহাও উল্লেখ করিতে হইবে, নাটক ও চলচ্চিত্রের সহায়তায়, "চণ্ডীদাস" এখন বিশেষ লোকপ্রিয় হইয়াছেন, তাঁহার রচনা বলিয়া "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল মোর প্রাণ," "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই" প্রভৃতি বহু পদাংশ আমরা সকলেই আওড়াইতেছি, আলাপে ও রচনায় উদ্ধার করিতেছি। আমার মনে হয়, বাঙ্গালার পুরাতন (অর্থাৎ ইংরেজী সভ্যতার ও মনোভাবের প্রচারের পূর্বেকার) যুগের বাঙ্গালী কবিদের মধ্যে ভারতচন্দ্রের গ্রন্থ হইতে যত পয়ার বা ত্রিপদী বা পদাংশ অথবা বাক্য বাঙ্গালা ভাষায় প্রবচন বা প্রবাদ রূপে আপনা হইতেই গৃহীত হইয়াছে, এমন আর কোনও কবির লেখা হইতে হয় নাই।

ভারতচন্দ্রের মৃত্যু হইয়াছিল, আনুমানিক ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পরে। তাঁহার জীবৎকালে 'অন্নদামঙ্গল' রচনার সময় হইতে আরম্ভ করিয়া, ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রথম তাঁহার গ্রন্থ মুদ্রণের সময় পর্যন্ত, হাতে লেখা পুঁথিতে তাঁহার রচনা
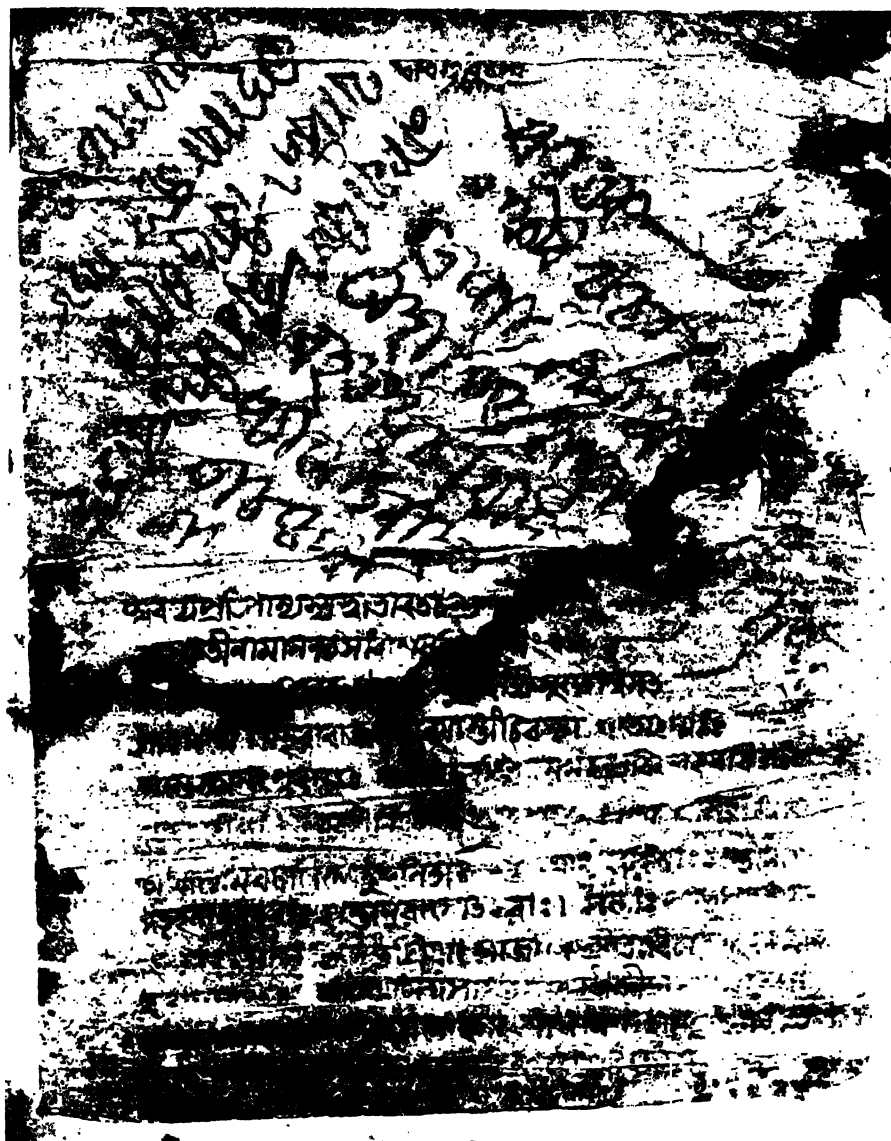
কবি ভারতচন্দ্রের স্বহস্তলিখিত আবেদন পত্র, তদুপরি
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের স্বহস্তলিখিত আদেশ
[বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালা হইতে]

লোকসমাজে প্রচারিত হইত। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের সংস্করণের পরে ১২৩৫ সালে (১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে) কলিকাতা সিমুলিয়ার "পীতাম্বর সেন দিগরের" (and Company-র খাসা বাঙ্গালা তরজমা—"দিগরের") ছাপাখানায় "অন্নদামঙ্গল—বিদ্যাসুন্দর" মুদ্রিত হয়। তাহার পরে ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একখানি সুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করেন। কবির মৃত্যুর পরে ষাট বৎসরের মধ্যে তাঁহার রচিত কাব্য সমগ্রভাবে মুদ্রিত হওয়ায়, উক্ত গ্রন্থে বিশেষ পাঠবিকৃতি ঘটিতে পারে নাই। গঙ্গাকিশোর-প্রমুখ প্রথম সংস্কর্তা ও প্রকাশকগণ যে পুঁথি বা পুঁথিসমূহ অবলম্বন করিয়া বই ছাপান, সে সমস্ত পুঁথি ভারতচন্দ্রের সময়ের কত কাছাকাছি লিখিত হইয়াছিল তাহা আমরা জানি না। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুঁথিশালায় ভারতচন্দ্রের কাব্যের তারিখ দেওয়া ছয়খানি পুঁথি আছে; এগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীনটীর তারিখ হইতেছে ১২০৪ সাল (=১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দ), তাহার পরে আছে ১২০৯ সাল (=১৮০২ খ্রীষ্টাব্দ), ১২২৮ সাল (=১৮২১ খ্রীষ্টাব্দ), ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দ, ১৭৫১ শক (=১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দ), ১২৩৯ সাল (=১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ)। খণ্ডিত তারিখ-বিহীন পুঁথিও কতকগুলি আছে। বাঙ্গালা দেশে বা অন্যত্র বাঙ্গালা-পুঁথি-সংগ্রহ-সমূহে ভারতের এইরূপ পুঁথি আরও মিলিতে পারে।

ভারতচন্দ্রের কাব্যের একটী যুগোপযোগী প্রামাণিক এবং সুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত হওয়া উচিত। বাঙ্গালার ব্রিটিশ-পূর্ব যুগের শ্রেষ্ঠ কাব্যশিল্পী হিসাবে এরূপ একটী সংস্করণ না থাকা বাঙ্গালা দেশের ও বাঙ্গালী জাতির পক্ষে লজ্জার কথা। আমাদের সাহিত্যিকগণের মধ্যে ভারতচন্দ্রের গুণগ্রাহী সমালোচকের অভাব নাই। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম;—তাঁহার সম্পাদনায় ভারতচন্দ্রের কাব্যটী প্রকাশ করার কথা এক সময়ে আমাদের অনেকেরই মনে হইয়াছিল। সম্প্রতি সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস তাঁহাদের দ্বারা সম্পাদিত ও প্রকাশিত, বাঙ্গালার সাহিত্যরসিক ও সাহিত্যালোচক সমাজে সুপরিচিত "দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা"-তে, ভারতচন্দ্রের একটী প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশিত করিতে সংকল্প করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা ভারতচন্দ্রের পুঁথি ও মুদ্রিত সংস্করণের সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছেন।

পারিসের 'বিব্লিওতেক নাসিওনাল' বা ফরাসী জাতীয় গ্রন্থাগারের ভারতীয় পুঁথির সংগ্রহের মধ্যে একখানি বিদ্যাসুন্দরের পুঁথি আছে; A. Cabaton আ. কাবার্তঁ-সংকলিত উক্ত পুঁথিসংগ্রহের তালিকায় এই সংবাদ পাইয়া, ব্রজেন্দ্র-বাবু ও সজনী-বাবু, এইবার যখন আমি ইউরোপে যাই তখন আমায় অনুরোধ করেন, সম্ভব হইলে পারিসে ঐ পুঁথিটী যেন আমি দেখিয়া আসি। তদনুসারে আমি এই বৎসরের (১৩৩৮ সালের) জুলাই মাসে ও সেপ্টেম্বর মাসে পুঁথিখানি দেখি। সুখের বিষয়, পুঁথিতে লিখনের তারিখ দেওয়া আছে; সন ১১৯১ সাল ১৪ কার্তিক তারিখে ইহার লিখন সমাপ্ত হয়; ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে লেখা এই পুঁথি; উপস্থিত আমাদের গোচর-মত ইহাই হইতেছে ভারতচন্দ্রের কাব্যের সবচেয়ে প্রাচীন পুঁথি।

Augustin Aussant ওগুস্ত্যাঁ ওসাঁ নামে এক ফরাসী ভদ্রলোক চন্দননগরে অষ্টাদশ শতকের শেষপাদে ছিলেন, ইনি ফরাসী সরকারের বাঙ্গালা দোভাষীর কাজ করিতেন। ইহার সংকলিত ফরাসী-বাঙ্গালা অভিধান অমুদ্রিত অবস্থায় পারিসের বিব্লিওতেক্ ন্যাসিওনাল-এ রক্ষিত আছে—এই অভিধানে বাঙ্গালা শব্দগুলি ফরাসী বানানে রোমান অক্ষরে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে (এ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ, 'ভারতী,' জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০, পৃঃ ১৩৬-১৩৭)। পুঁথিখানি ইনিই ভারতবর্ষ হইতে পারিসে লইয়া যান।

পুঁথিখানি ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পরে ২৫ বৎসরের মধ্যে লিখিত। সাধারণ অষ্টাদশ শতকের বাঙ্গালা পুঁথি, একটু বড় আকারের লম্বা চওড়া পুঁথি। পত্র-সংখ্যা ৫০। পুঁথির আরম্ভে ফরাসী ভাষায় টানা হাতের লেখায় মন্তব্য লেখা আছে—Calikkya Mongol ou Biddya Choundour Oupoyekhyana—Mariage de Biddya et Choundour sous l'aprobation de Calikkya femme de la Divinite´ Chib, tire´ de l' Histoire de la ditte Divinite´—coppie´ en 1784; তদনন্তর, অন্য হাতে লেখা, Poème Bengali modern intitule´ Vidyasundara ou les Amours de Vidya´ et de Sundara. MS. Bengaly d 'Aussaint. অর্থাৎ, 'কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান—শিব দেবতার স্ত্রী কালিকার অনুমোদন অনুসারে বিদ্যা ও সুন্দরের বিবাহ, উক্ত দেবতার ইতিহাস (বা পুরাণ) হইতে উদ্ধৃত, ১৭৮৪ সালে অনুলিখিত; বিদ্যাসুন্দর অর্থাৎ বিদ্যা ও সুন্দরের প্রেম নামক আধুনিক বাঙ্গালা কাব্য,—ওস্যাঁর ('আনীত) বাঙ্গালা পুঁথি'।

এই পুঁথির লেখা সর্বত্র গোটাগোটা ও সহজপাঠ্য। ইহার আরম্ভ এই রূপ—"৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ। অথ অন্নপূর্ন্না ঠাকুরানির পুস্তক লিক্ষতে। কবি সক্তী শ্রী ভারথচরণ রায়। আজ্ঞা শ্রীযুক্ত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহাশয়।" ইত্যাদি।

তদনন্তর, "আল আমার প্রাণ কেমন লো করে না দেখি তাহারে॥" এই ছত্রশীর্ষক গান দিয়া পালা আরম্ভ হইয়াছে।

ইহার সমাপ্তি এই রূপ—"বিদ্যাসুন্দরে লইয়া কালিকা কৌতুকী হয়্যা কৈলাসেতে করিলা প্রবেস। কালিকা-মঙ্গল সায়ঃ ভারথ ব্রাহ্মণে গায়ঃ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেস॥ ইতি কালিকামঙ্গল সমাপ্ত। সন ১১৯১ সাল তারিখ ১৪ কার্তিক।'

এই পুঁথিখানি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়াছি, কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে পারিসে বিশেষ উদ্বেগের সময় গিয়াছিল, আর নানা কাজে নকল করিবার সময় হয় নাই, সমস্তটার ফোটোগ্রাফ আনাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। প্রামাণিক সংস্করণের জন্য এই পুঁথি প্রাচীনতম বিধায় আমাদের মিলাইয়া দেখা দরকার। কিন্তু সাহিত্য-পরিষদের সর্বপ্রাচীন পুঁথিখানির তুলনায় বোধ হয় পারিসের এই পুঁথি খুব বেশী বৈশিষ্ট্যযুক্ত হইবে না।

ভারতচন্দ্রের পুঁথিগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাঁহার কাব্যের একটা নাম

স্থির-নির্ধারিত হয় নাই। 'কালিকামঙ্গল,' 'অন্নদামঙ্গল,' 'বিদ্যাসুন্দর,' 'কালিকাপুরাণ' এই রূপ বিভিন্ন নাম পাওয়া যায়। তবে 'অন্নদামঙ্গল' নামটীই সমধিক প্রচলিত ছিল। প্রথম মুদ্রিত সংস্করণে এই নামই পাই।

আধুনিক সংস্করণে ভাষা অল্পবিস্তর আধুনিক রূপ পাইয়া বসিয়াছে, ১৭৮৪-র পুঁথি সে বিষয়ে আমাদিগকে অনেকটা সংশোধন করিয়া দিবে। পুঁথির পাঠে দেখা যায়, এখনকার "মাথা খেতে এলি মোর" অষ্টাদশ শতকে ছিল "মাথা খাত্যি আল্যি মোর"। পুঁথির পাঠে দুই পাঁচটী শব্দও প্রাচীন রূপেই মিলিতেছে—ফরাসী Hollandaise 'ওলাঁদেজ্' হইতে বাঙ্গালা 'ওলন্দাজ', এই পুঁথিতে 'ওলন্দেজ' রূপে পাই। পুঁথিতে—এমন কি, ভারতচন্দ্রের গ্রন্থ মুদ্রিত হইবার পরও যে সব পুঁথি লিখিত হইয়াছিল সেগুলির মধ্যে কোনও-কোনওটীতে—'ভারতচন্দ্র' এই নামটী বহুশঃ 'ভারথচন্দ্র' রূপে পাই। সংস্কৃতে ত-কার যুক্ত 'ভারত' রূপই প্রচলিত; কিন্তু থ-কার যুক্ত 'ভারথ'-রূপও প্রাচীন ভারতে কথ্য ভাষায়—যে ভাষার আধারে সাহিত্যিক সংস্কৃত গঠিত হইয়াছিল তাহাতে—বিদ্যমান ছিল; এই 'ভারথ' শব্দ প্রাকৃতে 'ভারধ' ও 'ভারহ' রূপ গ্রহণ করে, এবং ইহা মধ্য-যুগে হিন্দী বাঙ্গালা প্রভৃতিতে 'ভারথ' রূপেই গৃহীত হয়। প্রাচীন বাঙ্গালায় প্রায় সর্বত্র 'ভারত' অপেক্ষা 'ভারথ' শব্দই অধিকতর ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়—'মহাভারথ, ভারথ-পুরাণ' প্রভৃতি শব্দে। ভারতচন্দ্রের নামেও এই অসংস্কৃত রূপ হাতের লেখা পুঁথিতে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে—কেবল ছাপার সময়ে সংস্কৃত শুদ্ধ রূপই গৃহীত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতের ভাষায় 'ভারত—ভারথ' এই দুই রূপের পাশাপাশি অবস্থান, একক বা বিশিষ্ট ব্যাপার নহে; চীনা ভাষায় রামায়ণের আখ্যানের তিনটি অনুবাদ হয়, তাহার দুইটীতে রাজা দশরথের নাম 'দশ-রথ' রূপেই আছে, অন্যটীতে 'দশ-রত' রূপে পাওয়া যাইতেছে; চীনারা সাধারণতঃ বড়-বড় সংস্কৃত নাম চীনা অক্ষরে প্রতিবর্ণীকরণ দ্বারা জানাইত না, অনুবাদ করিয়া লইত; Ten-Chariots ('দশ-রথ'), এই রূপ অনুবাদের পার্শ্বে আবার Ten-Pleasures ('দশ-রত') অনুবাদ হইতে, 'দশ-রত' শব্দের অস্তিত্ব প্রতীয়মান হয়। ভারতবর্ষে আর্য ভাষার আদি-যুগে 'ত' ও 'থ' প্রত্যয়দ্বয়ের পারস্পরিক প্রভাবের ফলে এইরূপ ঘটিয়া থাকিবে।

ভারতচন্দ্রের শব্দসম্পদ্ বিশেষ লক্ষণীয়। বোধ হয়, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম এবং রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র শব্দসংখ্যায় তুল্যমূল্য হইবেন। ভারতচন্দ্রের ব্যবহৃত বহু শব্দ মুদ্রিত পুস্তকে বিকৃত রূপে পাওয়া যায়, এগুলির পুরাতন বা যথাযথ রূপ পুঁথি দৃষ্টে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হইলে, শব্দগুলির ব্যাখ্যাও সহজ হইবে। অষ্টাদশ শতকের বাঙ্গালা দেশের গ্রামীণ সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যে, এই দেশের নাগরিকতার একমাত্র প্রকাশক ছিলেন কবি ভারতচন্দ্র। অষ্টাদশ শতকের বাঙ্গালার সংস্কৃতির সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল সাহিত্যিক নিদর্শন হিসাবে আশা করি মৌজুদ পুঁথি ও মুদ্রিত পুস্তক অবলম্বন করিয়া শীঘ্রই ভারতচন্দ্রের কাব্যের প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশের ব্যবস্থা হইবে।

রামনারায়ণ তর্করত্ন

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র পূর্ব্বে দুই এক জন বাঙালী কবি ইংরেজী কাব্যের প্রভাবে পড়িয়া সম্পূর্ণ নূতন পদ্ধতিতে কাব্যরচনার সূত্রপাত করিয়া থাকিলেও আমরা যেমন আজও পর্য্যন্ত তাঁহাকেই আধুনিক পদ্ধতির সর্ব্বপ্রথম কবি হিসাবে সম্মান করিয়া থাকি, রামনারায়ণ তর্করত্ন—বা নাটুকে রামনারাণকেও তেমনি দুই-চারি জন পূর্ব্বগামী নাট্যকারের নাট্যপ্রচেষ্টা সত্ত্বেও সর্ব্বপ্রথম আধুনিক নাট্যশিল্পীর সম্মান দিয়া থাকি। ইহার কারণ এই যে, মাইকেলের মত তিনিও অসাধারণ শিল্পপ্রতিভাবলে মৃত ও প্রণালীবদ্ধ গতানুগতিকতার মধ্যে প্রাণসঞ্চার করিতে পারিয়াছিলেন; উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইউরোপীয় রঙ্গমঞ্চের অনুকরণে বাংলা দেশে যে রঙ্গমঞ্চের উদ্ভব হইয়াছিল, তাঁহারই কবিকীর্ত্তির দ্বারা তাহা সর্ব্বপ্রথম সার্থকতা লাভ করে। ইহা এক হিসাবে অধিকতর বিস্ময়কর এই কারণে যে, বহুভাষাবিৎ মাইকেল ইউরোপীয় জ্ঞানসমুদ্র মন্থন করিয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কিন্তু পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন দীর্ঘকাল কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত ব্যাকরণ অলঙ্কারের অধ্যাপকমাত্র ছিলেন, ইউরোপীয় বা আধুনিক পদ্ধতির সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ কোনই পরিচয় ছিল না। সংস্কৃত কাব্য ও অলঙ্কারে তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল, তিনি অধ্যাপক হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন—তাঁহার এই সকল পরিচয় আজিকার দিনে প্রত্নতত্ত্বের বিষয়ীভূত হইয়াছে, কিন্তু বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ নাট্যকার হিসাবে তিনি আজিও সগৌরবে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার জীবনী ও কীর্ত্তির পুনরালোচনা সহৃদয় বাঙালী পাঠকের নিকট অনাবশ্যক বিবেচিত না হইতেও পারে।

বাল্য ও ছাত্র-জীবন

২৬ ডিসেম্বর ১৮২২ তারিখে চব্বিশ-পরগণার অন্তঃপাতী হরিনাভি গ্রামে রামনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রামধন শিরোমণি। রামনারায়ণ "বাল্যাবস্থাতে দেশে ও বিদেশে চৌবাড়িতে ব্যাকরণ, কাব্য ও স্মৃতির কিয়দংশ এবং ন্যায়শাস্ত্রের অনুমানখণ্ড প্রায় অধ্যয়ন" করেন।

রামনারায়ণ শৈশবেই পিতামাতাকে হারাইয়াছিলেন। তাঁহার কোন পরিচিত বন্ধু লিখিয়াছেন, "তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর স্বর্গীয় প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর* ও তৎপত্নী কর্ত্তৃক

* প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে ১৩৪৪ সালের প্রথম সংখ্যা (পৃ. ২৫-৩০) ও ১৩৪৫ সালের প্রথম সংখ্যা (পৃ. ২৭) 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় আমি আলোচনা করিয়াছি।

লালিত হইয়া পিতৃ মাতৃ বিয়োগ কষ্ট অনুভব করিতে পারেন নাই। আমরা তর্করত্ন মহাশয়কে স্বীয় ভ্রাতৃজায়ার গুণোদ্ঘোষণ করিয়া বলিতে শুনিয়াছি যে, 'তিনি শৈশবে আমায় মাতৃস্নেহে পালন না করিলে বোধ হয় শৈশবেই আমার সত্তা লোপ হইত'।*

১৮৪৩ সনের আগষ্ট মাসে প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর অস্থায়ী ভাবে কিছু দিনের জন্য গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপক হন। এই সময় রামনারায়ণ ভ্রাতার নিকট থাকিয়া, সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হন। ১৮৪৩ হইতে ১৮৫৩ সনের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত—দশ বৎসর তিনি গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বৃত্তিপ্রাপ্ত কৃতী ছাত্র হিসাবে কলেজে তাঁহার সুনাম ছিল।

কর্ম্মজীবন

হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ

কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজের পাঠ সাঙ্গ করিয়া রামনারায়ণ হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। রাজেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ কয়েক জন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির চেষ্টায় সিঁদুরিয়াপটীর ৺রামগোপাল মল্লিকের বৃহৎ বাটীতে এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার সহিত শীল্‌স কলেজ ও ডেবিড হেয়ার অ্যাকাডেমিও সংযুক্ত হইয়াছিল। এই কলেজের শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত রাণী রাসমণি দশ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন।† কলেজের কার্য্য আরম্ভ হয় "১৮৫৩ সালের ২রা মে সোমবার"।‡ রামনারায়ণের অধ্যাপনা বিষয়ে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যে মন্তব্য করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

> শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় হিন্দু মিট্রোপলিটন কালেজের প্রধান পণ্ডিতের পদে অভিষিক্ত হওয়াতে ছাত্রদিগের বাঙ্গালা শিক্ষা অতি সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতেছে, ইনি অতি সুপণ্ডিত, ও সংস্কৃত কালেজের একজন বৃত্তিধারি ছাত্র ছিলেন। বঙ্গভাষা লেখন পঠনেও বিশেষ পারদর্শী, পতিব্রতোপাখ্যান নামক পুস্তক লিখিয়া রঙ্গপুরের কুণ্ডি পরগণার বিখ্যাত ভূম্যধিকারি শ্রীযুত কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রদত্ত প্রাইজ গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব এতাদৃশ সুযোগ্য মহাশয়ের সংযোগ দ্বারা অভিনব কালেজ বিদ্যালোকে পরিদীপ্ত হইবেক তাহার সন্দেহ নাই।—'সংবাদ প্রভাকর,' ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৫৩।

২২ অক্টোবর ১৮৫৩ তারিখে রামনারায়ণ হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজের ছাত্রদিগের উপদেশার্থ বিদ্যা-বিষয়ক প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতায় তিনি মাতৃভাষা শিক্ষার

* "কবিকেশরী রামনারায়ণ তর্করত্ন"—'শিল্পপুষ্পাঞ্জলি,' ১২৯২ সাল, পৃ. ১৫৬।

† 'সংবাদ প্রভাকর,' ১৩ মে ১৮৫৩। ‡ ঐ ৩০ এপ্রিল ১৮৫৩।

প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন, আজিকার দিনেও তাহার মূল্য আছে। তিনি বলেন :—

তোমরা যেমন মনোযোগ পূর্ব্বক ইংরাজী শিখিবে বাঙ্গলাও সেইরূপ শিক্ষা করিবে, বাঙ্গলার প্রতি কদাচ অনাস্থা করিবে না; বাঙ্গলা এতদ্দেশীয় মাতৃভাষা, সুতরাং মাতৃবৎ এই মাতৃভাষার প্রতি ভক্তি রাখা নিতান্ত আবশ্যক। দেখ বর্ত্তমান কালে যে সকল প্রদেশ দৃষ্টি ও শ্রুতি গোচর হইতেছে সে সমস্ত দেশীয় লোকেরা সকলি স্ব স্ব দেশীয় ভাষাকে উত্তম ভাষা জ্ঞানে মান্য করিয়া থাকেন এবং সাধারণের এই এক প্রসিদ্ধ প্রথা আছে যে আপন২ দেশীয় ভাষা সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা না হইলে কেহই অন্য ভাষা প্রতি ধাবমান হয়েন না অতএব তোমাদিগের দেশ ভাষার প্রতি বিমুখ হওয়া কদাচ উচিত নহে॥

রামনারায়ণ দুই বৎসর অতীব যোগ্যতার সহিত হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজে প্রধান পণ্ডিতের পদে কার্য্য করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে যোগদান করেন।

কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজ

১৫ই জুন ১৮৫৫ হইতে ৩১এ ডিসেম্বর ১৮৮২ সন পর্য্যন্ত—অন্যূন সাড়ে সাতাশ বৎসর রামনারায়ণ সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। এই কয় বৎসরের মধ্যে তিনি কখন কি পদে কত বেতনে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহার সঠিক সংবাদ সংস্কৃত কলেজের পুরাতন নথিপত্রের সাহায্যে দিতেছি :—

পদ	বেতন	কার্য্যকাল
অধ্যাপক, ৫ম ব্যাকরণ-শ্রেণী	৪০৲	১৫ জুন ১৮৫৫ হইতে ৩১ মার্চ ১৮৬০
ঐ ৪র্থ ঐ	৪০৲	১ এপ্রিল ১৮৬০ হইতে ১১ জুন ১৮৬৩
	৪৫৲	১২ জুন ১৮৬৩ হইতে ২৩ মার্চ ১৮৬৪
ঐ ৩য় ঐ	৫০৲	২৪ মার্চ ১৮৬৪ হইতে ৩০ জুন ১৮৭৩
দ্বিতীয় ব্যাকরণ-পণ্ডিত, সংস্কৃত কলিজিয়েট স্কুল	৬০৲	১ জুলাই ১৮৭৩ হইতে ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪
প্রথম ব্যাকরণ-পণ্ডিত ঐ ঐ	৬০৲	১ মার্চ ১৮৭৪ হইতে ৭ জুন ১৮৭৪
সহকারী অধ্যাপক—সংস্কৃত, অলঙ্কার প্রভৃতি, সংস্কৃত কলেজ	৮০৲	৮ জুন ১৮৭৪ হইতে ৩১ জুলাই ১৮৭৯
	৮৫৲	১ আগষ্ট ১৮৭৯ হইতে ৩১ জুলাই ১৮৮০
	৯০৲	১ আগষ্ট ১৮৮০ হইতে ৩১ জুলাই ১৮৮১
	৯৫৲	১ আগষ্ট ১৮৮১ হইতে ৩১ জুলাই ১৮৮২
	১০০৲	১ আগষ্ট ১৮৮২ হইতে ৩১ ডিসেম্বর ১৮৮২

৩০ ডিসেম্বর ১৮৮২ তারিখে রামনারায়ণ পেন্‌সনের জন্য যথারীতি আবেদন

করেন। সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অস্থায়ী অধ্যক্ষ মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ৬ জানুয়ারি ১৮৮৩ তারিখে এই আবেদনপত্র সুপারিশ করিয়া শিক্ষা-বিভাগের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। ১ জানুয়ারি ১৮৮৩ তারিখ হইতে রামনারায়ণের পেন্‌সন মঞ্জুর হইয়াছিল।* সংস্কৃত কলেজে রামনারায়ণের শূন্য পদে নিযুক্ত হন—পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

মৃত্যু

সংস্কৃত কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর রামনারায়ণের শেষ দিনগুলি কি ভাবে কাটিয়াছিল, তাহার বিবরণ তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে পাওয়া যায়। ইহাতে প্রকাশ :—

> কার্য্যময় জীবন কোন কালে স্থির থাকিবার নয়, তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠাংশ শিক্ষাদানে অতিবাহিত হইয়াছিল, শেষাংশও সেই কার্য্য ত্যাগ করিতে পারে নাই। তিনি পেন্সন গ্রহণ করিয়াও বাটীতে দেশস্থ ব্রাহ্মণ বালকদিগকে সংস্কৃত শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এইক্ষণে ঐ কার্য্যের সুবিধার জন্য খ্রীঃ ১৮৮৪ অব্দের ৩০শে নবেম্বর রবিবার স্বীয় জন্মগ্রামে একটি চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠিত করেন। ঐ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে দেশস্থ লোকেরা উপস্থিত থাকিয়া বিশেষ সহানুভূতি দেখাইয়াছিলেন, স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি, চতুষ্পাঠীতে বিদেশীয় ছাত্রগণের অবস্থান ব্যয়ের সাহায্য জন্য মাসিক ১০৲ টাকা করিয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছিল, দূরদেশ হইতে ছাত্র আসিয়া চতুষ্পাঠীতে অবস্থান করিয়া শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার জন্মগ্রামের—অভিশপ্ত হরিনাভি গ্রামের—সৌভাগ্য সুখ সুদূরস্থ—এক বৎসর অতীত হইতে না হইতেই তর্করত্ন মহাশয় সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। প্রায় ৬ মাস কাল উদরী রোগাক্রান্ত হইয়া অনেক কষ্ট ভোগ করিয়া ১২৯২ সালের ৭ই মাঘ গত ১৯এ জানুয়ারিতে তিনটি পুত্র ও দুইটি কন্যা রাখিয়া ৬৩ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।†

১৯ জানুয়ারি ১৮৮৬ তারিখে রামনারায়ণের মৃত্যু হইলে 'সোমপ্রকাশ' যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা হইল :—

> পণ্ডিত ৺রামনারায়ণ তর্করত্ন।—আমরা অতিশয় দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে সংস্কৃত শাস্ত্রাধ্যাপক কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের অন্যতম প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন গত ৭ই মাঘ মঙ্গলবার মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ইনি প্রায় ৬ মাস কাল উদরীরোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন

* সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শিক্ষা-বিভাগকে রামনারায়ণের পেনসন-সংক্রান্ত যে-সকল কাগজপত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহা হইতে রামনারায়ণের জন্মতারিখ ও সংস্কৃত কলেজে চাকরির ইতিহাস পাওয়া গিয়াছে। পেন্‌সন-সংক্রান্ত কাগজপত্রে রামনারায়ণের আকৃতির এইরূপ বর্ণনা আছে :—"Height—5 feet 6 inches. Marks—Perpendicular wrinkle between the eye-brows leaning on the right side etc."

† "স্বর্গীয় কবিকেশরী রামনারায়ণ তর্করত্ন"—'শিল্পপুষ্পাঞ্জলি,' ১২৯২ সাল, পৃ. ১৫৭।

তর্করত্ন নানাগুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। যাঁহারা ইঁহার সহিত অল্প সময়ের জন্যও আলাপ করিয়াছিলেন তাঁহারা তাঁহার রসপূর্ণ মিষ্টালাপ কখন বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। বাঙ্গালা নাটকের ইনি এক প্রকার সৃষ্টিকর্ত্তা বলিতে হইবে। এইজন্য মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের প্রসিদ্ধ দেশীয় নাটক অভিনয়ের সময়ে ইনি একমাত্র সহায়তা করিয়াছিলেন। ইঁহার প্রণীত "কুলীন কুলসর্ব্বস্ব" নাটক বাঙ্গালা ভাষার প্রথম নাটক এবং এই নাটক হইতে প্রথম প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার রচিত অনেক নাটক আছে। "নবনাটক" "ধর্ম্মবিজয়" "বেণীসংহার" "চক্ষুদান" প্রভৃতি প্রত্যেক নাটকেই তাঁহার নাম এবং মাহাত্ম্য দেদীপ্যমান রহিয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় তিনি কাব্য ও অলঙ্কার বিষয়ে অতি সুপণ্ডিত ছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার ন্যায় সংস্কৃত কবি আর কেহ ছিল না। তাঁহার প্রণীত "আর্য্যাশতক" ও "দক্ষযজ্ঞ" সর্ব্বত্র বিশেষ প্রশংসালাভ করিয়াছে। দক্ষযজ্ঞ প্রণয়ন করাতে ইংলণ্ডীয় মহাত্মা ই, বি, কাউয়েল ইহাকে "কবিকেশরী" উপাধি পাঠাইয়াছিলেন। বস্তুতঃ সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার কবিত্বশক্তি এতদূর মধুর এবং গাঢ় ছিল যে তাঁহার নাম না থাকিলে কেহ তাঁহার প্রণীত কাব্যগুলি আধুনিক কবির রচিত বলিয়া অনুমান করিতে পারেন না। তাঁহার সংস্কৃত রচনা এতদূর প্রাঞ্জল এবং অলঙ্কারপূর্ণ, যে তাঁহার আর্য্যাশতক এবং দক্ষযজ্ঞ সহসা কবিচূড়ামণি কালিদাসের রচিত বলিয়া ভ্রম হয়। কলিকাতা সংস্কৃত কালেজে অলঙ্কারের পণ্ডিতরূপে বহুবার অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া ইনি ছাত্রদিগের নিরতিশয় শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম্মের মর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্য ইঁহার এতদূর যত্ন ছিল যে সঞ্চিত অর্থ তিনি ক্রিয়াকলাপে ব্যয় করিতেন। তিনি নিজ বাটীতে একটী হরিসভা প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রতি রবিবার বক্তৃতা ও ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠাদি দ্বারা সভ্যদিগকে উপদেশ দান করিতেন। তাঁহারই যত্নে তাঁহার জন্মভূমি হরিনাভিগ্রামে সংস্কৃত শিক্ষার নিমিত্ত একটী চতুষ্পাঠী খোলা হইয়াছিল। নিজে অধ্যাপকতা করিয়া অনেক দিন উক্ত চতুষ্পাঠীর মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তিনি যেমন সুপণ্ডিত ছিলেন তাদৃশ সুবক্তাও ছিলেন। যে সভায় তিনি উপস্থিত থাকিতেন তাঁহার মধুর বক্তৃতা শুনিবার জন্য সভাস্থ সকলেই ব্যগ্র হইতেন এবং তিনিও তাঁহাদিগকে রসগর্ভ ও উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা মুগ্ধ করিতেন। ইঁহার অভাবে আপামর সাধারণ এবং বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্য বৈদিক সমাজ যে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন তাহা আর বলিবার অপেক্ষা নাই।

পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার শৈশবাবস্থায় তাঁহার মাতা পিতার মৃত্যু হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর দুরবস্থাপন্ন হইয়াও তাঁহার লালনপালনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই অবস্থায় তিনি হরিনাভিস্থ প্রসিদ্ধ মধুসূদন বাচস্পতির নিকট প্রথমতঃ ব্যাকরণ, স্মৃতি ও কয়েকখানি সংস্কৃত কাব্য অধ্যয়ন করেন। পরে ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষার জন্য পূর্ব্বদেশস্থ পোড়া [পুঁড়া ?] নামক গ্রামে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা কলিকাতা সংস্কৃত কালেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হইলে তিনি তাঁহারই নিকট অবস্থান করিয়া উক্ত কালেজে অনেক দিন পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ভ্রাতার মৃত্যুর পর তিনিও সংস্কৃত কালেজের অধ্যাপক হয়েন। অধ্যাপকতা বিষয়ে উক্ত কালেজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া অবশেষে প্রায় দুই বৎসর হইল পেন্সন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই দুই বৎসর

কাল পেন্সনভোগ করিয়া প্রায় ৬৫ বৎসর বয়সে ৩টী পুত্র ও ২টী কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন।—'সোমপ্রকাশ,' ১৩ মাঘ ১২৯২।*

রামনারায়ণের রচনাবলী

রামনারায়ণের রচনাবলীর মধ্যে নাটক ও প্রহসনের সংখ্যাই বেশী। নাটক-রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে 'নাটুকে রামনারায়ণ' বলিত। সেকালে তাঁহার নাটক ও প্রহসনগুলি সখের নাট্যশালায় ও সাধারণ রঙ্গালয়ে সমারোহের সহিত অভিনীত হইয়াছিল। এই সকল অভিনয়ের বিবরণ আমার 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে' পাওয়া যাইবে।

১৮৫৪ সনে প্রকাশিত রামনারায়ণের প্রথম নাটক 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব'কে অনেকে বাংলার আদি নাটক বলিয়াছেন। কিন্তু 'কুলীন কুলসর্ব্বস্বে'র পূর্ব্বেও আরও কয়েকখানি বাংলা নাটক রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল; দৃষ্টান্তস্বরূপ ১২৫৮ সালে (১৮৫২ সনে?) প্রকাশিত যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের 'কীর্ত্তিবিলাস' ও ১৮৫২ সনে তারাচরণ শীকদারের 'ভদ্রার্জুন,' এবং ১৮৫৩ সনে প্রকাশিত হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' ও কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বাবু নাটকে'র নাম করা যাইতে পারে। তবে সামাজিক নাটকের মধ্যে 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' সর্ব্বপ্রথম বলিয়া মনে হয়।

নাটক-রচনায় নৈপুণ্যের জন্য এবং বাংলা ভাষায় সর্ব্বপ্রথম বিধিবদ্ধ ভাবে ("systematic form"-এ) নাটক রচনার জন্য দি বেঙ্গল ফিল্‌হার্ম্মোনিক অ্যাকাডেমি ৯ মার্চ ১৮৮২ তারিখের অধিবেশনে রামনারায়ণকে 'কাব্যোপাধ্যায়' উপাধি ও তাহার চিহ্নস্বরূপ 'হরকুমার ঠাকুর কনক কেয়ূর' প্রদান করিয়াছিলেন। এই অ্যাকাডেমির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং ডিরেক্টর ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী। রামনারায়ণকে প্রদত্ত মানপত্রখানি (ডিপ্লোমা অব অনার) হরিনাভি রামনারায়ণ লাইব্রেরির একটি কক্ষে টাঙানো আছে।†

রামনারায়ণের সংস্কৃত রচনাও প্রসাদগুণবিশিষ্ট ছিল। 'সোমপ্রকাশ' লিখিয়াছিলেন, "তাঁহার সংস্কৃত রচনা এতদূর প্রাঞ্জল এবং অলঙ্কারপূর্ণ, যে তাঁহার আর্য্যাশতক এবং দক্ষযজ্ঞ সহসা কবিচূড়ামণি কালিদাসের রচিত বলিয়া ভ্রম হয়।" 'দক্ষযজ্ঞ' পাঠ করিয়া সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ সুপণ্ডিত ই. বি. কাউয়েল বিলাত হইতে তাঁহাকে 'কবিকেশরী' উপাধি দিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

* শ্রীযুত নৃপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী আমার জন্য 'সোমপ্রকাশ' হইতে এই অংশ নকল করিয়া পাঠাইয়াছেন, এজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

† শ্রীযুত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এই মানপত্রের প্রতিলিপি ১৩২৩ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' (পৃ. ৭১১-১২) প্রকাশ করিয়াছেন।

রামনারায়ণের রচনাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(১) পতিব্রতোপাখ্যান।...কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরে শিক্ষিত সুশিক্ষিত শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য রচিত।...১২৫৯ শাল ১১ মাঘ। পৃ. ৯৪।

এই পুস্তক রচনার একটি ইতিহাস আছে। রংপুর কুণ্ডী পরগণার জমীদার কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী 'সংবাদ প্রভাকর', 'সম্বাদ ভাস্কর', 'রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ' পত্রে একটি বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। 'রঙ্গপুর বার্ত্তাবহে' প্রকাশিত বিজ্ঞাপনটি এইরূপ :—

বিজ্ঞাপন।

৫০ পঞ্চাশ টাকা পারিতোষিক।

এই বিজ্ঞপ্তি পত্র দ্বারা সর্ব্ব সাধারণ কৃতবিদ্য মহোদয়গণকে বিজ্ঞাত করা যাইতেছে, যিনি 'পতিব্রতোপাখ্যান' ইত্যভিধেয় এক প্রবন্ধ রচনা করিয়া রচকগণ মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্টতা দর্শাইতে পারিবেন তাঁহাকে সঙ্কল্পিত ৫০ পঞ্চাশ টাকা পারিতোষিক প্রদান করা যাইবেক। স্ত্রীজাতি স্বপতির মতাবলম্বিনী হইয়া, দেহযাত্রা নির্ব্বাহকরণে, দম্পতী প্রীতিবর্দ্ধন হওতঃ সৃষ্টিপ্রবাহের প্রতি প্রতিবন্ধকতা ছেদনপূর্ব্বক কি নিগূঢ় ইষ্টফলোৎপত্তি হইতে পারে? তদন্যথাতেই বা কি অনিষ্টতা অথবা শান্তির ব্যাঘাত জন্মে? বিবিধ প্রমাণ ও বিবিধ সদ্যুক্তির দ্বারা প্রবন্ধ মধ্যে ইহাই প্রতিপন্ন করা প্রশ্নকর্ত্তার মূলাভিপ্রেত। রচক মহাশয়েরা আগত আষাঢ় মাসের শেষ হইতে না হইতে স্ব স্ব রচিত প্রবন্ধ রীতিমত প্রেরণ করিবেন।

রঙ্গপুর

বঙ্গাব্দা ১২৫৮ সাল তারিখ ৬ কার্ত্তিক। কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী।

কুণ্ডী পং জমীদার।

'পতিব্রতোপাখ্যান' পুস্তকের "ভূমিকা"র প্রকাশ :—

অনেকে পতিব্রতোপাখ্যান লিখিয়া বাবুর নিকট পাঠাইয়াছিলেন তাঁহার সভা পণ্ডিত মহাশয়েরা সমস্ত পরীক্ষা করিয়া সংস্কৃত কালেজীয় সুপরীক্ষিত সুপাত্র ছাত্র শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্যের লিখিত এই গ্রন্থ মনোনীত করেন। পরে বাবুর অনুজ্ঞায় আদর্শ পুস্তক ভাস্কর যন্ত্রাগারে আসিয়াছিল, শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র রায় চৌধুরি মহাশয় ন্যূনাধিক ১৫০ দেড় শত টাকা ব্যয়ে ইহা মুদ্রাঙ্কিত করাইলেন।

(২) প্রকাশ্য বক্তৃতা অর্থাৎ কলিকাতাস্থ হিন্দু মেট্রপোলিটন নামক বিদ্যালয়ের ছাত্র দিগের উপদেশার্থে তত্রস্থ প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুত রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত দ্বারা বিদ্যা বিষয়ক বক্তৃতা। ৭ কার্ত্তিক, সন ১২৬০ সাল। পৃ. ২০।

পুস্তিকাখানি দুষ্প্রাপ্য। বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে ইহার এক খণ্ড আছে। আমি তাহার ফোটো প্রতিলিপি আনাইয়াছি। এই পুস্তিকা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।—

তোমরা যেমন মনোযোগ পূর্ব্বক ইংরাজী শিখিবে বাঙ্গলাও সেইরূপ শিক্ষা করিবে, বাঙ্গলার প্রতি কদাচ অনাস্থা করিবে না; বাঙ্গলা এতদ্দেশীয় মাতৃভাষা, সুতরাং মাতৃবৎ এই মাতৃভাষার প্রতি ভক্তি রাখা নিতান্ত আবশ্যক। দেখ বর্ত্তমান কালে যে সকল প্রদেশ দৃষ্টি ও শ্রুতি গোচর হইতেছে

সে সমস্ত দেশীয় লোকেরা সকলি স্ব স্ব দেশীয় ভাষাকে উত্তম ভাষা জ্ঞানে মান্য করিয়া থাকেন এবং সাধারণের এই এক প্রসিদ্ধ প্রথা আছে যে আপন২ দেশীয় ভাষা সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা না হইলে কেহই অন্য ভাষা প্রতি ধাবমান হয়েন না অতএব তোমাদিগের দেশভাষার প্রতি বিমুখ হওয়া কদাচ উচিত নহে।... ... ...

এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় বিবিধ প্রকার পদার্থবিদ্যা, জ্যোতিষ, দণ্ডনীতি, ও চিকিৎসা বিষয়ক উত্তমোত্তম প্রবন্ধ সকল দৃষ্ট হইতেছে যদি তোমরা স্বদেশীয় ভাষায় স্বরূপ যোগ্য হও তাহা হইলে ঐ সমস্ত উৎকৃষ্ট২ গ্রন্থ স্বদেশীয় ভাষায় অনুবাদিত করিতে পারিবে তাহাতে দেশীয় ব্যক্তিদিগের যে কত উপকার হইবে তাহা কথনাতীত। দেশীয় লোকেরাও তাদৃশ অসামান্য উপকারে উপকৃত হইয়া ঐ অনুবাদকর্ত্তাকে গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়া চিরকাল স্ব স্ব স্মৃতিপথে আরূঢ় রাখিবেন, তাহাতে তাঁহার বিদ্যোপার্জ্জন সার্থক হইবে।

বর্ত্তমান কালে এই বিষয়ের দৃষ্টান্তপথে পতাকা স্বরূপ কতিপয় সুবিজ্ঞ মহোদয়েরা সাতিশয় যত্নপূর্ব্বক নানা সংস্কৃত ও ইংরাজী গ্রন্থ দেশীয় ভাষায় অনুবাদিত করিয়াছেন, এক্ষণেও করিতেছেন, তাহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা দেশীয়দিগের কত অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা একবার বিবেচনা করিলেই সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারা যায়: ফলতঃ ইংরাজী গ্রন্থের অনুবাদ করা আবশ্যক বোধ করিয়াও স্বদেশীয় ভাষার প্রতি অনুরাগ রাখা নিতান্ত উচিত।

এই সুকুমার দেশীয় ভাষা ইহা শিক্ষা করিতে তোমাদিগকে নিতান্ত পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইবে না, যেহেতু ইহা এতদ্দেশীয় মাতৃভাষা। মাতৃ জঠর হইতে ভূমিষ্ঠ হইলেই ঐ ভাষা কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইতে থাকে, এবং স্তন্যপান সমকালেও অনেক কণ্ঠস্থ হয়, পরে মাতা পিতা প্রভৃতি স্বপর সাধারণ সকলেরি নিকট সর্ব্বদা তাহা শ্রবণ করাতে বাল্যাবস্থাতেই প্রায় অর্দ্ধেক অভ্যস্ত হইয়া থাকে, অনন্তর কিঞ্চিৎ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া যথা নিয়মে শিক্ষা করিলেই সম্পূর্ণরূপে তাহাতে ব্যুৎপত্তি জন্মে, ফলতঃ অনায়াসলভ্য এতাদৃশ উত্তম বস্তুতে কাহার্ না অভিলাষ হয়? যদি পথিমধ্যে এক অমূল্য রত্ন পতিত হইয়া থাকে এবং তাহা গ্রহণ করিতে কোন প্রতিবন্ধক না থাকে তাহা হইতে চক্ষুষ্মান্ পথিক কি তাহা পরিহার করে? কদাচ করে না; কিন্তু যদি পথিক নয়ন বিহীন হয় তবেই সেই বস্তু সুতরাং পরিহৃত হয় তাহার ন্যায় যদি তোমাদিগের বিবেক নয়ন থাকে তবে কদাচ এই অযত্নলভ্য স্বদেশীয় বিদ্যারত্নকে অশ্রদ্ধ করো না।

বর্ত্তমানাবস্থায় যে সমস্ত গ্রন্থ প্রচলিত আছে যদি ঐ সকল গ্রন্থ স্বদেশীয় ভাষায় অনুবাদিত হয় তাহা হইলে এতদ্দেশের কত মঙ্গলোন্নতি হইবে তাহা পূর্ব্বে কহিয়াছি, অতএব যাঁহারা দেশানুরাগি তাঁহারা স্বদেশীয় ভাষার উন্নতি বিষয়ে একান্ত সচেষ্ট থাকেন। ইতিপোর্ব্বীয় যবন জাতীয় রাজারা আপনাদিগের ভাষার প্রতি নিতান্ত দৃঢ়ভক্তি রাখিয়াছিলেন ইহাদিগের মধ্যে কাহার২ নিজ ভাষার প্রতি এতাদৃশ অনুরাগ ছিল যে তাঁহারা তদ্ভাষার সম্যক্ প্রচার করিবার নিমিত্ত অন্যান্য ভাষার সমূলোৎপাটনেও চেষ্টা করিয়াছেন এবং ইংলণ্ডীয় পণ্ডিতেরা যত দূর পর্য্যন্ত ক্ষমতা স্বদেশীয় ভাষা প্রতি অনুরাগ রাখিয়া ইহার দৃষ্টান্ত পথে দণ্ডায়মান আছেন, কিন্তু এতদ্দেশের দৌর্ভাগ্য প্রযুক্ত এতদ্দেশীয় লোকেরা প্রায় অনেকেই দেশীয় ভাষার প্রতি দ্বেষ করেন, বিদ্যালয়ে বাঙ্গলা বিদ্যা শিক্ষা ছাত্র দিগের অভিলাষানুসারেই চলিয়া থাকে, অর্থাৎ যে দিবস ইংরাজী শিক্ষা করিয়া অবসর সময় থাকে ও আলস্য দোষ উপস্থিত না হয় সেই দিনই একবার দেশীয় ভাষার পুস্তক অনাস্থা

বুদ্ধিতে গৃহীত হয়, নতুবা হয় না, ইহাতে যে কেবল ঐ সকল ছাত্র গণেরই দোষ এমত নহে, তাহাদিগের মাতা পিতাও তদ্বিষয়ে দোষাক্রান্ত হইতেছেন, যেহেতু ইহাঁরা স্বস্ব সন্তান দিগের স্বদেশীয় ভাষা শিক্ষা হইতেছে কি না ইহা একবারও দেখেন না, বালকেরা ইংরাজী পাঠাভ্যাস করিলেই প্রশংসা করেন, এবং যদি ঐ বালক ইংরাজী কোন পুস্তক ক্রয় করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের নিকটে দশ বা দ্বাদশ মুদ্রা প্রার্থনা করে তবে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তাহা দেন কিন্তু বাঙ্গলা পুস্তক ক্রয় করিতে অর্দ্ধমুদ্রা যাচ্ঞা করিলেও কহেন অর্থের বড় অনটন, কিছুদিন যাউক, এক্ষণ হইবে না, ইত্যাদি বিবিধ বাগাড়ম্বর করিয়া বালক দিগকে দেশ ভাষা শিখিতে অনুৎসাহ দেন, এই সমস্ত ব্যবহার কি দেশ ভাষা নির্ম্মূল করার কারণ নহে? হায় কি আশ্চর্য্য দেশ ভাষার প্রতি ইহাঁদিগের এত অরুচি কেন? কেহবা আপনি দেশানুরাগী ইহা জানাইবার নিমিত্ত মুখে মাত্র কহিয়া থাকেন যে 'আমাদিগের দেশ ভাষার উন্নতি করা নিতান্ত আবশ্যক' কিন্তু তাহা ইহাঁদিগের হৃদয়ঙ্গম নহে; যদি এমত অভিলষিত হইত তাহা হইলে কি তাঁহারা দেশীয় সভায় বিদেশীয় ভাষায় বক্তৃতা করিতেন, কি দেশীয় ভাষায় আলাপ করিতে হইলে ইংরাজী ভাষা মিশ্রিত করিতেন? কখনই করিতেন না।

বঙ্গ ভাষার আলাপ মধ্যে ইংরাজী দুই এক শব্দ প্রয়োগ করা আর বাঙ্গালি পরিচ্ছদ অর্থাৎ ধুতি চাদর পরিধান করিয়া একটি উত্তম ইংরাজী টুপি ধারণ করা তুল্য হাস্যাস্পদ, সত্য মিথ্যা তোমরা বিবেচনা কর। যাহা হউক দেশীয় ভাষায় আলাপ মধ্যে অন্য ভাষা সংশ্লিষ্ট করার কারণ দেশ ভাষার অনভিজ্ঞতা ব্যতীত আর কি বোধ হয়? বর্ত্তমান কালে ইংরাজ রাজপুরুষ গণের মধ্যে অনেকেই বাঙ্গলা ভাষা বিলক্ষণ জানেন্ কিন্তু ইহাঁরা কি ইংরাজী কহিতে২ দুই এক বাঙ্গলা ভাষা কহিয়া থাকেন? যদি বল এতদ্দেশীয়েরা যে বাঙ্গলা কথার মধ্যে ইংরাজীর দুই এক শব্দ কহেন তাহাতে ইহাঁদিগের ইংরাজী ভাষার অনুরাগই প্রকাশ পায়, কিন্তু ইহা আমাদিগের কদাচ অনুভবে আইসে না। ইংরাজ মহোদয় দিগের কি বাঙ্গলা ভাষায় অনুরাগ নাই, এমত নহে, অনেকানেক ইংলণ্ডীয় পণ্ডিতেরা এতদ্দেশীয় ভাষার প্রশংসা করিয়া থাকেন, তবে এই বরং কহা যায় যে এতদ্দেশীয়দিগের দেশ ভাষায় অনুরাগ নাই, ইহাঁরা দেশভাষা ক্রমশঃ নির্ম্মূলিত করিবার মানসেই তাদৃশ ব্যবহার করেন কিন্তু ইহা নিতান্ত অনুচিত কর্ম্ম।

ইংলণ্ডীয় ভাষার প্রেমমুগ্ধ কোন২ ব্যক্তি কহেন যদি কোন লোক জ্ঞানোপার্জ্জনে অভিলাষী হয়, তবে কেবল ইংরাজী শিক্ষা করিলেই অভীষ্টসিদ্ধ করিতে পারিবে, স্বদেশীয় ভাষা শিক্ষার অপেক্ষা কি, এতৎপ্রদেশীয় সকল লোকের যদি জ্ঞানোপার্জ্জন কর্ত্তব্য হয় সকলেই ইংরাজী শিক্ষা করুন, কিন্তু আমি ইহাঁদিগকে জিজ্ঞাসা করি, আত্মভাষায় বিদ্যা শিক্ষা ও পরভাষায় বিদ্যা শিক্ষা ইহার মধ্যে সুলভ কি, বোধ হয় ইহা বিবেচনা করিলে তাঁহারা আর এমত কথা কহিবেন না। অতএব ইহাঁরা স্বদেশের প্রতি প্রীতি রাখিয়া যাহাতে আত্মভাষার উচ্ছেদ না হয় এমত চেষ্টা করুন।

প্রাচীন পণ্ডিতেরা জন্মভূমিকে জননীর তুল্য বলিয়াছেন, সুতরাং সেই জন্মভূমিকে দুরবস্থা হইলে মোচন না করা আর ব্যাধি পীড়িতা জননীকে ঔষধ প্রদান ও শুশ্রূষা বিধানাদি দ্বারা সুস্থা না করা তুল্য কথা।

যে স্থানে আমরা জন্ম গ্রহণ করিয়া শৈশবলীলায় লালিত হইয়াছি, যে স্থানে যৌবন যাপন কালে ধন, জন, বিদ্যা, বুদ্ধি, সুনীতি, সচ্চরিত্রতা, যশঃ, সম্পত্তি প্রভৃতি সকল উপার্জ্জন করিয়া সুখী

হইতেছি এবং যে স্থানের স্মরণে মাতা, পিতা, দয়িতা, পরিণেতা, পুত্র, মিত্রাদির নির্ম্মল বদন কমল সহসাই স্মৃতি পথে পতিত হয় এতাদৃশ অস্মাদৃশ প্রেমাস্পদ জন্মভূমির প্রতি অশ্রদ্ধা করা কি আমাদিগের উচিত কর্ম্ম ? যে ব্যক্তি দেশান্তরে অবস্থান করে সেই ব্যক্তিই জন্মভূমির মর্ম্মস্নেহ অবগত থাকে, জন্মভূমি তাহারি আনন্দভূমি বোধ হয়, অতএব এই আনন্দভূমির প্রতি যাহার স্নেহ নাই সে কি মনুষ্য ?

দেশীয় ভাষায় যাঁহাদিগের নিতান্ত দ্বেষ তাঁহারা ইংরাজী বিদ্যায় আপনাদিগের গাঢ়তর ব্যুৎপত্তি জ্ঞাপন করাইবার নিমিত্ত স্বদেশীয় স্বজনগণের সহিতও ইংরাজী ভাষায় আলাপ করেন ; কিন্তু নিজ২ বাটীর পরিজনের সহিত আলাপ করিতে হইলে অবশ্যই ইঁহাদিগের দেশীয় ভাষা অবলম্বিতা হয় তাহার সন্দেহ নাই ; সুতরাং যে ভাষা ব্যতীত সাংসারিক ব্যাপার সমাধা হয় না, তৎপ্রতি অনাস্থা বোধ বৈধ নহে, স্বদেশীয় ভাষা ব্যতীত মনোগত অভিপ্রায় প্রায় প্রকাশ পায় না। প্রসূতির স্তনক্ষীর যে প্রকার শরীরের পুষ্টি ও বলিষ্ঠতা সম্পাদক, স্বদেশীয় ভাষাও তদ্রূপ মানসিক শক্তিদায়ক সন্দেহ কি ? ভাল স্বদেশীয় ভাষা প্রতি অশ্রদ্ধাকারীকে আরো জিজ্ঞাসা করি তাঁহারা সেক্সপীয়্যার প্রভৃতি গ্রন্থ যখন পাঠ করেন তখন কি স্বদেশীয় ভাষায় ভাব উদয় করেন না ? অগ্রে দেশ ভাষায় ভাব গ্রহণ না করিলে কখনই ভিন্নভাষায় ভাবোদয় হয় না ॥

অতএব হে ছাত্রগণ তোমরা বাঙ্গলা সাধুভাষা প্রতি কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ কর, ঐ ভাষা এতদ্দেশের দেশীয় ভাষা, যত দিন পর্য্যন্ত এতৎপ্রদেশে উহার শ্রীবৃদ্ধি না হইবে, তত দিন নানা ইংরাজী গ্রন্থ প্রচার হউক, উত্তমোত্তম শিক্ষক থাকুন, কিছুতেই এতদ্দেশীয় সাধারণের জ্ঞানরসাস্বাদন হইবে না।

(৩) কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটক। শ্রীরামনারায়ণ শর্ম্ম প্রণীত। সম্বৎ ১৯১১। পৃ. ১২৭।

১৮৫৪ সনের শেষভাগে এই নাটক প্রকাশিত হয়। 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে' (৩য় খণ্ড) ইহার সমালোচনা কালে রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখিয়াছিলেন :—

> ...এইক্ষণে...সহৃদয় ব্যক্তিগণ রঙ্গভূমিতে কবিতাসুধাকরের উদয় করণার্থে যত্নবান্ হইয়াছেন। যে গ্রন্থের প্রসঙ্গে এই প্রস্তাব আরব্ধ হইয়াছে তাহা এই নির্ম্মল চন্দ্রোদয়ের আদিকিরণ বলিলে বলা যায়।
>
> পূর্ব্বে বঙ্গভাষায় কয়েক খানি নাটক প্রকটিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা যথার্থ নাটক নহে। তাহাতে অনেক পদ্যাদি আছে, এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গ সমীচীন ও সুসম্পন্ন এবং সুপাঠ্য বটে ; কিন্তু সাহিত্যকারেরা যাদৃশ গুণপ্রযুক্ত নাটককে "দৃশ্য কাব্য" বলিয়া বর্ণন করেন, তাহার অত্যল্পমাত্র তাহাতে বর্ত্তমান দেখা যায়।
>
> প্রস্তাবিত নাটক খানিতে রূপকের অনেক ধর্ম্ম রক্ষিত হইয়াছে ; তাহার আখ্যায়িকা একানুগামিনী বটে, ইহার অভিপ্রায় উত্তম, ও ভাবও পরিশুদ্ধ। গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত সাহিত্যালঙ্কার-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, এবং কাব্যরচনায় তৎপর। তিনি সমীচীন-যত্নে এই নাটকখানি রচনা করিয়াছেন ; এবং সহৃদয় পাঠকগণ যে কেহ ইহা পাঠ করিয়াছেন, তিনি অবশ্যই স্বীকার করিবেন, যে তাঁহার প্রযত্ন ব্যর্থ হয় নাই। (পৃ. ২৫৫-৫৬)

'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' সম্বন্ধে আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন, "বোধ হয় ইংরাজি খুব ভাল ভাল comedy অপেক্ষা কোনও অংশে ইহা মন্দ নহে।" ('পুরাতন প্রসঙ্গ,' ১ম পর্য্যায়, পৃ. ৯৫)

'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব'-রচনার ইতিহাস এইরূপ। রংপুর কুণ্ডী-পরগণার বিদ্যোৎসাহী জমিদার কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী 'সম্বাদ ভাস্কর'-আদি পত্রে পুরস্কার ঘোষণা করিয়া একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। ৮ নবেম্বর ১৮৫৩ তারিখের 'রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ' পত্রেও বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হইয়াছিল; বিজ্ঞাপনটি এইরূপ :—

বিজ্ঞাপন।

৫০ পঞ্চাশ টাকা পারিতোষিক।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণ কৃতবিদ্য মহোদয়গণকে বিজ্ঞাত করা যাইতেছে, যিনি সুললিত গৌড়ীয় ভাষায় ছয় মাস মধ্যে "কুলীন কুলসর্ব্বস্ব" নামক একখানি মনোহর নাটক রচনা করিয়া রচকগণ মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্টতা দর্শাইতে পারিবেন তাঁহাকে সঙ্কল্পিত ৫০ পঞ্চাশ টাকা পারিতোষিক প্রদান করা যাইবেক।

রঙ্গপুর পং কুণ্ডী শ্রীকালীচন্দ্র রায় চৌধুরী
কুণ্ডী পং জমীদার।

এই বিজ্ঞাপন দেখিয়া রামনারায়ণ 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' রচনা করেন এবং ১০ মার্চ ১৮৫৪ তারিখে নিম্নোদ্ধৃত পত্রের সহিত রচনার পাণ্ডুলিপি রংপুরে পাঠাইয়া দেন :—

বিবিধ বিদ্যোৎসাহী গুণগ্রাহী মান্যবর
শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র চতুর্দ্ধুরীণ
মহাশয় সর্ব্বোপকারকেষু—

নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদনমিদং

আমি ভাস্কর পত্রস্থ মহাশয়ের বিজ্ঞাপন দৃষ্টে কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম তাহার কারণ আপনি অদ্বিতীয় বিদ্যোৎসাহী ও আপনার প্রস্তাবিত বিষয় অতি উপাদেয়। কিন্তু রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াই সাতিশয় শিরোবেদনা প্রভৃতি বিবিধ পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া কিছুদিন ক্ষান্ত হইতে হইয়াছিল তাহাতে পুস্তক প্রস্তুতপূর্ব্বক প্রেরণ করিতে শীঘ্র পারি নাই অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। এক্ষণে দৈবানুগ্রহে শারীরিক সুস্থ হওয়ায় অত্যন্ত যত্ন ও অজস্র পরিশ্রম সহকারে উক্ত গ্রন্থ রচনা করিয়া আপনকার নিকটে পাঠাইলাম পুরস্কার প্রদানে পরিশ্রম সার্থক করিবেন।...২৮ ফাল্গুনস্য।

শ্রীরামনারায়ণ শর্ম্মণঃ।
কলিকাতা হিন্দু মিট্রোপলিটান বিদ্যালয়স্থ
প্রধানাধ্যাপকস্য।

বলা বাহুল্য, রামনারায়ণ বিজ্ঞাপিত পুরস্কার ৫০৲ টাকা যথাসময়ে পাইয়াছিলেন।

(৪) বেণীসংহার নাটক। শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন কর্ত্তৃক গৌড়ীয় চলিত ভাষায় অনুবাদিত। সংবৎ ১৯১৩। পৃ. ৯৬।

'বেণীসংহার নাটক' ১৮৫৬ সনের মধ্যভাগে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের "বিজ্ঞাপন"-এর তারিখ "২৮ জ্যৈষ্ঠ, সংবৎ ১৯১৩"। 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে' (৪১ খণ্ড, পৃ. ১০৭) সমালোচনাকালে রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখিয়াছিলেন :—

> কবি না হইলে কাব্যের অনুবাদ করা অতিশয় দুরূহ। কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটককারের সে গুণের অভাব নাই; তিনি সর্ব্বত্র কাব্যরস রক্ষা করিয়া অভিনয়োপযুক্ত চলিত ভাষায় পরিপাটীরূপে বেণীসংহার অনুবাদিত করিয়াছেন।…

(৫) **রত্নাবলী নাটক।** শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন কর্তৃক চলিত ভাষায় অনুবাদিত। কলিকাতা সম্বৎ ১৯১৪। পৃ. ৯২।

'রত্নাবলী' ১৮৫৮ সনের মার্চ মাসে প্রকাশিত হয়। ইহার "ভূমিকা"র তারিখ "২৮ ফাল্গুন, সম্বৎ ১৯১৪"।

'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে' (৪৯ খণ্ড, পৃ. ১৮) সমালোচনাকালে রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখিয়াছিলেন :—

> …অবিশ্রান্ত পীযূষপানের ন্যায় গ্রন্থের আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমরা সর্ব্বতোভাবে পরিতৃপ্ত হইয়াছি।…তাঁহাকর্তৃক রত্নাবলীর সৌন্দর্য্য যাদৃশ পরিপাটীরূপে বঙ্গভাষায় প্রকটিত হইয়াছে; বোধ হয় অতি অল্প লোকে তাদৃশরূপে সংস্কৃতের চাতুর্য্য বাঙ্গালীতে রক্ষা করিতে পারিতেন।

(৬) **অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটক।** শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন কর্ত্তৃক চলিত গৌড়ীয় ভাষায় অনুবাদিত। সম্বৎ ১৯১৭।

ইহা কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকের অনুবাদ, "অধুনাতন নিয়মানুসারে নাটক অভিনয়োপযোগি করিবার নিমিত্ত স্থানে স্থানে রসভাবাদি পরিবর্ত্তিত পরিত্যক্ত ও সন্নিবেশিত"। পুস্তকের "মঙ্গলাচরণ"-এর তারিখ "১০ আশ্বিন ১২৬৭"।

(৭) **যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।** প্রহসন। [১৮৬৫ ?]

(৮) **বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক নব-নাটক।** শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত। শকাব্দাঃ ১৭৮৮। পৃ. ১৫৮।

'নব-নাটক' ১৮৬৬ সনের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হয়। ইহার রচনার একটি ইতিহাস আছে।

প্রধানতঃ গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবি অক্ষয় চৌধুরী প্রভৃতির চেষ্টায় জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়ীতে একটি নাট্যশালা গঠিত হয়। ইহার নাম জোড়াসাঁকো নাট্যশালা। অভিনয়োপযোগী অথচ লোকশিক্ষার অনুকূল উৎকৃষ্ট নাটকের অভাব অনুভব করিয়া, জোড়াসাঁকো নাট্যশালার কর্ত্তৃপক্ষ ১৮৬৫ সনের ২২ জুন তারিখে 'ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ' পত্রে প্রথমে বহুবিবাহ-বিষয়ে একখানি উৎকৃষ্ট নাটকের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। কিন্তু অল্প দিন পরেই সংবাদপত্র হইতে বিজ্ঞাপন প্রত্যাহার করিয়া, পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নের উপর এই নাটক-রচনার ভার অর্পিত হয়। ইহার অল্প দিন পরেই রামনারায়ণ 'নব-নাটক' রচনা করিয়া, জোড়াসাঁকো নাট্যশালার কর্ত্তৃপক্ষের

নিকট হইতে দুই শত টাকা পারিতোষিক লাভ করিয়াছিলেন। সংক্ষেপে ইহাই 'নব-নাটক'-রচনার ইতিহাস।*

(৯) **মালতীমাধব নাটক**। শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত। বাং ১২৭৪। ইং ১৮৬৭। পৃ. ১৭৯।

পুস্তকের বিজ্ঞাপনে প্রকাশ, "নাটকের সঙ্গীত কয়েকটী শ্রীযুত বাবু বনয়ারীলাল রায় মহাশয় রচনা করিয়া দিয়াছেন"।

(১০) **উভয় সঙ্কট**। প্রহসন। বন্ধুদিগের বিতরণার্থে। ১২৭৬ সাল। পৃ. ২৭

(১১) **চক্ষুদান**। প্রহসন। বন্ধুদিগের বিতরণার্থে। সন ১২৭৬ সাল। পৃ. ২৬।

(১২) **মহাবিদ্যারাধন**।

ইহা দশমহাবিদ্যার স্তোত্র ও গীতিকা এবং ১২৭৮ সালে রচিত বলিয়া রামনারায়ণের আত্মকথায় প্রকাশ, কিন্তু তারিখটি ঠিকমত মুদ্রিত হয় নাই বলিয়া মনে হয়। ১২৭৮ সালের পূর্ব্বে—সম্ভবতঃ ১৮৭০ সনে ইহা রচিত। এই পুস্তিকাখানি আমি এখনও কোথাও দেখি নাই।

(১৩) **রুক্মিণীহরণ নাটক**। শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন। সন ১২৭৮ সাল। পৃ. ১৯।

ইহার "উপহার"-পৃষ্ঠার তারিখ—"কলিকাতা। সংস্কৃত কালেজ, ১২৭৮। ভাদ্র"।

(১৪) **আর্য্যাশতকম্**। শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্নেন বিরচিতম্। ইং ১৮৭২। ফেব্রুয়ারি। পৃ. ১০।

পুস্তকখানি দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত। রচনার নিদর্শনস্বরূপ ইহা হইতে কয়েক পংক্তি হইল :—

এষা মুধৈব বার্ত্তা ন সুধা বসুধাতলে সুলভ্যেতি।
নবরসরসিকজনাস্যোদ্ভূতভারতী যদত্রাস্তে ॥৭
লেখনি খনিরসি লোকে কবিকরকলিতা সুবর্ণরত্নানাম্।
সা ত্বং পরার্থসিদ্ধেঃ কর্ত্রী চাধোমুখীভূয় ॥৮
কোমলমিহ নবনীতং সমধিককোমলতরং সতাং চেতঃ।
আদ্যং স্বস্মিংস্তাপাদ্ দ্রবতি তু পরতাপতোঽপ্যন্যম্ ॥৯
ধরণী ধরতি সমস্তং ধরণিমনন্তঃ শিরোভিরপি ধত্তে।
যো হি-বহতি পরভারং তস্য তু পতনং ন সম্ভাব্যম্ ॥১০
কস্তাং শিরসি নিদধ্যাৎ কো বা নিত্যং তবাদরং ধত্তে।
ছত্র স্বয়মপি তপ্তং পরতাপং চেন্ন বারয়সি ॥১১

(১৫) **স্বপ্নধন নাটক**। শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত। সম্বৎ ১৯৩০। পৃ. ৮৩

নাটকখানি সিমুলিয়া বঙ্গ রঙ্গভূমি (বেঙ্গল থিয়েটার) কর্ত্তৃক প্রকাশিত। রামনারায়ণ

* যাঁহারা জোড়াসাঁকো নাট্যশালা সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে আমার 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

ইহার স্বত্বাধিকার বঙ্গ রঙ্গভূমির কর্তৃপক্ষকে বিক্রয় করেন। 'স্বপ্নধন নাটক' বঙ্গ রঙ্গভূমিতে অভিনীত হয়। পুস্তকের বিজ্ঞাপনের তারিখ "সিমুলিয়া কার্ত্তিক,—১২৮০"।

(১৬) ধর্ম্ম-বিজয় নাটক। শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত। ১২৮২ সাল।

'ধর্ম্ম-বিজয় নাটক' হরিশ্চন্দ্রের আখ্যায়িকা অবলম্বনে রচিত। ১০ই ভাদ্র ১২৮২ তারিখে রামনারায়ণ এই নাটকখানি "সভ্যগণের আকিঞ্চনে" হরিনাভি বঙ্গ নাট্যসমাজের সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্যকে বিক্রয় করেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ই নাটকখানি প্রকাশ করেন; তাঁহার "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ, "শেষ ভাগে যে সকল সংগীত সন্নিবেশিত হইল, তজ্জন্য শ্রীযুক্ত বাবু কালীকুমার চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ সান্যাল মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলাম।...হরিনাভি ২০এ ভাদ্র ১২৮২।"

(১৭) কংসবধ নাটক। শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন-প্রণীত ও প্রকাশিত। সন ১২৮২ সাল [=ইং ১৮৭৫ ?]। পৃ. ৭২।

(১৮) দক্ষযজ্ঞম্ (পূর্ব্বার্দ্ধম্), সর্গ ১-৫। শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্নেন বিরচিতম্। শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নেন সংশোধিতম্। ১৮৮১। পৃ. ৪৩।

(১৯) দক্ষযজ্ঞম্ (উত্তরার্দ্ধম্), সর্গ ৬-১০। শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্নেন বিরচিতম্। শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নেন সংশোধিতম্। ১৮৮২। পৃ. ৪১।

রচনার নিদর্শনস্বরূপ দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত এই সংস্কৃত খণ্ডকাব্য হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল :—

হরো ব্রহ্মচারী কলঙ্কাপহারী
শশাঙ্কার্দ্ধধারী শ্মশানপ্রচারী।
বিপৎপাতবারী সদস্তর্ব্বিহারী
ভবত্রাণকারী স্মৃতো মেঽস্তু নিত্যম্ ॥৩৩
ভবানীশমীশং সুরেশং গিরীশং
জনেশং মহেশং শিবং ব্যোমকেশং।
মহাভীমবেশং সুবেশৈকবাসং
সতাং সুপ্রকাশং স্মরামি স্মরামি ॥৩৪
ত্বয়া যদ্বিধেয়ং তথা তদ্বিধেয়ং
বিধের্নাস্তি শক্তিস্তদন্যদ্বিধাতুম্।
অতঃ প্রার্থয়েঽহং ভবাম্ভোধিমগ্নঃ
ত্বয়া রক্ষণীয়ঃ শরণ্যাগ্রগণ্যঃ ॥৩৫
নমো বিশ্বকর্ত্রে নমো বিশ্বধর্ত্রে
নমো বিশ্বভর্ত্রে নমো বিশ্বহর্ত্রে।
নমো বিশ্ববীজস্বরূপায় নিত্যং
ত্রিনেত্রায় তুভ্যং নমঃ শঙ্করায় ॥৩৬
ত্বদন্যন্ন চাস্তে ভবে বস্তু কিঞ্চিৎ
ত্বমেবাদিমশ্চান্তিমো মধ্যমশ্চ।
বিধাতুং স্তবং তে বিধাতুর্ন শক্তিঃ
কথং বক্তুমীশো ভবেয়ং ভবেশ ॥৩৭

—পূর্ব্বার্দ্ধ, ৪র্থ সর্গ, পৃ. ২৮-২৯

ইহা ছাড়া রামনারায়ণ আরও দুইখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া সমসাময়িক কোন কোন ব্যক্তি উল্লেখ করিয়াছেন। পুস্তক দুইখানি অন্যের নামে প্রচারিত, কিন্তু এগুলির রচনায় যে তাঁহার যথেষ্ট হাত ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।—

(ক) যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর কালিদাস-প্রণীত 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের মর্ম্মানুবাদ করেন। নাটকখানি পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর-গোষ্ঠীর

আদি বাড়ীতে একাধিক বার অভিনীত হইয়াছিল। এই অভিনয়ে মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বিদূষকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন; তিনি তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

রামনারায়ণ পণ্ডিত মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে…বলিলেন—'আমি আপনাকে ঠিক 'রত্নাবলী'র মত একখানা নাটক লিখিয়া দিব।' তাঁহার রচিত 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটক আমরা প্রথম অভিনয় করিয়াছিলাম। ছোটরাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর সেই একবার মাত্র stageএ অভিনয় করিয়াছিলেন; বড় রাজার অনুরোধে তিনি 'কঞ্চুকী' সাজিয়াছিলেন…। ('পুরাতন প্রসঙ্গ,' ১ম পর্য্যায়, পৃ. ১৫৫)

মহেন্দ্রনাথের উক্তি একেবারে অমূলক বলিয়া মনে হয় না। 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের প্রথম সংস্করণে (১২৬৬ সাল) অনুবাদকের নাম ছিল না; দ্বিতীয় সংস্করণে (১২৮৪ সাল) শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নাম থাকিলেও, এই নাটক-রচনায় রামনারায়ণের যথেষ্ট হাত ছিল। ৭ জুলাই ১৮৬০ তারিখে এই নাটকের দ্বিতীয় বার অভিনয় হয়।* এই অভিনয়-প্রসঙ্গে 'সোমপ্রকাশ' (১৬ জুলাই ১৮৬০) লিখিয়াছিলেন :—

আমরা পূর্ব্বে [২ জুলাই ১৮৬০] মহাকবি কালিদাস প্রণীত মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের বাঙ্গলানুবাদ সমাচার পাঠকগণের গোচর করিয়াছি। গ্রন্থ মধ্যে অনুবাদকের নাম ছিল না, সুতরাং তাহা পাঠকগণকে জানাইতে পারি নাই। এক্ষণে জানিতে পারিলাম, পাথুরিয়া ঘাটার শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্র মোহন ঠাকুরের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু সৌরেন্দ্র মোহন ঠাকুরের যত্নে অনুবাদ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। পশ্চাৎ শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত বেশ ভূষা পরাইয়া দেন। সম্প্রতি উহার অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে।…†

(খ) পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, 'পৌরাণিক ইতিবৃত্ত' (১২৭৭ সাল) পুস্তকখানি রামনারায়ণের রচনা। দত্ত-মহাশয় রামনারায়ণের ছাত্র ছিলেন। তাঁহার কথাও অমূলক না হইতে পারে; কারণ, পুস্তকে গ্রন্থকার-হিসাবে "ডব্লু অব্রাএন স্মিথ" নাম থাকিলেও ইহার "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ :—

…ইহাও বক্তব্য, পুস্তক প্রণয়নে শ্রীযুত রামনারায়ণ তর্করত্নেরও সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

* "বিগত ২৫এ আষাঢ় [৭ জুলাই] শনিবার রজনীযোগে এই নাটকের দ্বিতীয় বার অভিনয় হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুত বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের বিশেষ প্রযত্নে অভিনয় ক্রিয়া সুসম্পাদিত হইয়াছে।" ('সোমপ্রকাশ,' ২৩ জুলাই ১৮৬০)

† 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটক ১৮৬০ সনের মাঝামাঝি প্রকাশিত হয়। ১ সেপ্টেম্বর ১৮৫৯ তারিখে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ইহার শেষ দুই অঙ্কের পাণ্ডুলিপি মাইকেলকে পাঠাইয়া তাঁহার অভিমত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ('মধুস্মৃতি,' পৃ. ১২৩); সুতরাং ইহার পরে যে নাটকখানি প্রকাশিত ও অভিনীত হইয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহ। কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখিয়াছেন, ১৮৫৯ সনে 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। আমার মনে হয়, ১৮৬০ সনের প্রথম ভাগে ইহা প্রথম অভিনীত হয়। কিশোরীচাঁদ ঘটনার বহু পরে—১৮৭৩ সনে এই অভিনয়ের কথা বলিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার ক্ষেত্রে সন-তারিখের এক-আধটু গোল হওয়া বিচিত্র নয়।

কেহ কেহ লিখিয়াছেন, রামনারায়ণ 'ধনুর্ভঙ্গ' নামে একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা মুদ্রিত হয় নাই।*

রামনারায়ণের আত্মকথা

১৮৭২ সনে রামনারায়ণ সংক্ষেপে আত্মকথা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। এই আত্মকথা শ্রীযুত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ১৩২৩ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু তারিখগুলি সর্ব্বত্র নির্ভুলভাবে মুদ্রিত হয় নাই বলিয়া মনে হয়। রামনারায়ণের আত্মকথা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

সন ১২২৯ সালে আমার জন্ম। আমার পিতৃঠাকুরের নাম ৺রামধন শিরোমণি মহাশয়। ২৪ পরগণার অন্তঃপাতি হরিনাভি নামক গ্রামে আমার বাস। আমি বাল্যাবস্থাতে দেশে ও বিদেশে চৌবাড়িতে ব্যাকরণ, কাব্য ও স্মৃতির কিয়দংশ এবং ন্যায়শাস্ত্রের অনুমানখণ্ড প্রায় অধ্যয়ন করি। পরিশেষে ইং ১৮৪৩ অর্থাৎ ১২৫০ সালে গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে পাঠার্থ প্রবিষ্ট হই। ইং ১৮৫৩ বাঙ্গলা ১২৬০ সালে কলেজ পরিত্যাগ করিয়া প্রথমতঃ হিন্দু মিট্রোপলিটন কলেজের প্রধান পাণ্ডিত্যপদে নিযুক্ত হই। দুই বৎসর তথায় কর্ম্ম করিয়া ১৮৫৫ সালের ১৬ই জুন† তারিখে (বাঙ্গলা ১২৬২ সালে) সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া অদ্যাপি সেই কর্ম্মই করিতেছি।

১২৫৯ সালে পতিব্রতোপাখ্যান প্রস্তুত করি। রঙ্গপুরের ভূম্যধিকারী বাবু কালীচন্দ্র রায় উক্ত পুস্তকে ৫০৲ টাকা পারিতোষিক দেন।

কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটক ১২৬১ সালে রচিত হয়, উহাতেও রঙ্গপুরের উক্ত ভূম্যধিকারী বাবু কালীচন্দ্র রায় ৫০৲ টাকা পারিতোষিক দেন; এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কনের সাহায্যে আরো ৫০৲ টাকা দান করেন। এই নাটক কলিকাতা নূতনবাজারে বাঁশতলার গলিতে ও চুচুড়াতে অভিনীত হয়।

বেণী-সংহার নাটক। ১২৬৩ সালে প্রস্তুত হয়। এই নাটক কলিকাতা জোড়াসাঁকোস্থ বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের বাটীতে ও নূতনবাজারে বাবু জয়রাম বশাকের বাটীতে অভিনীত হয়।

রত্নাবলী। ১২৬৪ সালে প্রস্তুত হয়। ইহাতে কান্দিনিবাসী রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর ২০০৲ টাকা পারিতোষিক দেন। উক্ত রাজার কলিকাতার সন্নিকট বেলগেছিয়ার বাটীতে ৬।৭ বার ঐ নাটক অভিনীত হয়। তদ্ভিন্ন গীতাভিনয় প্রস্তুত হইয়া একণেও নানাস্থানে অভিনীত হইতেছে।

অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটক। ১২৬৯ [১২৬৭ ?] সালে প্রস্তুত হয়। এই নাটক কলিকাতা শাঁকারিটোলার বাবু ক্ষেত্রমোহন ঘোষের বাটীতে ৫ বার অভিনীত হয়।

---

* "কবিকেশরী রামনারায়ণ তর্করত্ন"—'শিল্পপুষ্পাঞ্জলি,' ১২৯২ সাল, পৃ. ১৫৭।

† তারিখটি "১৫ই জুন" হইবে। সংস্কৃত কলেজে রক্ষিত অধ্যাপকদের মাহিনার রসিদ-বইয়ে প্রকাশ, রামনারায়ণ ১৮৫৫ সনের জুন মাসের বেতন বাবদ ২১।/৪ পাইয়াছিলেন।

নবনাটক ১২৭৩ সালে রচিত হয়। ইহাতে কলিকাতা জোড়াশাঁকোবাসি বাবু গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০০৲ টাকা পারিতোষিক দেন। এই নাটক তাঁহার বাটীতে ৯ বার অভিনয় হয়।

মালতীমাধব নাটক ১২৭৪ সালে প্রস্তুত করিয়া কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার সুপ্রসিদ্ধ রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরকে প্রদান করি। তিনি উহাতে ১০০৲ টাকা পারিতোষিক দেন। তাঁহার বাড়ীতে ঐ নাটক ১০।১১ বার অভিনীত হয়।

সুনীতিসন্তাপ নাটক ১২৭৫ সালে প্রস্তুত করিয়া কলিকাতা কাঁশারীটোলানিবাসি বাবু কালীকৃষ্ণ প্রামাণিককে প্রদান করি। তিনি আমাকে ২০০৲ টাকা পারিতোষিক দেন। ঐ নাটক কোন কারণে মুদ্রিত হয় নাই।

১২৭৮ সালে রুক্মিণীহরণ প্রস্তুত করিয়া পূর্ব্বোক্ত রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের নিকটে ৫০৲ টাকা পারিতোষিক পাই। ঐ নাটক তাঁহার বাটীতে ১০।১১ বার অভিনীত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত যেমন কর্ম্ম তেমন ফল, উভয় সঙ্কট এবং চক্ষুর্দ্দান নামে আরো ৩ খানি প্রহসন* অর্থাৎ হাস্যরসব্যঞ্জক ক্ষুদ্র নাটক প্রস্তুত করিয়া উক্ত রাজা বাহাদুরের নিকট যথাযোগ্য পুরস্কৃত হইয়াছি, সে সকল নাটকও প্রত্যেকে ৭।৮ বার করিয়া তাঁহারই বাটীতে অভিনীত হইয়াছে।

মধ্যে মধ্যে কল্কিপুরাণ, সমুদয় উত্তররামচরিত নাটক ও যোগবাশিষ্ঠের কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া সর্ব্বার্থপূর্ণ···দয়···[সর্ব্বার্থ পূর্ণচন্দ্র] নামক পত্রিকাতে ক্রমশঃ প্রকাশ করা হইয়াছে।

কেরলীকুসুমা† নামে একখানি নাটক প্রস্তুত করা গিয়াছে; অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই।

সংস্কৃত গ্রন্থ

১২৭৮ সালে মহাবিদ্যারাধন নামে দশমহাবিদ্যার স্তোত্র ও গীতিকা এবং বর্ত্তমান বর্ষে আর্য্যাশতক প্রস্তুত করিয়াছি।"

"বর্ত্তমান বর্ষে আর্য্যশতক প্রস্তুত করিয়াছি"—আত্মকথার এই কথাগুলি হইতে কাহারও বুঝিতে অসুবিধা হইবে না যে, যে-বৎসর 'আর্য্যাশতক' প্রস্তুত হয়, সেই বৎসরই আত্মকথা লিখিত হইয়াছিল। 'আর্য্যাশতকম্'-এর প্রকাশকাল "ইং ১৮৭২। ফেব্রুয়ারি," সুতরাং রামনারায়ণের আত্মকথা যে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বা ১২৭৮ সালে রচিত, তাহা নিঃসন্দেহ।

এই আত্মকথা রচনার পরও রামনারায়ণ আরও কয়েকখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনার সম্পূর্ণ তালিকা অন্যত্র দেওয়া হইয়াছে।

* এই প্রহসন তিনখানি অনেকে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের রচনা বলিয়া মনে করেন, কিন্তু তাহা ঠিক নহে।

† ইহাই 'স্বপ্নধন' নামে পর বৎসর ১২৮০ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল।

সড়ইকলা-রাজ্যে তৈলনিষ্কাশন-যন্ত্র

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

ভূমিকা

উড়িষ্যায় যে-সকল ছোট ছোট সামন্ত-রাজ্য আছে তাহার মধ্যে সড়ইকলা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তর দিকে অবস্থিত। ইহার পূর্ব্বে সিংহভূম জেলার ধলভূম পরগণা, সেখানকার অধিবাসিগণ বাংলাভাষী। পশ্চিমে সিংহভূমের সদর মহকুমা, সেখানে হিন্দী, উড়িয়া এবং কোল ভাষা প্রচলিত। দক্ষিণে উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ-রাজ্য। সড়ইকলার চলিত ভাষা উড়িয়াপ্রধান, কিন্তু শব্দ এবং বাক্যরীতিতে হিন্দী ও বাংলা উভয় ভাষারই প্রভাব লক্ষিত হয়। রাজদরবারে উড়িয়া ভাষা লিখিত হয়। এক কথায় বলিতে গেলে আমরা ভাষার দিক্ দিয়া সড়ইকলা-রাজ্যকে উড়িয়া, বাংলা এবং হিন্দীর মিলনভূমি বলিয়া ধরিতে পারি, তাহার মধ্যে উড়িয়াই প্রধান।

খাড়া ভাবে অবস্থিত দুইটি কাঠের পাটায় নির্ম্মিত যন্ত্র

শুধু ভাষার দিক্ দিয়া নহে, শিল্পকলা, দেশাচার এবং লোকাচার পর্য্যবেক্ষণ করিলেও উপরোক্ত বিষয়টি সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সড়ইকলায় প্রচলিত কয়েক প্রকার তৈলনিষ্কাশন-যন্ত্রের পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা এই বিষয়টি আরও দৃঢ়ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিব।

পাঁচ প্রকার তৈলনিষ্কাশন-যন্ত্র

যত দূর দেখিয়াছি সড়াইকলা-রাজ্যে সর্ব্বসমেত পাঁচ প্রকার তৈলনিষ্কাশন-যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(ক) খাড়াভাবে অবস্থিত দুইটি কাঠের পাটায় নির্ম্মিত যন্ত্র,

(খ) চিৎ করিয়া শোয়ানো দুইটি কাঠের পাটায় নির্ম্মিত যন্ত্র,

(গ) দুইটি বলদে টানা, নালিবিহীন কাঠের ঘানি,

(ঘ) এক বলদে টানা, নালিযুক্ত, একখণ্ড কাঠে নির্ম্মিত ঘানি,

(ঙ) এক বলদে টানা, নালিযুক্ত, কিন্তু দুই খণ্ড কাঠে নির্ম্মিত 'পিঁড়ি'-বিশিষ্ট ঘানি।

ইহার মধ্যে (ক) ও (খ) এক শ্রেণীর বলিয়া ধরা যাইতে পারে, (গ) দ্বিতীয় শ্রেণীর এবং (ঘ) ও (ঙ) তৃতীয় শ্রেণীর। এরূপ শ্রেণী-বিভাগের সঙ্গত কারণ আছে। প্রথম শ্রেণীর যন্ত্রে সাধারণতঃ রেড়ী, করঞ্জ, মহুয়াফলের বীচি বা কুসুম নিষ্পেষিত হয়। তিল ও সরিষাও পেষা যায়, তবে সচরাচর হয় না। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীতে সচরাচর তিল, সুরগুজা ও সরিষা পিষ্ট হয়, কিন্তু অপরগুলিও হইতে পারে।
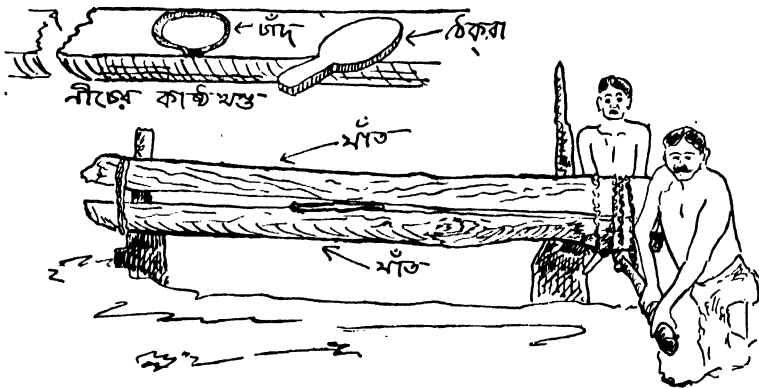
চিৎ করিয়া শোয়ানো দুইটি কাঠের পাটায় নির্ম্মিত যন্ত্র

প্রথম শ্রেণীর যন্ত্রে পিষিবার জন্য বীজগুলিকে আগে মিহি করিয়া ঢেঁকিতে কুটিতে হয়। তাহার পর উনানে এক হাঁড়ি জল চাপাইয়া তাহার উপরে আর একটি হাঁড়িতে কোটা বীজগুলি চাপাইতে হয়। দুই হাঁড়ির সন্ধিস্থল মাটির প্রলেপ দিয়া বুজানো থাকে এবং উপরের হাঁড়ির নীচে কয়েকটি ছিদ্রও থাকে। নীচের পাত্রে জল ফুটিলে উপরের পাত্রে অবস্থিত গুঁড়ার ভিতর দিয়া ভাপ বাহির হইবার চেষ্টা করে। তখন গুঁড়াগুলিকে বেশ করিয়া নাড়িতে হয়। গুঁড়া ভাল করিয়া ভাপানো হইলে অল্প অল্প লইয়া চটের টুকরায় মুড়িয়া অথবা বন্য লতায় প্রস্তুত এক প্রকার ছোট্ট চুপড়িতে ভরিয়া কাঠের দুইখানি পাটার মধ্যে রাখিয়া চাপ দিতে হয়। তখন তৈল বাহির হইয়া পড়ে।

দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শ্রেণীর যন্ত্রে কিন্তু এই ভাপানোর পর্ব্বটি নাই। বীজকে কাঁচা অবস্থাতেই অল্পাধিক জল মাখাইয়া ঘানিতে দিতে হয়। তবে দ্বিতীয় শ্রেণীর যন্ত্রে পেষাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও জল মিশাইতে হয়, তখন তেল উপরে ভাসিয়া উঠে। তৈলকার একখণ্ড কাঠিতে ন্যাকড়া বাঁধিয়া সেই ন্যাকড়ার সাহায্যে ভাসমান তেল শুষিয়া লয়। তৃতীয় শ্রেণীতে জল অতি সামান্য লাগে, বীজগুলিকে শুধু জলে মাখোমাখো করিয়া দিলেই যথেষ্ট হয়। তেল পেষা হইলে তাহা নীচের নালিপথে বিন্দু বিন্দু ঝরিয়া পড়ে। বীজের সহিত জল মিশাইলে তাহা ত আর নীচের দিকে নামিবে না।
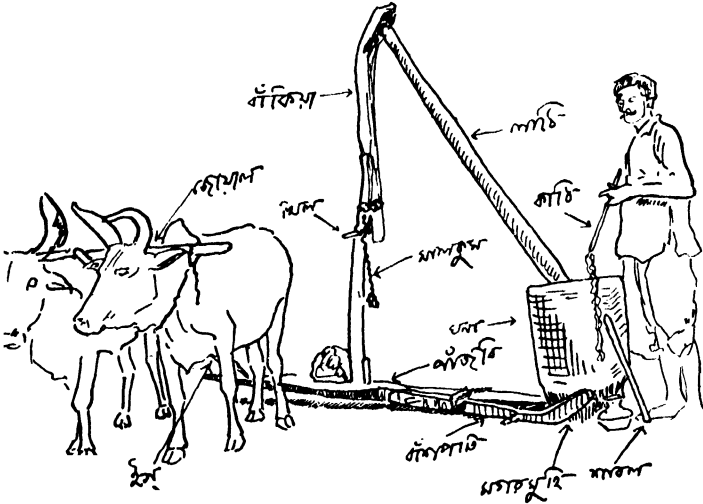
দুই বলদে টানা, নালিবিহীন কাঠের ঘানি

ইহাই তিন শ্রেণীর যন্ত্রের মধ্যে প্রধান প্রভেদ। এইবার প্রত্যেকটির পৃথক্ বর্ণনা করা যাউক।

(ক) সড়ইকলা শহরের পশ্চিম দিকে প্রায় চার মাইল দূরে জিলিংবুরু নামে একটি গ্রাম আছে। ইহাতে শুধু কোল জাতির বাস। গ্রামের মধ্যে তৈলনিষ্কাশনের জন্য একটি যন্ত্র আছে, যাহার যখন দরকার তখন ইহাতে তৈল পিষিয়া লয়। ১৯২৬ সালে এই যন্ত্রটি প্রথম দেখিয়াছিলাম, ১৯৩৮ সালেও দেখিলাম তাহা যথাস্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে।*

একটি শালের গুঁড়ি মাঝামাঝি চিরিয়া দুই খণ্ড করা হইয়াছে। তাহার এক দিকে একটি খিল দিয়া বাঁধা, অপর দিক উন্মুক্ত। এই মুক্ত প্রান্তের এক পাশে একটি খুঁটি শক্ত করিয়া পোঁতা আছে। অপর পাশে একটি আলগা খুঁটি, ঠেলিলে দুই খণ্ড কাঠ

* এই যন্ত্রের একখানি চিত্র ১৯৩১ সালের মে সংখ্যা 'মডার্ণ রিভিয়ু' পত্রের ৫৭৪ পৃষ্ঠার প্রথম প্রকাশিত হয়।

চাপিয়া ধরা যায়। সমস্ত যন্ত্রটি দুই খণ্ড পাথরের উপর বসানো আছে। কাঠের চেরা ও সমান পার্শ্ব দুইটি পরস্পরের প্রতি মুখোমুখি খাড়াভাবে অবস্থিত। তেল পিষিবার সময়ে সেই জন্য তেল সোজা নীচে ঝরিয়া পড়ে। তখন নীচে একখানি থালা পাতিয়া দিলেই যথেষ্ট হয়।

প্রথম চিত্রে এক জন বৃদ্ধ কোল যন্ত্রটির ব্যবহার-কৌশল দেখাইতেছে। ঐ সময়ে অপর দিকের খোলা খুঁটিটি, দুই এক জন বেশ জোরে চাপিয়া ধরে এবং চাপা থাকিতে থাকিতে দড়ি দিয়া আঁটিয়া বাঁধিয়া দেয়। যন্ত্রের মধ্যে বন্য লতায় নির্ম্মিত চুবড়ি ৩।৪।৫টি একত্র দেওয়া হয়।

কোল জাতির মধ্যে প্রধানতঃ খাড়া পাটার ব্যবহার দেখিয়াছি। ইটাকুদরের নিকটে নতুনডি বস্তিতেও এক জন কোলের বাড়িতে দুইখানি পাটা দেখিয়াছিলাম, তাহা জিলিংবুরুর মত তৈলনিষ্কাশনের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অনেক ব্যবহারের ফলে দুইটি পাটার মধ্যভাগ তেলে কুচকুচে কাল হইয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন হাওমোণ্ডা গ্রামে ভূমিজ জাতির মধ্যেও এইরূপ একটি যন্ত্র ২৪।২।১৯২৬ সালে দেখিয়াছিলাম। তবে সেক্ষেত্রে জিলিংবুরুর মত শালের গুঁড়িটি কাটিয়া আগাগোড়া ফাঁক করিয়া দেওয়া হয় নাই, খানিক চিরিয়া বাকী পূর্ব্বাবস্থায় ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল।

এই যন্ত্রটির সম্বন্ধে একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় হইল এই যে, যদিও কোলজাতির মধ্যে ইহা প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তবু যন্ত্রের বিভিন্ন অংশের নাম কোল ভাষায় নাই। প্রায় সবই সংস্কৃতমূলক শব্দ। হয়ত ইহারা নিজেরা এ যন্ত্র উদ্ভাবন করে নাই। যন্ত্রের নাম যান্তি বা সুমুম লেস্তেএ যান্তি (=তেলের জন্য যান্তি ?)। দুইটিকে এক প্রান্তে যথাস্থানে রাখিবার জন্য খুঁটা কিল। অপর প্রান্তের এক পাশে খুণ্টা, অপর পাশে চলিষ্ণু ঠাডা। মধ্যে যে বন্য লতায় নির্ম্মিত চুপড়ি দেওয়া হয় তাহার নাম কুলি টোপা।

(খ) দ্বিতীয় যন্ত্রটি মূলতঃ পূর্ব্ববর্ত্তী যন্ত্রের অনুরূপ। আমি মানিকবাজার গ্রামে ১১।১০।১৯৩৮ তারিখে দুর্য্যোধন মাহাতোর বাড়ীতে ইহা দেখি ও ইহার ছবি লই।

এ ক্ষেত্রে পাটা দুইটি খাড়া ও পাশাপাশি থাকে না, ভূমিজক্ষেত্রে একটি অপরের উপরে শোয়ানো থাকে। নীচের পাটার মধ্যস্থলে একটি বৃত্তাকার নালি থাকে, ইহার ব্যাস আনুমানিক আধ হাত হইবে। নালির একটি মুখ পাশের দিকে কাটা থাকে। তৈলবীজ-নিষ্পেষণের জন্য বৃত্তের মধ্যভাগে বসানো হয়। চাপ দিলে তেল নালিপথে গড়াইয়া পাশের মুখ দিয়া বাহির হইয়া যায়। কি ভাবে দড়ি বাঁধিয়া দুইখানি লাঠির সাহায্যে দুই দিক্ হইতে চাপ দেওয়া হয় তাহা চিত্রে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। এই যন্ত্রে সচরাচর দুইটি লতার চুপড়ি অথবা চটের তৈয়ারী একটি মাত্র পুঁটুলি দেওয়া হয়, জিলিংবুরুর খাড়া যন্ত্রের মত একসঙ্গে তিন-চারটি নহে। কিছু চাপিবার পর পুঁটুলি চাপে পাতলা হইয়া যায়। তখন দুই খণ্ড পাটার মধ্যে পিংপং খেলিবার ব্যাটের মত এক খণ্ড কাঠ

গুঁজিয়া দেওয়া হয়। পুনরায় চাপিলে পুঁটুলির উপরে আবার জোর পড়ে, অবশিষ্ট তেল নিষ্কাশিত হইয়া যায়।

যন্ত্রের নাম ঘাঁত। বৃত্তাকার নালির নাম চাঁদ, ব্যবধান কমাইবার কাষ্ঠখণ্ডের নাম ঠেক্‌রা। যে ক্ষুদ্র চুপড়িতে তৈল-নিষ্কাশনের জন্য বীজগুলিকে পুরিয়া চাপানো হয় তাহার নাম পোটোম।

কেন্দুপুসির নিকট মুকুন্দপুর গ্রামে ৯।১০।১৯৩৮ তারিখে একটি ঘাঁত দেখিয়াছিলাম, তাহার চাঁদ অন্য রকমের, চাঁদের মুখ পাশে কাটিয়া দেওয়া হয় নাই। ইহাকে ভিতরে কিছু দূর বিস্তৃত করিয়া তাহার পর নিম্নস্থ কাষ্ঠখণ্ডের মধ্যভাগে ছেদ করিয়া নীচে মধ্যস্থলে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছে।
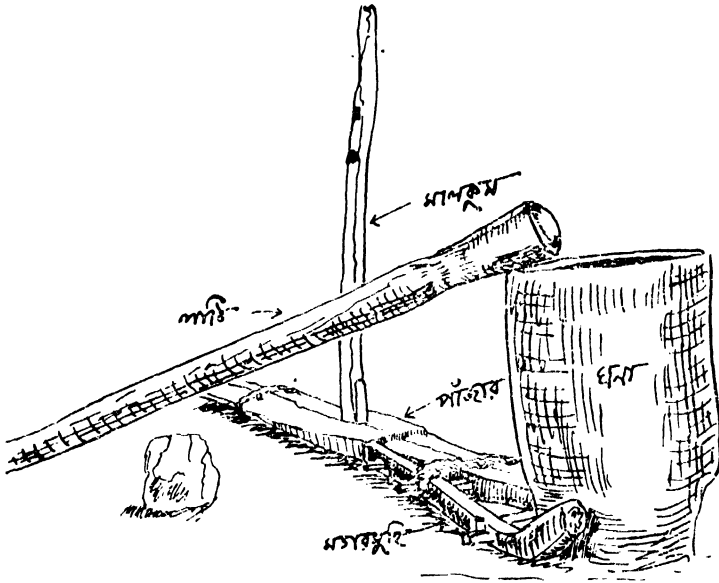
নালিবিহীন ঘানির বিভিন্ন অংশ

ভুমিজক্ষেত্রে অবস্থিত পাটার ঘাঁত মানিকবাজারে মাহাতো বা কুর্মিজাতির দ্বারা ব্যবহৃত হয়। ছোট লুপুং গ্রামে সাঁওতালদের মধ্যে ইহার একটি বিকল্প দেখিয়াছি। ধানকোটার ঢেঁকির উপরে ভাপানো বীজ বসাইয়া দেওয়া হয়, আর একটি ঢেঁকি তাহার উপর উল্টাইয়া শোয়াইয়া চাপ দেওয়া হয়, নয়ত একখণ্ড কাঠ তাহার বদলে উপরে দেওয়া হয়। তবে সাঁওতালদের মধ্যে জিলিংবুরুর মত খাড়া ঘাঁত দেখি নাই। ২৭।১২।১৯২৬ তারিখে পালামৌ জেলায় পাকু থানার অন্তর্গত গোইন্দি গ্রামে খেরওয়ারদের মধ্যে এইরূপ যন্ত্রের ব্যবহারের বিষয় শুনিয়াছিলাম, তবে কাহারও বাড়িতে ইহা চাক্ষুষ দেখিবার সুযোগ হয় নাই। ১৮।৯।১৯২৬ তারিখে রাঁচি জার্মান মিশনের জনৈক খ্রীষ্টান কোল শ্রীযুক্ত ইলায়াস তপন আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের গ্রামে রাঁচি জেলায় খুঁটি থানার পশ্চিমে অবস্থিত

সোনপুর এলাকায় এইরূপ যন্ত্রের ব্যবহার আছে। তবে সেখানে নাকি সরিষার তৈলও এই উপায়ে নিষ্কাশিত হইয়া থাকে। সাঁওতাল-পরগণা এবং আসাম হইতে আনীত দুইটি অনুরূপ যন্ত্রের নমুনা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব-বিভাগে রক্ষিত আছে। নিকোবর-দ্বীপ হইতে আনীত আর একটি যাঁত কলিকাতা যাদুঘরে রক্ষিত আছে।

(গ) তেলের ঘানিগাছটি এক খণ্ড শালকাঠে তৈয়ারি। ইহা ভূমির উপরে প্রায় দেড় হাত ও নীচে তিন চার বা আরও বেশী হাত পোঁতা আছে। ঘানিগাছের মাথায় যে খোলটি কাটা আছে তাহা কতকটা কলসীর আকারে কাটা। ইহা তেলিরা নিজে কাটিয়া লয়, ছুতারের সাহায্য গ্রহণ করে না। অনেক দিন কাজ হইলে উপরের অংশ ক্ষইয়া যায়, তখন একটু কাটিয়া ফেলিয়া আবার নূতন খোল নির্মাণ করিয়া লইতে হয়।

যন্ত্রের নাম ঘনা। যে দণ্ডের দ্বারা নিষ্পেষণ হয় তাহার নাম লাঠি। যে পাটায় বলদ জোতা থাকে তাহাকে পাঁজরি বলে। পাঁজরির সহিত বাঁশপাতি নামক আর এক খণ্ড কাঠ জোড়া থাকে, তাহার বাঁকা মুখের নাম মগরমুহি। পাঁজরিতে ইসের সাহায্যে জোয়াল বাঁধা থাকে। পাঁজরির উপরে খাড়া মালকুম দণ্ড, তাহাতে দুই তিনটি ছিদ্র থাকে। মালকুমের উপরিভাগের সহিত বাঁকিয়া নামে একটি বাঁকা কাঠ থাকে, তাহার মধ্যে একটি খোপে লাঠির উপর অংশ বসিয়া থাকে। আলগা যন্ত্রপাতির মধ্যে শাবল, ইহার মুখ ঈষৎ বাঁকা। তাই খইল কুরিয়া কুরিয়া তুলিতে সুবিধা হয়। আর কাঠি নামে এক খণ্ড কাঠে কিছু ময়লা স্তাকড়া বাঁধা থাকে। তাহার সাহায্যে জলে ভাসা তেল শুষিয়া লওয়া হয়।

বীজগুলিকে প্রথমে জলে মাখিয়া ঘানির মধ্যে দেওয়া হয়। পাঁজরির উপরে পাথরের ভার চাপানো হয়, যে চালায় সেও ইহার উপরে দাঁড়াইয়া বলদকে হাঁকায়। তেল যেমন বাহির হইতে থাকে, জলের পরিমাণও বাড়ানো হয়। তখন তেল ভাসিয়া উঠে এবং কাঠির সাহায্যে তাহা তুলিয়া ফেলা হয়। এইরূপ প্রক্রিয়ার ফলেই বোধ হয় খইলে চিট হয় এবং তাহা খইলের পার্শ্বদেশে লাগিয়া যায়। তখন চারটি খড় কুচাইয়া ঘানির মধ্যে ফেলিয়া পুনরায় ঘানি চালানো হয়। কুচা খড়ের ঘর্ষণেই বোধ হয় খইল পাশ হইতে ছাড়িয়া যায়।

যে-তেলিরা দুই বলদের ঘানি চালায় তাহাদের জল ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে গ্রহণ করে। ইহাদের জাতি তেলি, পদবী পড়িহারি। যেমন ক্ষেত্রমোহন পড়িহারি। ইহারা ঘানিতে কখনও এক বলদ জোতে না, ঘানির মধ্যে তৈল-নিষ্কাশনের ছিদ্র করে না।

(ঘ) কিন্তু মানিকবাজারের উত্তরে সুরতাড়ি গ্রামে যে শালকাঠের ঘানি দেখিয়াছি তাহা এক বলদে টানে।

ঘানিগাছ মাটির উপরে দেড় হাত বাহির হইয়া থাকে, নীচে দুই হাত পোঁতা। উপরে (গ) এর মত খোল কাটা থাকে, তাহার নীচের দিকে কিন্তু একটি গর্ত্ত। সুরতাড়ির ধনু পোরাঁইয়ের ঘানির ছবি লইয়াছিলাম।

ঘানির নাম ঘানা। যে ছিদ্র দিয়া তেল বাহির হয় তাহা নেরিও। নীচে গাদু থাকে। পেষণদণ্ডের নাম লাঠিম। কাঠের পাটাটি মাটি হইতে উপরে থাকে, ইহাকে কাতের বলে। কাতেরে সংলগ্ন খাড়া কাষ্ঠখণ্ডের নাম লইতে ভুল হইয়াছিল, তাহাতে বাঁধা বাঁকা কাঠের নাম ঢেঁকা। ইহাতে দুই তিনটি খাট কাটা আছে, তাহাতে লাঠিমের উপরাংশ প্রবিষ্ট থাকে। লাঠিমের সহিত আলগা ভাবে যুক্ত জোয়াল। ইহার সহিত আড়াআড়ি একটি কাঠি কাতেরের শেষ ভাগের সহিত দড়ি দিয়া বাঁধা থাকে। এই কাঠির নাম গলি। কাতেরে চালক পা ঝুলাইয়া বসিয়া থাকে, ওজনের জন্য পাথরও চাপানো হয়।
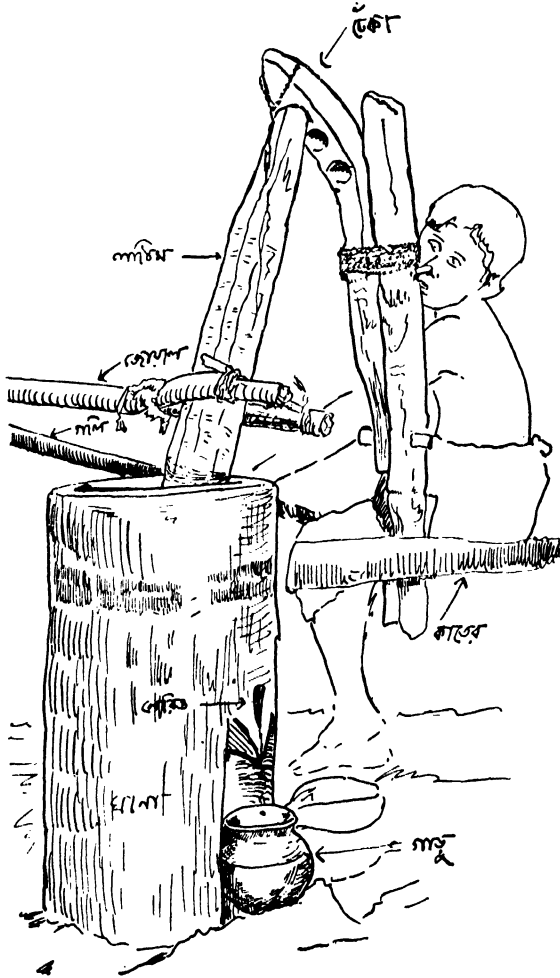
এক-বলদে টানা, নালিযুক্ত একখণ্ড কাঠের ঘানি

সুরতাডির ধমু গোঁসাইয়ের বাড়িতে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম তাহাদের সহিত মানিকবাজারের বড় ঘানি ব্যবহারকারী তেলিদের প্রভেদ কি। উত্তরে এক বৃদ্ধা বলিল, "উয়ারা দো-বলদিয়া, আমরা এক-বলদিয়া।" আরও শিখিলাম :

(১) দো-বলদিয়াদের লাঠি লম্বা, এক-বলদিয়াদের ছোট, মাত্র দুই হাত। তাই ইহারা ঘরের মধ্যে ঘানি চালাইতে পারে, দো-বলদিয়ারা পারে না।

(২) যে-পাটায় চালক চাপিয়া বলদ হাঁকায় তাহা দো-বলদিয়াদের ক্ষেত্রে মাটিতে ঠেকে, এক-বলদিয়াদের ঠেকিতে পারে না। ঠেকিলে গাড়ু ভাঙিয়া যাইবে।

(৩) দো-বলদিয়ারা ঘানিতে জল দেয়, ইহারা তেল পেষার সময়ে দেয় না, আগে যা সামান্য মাখাইয়া লয়। ইহাদের তেল বর্ষাকালেও ভাল থাকে, উহাদের নষ্ট হইয়া যায়, বেশী দিন থাকে না। ইহাদের খইল ছাড়াইতে কষ্ট নাই, উহাদের বিলক্ষণ বেগ পাইতে হয়।

(৪) ইহাদের ও উহাদের মধ্যেও সাগা বা বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে।

ধনু গোরাঁইয়ের আত্মীয়স্বজন পাতকুম (মানভুম) রাইরজড়ি (ময়ূরভঞ্জ), ঝালদা (মানভূম), গোলা (হাজারিবাগ) অঞ্চলে থাকে। এই স্থানগুলি মানিকবাজার হইতে দক্ষিণে এবং উত্তরে, ঈষৎ উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত।

(ঘ) শেষের যন্ত্রটিও এক বলদে টানে। আমি নারাণপুর গ্রামে ঘাসিরাম গরাঁইয়ের বাড়ীতে ইহা দেখিয়াছি।

যন্ত্রের নাম ঘানা। উপরে আলাদা কাঠে তৈয়ারি জামবাটির মত অংশের নাম পিঁড়ি। পেষণদণ্ডের নাম জাঠ। জাঠের উপর অংশে একটি বাঁকা সুদৃশ্য কাষ্ঠখণ্ড আটকানো থাকে, তাহার নাম মাকড়ি। মাকড়ির পশ্চাদ্ভাগে একটি ছিদ্র, তাহার সহিত দড়ি দিয়া মথমখুঁটা বাঁধা। মথমখুঁটা পাটার উপরে দাঁড়াইয়া থাকে। পাটার যে-প্রান্ত ঘানার গায়ে ঘষিয়া যায় সেখানে গোলোই নামে আর একটি কাঠের টুকরা জোড়া থাকে। ঘানার নীচে যে-স্থান দিয়া তেল বাহির হয় তাহার নাম পাৎনালি। নীচে ভাঁড়ে তেল পড়ে। ঘানির মধ্যে বীজকে নাড়িয়া দিবার জন্য একটি কাঠি আটকানো থাকে, তাহাও ঘোরে। ইহার নাম সাঁকনি। গরুর চোখে চামড়ার ঠুলি থাকে। গরুকে জুতিবার জন্য জোয়াল। জোয়াল পাটার সঙ্গে একটি আড়াআড়ি ভাবে বাঁধা কাঠি দিয়া আটকানো থাকে, তাহা কাইনুড়ি।

একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় হইল এই যে, নারাণপুরের কলুরা শালের পরিবর্ত্তে অশ্বত্থ, বট ও নিম কাঠের ঘানি করা ভাল মনে করে। হয়ত তাহারা যে-দেশ হইতে আসিয়াছিল, সেখানে শালকাঠের অভাব আছে।

নারাণপুর গ্রামের ঘাসিরাম গরাঁই এবং মহেশ্বর গরাঁই নামে দুই জন কলুর কাছে সুরতাড়ির গোরাঁইদের বিষয় জিজ্ঞাসা করায় নিম্নোক্ত সংবাদ পাওয়া গেল।

(১) "আমরা একাদশ তেলির অন্তর্গত। জাতি, কলু। এই গ্রামে দ্বাদশ তেলির অন্তর্গত লোকও আছে, তবে তাহারা তেল পেষে না, ব্যবসা-বাণিজ্য করে। আমরা রাঢ়ী কলু অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর, কেননা আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা দ্বিতীয় বিবাহের (=বিধবাবিবাহ) চলন করিয়া গিয়াছিলেন।

(২) "মানিকবাজারের দুই-বলদওয়ালা তেলি এবং সুরতাড়ির এক-বলদওয়ালা

তেলিদের সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই। উহারা উভয়েই উড়িষ্যা-বিভাগের লোক। আমরা পূর্ব্ব-বঙ্গের লোক (=পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত বঙ্গদেশের, বাংলার পূর্ব্বাঞ্চলের নহে)। এখানে তিন চার পুরুষ বাস করিতেছি। শিখরভূম হইতে আসিয়াছিলাম।" শিখরভূম মানভূমের বরাহভূমের পূর্ব্বে অবস্থিত।

(৩) "সুরতাডির উহাদের সহিত আমাদের জল চলে না। উহারা কুঁকুড়া ও মদ খায়। উহারা বোধ হয় মগহিয়া (=মগধ বা বিহার প্রান্তের লোক)।"

১৬।১০।১৯৩৮ তারিখে আমি পুনরায় সুরতাডির ধনু গোরাঁইয়ের বাড়ী যাই; সেখানে সকলকে নারাণপুরের কলুদের বিষয় প্রশ্ন করায় সেই বৃদ্ধা উত্তর করিল,

এক-বলদে টানা, নালিযুক্ত, পিঁড়ি-বিশিষ্ট ঘানি

(১) "নারাণপুরের বাঙালীশাহীর (=বাঙালী-পাড়ার) উয়ারা শিখ্‌রিয়া (=শিখরভূমের অধিবাসী) বটে।"

(২) "উয়াদের ঘানিতে পিঁড়ি আছে, আমাদের নাই।"

সেই দিন ধনুর বাড়ীতে পোষা মুরগী দেখি এবং পূজা-বিশেষে তাহারা মুরগী বলি দেয় ইহাও শুনি। ইহাদের মধ্যেই যে সাগা বা বিধবাবিবাহ আছে তাহা নহে। ধনু

এবং অপরেও বলিল যে ব্রাহ্মণাদি দু-এক বর্ণ বাদে সকলের মধ্যেই এদেশে সাপা প্রচলিত আছে। দো-বলদিয়া তেলিদেরও নাকি সাপা হয়। আর মুরগী বলি দেওয়ার কথা, তাহা দেবতা-বিশেষে ব্রাহ্মণাদি সকলেই নাকি করিয়া থাকে। ক্ষেত্রে চাষের সময়ে গোবর দিয়া লেপিয়া সিঁদুর দিয়া স্থানটি চিহ্নিত করিয়া আতপচাল নৈবেদ্য দেয়, মুরগীরও বলি হয়। তবে এ সকল সংবাদ অন্য কোথাও যাচাই করিবার অবসর পাই নাই।

কয়েকটি সাধারণ তথ্য

তৈল-নিষ্কাশনের জন্য দো-বলদিয়া অথবা এক-বলদিয়া তেলি ও কলুদের মধ্যে বাণী বা মজুরি লইবার নিম্নলিখিত রীতি প্রচলিত আছে। যত সের সরিষা, তিল বা গুজা পেষা হয় তৈলকার তত সের চাল পায়। উপরন্তু খইল তৈলকারের লভ্য হয়। ঘানিতে চার মণ সরিষায় এক মণ তেল হয়। কিন্তু আজকাল কলের ঘানিতে তিন মণে নাকি এক মণ তেল হয়। তাই তেলিরা বাজারে কলের তেলের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না, তাহাদের পড়্‌তায় পোষায় না।

পূর্ব্বে সড়াইকলায় কেবল তিল, গুজা, রেড়ী ও মহুয়া-বিচির তেলই চলিত। কোলেরা রেড়ী ও মহুয়া-বিচি বা কড়চার তেল ব্যবহার করিত। ইদানীং, বিশ পঁচিশ বৎসর হইতে সরিষা চলিতেছে। ইহাকে "ভাল তেলও" বলে, কেননা ভাল লোকেরা ইহা খায়। নারাণপুরের বাঙালী কলুরা আজকাল ছয় সাত ক্রোশ দূরে অবস্থিত জমসেদপুরের মাদ্রাজী অধিবাসিগণের নিকট তিল-তেল বিক্রয় করিয়া দু-পয়সা রোজগার করিতেছে।

ঐতিহাসিক আলোচনা

পূর্ব্বে যে-পাঁচটি যন্ত্রের বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর যন্ত্র জাতিনির্ব্বিশেষে লোকে নির্ম্মাণ করিতে পারে। তবে খাড়া পাটা কোলেদের ও ভূমিজদের মধ্যে দেখিয়াছি, অন্যটি নানা জাতির মধ্যে। দুই যন্ত্রের অংশের নাম আলাদা, অতএব দুই স্থান হইতে হয়ত দুইটি যন্ত্র সড়াইকলায় পৌঁছিয়াছিল। বলদ জুতিয়া ঘানি চালানো কেবল তেলি ও কলুদের কাজ। রাঁচি জেলায় দেখিয়াছি তেলি ভিন্ন অপর জাতির লোকেও ঘানিতে তেল পেষে, তবে জাত-হারাইবার ভয়ে বলদ জোতে না, মানুষেই ঠেলিয়া চালায়। নারাণপুরে সংবাদ পাইলাম যে সিংহভূমের জয়ন্তগড় এলাকায়, অর্থাৎ কেঁওঝর-রাজ্যের সীমানায় অনুরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

এইবার বলদে চালানো তিনটি ঘানি সড়াইকলায় কোথা হইতে আসিল তাহার সন্ধান লওয়া যাক। দ্বিতীয় শ্রেণীর ঘানি অর্থাৎ "দো-বলদিয়া" জলচল জাতির দ্বারা চালিত হয়। তৃতীয় বা "এক-বলদিয়া" ঘানি জল-অচল জাতিতে চালায়। তাহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে। যাহারা এক-কাঠের ঘানি করে তাহারা আবার মদ ও মুরগী খায়, পিঁড়িবিশিষ্ট ঘানিকরেরা অনাচরণীয় হইলেও মদ বা মুরগী খায় না।

ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে প্রচলিত ঘানির বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে গ্রিয়ার্সন সাহেব *Bihar Peasant Life* গ্রন্থে বিহারের ঘানির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়াছেন, তাহার সহিত সুরতাডির এক-কাঠের ঘানি অনেকটা মিলিয়া যায়। এখানে যাহা ঘানা সেখানে তাহা কোল্হু। বিহারে ঘানী বা ঘান বলিতে ততখানি তৈলবীজকে বুঝায় যাহা একবারে কোল্হুর মধ্যে পেষার জন্ত দেওয়া চলে।* সুরতাডির নেরিও বিহারে নিরোহ্ বা নারাহ্। কাতের বিহারে কৎরী নামে পরিচিত। লাঠিম কিন্তু জাঠ নাম ধরিয়াছে। সুরতাডির ঢেঁকা বিহারের ঢেকা বা ঢেকুআ। গাড়ু কিন্তু ছনা। অর্থাৎ বিহারের সহিত সুরতাডির কিছু নাম মেলে, কিছু মেলে না।

এইরূপ এক-কাঠে-তৈয়ারি ঘানি পূর্ব্ববঙ্গে সিলেট, নোয়াখালি প্রভৃতি জেলাতেও প্রচলিত আছে, তবে সেখান হইতে বিভিন্ন অংশের নাম এখনও সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

মানিকবাজারের দো-বলদিয়াদের কথা বিশেষ জানি না। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বিগত সায়েন্স কংগ্রেসে (জানুয়ারি ১৯৩৮) তৈলকার এবং বিভিন্ন প্রকারের ঘানির সম্বন্ধে এক বিস্তৃত প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহাতে এবং মহাত্মা গান্ধীর 'হরিজন' পত্রিকাতেও† সংবাদ প্রকাশিত হয় যে, দাক্ষিণাত্যে দো-বলদিয়া ছিদ্রবিহীন এবং গুজরাত-প্রান্তেও ছিদ্রবিহীন ঘানির প্রচলন আছে। সম্প্রতি গুজরাতে ছিদ্রযুক্ত ঘানির ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে। সেখানকার নাম ও পুরা বর্ণনা পাইলে মাণিকবাজারের ঘানির ইতিহাস মিলিতে পারে। উড়িষ্যায় প্রচলিত ঘানির বর্ণনাও এই প্রসঙ্গে সংগ্রহের আবশ্যকতা আছে।

নারাণপুরের কলুরা নিজেদের স্পষ্টই বাঙালী বলিয়া পরিচয় দিল। নদীয়া জেলা এবং চব্বিশ-পরগণায় পিঁড়িবিশিষ্ট ঘানির চলন আছে। অন্যত্রও থাকিতে পারে, তবে সে সংবাদ সংগৃহীত হয় নাই। সেগুলি পাইলে কলুরা কোথা হইতে সড়ইকলা এবং শিখরভূমে পৌছিয়াছিল তাহার একটা হদিস্ মিলিতে পারে।

যাহাই হউক, সড়ইকলায় তেলের ঘানি হইতেই আমরা দেখিতে পাই বিভিন্ন প্রদেশ হইতে এখানে বিভিন্ন শিল্পধারা আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছে। ভাষাও আমাদের সেই তত্ত্বে পৌছাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু সভ্যতা-বিস্তারের ইতিহাসটি পুরাপুরি উদ্ধার করিতে হইলে বাংলা দেশের এবং ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রান্তের শিল্পকলা, আচার-ব্যবহার, যন্ত্রপাতির খুঁটিনাটির পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্য্যবেক্ষণ ও বর্ণনের আবশ্যকতা আছে। গ্রিয়ার্সন বিহারের সম্বন্ধে যে-কাজ করিয়া গিয়াছেন, বাংলা দেশে তাহার আশু প্রয়োজন আছে।

* ঘান বলিতে হিন্দীতে একসঙ্গে উদূখলে বা যাঁতায় যতখানি শস্য ধরে, একবারে কড়ায় যতখানি জিনিষ ধরে তাহাকেও বুঝায়।

† *Harijan,* Vol. V. 1937-38, Nos. 16, 17, 19, 20, 21. ক্ষিতীশবাবুর প্রবন্ধটি *Journal of the Anthropological Institute of India,* Vol. I. No. 1-এ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

বগুড়ার কবি গোবিন্দচন্দ্র

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ

বিগত শতাব্দীতে বগুড়া জেলার সেরপুর নামক গ্রামে কবি গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী এক ব্রাহ্মণ-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মের সন তারিখ জানা যায় না। ১৩০৫ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। গোবিন্দচন্দ্রের শিক্ষা বোধ হয় সেকালে ছাত্রবৃত্তি অপেক্ষা অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। কিন্তু তাঁহার কবিতায় যেরূপ শাস্ত্রজ্ঞান ও ভাষার কারুকার্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে এই গ্রাম্য কবির প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও সাধনার সুখ্যাতি না করিয়া পারা যায় না। ইঁহার গানে এমনই একটি সরল সহজ স্বচ্ছ ভাব আছে, যাহা অনায়াসে হৃদয় স্পর্শ করে। বহু লোকের মধ্যে গোবিন্দচন্দ্রের গান এখনও প্রচলিত আছে। রামপ্রসাদের গানে যেরূপ সরল প্রাণের স্পর্শ আছে, এই কবির গানেও তাহা পাওয়া যায়। এই অনন্যসুলভ মর্মস্পর্শী বৈরাগ্যমিশ্রিত ভক্তিভাব তিনি কেমন করিয়া লাভ করিলেন, ইহা লইয়া কিংবদন্তীর সৃষ্টি হইয়াছে। অনেকে বলেন তিনি গ্রামের শ্মশানে বসিয়া সাধনা করিতেন। নিশীথ রাত্রিতে নৌকার মাঝিরা নদীতীরের এই শ্মশান-ঘাটে লোক বসিয়া থাকিতে দেখিয়া ভীতিজড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিয়াছে—ওখানে কে? গোবিন্দচন্দ্র প্রত্যুত্তর দিয়া তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়াছেন। গোবিন্দচন্দ্র প্রকাশ্যভাবে সংসারে বাস করিতেন বটে, কিন্তু সংসারের সুখদুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করিত না। মনে মনে তিনি বিষয় হইতে নির্লিপ্ত ভাবেই সাধনা করিতেন। এই বৈরাগ্যের সুর তাঁহার কবিতায় বিশেষ ভাবে বাজিয়াছে :

সংসারী বলিয়ে শ্যামা
        ঘৃণা আমায় কর মিছে।
দেহ আমার গেহবাসী
        মন যে সন্ন্যাসী হয়েছে।
        দুর্নিবার বিষয়-দায়
        দেহ আমার গেহ চায়

মন কিন্তু আগে হতেই
        শ্মশান-আশ্রম সার করেছে।
দেহ দিব্য বসন ধরা
মন যে আমার কৌপীন পরা
দেহ চায় মোর গন্ধ তৈল মা!
        মন যে চিতা ছাই মেখেছে।

—সদ্‌ভাব পুষ্পাঞ্জলি

গোবিন্দচন্দ্র শ্মশানের বর্ণনায় শতমুখ। তাঁহার এই শ্মশান-প্রীতির তুলনা বঙ্গভাষায় নাই।

আমার শ্মশান ব'লে কিবা ভয়।
শ্মশান রঙ্গিণী   শ্যামা মোর জননী
শ্মশানবাসী আমার পিতা মৃত্যুঞ্জয়।

বিভীষিকা আমায় দিবে কি রে সাজা ;
পিতা ঈশান আমার শ্মশানভূমির রাজা
প্রেত পিশাচ কবন্ধ বিত্তভোগী প্রজা
ভূত ভৈরবাদি ভৃত্য বইত নয়।

শ্মশানে শুধু যে ভয় নাই, তাহা নহে। কবি উহাকে পরম পবিত্র স্থান রূপে বর্ণনা করিয়া মৃত্যুর করাল বিভীষিকাকে উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছেন।

ভবে কে বলে কদর্য শ্মশান !
পরম পবিত্র চরম যোগের স্থান,
পাপী পুণ্যবান মূর্খ কি বিদ্বান,
সমান ভাবে হেথা সকলে শয়ান।

* * *

জাতিভেদ হেথা নাই রে কোন কালে
এক শয্যায় শয়ান ব্রাহ্মণে চণ্ডালে
সমান কুশ-পাত্র প্রেতান্ন আর জলে
সমান তৃপ্ত সবার প্রাণ—

* * *

জিতেন্দ্রিয় জীব আসা মাত্র হেথা
মহামৌনী দগ্ধ হ'লেও কয় না কথা
ক্ষুধা তৃষ্ণা যায় উপাধি লোপ পায়
সমাধির অধীন হয় প্রাণ,—
জন্মের মত ঘুচে যায় রে শোক রোগ
স্বপ্ন শূন্য নিদ্রা হয় রে উপভোগ
শ্মশান মাত্র নাম কিন্তু শান্তিধাম
(হেথা) সুখদুঃখ শ্রান্তি চির অবসান।

উপরের গান দুইটিতে মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করিবার যে ভাবটি পাওয়া যায়, তাহা আমরা সাধক কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের মধ্যেও দেখিতে পাই। কৃষ্ণচন্দ্রের ন্যায় গোবিন্দচন্দ্রের খ্যাতিও বঙ্গদেশে ছড়াইয়া পড়ে। গোবিন্দচন্দ্রের উপরিলিখিত গান ও অন্য অনেকগুলি গান এখনও লোকের মুখে মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ কীর্তন-গায়ক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামকমল ভট্টাচার্য এরূপ ভাবের সঙ্গে গোবিন্দচন্দ্রের গীত গান করেন যে, তাহাতে সহস্র সহস্র নরনারী মুগ্ধ হয়। কবি যে সঙ্গীত সম্বন্ধেও পারদর্শী ছিলেন, তাহা তাঁহার একটি রূপকে বুঝিতে পারা যায়ঃ

মনের বাসনা যদি গাবে গান।
যদি থাকে উদ্‌ভব লয়ের স্থান,
তবে ত্রাণ কর মা বলে' একবার তারা নামে ছাড় তান।
বসন্তের হৈও না বশ বাহার বিষম বিরস,
নটখটে ক'র না রে যোগদান ;—
অহং রাগ পরিহর, গৌরী আলাপন কর,
জয়জয়ন্তি বল একবার জুড়াই কান ;—
ক্রমে শ্রীরাগ জন্মিবে হবে বাগীশ্বরীর অধিষ্ঠান।

* * * *

ছায়া নটের সভায় এসে, আদর কেন মালকোষে
কর সদা পরজে আপন জ্ঞান ;
এবার সিন্ধুতে ত্রাণ পেলে তবে বাঁচে রে গোবিন্দের মান।

দুস্তর ভবসিন্ধু হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য গোবিন্দচন্দ্রের আর্তির সীমা নাই। এই ভাবধারা তাঁহাকে বৈরাগ্যে দীক্ষিত করিয়াছিল। তাঁহার সাধনার মূলমন্ত্র :

* * * *

কেবল বায়ু বইত নয়, প্রাণের ভরসা কি মন।
নিমিষে মিশে যায় জল-বুদ্‌বুদের মতন॥
অধোমুখে কুশাগ্রে শিশির বিন্দু যতক্ষণ,
ভগ্ন ঘটের বারি যেমন টুটে প্রতিক্ষণ,
উৎপলের দলে জল চঞ্চল যেমন,
তেমনই পলে পলে টলে এ জীবন॥

এইরূপ দার্শনিকতা বা আধ্যাত্মিকতা তাঁহার কবিতার মেরু মজ্জা জোগাইয়াছে। কিন্তু গোবিন্দচন্দ্রের যুগে এবং তাহার পূর্বেও আমাদের দেশের নরনারীর পক্ষে ইহা একেবারেই দুর্বোধ্য ছিল না। এখনও বাংলার এই অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য একেবারে লোপ পায় নাই। সেই জন্য রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলিতে পাশ্চাত্য পাঠক বিস্মিত হইলেও আমাদের দেশে ইহার ছন্দ, ইহার ব্যঞ্জনা চিরপুরাতন এবং চিরনূতন। সেই জন্য গোবিন্দচন্দ্রের কবিতা দার্শনিকতা সত্ত্বেও জনপ্রিয় হইতে পারিয়াছিল। রংপুরের খ্যাতনামা জমিদার গোবিন্দলালের অর্থব্যয়ে ১২৯১ সালে তাঁহার 'সদ্‌ভাব সঙ্গীত' প্রকাশিত হইয়াছিল। গোবিন্দচন্দ্রের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র নিরঞ্জন চৌধুরী কর্তৃক এই গ্রন্থের আরও কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার 'সঙ্গীতপুষ্পাঞ্জলি' নামক আর একখানি কবিতা-গ্রন্থও প্রকাশিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বোধ হয় সন্দিগ্ধ হৃদয়ে লিখিয়াছিলেন,

দেখিতে গেলে অলসের অদৃষ্টবাদ, চেষ্টাশূন্যের আত্মসমর্পণ, অক্ষমের কর্মপ্রতীক্ষা, পাপীর অযোগ্য প্রার্থনা, নিরুপায়ের অলীক সরলতা, ভীরুর অস্ফুট বলগর্ব, দরিদ্রের অসার বৈরাগ্য—ইহাই কেবল লক্ষিত হইবে। এরূপ দুঃসাহস লোকে ক্ষিপ্ত হৃদয়ের অবৈধ উচ্ছ্বাস বলিয়াই অভিহিত করিবে, তবে ভরসা এই স্থানে স্থানে অমৃত পুরুষের নামামৃত-প্রক্ষেপ আছে; তাই ধৃষ্টতা ও লজ্জার ভ্রূকুটীতে ভীত না হইয়া নিতান্ত আগ্রহের সহিত সঙ্গীত পুষ্পাঞ্জলি প্রকাশ করিলাম।

গোবিন্দ যে কর্মচেষ্টারহিত অলসপ্রকৃতির লোক ছিলেন তাহা বোধ হয় না। তিনি স্থানীয় (শেরপুর) জমিদার মুন্সী-বাবুদের অধীনে কার্য করিতেন। মুন্সী-বাবুরা তাঁহাকে কবিত্ব ও সাধুতার জন্য অত্যন্ত খাতির করিতেন। কিন্তু রামপ্রসাদের মত, গোবিন্দের মনও বিষয়কর্মে আবদ্ধ করিতে পারিল না। জগন্মাতার তবিলদারীর জন্য তাঁহারও প্রাণ ব্যগ্র হইয়া উঠিল। মুনসী-বাবুরা তথাপি তাঁহার ভরণপোষণের দায়িত্ব পরিত্যাগ করেন নাই, এইরূপ শুনিয়াছি। তাঁহার চরিত্রে অসাধারণ তেজ ছিল। এ সম্বন্ধে একটি গল্প যাহা শুনিয়াছি, তাহা উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে হয়। এক জন ৬৫ বৎসরের বৃদ্ধ ধনশালী ব্যক্তি প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পরে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিলেন। তখন তাঁহার ২৫।২৬ বৎসরের পুত্রটি বর্তমান। পুত্রের বিবাহের চেষ্টা না করিয়া তিনি

নিজে বিবাহ করিলেন, এই লজ্জায় পুত্রটি আত্মহত্যা করিল। এই আত্মঘাত গোপন করিয়া পিতা সমারোহে পুত্রের শ্রাদ্ধ করিলেন। সেই সভায় গোবিন্দচন্দ্র সকলকে সম্বোধন করিয়া এই গল্পটি বলেন : এক দিন কামদেব ও যমরাজ শিকারের সন্ধানে পৃথিবী পরিক্রমণ করিতে করিতে এক সরোবর-তীরে মিলিত হইলেন। তখন তাঁহারা আপন আপন পরিচ্ছদ ও তীর-ধনুক তীরে রাখিয়া স্নানার্থ সরোবরে নামিলেন। পরে উঠিয়া নিজ নিজ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আপন গন্তব্য পথের অনুসরণ করিলেন। কিন্তু ভ্রমক্রমে তাঁহাদের তূণের বদল হইল। শেষে যমরাজ এই বৃদ্ধকে লক্ষ্য করিয়া তীর ছুঁড়িলেন এবং কামদেব বৃদ্ধের অনিন্দ্যসুন্দরকান্তি যুবাপুত্রকে লক্ষ্য করিলেন। যমের বাণে এই বৃদ্ধ কামমোহিত হইয়া বিবাহ করিয়া বসিলেন এবং কামের বাণে তাহার পুত্র স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করিল।

শুনিয়াছি, এই গল্প শুনিয়া সকলেই সে কলুষিত ভবন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। গল্পটি সত্য হউক বা না-হউক, ইহা হইতে বুঝা যায় যে গোবিন্দচন্দ্রের চরিত্রে দৃঢ়তা ও সত্যের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল।

গোবিন্দচন্দ্রের কবিতায় যথেষ্ট উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার কোনও কোনও সঙ্গীত ব্রহ্মসঙ্গীতের মত শোনায়।

ভাব মন তাঁরে যে জন
এ ভব কেলিকুঞ্জের কারুকর।
যাঁর নিরমিত গরল অমৃত
মৃত জীবিত চরাচর।
যাঁর সৃজন সিন্দূরারুণ
সান্ধ্য বিমল দিনকর,
নীরদমুক্ত শরদ চন্দ্রের
ক্ষীরোদ ধবল বিনোদকর,
যাঁর সৃজন দামিনী-
দামজড়িত শ্যাম জলধর।

গোবিন্দের বীণা কিন্তু মায়ের নামেই সাধা। মায়ের নামে কবি আত্মহারা। কিন্তু অন্য ধর্মের প্রতি তাঁহার মনে তিলমাত্র বিদ্বেষ নাই। গোবিন্দচন্দ্র বৈষ্ণব কবিদের অনুকরণে রাধাকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে পদ রচনা করিয়াছেন :—

ঘাটে হেরিনু নব কৈশোর
কে সে শ্যামল লাবণি।

* * *

ইন্দ্রধনুকতুচ্ছকারী কুসুমগুচ্ছ গাঁথনি
ময়ূরপুচ্ছ খচিত সইরে উচ্চ চূড়ার টালনি।
বিনোদ ভালে নিবিড় অলকা
বলাকা মদ বিড়ম্বিনী,
নধর বক্ষে ভৃগু পদাঙ্ক
মণি কৌস্তুভ সাজনি। ইত্যাদি

তাঁহার একটি অপ্রকাশিত পদে রাধামাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। এ পদটি আমি

পণ্ডিত রামকমল ভট্টাচার্য্যের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। ভাবে ও ভাষায় এই গানটি কবির রচনার উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে :—

অল্পভাগ্যে অবৈরাগ্যে চিনবে কি মন শ্রীরাধায়।
সে নয় সামান্যা রমণী রমণীর শিরোমণি
সুষুম্না চিত্রাণীর মূলে
সুষুপ্তা সাপিণীর প্রায়।
সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকারে মূলাধারে পাড়ে ঘুম
যোগে যাগে জাগাইয়ে দেখরে তার লীলার ধুম
কথায় বল্‌লে বুঝ্‌বে কি তা
যা বুঝে না গণেশের পিতা—
স্তব্ধ পুরাণ গীতা
যার গুণ বর্ণনায়।
সে যে পরম ব্রহ্মের পরাশক্তি
ধরে রে হ্লাদিনী নাম
ভক্ত চিত্ত বিনোদিনী
অভক্তের প্রতি বাম
সে বিনা আর অন্য জনা
জানে কি কৃষ্ণ ভজনা
জনার্দ্দন জড়িত শুধু তার মায়ায়—
কৃপা করি চিদাগারে কচিৎ প্রকাশ হয় যদি
মানস সরঃ উদ্বেলিয়া বয়ে' যায় অমৃতের নদী
শ্রীমূর্ত্তি-ছটায় তার দীপ্ত করে ত্রিসংসার
যার ভ্রূভঙ্গে ত্রিভঙ্গ ভোলে
অনঙ্গ মূরছা যায়।
সে যে সদ্‌ভাব সখীমণ্ডলে
ঘেরা থাকে অষ্টযাম
কামগন্ধবিহীনা সে
নাশে মায়া মোহদাম
গোপনে গোপ সমাজে জন্ম লয়ে মাঝে মাঝে
রসরাজে মাধুর্য রস বিলায়—
করুণায় গড়া তার সুচির তনুর তনু
কিবা সে রুচির রুচি সুস্থিরা বিজুরি জনু
সে কনক কোকনদ সদা প্রেমে গদগদ
ঢলে পড়ে বিদগধ বিনোদ শ্যামের গায়।

গোবিন্দ বর্ণিতে নারে　　কিঞ্চিৎ স্বরূপ তার
ব্রহ্মা আদির অগোচর　　শ্রীমূর্ত্তি সে শ্রীরাধার
জটিলা কুটিলা তারে　　চিনিবে রে কি প্রকারে
কেবলি আয়ানের নারী ভাবে তায়—
তেমনি জটিলা প্রকৃতি যত　　অভক্ত আর অসাধকে
সাজায়ে মানসী তনু　　গোপী ভাবে শ্রীরাধাকে
আর রসিক কোকিল যত　　তারা সুরসালে রত
রসহীন বায়স যত　　নিম্বের আস্বাদ পায়।

গোবিন্দচন্দ্রের অপ্রকাশিত পদ এখনও হয়ত অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইতে পারে। রংপুর সাহিত্য-পরিষদ্-শাখা এ বিষয়ে একবার যত্নবান্ হইয়াছিলেন বলিয়া মনে পড়ে। তখন গোবিন্দচন্দ্রের গান অনেক স্থলে প্রচলিত ছিল। যাঁহারা এই গানগুলি মুখে মুখে শিখিয়া রাখিয়াছিলেন, এখন তাঁহাদের সংখ্যা ক্রমেই বিরল হইয়া পড়িতেছে। তাঁহার আর একটি অপ্রকাশিত পদ আমি পাইয়াছি। তাহাই উদ্ধৃত করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিব। গানটি সাধন-পথের পথিকদের জন্যই অভিপ্রেত :

পিতার কোনো গুণ পেলাম না আমি।
পিতা পরম যোগী　　নির্বিকার নিরাগী
আমি ঘোর সম্ভোগী　　বিকারগ্রস্ত রোগী
পিতা মোর ত্যাগী　　আমি অনুরাগী
পিতা নিষ্কাম আমি কামী।
পিতার ভালে চাঁদ　　মোর ভালে কলঙ্ক
পিতা কালের কাল　　কালেই মোর আতঙ্ক
আমার নিজের যে বিত্ত　　তাতেই নাই কর্তৃত্ব
পিতা আমার ভবস্বামী।
বিশ্বদাহন বহ্নি　　পিতার ভালে জ্বলে
আমার পোড়া কপাল　　স্বীয় কর্মানলে
আমি আত্মবিস্মরিত　　আত্মকর্মফলে
পিতা আমার অন্তর্যামী
কেবল একটি গুণ　　পেয়েছি পিতার
ক্ষুধা পেলে সদা　　করি বিষ আহার
তার ভোগ্য বিষয়　　পিতা মৃত্যুঞ্জয়
আমি মৃত্যুর অনুগামী।
গোবিন্দ কয় মন　　কেন রে বিষাদ
পিতার গুণ পেতে　　কর যদি সাধ
তেজে বিষয় সাধ　　পিতায় গিয়ে সাধ
দেহপ্রাণ দিয়ে প্রণামী।

বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ (৩)*

শ্রীসজনীকান্ত দাস

চার্লস উইলকিন্স ও পঞ্চানন কর্ম্মকার

বাংলা দেশে মুদ্রাযন্ত্র ও হরফ-নির্ম্মাণ প্রসঙ্গে চার্লস উইলকিন্স ও পঞ্চানন কর্ম্মকারের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ছাপার হরফের সহিত বাংলা-গদ্যের ক্রমোন্নতির কাহিনী ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত, সুতরাং উইলকিন্স-পঞ্চানন প্রসঙ্গ একটু বিস্তৃত করিলে দোষ হইবে না।

পঞ্চাননের জীবন-কাহিনী আমাদের প্রয়োজনের পক্ষে খুব বেশী নয়। শ্রীরামপুরের মিশনরীদের বিবরণী হইতে এইটুকু মাত্র জানা যায়, হুগলির নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানে তাহার নিবাস ছিল। 'বেঙ্গল পাষ্ট এণ্ড প্রেজেণ্টে' (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯১৬, পৃ. ১৪০)

* বাংলা গদ্যের প্রথম যুগের ইতিহাস রচনা করিতে বসিয়া আমি এখন পর্য্যন্ত যাহা লিখিয়াছি, তাহার তিনটি স্থল সম্বন্ধে আরও কিছু বক্তব্য আছে।

১। "মুদ্রিত ইতিহাস" শিরোনামায় (৪৫ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃ. ৪২) লিখিয়াছিলাম, "পদ্মনাভ ঘোষালের কোনও ইতিহাস আমরা দেখি নাই।" 'গৌড়ীয় ভাষা-তত্ত্ব, প্রথম খণ্ড' নামক একখানি পুস্তক সম্প্রতি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। গ্রন্থকার দুই জন—শ্রীপদ্মনাভ ঘোষাল ও শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। পুস্তকটি কলিকাতা পুরাণপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া ১৭৯৭ শকে (১৮৭৫ খ্রীঃ) প্রকাশিত হইয়াছিল। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ।৶+১১৬। এই পুস্তকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ সামান্যই আছে।

২। "বাংলা গদ্যের অন্ধকার যুগ" শিরোনামায় (পৃ. ৪৫) শ্রীজহরলাল বসুর 'বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাসে'র ২৫ পৃষ্ঠা হইতে প্রাচীনতম বাংলা গদ্যের নিদর্শন হিসাবে শ্রীরাজা ভারামল্ল রায়ের যে ছাড়পত্র মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা প্রামাণিক নহে। "সন ১৮৫ সাল" খাঁটি হইতে পারে না, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই মত প্রকাশ করেন। পরে জানিতে পারিয়াছি, তারকেশ্বরের মোহন্তের মামলার আপীলের পেপার-বুকে যে সকল প্রাচীন দলিল উদ্ধৃত হইয়াছে, সেগুলি ঐতিহাসিকের নির্ভরযোগ্য নয়।

৩। "১৭৭৮-১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দ" শিরোনামায় যে সকল পুস্তকের তালিকা দিয়াছি, কেহ কেহ বলিয়াছেন তাহাতে দুইটি নাম বাদ গিয়াছে। তাঁহারা স্বর্গীয় কেদারনাথ মজুমদার প্রণীত 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য, প্রথম খণ্ডে'র ২১ পৃষ্ঠায় ১৭৯৬ অব্দে প্রকাশিত রামতারক রায় সঙ্কলিত 'সদর দেওয়ানী আইন বিধি' ও রাধারমণ বসু সঙ্কলিত 'নিজামৎ আইন বিধি'র প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কেদারবাবুর এই তালিকা আমি পূর্ব্বেই দেখিয়াছিলাম। লঙের তালিকায় পুস্তক দুইটির প্রকাশকাল যথাক্রমে ১৮৪৬ ও ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ দেওয়া আছে। মজুমদার মহাশয় কোনও ভুলের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার তালিকায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রকাশিত পুস্তকের মধ্যে এই দুইটিকে স্থান দিয়াছেন। রাধারমণ বসু ও রামতারক রায় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের লোক। প্রথমটিতে ১৭৯৩ হইতে ১৮৪৬ এবং দ্বিতীয়টিতে ১৭৯৫ হইতে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের আইন মুদ্রিত আছে। সুতরাং ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থ এ দুইটি হইতে পারে না।

উদ্ধৃত শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নোট-বইয়ে তাহাকে ত্রিবেণীর লোক বলা হইয়াছে। ১৭৭৭-৭৮ খ্রীষ্টাব্দে উইলকিন্স যখন হালহেডের ব্যাকরণের জন্য হুগলিতে ছেনি কাটিয়া বাংলা হরফ প্রস্তুত করিতেছিলেন, তখন পঞ্চানন কর্ম্মকারের সাহায্য গ্রহণ করেন; তাঁহার শিক্ষকতায় পঞ্চানন ছেনিকাটা ও হরফ-ঢালাইয়ের কাজে দক্ষতা লাভ করে। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ফরষ্টার-অনূদিত কর্ণওয়ালিস কোড পুস্তক মুদ্রণে যে হরফ ব্যবহৃত হয়, তাহা পঞ্চাননের কৃত এবং উইলকিন্সের হরফ হইতে অনেক বেশী সুন্দর। পরে অনেক দিন পর্য্যন্ত এই হরফের ব্যবহার ছিল।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি তারিখে শ্রীরামপুরে ব্যাপটিষ্ট মিশনের পত্তন হয়; মুদ্রাযন্ত্রও প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহারই দুই তিন মাসের মধ্যে দেখি, পঞ্চানন মিশনের ছাপাখানায় অক্ষর-নির্ম্মাণের কাজে নিযুক্ত। ১৮০৩-৪ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু পর্য্যন্ত পঞ্চানন মিশনরীদের আশ্রয়ে থাকিয়া একটি নাগরী সাট (ফাউণ্ট) ও অপেক্ষাকৃত ছোট হরফের একটি বাংলা সাট তৈয়ারী করে। ত্রিবেণী-নিবাসী (শম্ভুচন্দ্রের মতে) যুবক মনোহর এই সময়ে প্রথমে পঞ্চাননের সহকারী, পরে জামাতা হইয়াছিল। মনোহর দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া (১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) ভারতবর্ষের প্রায় পনরটি প্রাদেশিক ভাষার এবং চীনা ভাষার হরফ প্রস্তুত করিয়া যশস্বী হইয়াছিল। তাহার পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র মিস্ত্রীও এই কার্য্যে খ্যাতি-লাভ করে। বস্তুতঃ পঞ্চাননকে কেন্দ্র করিয়া শ্রীরামপুরে একটি হরফ-কারখানা (টাইপ-ফাউণ্ড্রি) গড়িয়া উঠে। কেরীর জীবনীকার জর্জ স্মিথ লিখিয়াছেন, ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রাচ্য ভূখণ্ডে এমন কারখানা আর দ্বিতীয় ছিল না। শম্ভুচন্দ্র তাঁহার নোট-বইয়ে পঞ্চাননের দখল লইয়া কেরী ও কোলব্রুকের মধ্যে বিবাদের এক কৌতুককর বিবরণ দিয়াছেন।

চার্লস উইলকিন্স ১৭৫০ (১৭৪৯?) খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সমারসেটশায়ারের ফ্রোম নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতা বিখ্যাত এনগ্রেভার রবার্ট বেটম্যান রে (Robert Bateman Wray)র সহিত সম্পর্কিতা (niece) ছিলেন। পিতা ওয়াণ্টার উইলকিন্স। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সে তিনি ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সিবিল সার্বিসে প্রবেশ করিয়া রাইটার রূপে বাংলা দেশে আগমন করেন। কলিকাতায় সেক্রেটরির আফিসে দুই বৎসর কাজ করিয়া তিনি মালদহে কোম্পানীর কুঠিতে সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রূপে প্রেরিত হন। কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা তখন পর্য্যন্ত এদেশের ভাষা ও সাহিত্য শিখিবার কোনই প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেন না; দোভাষীর সাহায্যে ব্যবসায়ের কাজ চলিত; রীতিমত রাজ্যশাসনের দায়িত্বও তখন পর্য্যন্ত কোম্পানী গ্রহণ করেন নাই। দূরদর্শী উইলকিন্সই সর্ব্বপ্রথম এ-দেশের সহিত ভাষা-ও-সাহিত্যগত আত্মীয়তা গড়িয়া তোলার কথা চিন্তা করিয়াছিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে বাংলা ও ফার্সী শিখিতে আরম্ভ করেন। অসাধারণ অধ্যবসায় ও ধীশক্তি বলে এই দুইটি ভাষা আয়ত্ত করিতে তাঁহার বেশী দিন লাগে নাই। তিনি অবিলম্বে বুঝিতে পারিলেন, ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য্য ও ঐতিহ্য এই সকল সাধারণ-ব্যবহৃত অপরিপুষ্ট প্রাকৃত ভাষার মধ্যে নয়, সুতরাং ভাষা ও সাহিত্যের আকর সংস্কৃতের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল।

১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সংস্কৃত শিখিতে আরম্ভ করিয়া ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত ভাষার একটি ছোট ব্যাকরণ প্রকাশ করেন। সত্য বটে, জেণ্টু কোড ও বাংলা ব্যাকরণ প্রণেতা নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড উইলকিন্সের পূর্ব্বেই সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন, এবং উইলকিন্স একথা তাঁহার ব্যাকরণের ভূমিকায় স্বীকারও করিয়াছেন। কিন্তু হালহেডের সংস্কৃতজ্ঞান মোটেই গভীর ছিল না। উইলকিন্স সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার সংস্কৃত মহাভারতের অপূর্ব্ব অনুবাদ এই জ্ঞানের ফল।

ভারতবর্ষের তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল বহুনিন্দিত ওয়ারেন হেষ্টিংসের কথা এখানে কিছু বলা আবশ্যক। তাঁহার রাষ্ট্র-জীবন যাহাই হউক, এ-দেশের ভাষা, সাহিত্য ও শিক্ষার উন্নতি কল্পে তিনি যে পরিমাণ উদার ও সহৃদয় দৃষ্টি দিয়াছিলেন, নিতান্ত অকৃতজ্ঞ না হইলে আমরা চিরদিন তাহা স্মরণ করিব। তিনিই সর্ব্বপ্রথম ইউরোপীয় পণ্ডিতদের দৃষ্টি ভারতের জ্ঞানভাণ্ডারের দিকে আকর্ষণ করেন। নিজের শিক্ষাদীক্ষা যাহাই হউক, তাঁহার দূরদৃষ্টি ছিল অসাধারণ। জয়গর্ব্বিত ইংরেজকে বিজিত জাতির শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি তিনিই সর্ব্বপ্রথম শ্রদ্ধাসম্পন্ন করিয়া তোলেন। তাঁহারই চেষ্টায় এ-দেশের সংস্কৃত ব্যবহার-শাস্ত্র ও রাষ্ট্রনীতি বিখ্যাত পণ্ডিতদের দ্বারা সঙ্কলিত হইয়া ফার্সী অনুবাদের মধ্য দিয়া হালহেড কর্তৃক 'জেণ্টু কোডে' রক্ষিত হয়। তিনিই উইলকিন্সকে দিয়া বাংলা হরফ প্রস্তুত করাইয়া হালহেডের বাংলা ব্যাকরণ মুদ্রিত করান; * কলিকাতা মাদ্রাসা তাঁহার ব্যক্তিগত ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্ত্তী কালে সার্ উইলিয়ম জোন্স, কোলব্রুক, অধ্যাপক উইলসন প্রভৃতি ব্যক্তিগত চেষ্টা ও এশিয়াটিক সোসাইটির সাহায্যে এ দেশের সংস্কৃতি-বিস্তারে যে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহার অনেকখানি কৃতিত্ব ওয়ারেন হেষ্টিংসের।

উইলকিন্সের মহাভারত-অনুবাদও হেষ্টিংসের উৎসাহের ফল। হেষ্টিংস স্বয়ং এই অনুবাদের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-অংশ ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর তারিখে বারাণসী হইতে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তদানীন্তন চেয়ারম্যান নাথানিয়েল স্মিথের নিকট প্রেরণ করিয়া কোম্পানীর ব্যয়ে তাহা মুদ্রণ ও বিতরণ করিতে অনুরোধ করেন। বাংলা-গদ্যের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত না হইলেও হেষ্টিংস ও চার্লস উইলকিন্সকে বুঝিবার জন্য এই প্রসঙ্গে লিখিত হেষ্টিংসের ঐতিহাসিক পত্রের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। মনে রাখিতে হইবে, ইউরোপে ভারতীয় জ্ঞানবিস্তারের ইহাই সূত্রপাত। হেষ্টিংস লিখিতেছেন—

Might I, an unlettered man, venture to prescribe bounds to the latitude of criticism, I should exclude, in estimating the merit of such a production, all rules drawn from the ancient or modern literature of Europe, all references to such sentiments or manners as are become the standards of propriety for opinion and action in our own modes of life, and equally all appeals to our revealed tenets of religion, and moral duty. I should exclude them, as by no means applicable to the language, sentiments, manners, or morality appertaining to a system of society with which we have been for ages unconnected, and

* "১৭৭৮ খ্রীঃ মিঃ এণ্ড্রুস নামক জনৈক ইংরেজ, হুগলী সহরে সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গলা মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন।...মিঃ হলহেড সাহেব সর্ব্বপ্রথমে 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' নামে গ্রন্থ রচনা করিয়া সেই মুদ্রাযন্ত্রে ছাপেন।"—'প্রচার', ফেব্রুয়ারি, ১৯০১।

of an antiquity preceding even the first efforts of civilization in our own quarter of the globe, which, in respect to the general diffusion and common participation of arts and sciences, may be now considered as one community . . . . .

Many passages will be found obscure, many will seem reduntant; others will be found clothed with ornaments of fancy unsuited to our taste, and some elevated to a track of sublimity into which our habits of judgment will find it difficult to pursue them; but few which will shock either our religious faith or moral sentiments . . . . the last sentence with which Kreeshna closes his instruction to Arjoon, and which is properly the conclusion of the Geeta: "Hath what I have been speaking, O Arjoon, been heard *with thy mind fixed to one point?* Is the *distraction* of thought, which arose from thy ignorance, removed?"

To those who have never been accustomed to this separation of the mind from the notices of the senses, it may not be easy to conceive by what means such a power is to be attained; since even the most studious men of our hemisphere will find it difficult so to restrain their attention but that it will wander to some object of present sense or recollection; and even the buzzing of a fly will sometimes have the power to disturb it. But if we are told that there have been men who were successively, for ages past, in the daily habit of abstracted contemplation, begun in the earliest period of youth, and continued in many to the maturity of age, each adding some portion of knowledge to the store accumulated by his predecessors; it is not assuming too much to conclude, that, as the mind ever gathers strength, like the body, by exercise, so in such an exercise it may in each have acquired the faculty to which they aspired, and that their collective studies may have led them to the discovery of new tracks and combinations of sentiment, totally different from the doctrines with which the learned of other nations are acquainted: doctrines, which however speculative and subtle, still, as they possess the advantage of being derived from a source so free from every adventitious mixture, may be equally founded in truth with the most simple of our own . . . . . I hesitate not to pronounce the Geeta a performance of great originality; of a sublimity of conception, reasoning, and diction, almost unequalled . . . . .

It now remains to say something of the Translator, Mr. Charles Wilkins. This Gentleman, to whose ingenuity, unaided by models for imitation, and by artists for his direction, your government is indebted for its printing-office, and for many official purposes to which it has been profitably applied, with an extent unknown in Europe, has united to an early and successful attainment of the Persian and Bengal languages, the study of the Sanskreet. To this he devoted himself with a perseverance of which there are few examples, and with a success which encouraged him to undertake the translation of the Mahabharat . . . . . he has at this time translated more than a third; . . . . he has rendered it with great accuracy and fidelity . . . . . .

I have always regarded the encouragement of every species of useful diligence, in the servants of the Company, as a duty appertaining to my office; and have severely regretted that I have possessed such scanty means of exercising it . . . . .

Nor is the cultivation of language and science, for such are the studies to which I allude, useful only in forming the moral character and habits of the service. *Every accumulation of knowledge, and especially such as is obtained by social communication with people over whom we exercise a dominion founded on the right of conquest, is useful to the state: it is the gain of humanity*: in the specific instance which I have stated, it attracts and conciliates distant affections; it lessens the weight of the chain by which the natives are held in subjection; and it imprints on the hearts of our own countrymen the sense and obligation of benevolence. Even in England, this effect of it

is greatly wanting. It is not very long since the inhabitants of India were considered by many, as creatures scarce elevated above the degree of savage life; nor, I fear, is that prejudice yet wholly eradicated, though surely abated. Every instance which brings their real character home to observation will impress us with a more generous sense of feeling for their natural rights, and teach us to estimate them by the measure of our own. But such instances can only be obtained in their writings : *and these will survive when the British dominion in India shall have long ceased to exist*, and when the sources which it once yielded of wealth and power are lost to remembrance . . . . .

I have seen an extract from a foreign work of great literary credit, in which my name is mentioned, with very undeserved applause, for an attempt to introduce the knowledge of Hindoo literature into the European world, by forcing or corrupting the religious consciences of the Pundits, or professors of their sacred doctrines. This reflexion was produced by the publication of Mr. Halhed's translation of the Poottee, or code of Hindoo laws; and is totally devoid of foundation. . . . . . It was contributed both cheerfully and gratuitously, by men of the most respectable characters for sanctity and learning in Bengal, who refused to accept more than the moderate daily subsistence of one rupee each, during the term that they were employed on the compilation; nor will it much redound to my credit, when I add, that they have yet received no other reward for their meritorious labors. Very natural causes may be ascribed for their reluctance to communicate the mysteries of their learning to strangers, as those to whom they have been for some centuries in subjection, never enquired into them, but to turn their religion into derision, or deduce from them arguments to support the intolerant principles of their own . . . . .

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতির মধ্যে ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের প্রথম গবেষণার প্ররোচনা লুক্কায়িত আছে। এ বিষয়ে ওয়ারেন হেষ্টিংসের কীর্ত্তি কাহারও অপেক্ষা কম নয়।

হেষ্টিংসের সুপারিশে উইলকিন্স-অনূদিত *The Bhagvat-Geeta, or Dialogues of Kreeshna and Arjoon* কোম্পানীর ব্যয়ে বিলাতে মুদ্রিত হইয়া ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ মে প্রকাশিত হয়। ওয়ারেন হেষ্টিংসের নামে উৎসর্গপত্রে উইলকিন্স বলেন,

The world, Sir, is so well acquainted with your boundless patronage in general, and of the personal encouragement you have constantly given to my fell-servants in particular, to render themselves more capable of performing their duty in the various branches of commerce, revenue, and policy, by the study of the languages, with the laws and customs of the natives, that it must deem the first fruit of every genius you have raised a tribute justly due to the source from which it sprang.

এই গীতাই ইউরোপীয়গণ কর্ত্তৃক ভারতীয় কাব্যগ্রন্থের সর্ব্বপ্রথম অনুবাদ;

"The effect which this little work, of only 156 pages, including notes, produced upon the literary public in England and throughout Europe, was electrical. All hailed its appearance as the dawn of that brilliant light, which has subsequently shone with so much lustre in the productions of Sir William Jones, Mr. Colebrooke, Professor Wilson, etc., and which has dispelled the darkness in which the pedantry of Greek and Hebrew Scholars had involved the etymology of the languages of Europe and Asia." *The Asiatic Journal*, July 1836, p. 166.

এই অধ্যায় এমন বিস্তৃতভাবে লিখিবার কারণ এই যে, হেষ্টিংস-হালহেড-উইলকিন্স-

জোন্স-সম্প্রদায় ভারতবর্ষের সহিত ইউরোপের সংস্কৃতিগত ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত করিলেও নিজেরা শুধু দিতে ও শিখাইতে আসেন নাই; শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতে ও শিখিতে আসিয়াছিলেন। একটা বর্ব্বর অসভ্য জাতিকে অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাইবার দম্ভ তাঁহাদের ছিল না; তাঁহারা সশ্রদ্ধ অন্তঃকরণে বিনীতভাবে আত্মীয় হস্ত প্রসারণ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে যে মিশনরী সম্প্রদায়ের কল্যাণে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তাঁহারা বিপরীত মনোভাব লইয়া এদেশে আসিয়াছিলেন; ধর্ম্মহীনকে ধর্ম্ম শিখাইতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ-প্রচারের প্রয়োজন আমাদের সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রয়োজন সাধন করিয়াছে, শাপে বর হইয়াছে। ইঁহাদের নামও শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবার কালে আমরা যেন তাঁহাদের পূর্ব্বগামীদের অপরূপ সহৃদয়তা ও মহাপ্রাণতার কথা বিস্মৃত না হই।

বঙ্গদেশে অবস্থানকালে উইলকিন্স প্রাচ্য ভাষায় গ্রন্থমুদ্রণ-সমস্যা দূর করিতে চেষ্টিত হন, ফলে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বাংলা হরফ প্রস্তুত করিতে সক্ষম হন। তিনি সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রণের জন্য নাগরী হরফও প্রস্তুত করিয়াছিলেন; এই সময়ে তিনি যে ফার্সী হরফ তৈয়ারী করেন, তাহা অনেক পরে ছাপার কাজে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং উইলকিন্সকে ভারতের ক্যাক্সটন বলিলে অন্যায় হইবে না।

সার্ উইলিয়ম জোন্স সুপ্রীম কোর্টের বিচারকরূপে ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশে আসেন। উইলকিন্সের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি দীর্ঘকাল পরে আবার প্রাচ্য ভাষার চর্চ্চা শুরু করেন। উইলকিন্স এই সময়ে মনুস্মৃতির দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রথম চার অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত করিয়াছিলেন। জোন্স উৎসাহিত হইয়া মনু-অনুবাদের ভার নিজে লইতে চাহেন, উইলকিন্স আশ্চর্য্য উদারতার সহিত স্বকৃত অনুবাদ সহ অনুবাদের দায়িত্ব জোন্সকে অর্পণ করেন। ইহার ফলেই জোন্সের *Institutes of Hindu Law*। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহারা উভয়ে মিলিয়া এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের প্রতিষ্ঠা করেন।

দীর্ঘ ১৬ বৎসর কাল এদেশে থাকিয়া উইলকিন্সের স্বাস্থ্যহানি ঘটে; তিনি স্বাস্থ্য-কামনায় ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন ও বাথে (Bath) অবস্থান করেন। এখান হইতেই ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি Fables of Pilpay বা সংস্কৃত হিতোপদেশের অনুবাদ প্রকাশ করেন। পরে তিনি কেণ্টে একটি বাড়ী খরিদ করিয়া সেখানেই বসবাস করিতে থাকেন। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে অগ্নিদাহে এই গৃহ ভস্মীভূত হয়। ইহাতে তাঁহার পুস্তক ও পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের আংশিক ক্ষতি হয়, কিন্তু স্বহস্তনির্ম্মিত হরফ, পাঞ্চ ও ম্যাট্রিক্সগুলি একেবারে নষ্ট হইয়া যায়।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে উইলকিন্স ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান নিযুক্ত হন। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মে তারিখে মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি এই কাজেই নিয়োজিত ছিলেন। ১৮০৫ সালে ভারতীয় সিভিলিয়ানদের জন্য হেলিবেরিতে

কলেজ স্থাপিত হইলে উইলকিন্স তাহার প্রাচ্য বিভাগের দর্শক নিযুক্ত হন। এই সময়ের মধ্যে (১৮০০-৩৬) তিনি নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি সঙ্কলন বা সম্পাদন করিয়াছিলেন—

Richardson's *Persian, Arabic and English Dictionary*, new edition Vol. I, 1806.
Richardson's *Persian, Arabic and English Dictionary*. new edition Vol. II, 1810.
Sanskrit Grammar, 1808.
Radicals of the Sanskrit Language,* 1815.
Dushmanta and *Sakoontala* (Dalrymple's Oriental Repertory).
Translation of the *Mahabharata* (A portion, in the Annals of Oriental Literature).

এতদ্ব্যতীত *Asiatick Researches*-এর কয়েক সংখ্যায় তাঁহার কয়েকটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছিল।

উইলকিন্স রয়াল সোসাইটির ফেলো হইয়াছিলেন। ইনষ্টিটিউট অব ফ্রান্সও তাঁহাকে এক জন "ফরেন অ্যাসোসিয়েট" নির্ব্বাচিত করেন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নাইটহুড প্রাপ্ত হন।

চার্লস উইলকিন্স সম্বন্ধে যাঁহারা বিস্তৃততর বিবরণ চান, তাঁহাদিগকে নিম্নলিখিত পুস্তক ও প্রবন্ধ পড়িতে বলি—

(1) *The Library of the India Office* by A. J. Arberry (1938), pp. 13-56
(2) *The Asiatic Journal* for July, 1836, pp. 165-70. "Sir Charles Wilkins."

এই প্রবন্ধে রচয়িতার নাম না থাকিলেও ইহা বিখ্যাত প্রাচ্য-ভাষাবিৎ সার্ গ্রেভস চামনি হটনের রচনা বলিয়া জানা যায়।

জন টমাস

"খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করা যদিও ঐ সাহেবদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, তথাপি তৎপ্রসঙ্গে তাঁহাদিগের দ্বারা বাঙ্গালাভাষার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। যেরূপ চৈতন্যসাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবদিগের দ্বারা বাঙ্গালাপদ্যরচনার উন্নতি হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, সেইরূপ খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী পাদরী সাহেবদিগের দ্বারাই বাঙ্গালাগদ্যরচনা সমধিক অনুশীলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।"—রামগতি ন্যায়রত্ন, 'বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব,' ১ম সংস্করণ, সংবৎ ১৯৩০, পৃ. ২০২।

এই সাহেবদিগের অগ্রণী ছিলেন জন টমাস। ইনিই বঙ্গদেশে প্রথম ব্যাপটিষ্ট পাদরি। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে পোর্ত্তুগীজ রোমান কাথলিকদের ধর্ম্ম-প্রচারের উৎসাহে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে উপকার হইয়াছিল, পূর্ব্বে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। পলাশী-যুদ্ধের পূর্ব্বেই পোর্ত্তুগীজ প্রভাব সম্পূর্ণ হ্রাস পাইয়াছিল, বর্ব্বর 'নেটিব'-দিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য নূতন কোন পাদরি-সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে নাই। পলাশী-যুদ্ধের অব্যবহিত পরে ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইভ ট্রাঙ্কেবার মিশনের ডেনিশ পাদরি

* A fragment of a Sanskrit vocabulary by Wilkins is preserved in MSS. Eur. D. 130 (India office).

কিয়ারনাণ্ডারকে বাংলা দেশে ধর্ম্মপ্রচারের জন্ম আনাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কিয়ারনাণ্ডারের সহিত দেশীয় সম্প্রদায়ের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বিশেষ যোগ ছিল না, তিনি মূলতঃ পোর্ত্তুগীজ, আর্মেনিয়ান ও ফিরিঙ্গিদের মধ্যে ধর্ম্ম ও শিক্ষা বিস্তরণ করিতেন। কলিকাতা মিশন স্কুল ও মিশন চার্চের প্রতিষ্ঠাতা কিয়ারনাণ্ডার যদিও ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, ধর্ম্মযাজক হিসাবে জীবনের শেষ কুড়ি বৎসর তাঁহার প্রতিষ্ঠা প্রায় লুপ্ত হইয়াছিল, তিনি ব্যক্তিগত নানা দৌর্ব্বল্যদোষে চরম দারিদ্র্যদশায় পতিত হন ও নানা লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া কলিকাতা হইতে ব্যাণ্ডেলে গিয়া বসবাস করিতে থাকেন।

এই সময়ে কলিকাতায় চার্লস গ্রাণ্টের বিশেষ প্রতিপত্তি। তিনি ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে সামরিক বিভাগে চাকুরি লইয়া সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষে আগমন করেন, কিন্তু শীঘ্রই স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। পুনরায় ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বেঙ্গল এষ্টাব্লিশমেণ্টের এক জন রাইটাররূপে বাংলা দেশে আসেন এবং ধীরে ধীরে উন্নতি করিয়া কোম্পানীর বোর্ড অব ডিরেক্টর্সের চেয়ারম্যান হন। পর পর কয়েকটি পারিবারিক দুর্ঘটনায় এই প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির শোকার্ত্ত মন ধর্ম্মের আশ্রয়ের জন্য লালায়িত হইয়া উঠে, কলিকাতায় ইংরেজ-সমাজে খ্রীষ্টমহিমা প্রতিষ্ঠার জন্ম তিনি চেষ্টিত হন। দেনার দায়ে যখন কিয়ারনাণ্ডারের সম্পত্তি নিলামে উঠে, চার্লস গ্রাণ্ট দশ হাজার টাকা দিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন। গ্রাণ্টের সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী, শাশুড়ী মিসেস্ ফ্রেজার ও ভগিনী থাকিতেন। কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের মধ্যে তখন চেম্বার্স ভ্রাতৃদ্বয়ের (উইলিয়ম ও রবার্ট) বিশেষ প্রতিপত্তি। উইলিয়ম চেম্বার্স গ্রাণ্টের ভগিনীকে বিবাহ করেন। ডেভিড ব্রাউন ও জর্জ উড্‌নি প্রভৃতিও এই গ্রাণ্ট-গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে গ্রাণ্ট কোম্পানীর মালদহের কুঠির কমার্সিয়াল-রেসিডেণ্ট পদে নিযুক্ত হন। গ্রাণ্ট যখন মালদহ হইতে পুনরায় কলিকাতায় আসেন তখন জর্জ উড্‌নিকে তাঁহার পদে বাহাল করা হয়। এই জর্জ উড্‌নির সহিত বাংলা সাহিত্যের পরোক্ষ যোগ আছে। তাঁহারই চেষ্টায় জন টমাস ও উইলিয়ম কেরী পরে যথাক্রমে মহীপালদীঘি ও মদনাবতীর কুঠির অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

গ্রাণ্টের ভগিনীপতি উইলিয়ম চেম্বার্স সুপ্রীম কোর্টের ফার্সী ইণ্টারপ্রিটার বা দোভাষী ছিলেন, ফার্সী ভাষায় তাঁহার অসাধারণ দখল ছিল। বাংলা সাহিত্যের প্রথম গদ্যলেখক রামরাম বসু উইলিয়ম চেম্বার্সের মুন্‌শী ছিলেন। চেম্বার্স নিউ টেষ্টামেণ্টের ফার্সী অনুবাদ করিতে মনস্থ করেন। কথা ছিল, রামরাম বসু ফার্সী হইতে বাংলায় অনুবাদ করিবেন। চেম্বার্সের মতলব কিন্তু কার্য্যে পরিণত হয় নাই। দীর্ঘ সাত বৎসরের চেষ্টায় সেণ্ট ম্যাথুর ১৩ অধ্যায় মাত্র অনূদিত হইয়াছিল। এই অনুবাদের কিয়দংশ গ্ল্যাডউইনের 'পার্সিয়ান মুন্‌শী' পুস্তকের শেষে মুদ্রিত হইয়াছিল।

জন টমাস ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা দেশে পদার্পণ করেন। ইংলণ্ডের গ্লষ্টারশায়ারের

ফেয়ারফোর্ডে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মে তারিখে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার আত্মজীবনীতে আছে—

My father is deacon of a Baptist Church at *Fairford*, in *Gloucestershire.* He trained me up in the nurture and admonition of the Lord; but I proved for a long time a hopeless child. Very sharp convictions were often felt and repeatedly stifled, till it pleased God to make my sins a heavy burden to me, in the year 1781. I had lately married and my nights and days were dreadful both to me and my wife......At the time mentioned I was settled in Great Newport-street, in the practice of Surgery and Midwifery: but finding the world more ready to receive credit than give it, I was obliged to sell all, and wait in lodgings, till an offer was made me of going to sea: and in the year 1783, I sailed in capacity of *Surgeon* of the *Oxford* Indiaman to Bengal. On my arrival at Calcutta, I sought for religious people, but found none.

ধর্ম্ম ও নীতি-বিজ্ঞানের দিক্ দিয়া কলিকাতার ইংরেজ সমাজ তখন সাতিশয় দুর্দ্দশাগ্রস্ত; স্ত্রীলোক, ডুয়েল, মদ ও জুয়ার মোহে তাঁহারা হিতাহিতজ্ঞানশূন্য; দেনার দায়ে দেশীয় পোদ্দার ও ধনীদের নিকট তাঁহাদের টিকি বাঁধা। ফলে তাঁহারা কালীঘাটে পূজা দিতেছেন ও হিন্দু পূজাপার্ব্বণে অবাধে যোগদান করিতেছেন। ভগবান ও ডেভিলের নাম একই নিশ্বাসে উচ্চারণ করিয়া কথায় কথায় বাজি রাখিতে ও কটূক্তি করিতে তাঁহারা দ্বিধা করেন না। মর্ম্মাহত টমাস ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নবেম্বর 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ করিলেন—

RELIGIOUS SOCIETY.

"A plan is now forming for the more effectually spreading the knowledge of Jesus Christ, and His glorious Gospel, in and about *Bengal*: any serious persons of any denomination, rich or poor, high or low, who would heartily approve of, join in, or gladly forward such an undertaking, are hereby invited to give a small testimony of their inclination, that they may enjoy the satisfaction of forming a communion, the most useful, the most comfortable, and the most exalted, in the world. Direct for A. B. C. to be left with the Editor."

পরদিন টমাস এই বিজ্ঞাপনের দুইটি জবাব পান। একটির লেখক কলিকাতা প্রেসিডেন্সী চার্চের তৎকালীন চ্যাপলেন রেভারেণ্ড ডব্লিউ. জনসন, অপরটি বেনামী। পরে জানা যায় উইলিয়াম চেম্বার্স ইহা লিখিয়াছিলেন। চেম্বার্সের জবাবটি এইরূপ—

"If A. B. C. will open a subscription for a translation of the New Testament into the *Persian* and *Moorish languages* (under the direction of proper persons), he will meet with every assistance he can desire, and a competent number of subscribers to defray the expense."

প্রকৃতপক্ষে বাংলা দেশে ব্যাপটিষ্ট মিশনের বীজ তখনই উপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু অঙ্কুরোদ্গম হয় নাই। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ তারিখে আর্ল অব অক্সফোর্ড জাহাজ-যোগেই টমাস স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, কিন্তু তৎপূর্ব্বে তিনি মালদহের রেসিডেন্ট চার্লস গ্রান্টের অসাধারণ ধর্ম্মপ্রীতির কথা শুনিয়া যান। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মার্চ আর্ল অব অক্সফোর্ড জাহাজ পুনরায় ভারতবর্ষের দিকে রওয়ানা হয়, টমাস সেই জাহাজেই ফিরিয়া আসেন ও ১৪ই জুলাই

তারিখে বাংলা দেশে পৌঁছান। অক্সফোর্ড জাহাজের চাকুরি তিনি তখনও ছাড়েন নাই। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি 'A Word of Comfort and Encouragement to the Poor Afflicted People of God' নামক একটি পুস্তিকা মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করেন। সেই বৎসরেই কিয়ারনাণ্ডারের সম্পূর্ণ পতন হইয়াছে, রেভারেণ্ড ডেভিড ব্রাউন কলিকাতা অরফ্যান স্কুলের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। টমাস এই সময়েই জর্জ উড্‌নি, উইলিয়াম চেম্বার্স প্রভৃতি গ্রাণ্টের ধর্ম্মপ্রাণ আত্মীয়দের সহিত পরিচিত হন। তাঁহারা সকলে মিলিয়া ডেভিড ব্রাউনের যাজকতা শুনিতে যাইতেন এবং মাঝে মাঝে নিজেরাও উপাসনা করিতে বসিতেন। ঠিক এই সময়ে চার্লস গ্রাণ্ট মালদহ হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসাতে ইঁহাদের শক্তি ও দল বৃদ্ধি হয়। গ্রাণ্টের বাড়ীতেই প্রত্যহ সন্ধ্যায় ইঁহারা মিলিত হইতেন। চার্লস গ্রাণ্ট টমাসকে জাহাজের চাকুরি পরিত্যাগ করিয়া এদেশে বসবাস করিতে এবং বাংলা ভাষা শিখিয়া হিন্দুদের মধ্যে 'গসপেল' প্রচার করিতে অনুরোধ করিলেন। এ-দেশের জলবায়ু টমাসের মোটেই সহ্য হইত না, তাছাড়া জাহাজের কাজ পরিত্যাগ করারও বাধা ছিল। তথাপি তিনি কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণের চিন্তায় তিন চার সপ্তাহ নিদারুণ উদ্বেগের মধ্যে কাটাইয়া শেষ পর্য্যন্ত ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে অক্সফোর্ড জাহাজের চিকিৎসকের কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণভাবে ভগবানের কাজে আত্মসমর্পণ করিলেন।* ডাক্তার জন টমাস পাদ্রি টমাস হইলেন।

টমাস ও রামরাম বসু

নূতন কাজের গোড়াতেই টমাস বাংলা ভাষা এবং দেশীয় লোকের মধ্যে প্রচলিত ধর্ম্ম ও শাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন। সাধারণ লোকের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার শেখাও আবশ্যক হইল। কিন্তু ভাষার বাধাই প্রধান। চার্লস গ্রাণ্ট ঠিক করিলেন, কিছু পরিমাণ ভাষা শিখিয়াই টমাস মালদহে কালা আদ্‌মিদের মধ্যে প্রচার-কার্য্য চালাইবেন।† হালহেডের বাংলা ব্যাকরণ এক খণ্ড সংগ্রহ করিয়া টমাস শিক্ষা সুরু করিলেন। কিন্তু কাজ কিছুই অগ্রসর হইল না। টমাস বুঝিতে পারিলেন, গুরু ছাড়া ভাষা শিক্ষা অসম্ভব। তিনি চার্লস গ্রাণ্টকে জানাইলেন। গ্রাণ্ট ভগিনীপতি উইলিয়ম

* "....after a few weeks I became greatly concerned at heart for the condition of these perishing multitude of Pagans, in the darkness; and was inflamed with fervent desires to go and declare the glory of Christ among them. Waters enough have risen since to damp, but will never utterly extinguish what was lighted up at that time. After much prayer and many tears, I gave myself up to this work, and the Lord removed difficulties out of the way......" *Periodical Accounts Relative to the Baptist Missionary Society*, Vol. I. p. 18.

† ". . . to teach to the black fellows at Malda." *The Life of John Thomas* by C. B. Lewis. p. 64.

চেম্বার্সের শরণাপন্ন হইলেন। চেম্বার্সের কাছে থাকিয়া তাঁহার মুন্সী রামরাম বসু অত দিনে ইংরেজী বলিতে কহিতে শিখিয়াছেন, কিন্তু লিখিতে পড়িতে শিখেন নাই। মহত্তর উদ্দেশ্যে চেম্বার্স নিজের মুন্সীকেই দান করিলেন। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই মার্চ তারিখে জন টমাস ও রামরাম বসুর যোগাযোগ ঘটিল। আধুনিক বাংলা গদ্যসাহিত্যের ভিত্তিপত্তন হইল।†

কলিকাতায় তিন মাস মুন্সী রামরাম বসুর নিকট বাংলা ভাষা ও হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে গুরুশিষ্য উভয়েই মালদহ পৌছিলেন। চার্লস গ্রাণ্টের স্থলে জর্জ উড্‌নি তখন মালদহ কুঠির কমার্সিয়াল-রেসিডেণ্ট হইয়াছেন। টমাস ও মুন্সী উড্‌নির আশ্রয়ে মালদহে বসবাস করিতে লাগিলেন। বৎসর কালের মধ্যে টমাস বাংলা যাহা শিখিলেন, তাহার একটিমাত্র পংক্তির নমুনা আমরা পাইয়াছি—

গোনার মাহিনা মির্ত্তু কিন্তু খোদার দিয়া চির প্রমাই জিজছ ক্রাইষ্ট হইতে। এই মির্ত্তু এখন অবধ, তখন [এপ্রিল, ১৭৮৮]*

টমাস অবশ্য এই কালের মধ্যে রামরাম বসুর সাহায্যে ম্যাথু, মার্ক, জেম্‌স প্রভৃতির গস্‌পেল বাংলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন; পরবর্ত্তী কালের কেরীর অনুবাদের মধ্যে সেগুলি বিলুপ্ত হইয়াছে, এখন চিনিয়া বাহির করিবার উপায় নাই।

এ দেশের শাস্ত্র ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে টমাস যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিজের ভাষাতেই উদ্ধৃত করিতেছি—

"There are four *Shasters*, or laws, among the Hindus, which they call the Vedas; these they hold in the highest esteem, and say it is unlawful for any man to read or hear them read, except he is a *Bramin*. The Vedas are said to have been written many millions of years ago, which however, is easily disproved by other books and writings in use among themselves. These Vedas are written in *Sanscrit*, which may be called the Latin of the East, and they are the fountain of all their books of theology, as the Koran among the Moors, and the Bible among us. There are eighteen sacred books called *Poorans*, which are all commentaries on the Vedas: and it is the custom of all the *Bramins* to learn a great part of these by heart, and they are very apt and clever in quoting portions of them in conversation: this they find the more easy to them, as all their books are written in verse.....Some of these books hold up for their veneration characters which are very profligate, and contain dreadful doctrines, evidently of an infernal origin, which have a strange effect on their minds and manners....But I can truly say, whenever I have been conversing or preaching among them, I have invariably found them willing to hear, and that they always behave with great decency and respect. I trust also that the door of faith is opened to the Hindoos......"

—Rippon's Baptist Register, No. V.

বাংলা ভাষা শিক্ষা এবং হিন্দুজাতি সম্পর্কে অন্যত্র টমাস বলিতেছেন—

"As to the learning of the language, it is a work attended with difficulties, but when the wholetime is devoted to it, three or four months will bring a man through the

* "Now the wages of sin is death . . . But the gift of God is eternal life through Jesus Christ Our Lord."

greatest of them; and he will begin to converse with the natives, with great amusement and pleasure to himself, and profit to them. And as to the barbarity of these people, it is not with them as it is with other Pagans, of whom we have read and heard: for the Hindoos are certainly distinguished from all people on the face of the earth, for their harmless and inoffensive behaviour; and the province of *Bengal*, and its inhabitants, are proverbially distinguished from all other parts of *India*, for their gentleness of manners, and harmless behaviour to their enemies, as well as their friends. I have known among them, men of considerable power and authority, who were highly offended with me, because they imagined my work affected their interests: but I lived within a mile of them, in a lonely house, with my windows and doors wide open all night, without a sword or fire-arms, and free from the smallest apprehension of danger."

—Periodical Accounts, Vol. I. p. 31.

কিন্তু টমাসের মনে ধর্ম্মপ্রচারের উৎসাহ ও উত্তেজনা যতখানিই থাকুক, কাজে তিনি কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার মুন্শী রামরাম বসু ও পার্ব্বতী নামীয় এক জন ব্রাহ্মণ তাঁহার ধর্ম্মোন্মাদনার সুযোগ লইয়া তাঁহাকে নানা মিথ্যা আশ্বাস দিয়া দোহন করিতে থাকেন; দীর্ঘ পাঁচ বৎসরে তিনি এক জন হিন্দুকেও ধর্ম্ম বা জাতিচ্যুত করিতে সক্ষম হন নাই। এই পাঁচ বৎসরে রামরাম বসুর সহিত তাঁহার সম্পর্কের সংক্ষিপ্ত বিবরণী শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র (দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা—৩) ভূমিকায় দেওয়া আছে। ভগ্নহৃদয় টমাস ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে মালদহ পরিত্যাগ করিয়া "হিন্দু অক্সফোর্ড" নবদ্বীপ হইয়া কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

টমাসের স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন

এই দীর্ঘকাল চার্লস গ্রাণ্ট তাঁহাকে অর্থসাহায্য করিতেছিলেন। খ্রীষ্টধর্ম্ম কত দূর বিস্তৃত হইল ইহা জানিতে চাহিয়া গ্রাণ্ট মাঝে মাঝে তাঁহাকে তাগাদা করিতেন; টমাস নানা স্তোকবাক্যে তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার নিজের মনেও বরাবর বিশ্বাস ছিল তিনি অন্ততঃ রামরাম বসু ও পার্ব্বতীকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনিতে পারিবেন। শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার এই বিশ্বাস ভাঙিয়া যায়। তা ছাড়া ধর্ম্মভাব তাঁহার যতই থাকুক তিনি নিতান্ত দুর্ব্বল চরিত্রের লোক ছিলেন; আয়ের অধিক ব্যয় করিতেন, এবং মাঝে মাঝে প্রলোভনে পড়িয়া জুয়া খেলিতেন। তাহাতে তিনি বারম্বার ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন। উড্‌নি সাহেব কয়েক বার তাঁহাকে রক্ষা করেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত চার্লস গ্রাণ্ট টমাস-চরিত্রের এই দুর্ব্বলতার কথা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করেন এবং ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৩এ ফেব্রুয়ারি তারিখে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করেন। উড্‌নি টমাসকে চাপ দিতে থাকেন। ঋণগ্রস্ত এবং লাঞ্ছিত টমাস অক্টোবর হইতে ১০ই ডিসেম্বর (১৭৯১) পর্য্যন্ত নবদ্বীপে থাকিয়া পদ্মলোচন পণ্ডিতের নিকট মুগ্ধবোধের পাঠ অসমাপ্ত রাখিয়াই কলিকাতা ফিরিয়া আসেন। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারি তারিখে টমাস তাঁহার পিতার নিকট এক পত্রে লেখেন "ম্যাথু এবং মার্কের বাংলা অনুবাদ শেষ করিয়াছি।" ঐ বৎসরের

সেপ্টেম্বর মাসে টমাস তাঁহার অনুবাদ সহ কৃষ্ণনগরে সার্ উইলিয়ম জোন্সের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে রামরাম বসু তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। জোন্স টমাসকে বিশেষ উৎসাহ দিয়াছিলেন এবং অনুবাদ মুদ্রিত হইলে ৪৮০ টাকায় ত্রিশ কপির গ্রাহক হইতে রাজী হইয়াছিলেন। টমাস সার্ উইলিয়মকে তাঁহার অনুবাদের পাণ্ডুলিপি দিয়া এই অনুরোধ জানাইয়াছিলেন, তিনি যেন লর্ড কর্ণওয়ালিসের নিকট অনুবাদের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে একটু সুপারিশ করেন। সার্ উইলিয়ম তখন বাংলা ভাষায় তাঁহার অজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছিলেন। টমাস ইহাতে না দমিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার ধর্ম্মগ্রন্থ অনুবাদের এক অনুষ্ঠানপত্র ছাপাইয়া বিলি করেন। টমাসের জর্ণাল হইতে জানা যায়—

The projected work was "to consist of seven parts. (1) Promises and Prophecies, (2) Matthew, (3) Mark, (4) Texts and Precepts of the New Testament, for Newness of Life, (5) The Ten Commandments, and a dissertation on Scripture in general, (6) An explanation of the three first chapters of Matthew, (7) A Glossary." The Price of the book was to be a gold mohur, or Rs. 16. per copy, to Europeans; and the natives were to receive it gratis.

টমাসের এই স্বপ্ন এই যাত্রায় সফল হয় নাই। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

THE PARTICULAR BAPTIST SOCIETY FOR PROPAGATING THE GOSPEL AMONGST THE HEATHEN.

উপরি-উক্ত সমিতির সম্ভাবনার কথা উইলিয়ম কেরী নামক এক জন তন্তুবায়-পুত্রের মনে সর্ব্বপ্রথম উদিত হয়। তাঁহার বিরাট্ জীবন ও কীর্ত্তি আমাদের স্বতন্ত্র অধ্যায়ের বিষয় হইলেও টমাসের কাহিনী অনুসরণ করিয়া এখানেই তাঁহার সহিত আমাদের প্রথম পরিচয় হইতেছে। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মুলটনে আসিয়া বসবাস করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার মনে হিদেনদের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচারের বাসনা জাগে। এখানেই তিনি "An Enquiry into the Obligations of Christians to use means for the conversion of the Heathen" নামক বিখ্যাত পুস্তক রচনা করেন—এই পুস্তক ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হয়। এই উদ্দেশ্য মনে মনে পোষণ করিয়া তিনি বহুকাল যাবৎ নানা ভৌগোলিক জ্ঞান সঞ্চয় করিতেছিলেন। তাঁহার বাসনা উত্তরোত্তর প্রবল হইতে থাকে এবং ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে নরদামটনশায়ারের ক্লিপষ্টোনে অনুষ্ঠিত একটি সভায় সাট্‌ক্লিফ ও ফুলারের উপস্থিতিতে কেরী প্রশ্ন করেন, "হিদেন-জগতে গসপেল প্রচার সম্ভব কিনা এবং সম্ভব হইলে তাহা করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য কিনা।" ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের ৩১এ মে তারিখে নটিংহামে এ-বিষয়ে আলোচনার জন্য পুনরায় সভা আহূত হয়। কেরী বক্তৃতা করেন; দুটি বিষয়ের তিনি বিশদ ব্যাখ্যা করেন

(১) That we should expect great things ও (২) that we should *attempt* great things. বক্তৃতার শেষে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়—"That a plan be prepared against the next ministers' meeting at *Kettering* for forming a society among the Baptists for propagating the Gospel among the

Heathen"। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর কেটারিঙের এই ঐতিহাসিক সভা বসে। সভায় সমিতি-গঠনের প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন—John Ryland, Reynold Hogg, John Sutcliffe, A. Fuller, W. Carey, Abraham Greenwood, Edward Sharman, Joshua Burton, Samuel Pearce, Thomas Blundell, Wm. Heighton, John Eayres, ও Joseph Timms। রাইলাণ্ড, হগ, কেরী, সাটক্লিফ ও ফুলারের উপর সমিতি এই উদ্দেশ্যে যাবতীয় কর্ত্তব্য সাধনের অনুমতি দিয়া রাখেন। এই সভাই ব্যাপটিষ্ট মিশনরী সমিতির প্রথম সভা। দ্বিতীয় সভা বসে ১৭৯২, ৩১শে অক্টোবর। ১৩ই নবেম্বর নরদামটনের প্রাইমারি সমিতির সভায় কেরী উপস্থিত হইতে পারেন নাই। একটি পত্রে তিনি সমিতিকে বঙ্গদেশীয় মিশনরী জন টমাসের কথা জানান। টমাসের সহিত তাঁহার ইতিমধ্যেই পরিচয় হইয়াছিল এবং টমাস তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথম বাংলা দেশে তাঁহাদের প্রচারকার্য্য চালাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। টমাস বলেন, তিনি নিজেও বাংলা দেশে প্রচার-কার্য্যের সুবিধার জন্ম লণ্ডনে চাঁদা সংগ্রহ করিতেছেন; এক জন সঙ্গী পাইলে তিনি বাংলা দেশে প্রচারের ভার লইতে রাজি আছেন। কেরীর পত্রের শেষে ছিল—

"The reason for my writing is a thought, that his fund for *Bengal* may interfere with our larger plan; and whether it would not be worthy of the Society, to try to make that and ours unite into one fund, for the purpose of sending the Gospel to the Heathen indefinitely."

কেরীর পত্র পঠিত হইলে সমিতি জন টমাস সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করিতে মনস্থ করেন। সমিতির সম্পাদকের উপর এই বিষয়ের ভার অর্পিত হয়। টমাসকে তাঁহার নিজের জীবন ও বাংলা দেশে তাঁহার কীর্ত্তি সম্পর্কে একটি বিবরণী দাখিল করিতে বলা হয়। তাহাতে সমস্ত ব্যাপার বিশদ ভাবে বিবৃত করিয়া সর্ব্বশেষে টমাস লেখেন—

"In the year 1787, I began to learn to speak and write the *Bengalee.* Till the month of June or July of this year, I was engaged at Calcutta, and preached to a few Europeans there. In 1788, I could *converse* freely with the natives, especially with those I was well acquainted with. In 1789, I began to find that my pronunciation was generally very defective, and consequently my preaching, for the most part, could not be understood: I had also begun to translate. I remained there the second time, from the middle of 1786, till the end of 1791; but had no thoughts of staying there till about the beginning of 1787, nor did I sit down to the work till about the middle of that year: so all the time spent among them was five years and a half;....Considering this, and the difficulties that must necessarily occur to the first adventurer, (for they have no dictionary, vocabulary, nor printed books to assist one, as in European countries); I say, considering these things, the time may be reckoned but two or three years; and I doubt not but a person of a moderate capacity may attain, in that time, as much knowledge of the language as I have; and I can now express myself in *prayer, preaching* and conversation, comfortably to myself, and so as to be understood by others."

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি কেটারিঙে সমিতির অধিবেশনে 'টমাস-অনুসন্ধানে'র ফল বিবৃত হইল; সমিতি ইহা সন্তোষজনক বিবেচনা করাতে মিঃ টমাসকে সমিতির পক্ষে

বাংলা দেশে প্রচারকার্য্য পরিচালনের অনুরোধ জ্ঞাপন করার প্রস্তাব হইল। টমাস যদি রাজি থাকেন তাহা হইলে তাঁহার সঙ্গী কে হইবেন, পূর্ব্বাহ্ণেই তাহা স্থির করিবার কথা উঠিল। উইলিয়ম কেরী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া জন টমাসের সহকর্ম্মীরূপে নিজের নাম প্রস্তাব করিলেন। সেই দিন অপরাহ্ণে টমাস স্বয়ং কেটারিঙে উপস্থিত হইয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। রামরাম বসু ও পার্ব্বতী ব্রাহ্মণ টমাসের হাতে রেভারেণ্ড 'এম'-এর নিকট যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন সমিতি হইতে এই মর্ম্মে তাহার জবাব লেখা হইল যে, ভগবান্ হিন্দুদের উপর প্রসন্ন হইয়াছেন; তাঁহার দুই জন সেবক সেই দেশে তাঁহার বাণী প্রচারার্থ যাইতেছেন। রামরাম বসু, পার্ব্বতী ও তাঁহাদের বন্ধুগণ যেন অবিলম্বে ব্যাপটাইজড হইয়া খ্রীষ্টের শরণাপন্ন হন।

এই পত্র এবং প্রভূত আশা লইয়া উইলিয়ম কেরী সপরিবারে এবং টমাস একাকী ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জুন তারিখে ক্যাপ্টেন ক্রিসমাসের অধীনে পরিচালিত ডেনিশ ইণ্ডিয়াম্যান 'প্রিন্সেস মারিয়া'-(Kron Princesse Marie) যোগে বঙ্গদেশ যাত্রা করিলেন।

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নবেম্বর তারিখে কেরী ও টমাস কলিকাতায় পৌঁছিলেন; রামরাম বসু তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। টমাসের আরব্ধ কার্য্য কেরী নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করিলেন। এখন হইতে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর তারিখে দিনাজপুরে মৃত্যু পর্য্যন্ত জন টমাস কেরীর ছায়া-স্বরূপ জীবিত ছিলেন; কেরীর প্রসঙ্গে তাঁহারও অবশিষ্ট জীবন আলোচিত হইবে। টমাস শেষ-জীবনে উন্মাদ হইয়া গিয়াছিলেন। তবে তিনি অসুস্থতা ও অশান্তির মধ্যে এইটুকু সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন যে, বাংলা দেশে ব্যাপটিষ্ট মিশনের পক্ষে প্রথম বাঙালী ধর্ম্মান্তরগ্রহণকারী কৃষ্ণ পাল তাঁহারই প্ররোচনায় খ্রীষ্টান হইয়াছিলেন এবং ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়ম ওয়ার্ড, জোশুয়া মার্শম্যান, ব্রান্সডন ও গ্রাণ্টের আগমন ও ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশনের প্রতিষ্ঠা তিনি দেখিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন।

ক্রমশঃ

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

৪৫শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

১৩৪৫

ভেল-সংহিতার প্রাচীনত্ব ও বিশেষত্ব

শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া, এম-এ, ডি-লিট্

অগদ-তন্ত্র ও শল্যতন্ত্র, প্রধানতঃ এই দুই ধারায় আয়ুর্বেদ বা ভারতীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ হইয়াছে। এই দ্বিবিধ ধারায় যে সকল সংহিতা প্রণীত হইয়াছে, উহাদের অবদানে দুইজন প্রাচীন ঋষি সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, যথা—অগদ-তন্ত্রের অবদানে পুনর্বসু আত্রেয় এবং শল্য-তন্ত্রের অবদানে ধন্বন্তরি। অগ্নিবেশ, ভেল বা ভেড়, জতূকর্ণ, পরাশর, হারীত ও ক্ষারপাণি, ভগবান্ পুনর্বসু আত্রেয়ের এই ছয় জন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ শিষ্যের প্রত্যেকেই পৃথক্ পৃথক্ সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া লোক-প্রসিদ্ধি আছে। এই ছয় প্রাচীন সংহিতার কোনটিই সম্পূর্ণ এবং অবিকলভাবে এযাবৎ আবিষ্কৃত হয় নাই। দৃঢ়বল-সংশোধিত চরক-সংহিতার মধ্যে অগ্নিবেশ-সংহিতা লীন হইয়াছে অথবা আত্মগোপন করিয়া আছে। অগ্নিবেশ-সংহিতার পৃথক্ অস্তিত্ব কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই সংহিতা আবিষ্কৃত হইলে আমরা নিশ্চয় বুঝিতে পারিতাম, ঠিক কোন্ ভিত্তির উপর চরকের প্রতিসংস্কর্ত্তা দৃঢ়বল তাঁহার সংহিতা-সৌধ নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। জতূকর্ণাদি চারি সংহিতা সম্পূর্ণ লোপ পাইয়াছে বলিলেও চলে। ছয় সংহিতার মধ্যে মাত্র ভেল-সংহিতারই এক পুথি তাঞ্জোর প্যালেস লাইব্রেরীতে সংগৃহীত ছিল (বর্ণেল, ক্যাটালগ, নং ১০৭৭৩), এবং উহারই সাহায্যে স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইং ১৯২১ সালে পরলোক-গত স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহোদয় উক্ত সংহিতার এক সংস্করণ প্রকাশ করেন। উক্ত ছয় সংহিতাই যে প্রচলিত চরক ও সুশ্রুতসংহিতার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রামাণিক গ্রন্থ, তাহা বাগ্‌ভটের নিম্নোদ্ধৃত উক্তি হইতে প্রমাণ করা চলে :—

> "ঋষি-প্রণীতে প্রীতিশ্চেন্মুক্ত্বা চরক-সুশ্রুতম্।
> ভেড়াদ্যাঃ কিং ন পঠ্যন্তে, তস্মাদ্ গ্রাহ্যং সুভাষিতম্॥

[অষ্টাঙ্গ-হৃদয়, উত্তরস্থান, অঃ ৪০, শ্লোঃ ২৫]

ভেল-সংহিতার মুদ্রিত সংস্করণ পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, উহার সূত্রস্থানের প্রথম তিন অধ্যায় এবং সিদ্ধিস্থানের কতিপয় অংশ বাদে গ্রন্থটি সম্পূর্ণ আকারেই আছে। আউফ্রেক্টকৃত ক্যাটালোগাস্ ক্যাটালোগোরামে উল্লিখিত ৪১৬ নম্বরভুক্ত অপর পুথিখানির সাহায্যে অপ্রাপ্ত অধ্যায় এবং অংশগুলিরও পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হইতে পারে। কথিত

উপায়ে সংহিতার সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণ করিতে পারিলেও, সর্ব্বাংশে ইহার মূল পাঠোদ্ধার করা দুঃসাধ্য। মুদ্রিত সংস্করণে আমরা যে আকারে সংহিতাটি পাইতেছি, উহাতে মাত্র শরীর-স্থানেরই ৪র্থ হইতে ৮ম, এই পাচ অধ্যায় মধ্যে মধ্যে পদ্য-সন্নিবিষ্ট গদ্যে, এবং অবশিষ্ট অংশ সর্ব্বত্রই পদ্যে। গদ্যাংশ পদ্যে পরিণত হওয়ায় সংহিতা, বহু অংশে ইহার মূল পাঠ ও ঐতিহাসিক বিশেষত্ব হারাইয়াছে। অদ্যাপি যে কয়টি অধ্যায় গদ্যে আত্মরক্ষা করিয়া আছে, উহারা পদ্য-নদীতে দ্বীপের ন্যায় বিরাজমান। বস্তুতঃ এই গদ্যাংশগুলিই সংহিতার প্রাচীনত্ব ও বিশেষত্ব প্রমাণ করিবার প্রকৃষ্ট উপায়। শঙ্খ-লিখিতাদি কতিপয় স্মৃতিসংহিতার মধ্যেও পদ্য-রাক্ষসী গদ্য মূল হজম করিয়া গ্রন্থগুলির প্রাচীনত্বের নিদর্শন লুপ্ত করিয়াছে। প্রকৃত আয়ুর্ব্বেদ বিষয়ে অধুনা ভেল-সংহিতার তেমন কোন বিশেষত্ব বা প্রয়োজন নাই। চরক-সংহিতা, সুশ্রুত-সংহিতা অথবা অষ্টাঙ্গ-হৃদয়ের তুলনায় ভেল-সংহিতা যেন সূর্য্য অথবা চন্দ্রের নিকট সামান্য খদ্যোত; অথচ ইহার ঐতিহাসিক বিশেষত্ব যথেষ্ট। ভেল-সংহিতা, বিশেষতঃ ইহার গদ্যাংশ হইতে সহজে অনুমান করা যায়, পুরাতন কোন্ স্তর হইতে আয়ুর্ব্বেদ চরক ও সুশ্রুতসংহিতায় আত্মপ্রকাশ করিতে পারিয়াছে।

চরকের অন্তর্গত অগ্নিবেশ-সংহিতার ন্যায় ভেল-সংহিতাও যে পুনর্বসু অথবা ভগবান্ আত্রেয়-সম্প্রদায়ের অন্যতম আয়ুর্ব্বেদগ্রন্থ, তাহা সংহিতাই নিজে প্রমাণ করে। কারণ, এই সংহিতায় আত্রেয়-বচনই বেদবাক্য, আত্রেয়-মতই প্রতিপাদ্য বিষয়ে চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। "ইত্যাহ ভগবান্ আত্রেয়ঃ", "নেত্যাহ ভগবান্ পুনর্বসুরাত্রেয়ঃ", ইত্যাকার উক্তি হইতে উক্ত বিষয়ে অপর সিদ্ধান্ত কি হইতে পারে?

এখন প্রশ্ন হইতেছে—গদ্য অথবা পদ্য-সন্নিবিষ্ট গদ্য ভেল-সংহিতার রচনাকাল কত প্রাচীন হইতে পারে এবং তাহা নির্দ্ধারণ করিবার উপায়ও বা কি আছে? প্রথমতঃ, ইহার গদ্যাংশের রচনারীতি অনেকাংশে অর্থশাস্ত্র, কামসূত্র, প্রাচীন ধর্ম্মসূত্র ও পালি অভিধর্ম্ম পিটকের অনুরূপ। উপমাস্থলে:

"তত্রাহ কথং গর্ভো মাতুরুদরে তিষ্ঠতীতি? ঊর্ধ্বমিতি শৌনকঃ। অবাক্‌শিরা ইতি ভরদ্বাজঃ। নেত্যাহ ভগবান্ পুনর্বসুরাত্রেয়ঃ। যদ্যূর্ধ্বং তিষ্ঠেৎ তর্হি মাতৃমা(রঃ) স্যাৎ। যদ্যবাক্‌শিরাঃ তদা স্বমা(রঃ) স্যাৎ" (ভেঃ-সং, পৃঃ ৮৫)।

দ্বিতীয়তঃ, আত্মার দেহান্তর-উপক্রম বিষয়ে দেখিতে পাই, ভেল-সংহিতা বৃহদারণ্যক-উপনিষদুক্ত ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের মতই খণ্ডন করিতে গিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে,

"যেমন তৃণ-জলৌকা তৃণাস্তে গিয়া অপর এক তৃণের প্রতি অগ্রসর হইয়া নিজেকে গুটাইয়া পূর্ব্বতৃণ হইতে পরতৃণে গমন করে, তেমন আত্মাও এক দেহ পরিত্যাগ করিয়া, অবিদ্যা দূর করিয়া, অপর দেহের প্রতি অগ্রসর হইয়া দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করে।"

"তদ্‌যথা তৃণ-জলায়ুকা তৃণস্যান্তং গত্বাঽন্যমাক্রমং আক্রম্যাত্মানং উপসংহরত্যেবমেবায়ম্ আত্মেদং শরীরং নিহত্যাবিদ্যাং গময়িত্বান্যম্ আক্রমম্ আক্রম্যাত্মানম্ উপসংহরতি।"

[বৃহদারণ্যক-উপনিষৎ, ৪-৪-৩]

উক্ত উপমার সাহায্যে অপর কোথাও আত্মার সংক্রমণ বা দেহান্তর-গমন বর্ণিত হয় নাই। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উপমা হইতেছে—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

[ভগবদ্গীতা, ২-২২]

"যেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ আত্মা জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন দেহ ধারণ করে।"

এই শেষোক্ত জাতীয় একাধিক উপমা পালি জাতক, পেতবত্থু, দীঘ-নিকায় ও মজ্ঝিম-নিকায়ে দৃষ্ট হয়, যথা :—

(১) উরগ-জাতক ও উরগ-পেতবত্থুতে—

"উরগো ব তচং জিন্নং হিত্বা গচ্ছতি সন্তনুং।
এবং শরীরে নিব্ভোগে পেতে কালকতে সতি॥"

"উরগ যেমন জীর্ণ ত্বক্ পরিত্যাগ করিয়া নব রূপ গ্রহণ করে, তেমন দেহ-বিনাশে, মৃত্যু হইলে পর (সত্ত্ব নব দেহ গ্রহণ করে)।"

(২) নন্দিকাপেতবত্থুতে, দীঘ-নিকায়ের সামঞ্ঞফল এবং মজ্ঝিম-নিকায়ের মহা-অস্সপুরসুত্তে :—

"যথা গামতো নিক্খম্ম অঞ্ঞং গামং পবিসতি।
এবমেবম্পি সো জীবো অঞ্ঞং কায়ং পবিসতি॥
যথা গামতো নিক্খম্ম অঞ্ঞং গেহং পবিসতি।
এবমেবম্পি সো জীবো অঞ্ঞং বোন্দিং পবিসতি॥"

"যেমন কেহ গ্রাম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অন্য গ্রামে অথবা গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অন্য গৃহে প্রবেশ করে, তেমন জীব (দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া) অন্য দেহে প্রবিষ্ট হয়।"[১]

এই সকল উপমা হইতে বৃহদারণ্যক উপনিষদের উপমা প্রাচীনতর, এবং উপনিষদের উপমারই যুক্তি-খণ্ডন ভেল-সংহিতার গদ্যাংশে আছে :

"অথ প্রশ্নো ভবতি : কথময়ং দেহো দেহান্তরম্ উপক্রমত ইতি ? অত্রোবাচ ভগবান্ আত্রেয়ঃ : জলুকায়া ইবাস্য কেচিদ্ গতিং ব্রুবতে। তন্ন যুক্তম্ ইহানীতিন্যত্যন্তামূর্তত্বং যুগপৎ স্যাদেব" (ভেঃ সং, পৃ. ৯৩)।

"অনন্তর প্রশ্ন হইতেছে : কিরূপে এই দেহী দেহান্তর গমন করে ? এ বিষয়ে ভগবান্ আত্রেয় বলিতেছেন : কেহ কেহ বলেন যে, (তৃণ)জলৌকার তৃণ হইতে তৃণান্তরে গমনের ন্যায়ই দেহীর দেহান্তর-গমন হইয়া থাকে। দেহীর ইহ হইতে পরলোক-গমনবিষয়ক এই উপমা যুক্তিযুক্ত নহে, যেহেতু অত্যন্ত অমূর্ত্ত হওয়ায় আত্মার পক্ষে যুগপৎ দেহ পরিত্যাগ ও দেহান্তর-গ্রহণ হইতে পারে।"

১। শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা-প্রণীত *The Buddhist Conception of Spirits* পৃ. ৩ দ্রঃ। দীঘ ও মজ্ঝিম-নিকায়ের উপমা : "সেয্যথা পুরিসো সকম্হা গামা অঞ্ঞং গামং গচ্ছেয্য, তম্হা পি গামা অঞ্ঞম্পি গামং গচ্ছেয্য, সো তম্হা গামা সকং যেব গামং পচ্চাগচ্ছেয্য, ইত্যাদি।

তৃতীয়তঃ, কতিপয় পরিভাষা ও দার্শনিক মতের সৌসাদৃশ্য হইতে বিচার করিলে ভেল-সংহিতা ও পালি পঞ্চনিকায় একই সময়ের রচনা বলিয়া অনুমিত হইতে পারে।

(১) পরিভাষার সৌসাদৃশ্য পালি নিকায় ও জৈন আগমের প্রমাণে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের উদ্ভবকালে নিকায়, জাতি বা বর্ণ অর্থে কায় শব্দের প্রচলন হয়। ভেল-সংহিতায় পৃথিবী-কায়, অপ্‌কায়,জল-কায়, বায়ু-কায়, তেজঃকায়, এই পাঁচ সংজ্ঞার ব্যবহার আছে। পালি নিকায়োক্ত বুদ্ধ ও মহাবীরের সমসাময়িক এবং সামান্য পূর্ব্ববর্ত্তী তীর্থিক পকুধ কচ্চায়নের (ককুদ কাত্যায়নের) দার্শনিক উক্তিতে অবিকল এই সকল পরিভাষা দৃষ্ট হয় :

"পঠবি-কায়ে, আপোকায়ে, তেজো কায়ে, বায়োকায়ে, সুখে দুক্‌খে, জীবে সত্তমে" (দীঃ নিঃ, সামঞ্‌ঞফলসুত্ত, মঃ নিঃ, সন্দক-সুত্ত, জৈন সূয়গডঙ্গ, ইত্যাদি)।

পালি নিকায়ে প্রযুক্ত ব্রহ্ম-কায়, দেব-কায়, গন্ধব্ব-কায়, অসুর-কায় ইত্যাদির অনুরূপ পরিভাষা ভেল-সংহিতার ব্রহ্ম-কায়ং, দেব-কায়ং, বরুণ-কায়ং, গন্ধর্ব-কায়ং, পিশাচ-কায়ং, অসুর-কায়ং ও মহারাজ-কায়ং শব্দে পরিলক্ষিত হয়।

(২) দার্শনিক মতের ও উক্তির সৌসাদৃশ্য :

(ক) ভেল-সংহিতা, পৃ. ৮৯ :

"স যদা ভেদং গচ্ছতি তদাপঃ অপ্‌কায়মেব যান্তি, বায়ুর্বায়ুকায়ং, তেজঃ তেজঃকায়ং পৃথিবী পৃথিবী-কায়ং, আকাশং আকাশ-কায়মিতি। তদা রসো রস-কায়ম্ ইন্দ্রিয়মিন্দ্রিয়-কায়ং ভজতে। ভবতি চাত্র : ভিদ্যমানে শরীরে বৈ ধাতুর্ধাতুং নিযচ্ছতি।"

(খ) পালি নিকায়োক্ত বুদ্ধ ও মহাবীরের সমসাময়িক ও সামান্য পূর্ব্ববর্ত্তী তীর্থিক অজিত কেশকম্বলীর দার্শনিক মত ও উক্তি :

অয়ং পুরিসো যদা কালং করোতি পঠবী পঠবি-কায়ং অনুপেতি অনুপগচ্ছতি, আপো আপোকায়ং, তেজো তেজোকায়ং, বায়ো বায়োকায়ং অনুপেতি অনুপগচ্ছতি, আকাসং ইন্দ্রিয়ানি সঙ্কমন্তি।"

(দীঃ নিঃ, সামঞ্‌ঞফল-সুত্ত)

ভগবান্ বুদ্ধের আবির্ভাবকালে অথবা পালি পঞ্চনিকায়ের যুগে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের কিরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তাহা বারান্তরে আলোচনা করিব। উপসংহারে অগদ-তন্ত্র, শল্য-তন্ত্র, শালাক্য ও কৌমারভৃত্য বিষয়ে দীঘ-নিকায়ের ব্রহ্মজালাদি প্রথম তের সুত্রের অন্তর্গত সীলক্‌খন্ধ হইতে বুদ্ধবচন উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট হইবে মনে করি। ভগবান্ বুদ্ধ বলিতেছেন :

"একে সমণ-ব্রাহ্মণা...এবরূপে তিরচ্ছান-বিজ্জায় মিচ্ছাজীবেন জীবিকং কপ্পেন্তি, সেয্যথীদং :... বমনং বিরেচনং [উদ্ধ-বিরেচনং অধোবিরেচনং সীস-বিরেচনং] কণ্ণতেলং নেত্তঞ্জনং নথুকম্মং অঞ্জনং পচ্চঞ্জনং সালাকিয়ং সল্লকত্তিয়ং দারক-চিকিচ্ছা মূলভেসজ্জানং অনুপ্পদানং ওষধীনং পটিমোক্‌খো ইতি।"

"কতিপয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এই প্রকার তিরশ্চীন বিদ্যা দ্বারা, মিথ্যাজীব দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, যথা : বমন, বিরেচন, ঊর্দ্ধবিরেচন, অধঃ বিরেচন, শিরঃ বিরেচন, কর্ণ তৈল, নেত্রাঞ্জন, নস্যকর্ম্ম, অঞ্জন, প্রত্যঞ্জন, শালাক্য, শল্যকর্ম্ম, শিশু-চিকিৎসা (কৌমারভৃত্য), মূল ভৈষজ্য উৎপাদন, ঔষধের জারণ।"

মদনমোহনজীর মন্দির—বৃন্দাবন
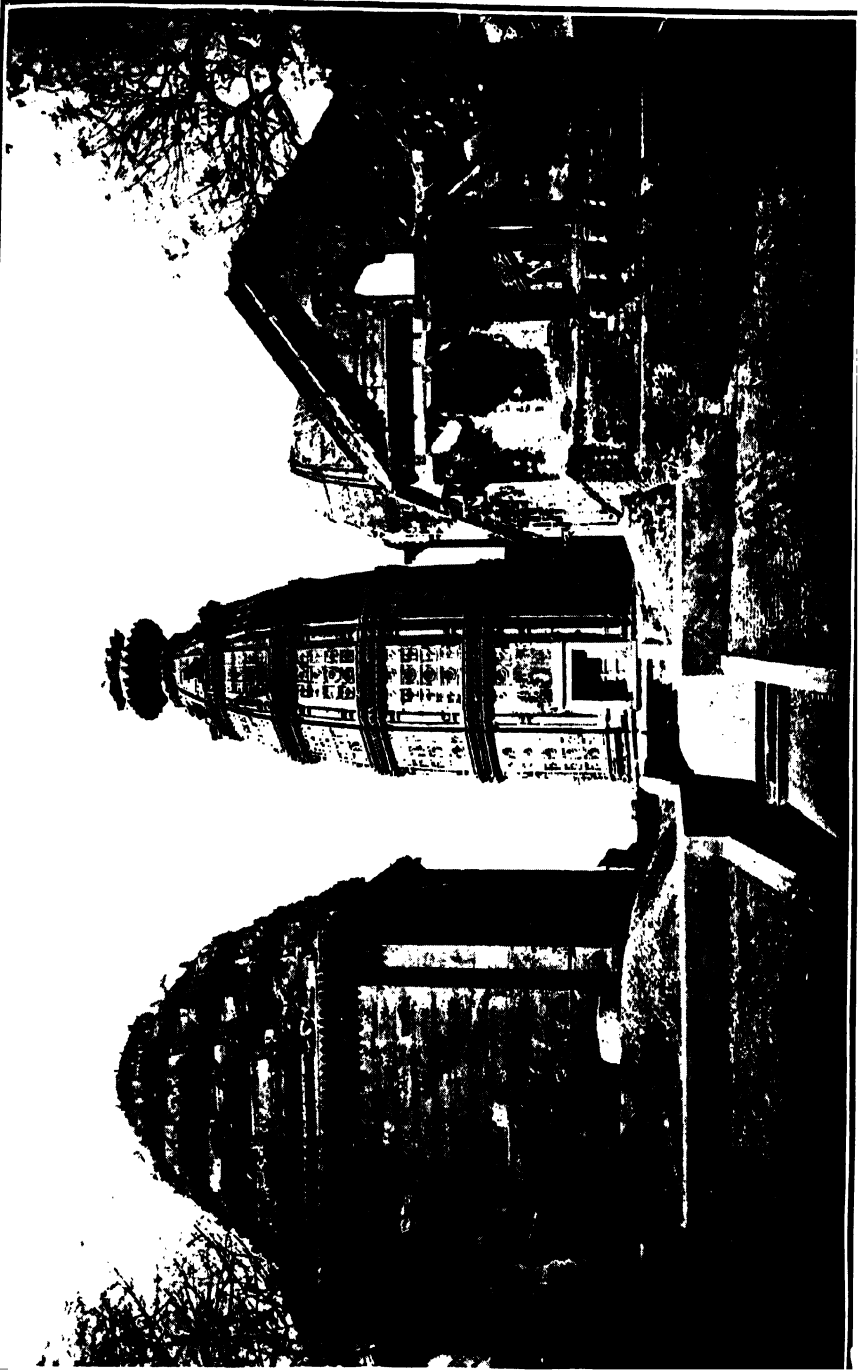
বৃন্দাবনের কয়েকটি মন্দিরের ঐতিহাসিক পরিচয়

ডক্টর শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো, এম-এ

যাঁহারা এ পর্য্যন্ত বৃন্দাবনের পুরাতন ভগ্ন ও অর্দ্ধভগ্ন মধ্যযুগের মন্দিরগুলি সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন, তাঁহারা মন্দিরের স্থাপত্য-সৌষ্ঠব, ভাস্কর্য্য ও অন্যবিধ শিল্পকলা সম্বন্ধেই বেশী আলোচনা করিয়াছেন; বিশদভাবে ঐগুলির ঐতিহাসিক পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করেন নাই। বৃন্দাবনের অধিকাংশ মন্দির সম্রাট্ আকবরের রাজত্বে রাজপুত সামন্তরাজগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। জনশ্রুতি কিংবা শিলালিপি হইতে ইঁহাদের সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিতে পারি, তাহার ঐতিহাসিক বিচার এ প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়।

মদনমোহনজীর মন্দিরের নির্ম্মাতা কে?

এই মন্দির কচ্ছবাহ্-রাজ মানসিংহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া বর্ত্তমানে জনশ্রুতি প্রচলিত। মদনমোহনজী জয়পুর রাজ্যের অন্যতম প্রসিদ্ধ বিগ্রহ। জয়পুরের লোক উপহাসচ্ছলে বলে,—"লড়্‌নে ভড়্‌নেমে সীতারামজী; লাড্ডু খানেমে মদনমোহন!" অর্থাৎ লড়াই ঝগড়ায় সীতারামজী, আর লাড্ডু খাওয়ার বেলা মদনমোহন! পূর্ব্বে আম্বরের যুদ্ধপতাকার সঙ্গে সঙ্গে সীতারামজীও লড়াই করিতে যাইতেন। কথিত আছে, আওরঙ্গজেবের দৌরাত্ম্যে ৺বিশ্বেশ্বর যখন বেগতিক দেখিয়া জ্ঞানবাপীতে আত্মগোপন করিয়াছিলেন, সে সময় মদনমোহনজীও আম্বরে পলায়ন করিয়াছিলেন। ইহা সম্ভবতঃ সত্য। কিন্তু ইহাতে প্রমাণ হয় না যে, মানসিংহ এ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে গ্রাউস্ (Growse) সাহেব মথুরা গেজেটিয়ার লিখিয়াছিলেন। ঐ সময় পর্য্যন্ত মানসিংহ এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এ জনশ্রুতির আভাস পাওয়া যায় না। লোকে বলে, রামদাস নামক জনৈক মুলতানী শেঠ এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।* ✓

মদনমোহনজীর মন্দির কখন্ নির্ম্মিত হইয়াছিল, এ সম্বন্ধে কোন তারিখযুক্ত শিলালিপি প্রভৃতি পাওয়া যায় নাই। ভক্তমাল গ্রন্থে কবি সুরদাসের নাম মদনমোহনজীর সহিত সংশ্লিষ্ট দেখা যায়:—

"শ্রীমদনমোহন সুরদাস্‌কী নাম-শৃঙ্খলা জোরী অটল।"

উক্ত গ্রন্থে কথিত আছে, সুরদাসজী সাণ্ডিলা পরগণার বাদশাহী খাজনা তছরূপ করিয়াছিলেন; এই অপরাধে দেওয়ান টোডরমল তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। পরে আকবরের কৃপায় মুক্তিলাভ করিয়া তিনি বৃন্দাবনে আসেন এবং ইষ্টদেব মদনমোহনজীর প্রসাদে অপূর্ব্ব

---

* *Mathura Gazetteer*, Pt. I, p. 128.

কবিত্বশক্তি লাভ করিয়া কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক কাব্য রচনা করেন। বর্ত্তমানে সূরদাসজীর কাল ১৫৪০—১৬২০ সংবৎ বলিয়া ধরা হয়। সুতরাং ১৪৮৪ হইতে ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তী কোন সময়ে মদনমোহনজীর মন্দির সুপরিচিত ছিল, আমরা জনশ্রুতি হইতে ইহাই শুধু অনুমান করিতে পারি। আকবর-টোডরমল এবং সূরদাসজী-বিষয়ক গল্পের মূলে কোন সত্য নাই। রাজা টোডরমল আকবরের রাজত্বের দ্বাবিংশ বৎসরে অর্থাৎ ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বার দেওয়ান-পদ পাইয়াছিলেন।

সৌভাগ্যক্রমে গ্রাউস্ সাহেব এই মন্দিরের বিগ্রহকক্ষের পূর্ব্বভাগে একমাত্র প্রবেশ-দ্বারের উপর একখানি লুপ্তপ্রায় শিলালিপির পাঠোদ্ধার করিয়া গিয়াছেন। উক্ত লিপিতে কোন তারিখ নাই এবং ইহার ভাষা সংস্কৃত; কিন্তু প্রশস্তিটি **প্রথমে** বাংলা অক্ষরে এবং **নীচে** দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত। যিনি বাংলা ও নাগরী, দুই রকম অক্ষরে নিজের কীর্ত্তি অক্ষয় করিবার প্রয়াসী ছিলেন, তিনি বাঙালী ছাড়া অন্য দেশবাসী হইতেই পারেন না। তিনি নিশ্চয়ই অবগত ছিলেন, তাঁহার স্বদেশবাসী যাত্রীরা সকলেই দেবনাগরী অক্ষর পড়িতে অভ্যস্ত নয়। সংস্কৃতজ্ঞ বাঙালীর মধ্যে আজকালও শতকরা প্রায় ৮০ জন নাগরী অক্ষর লিখন-পঠনে সক্ষম নহে। যিনি মদনমোহনজীর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তিনি বঙ্গজননীর সন্তান না হইলে বাংলা অক্ষরের সহিত তাঁহার নাড়ীর এ টান থাকিত না। শিলালিপিতে প্রতিষ্ঠাতার পরিচয় এইরূপ দেওয়া হইয়াছে :—

হর ইব গুরুবংশো যৎপিতা রামচন্দ্রো
গুণিমণিরিব পুত্রো যস্য রাধাবসন্তঃ।
সকৃতস্কৃতরাশিঃ শ্রীগুণানন্দনামা
ব্যধিত বিধিবদেতন্মন্দিরং নন্দসূনোঃ॥

এই শিলালিপি পাঠে আমরা জানিতে পারি, মদনমোহনজীর মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা গুণানন্দের পিতার নাম রামচন্দ্র, পুত্রের নাম রাধাবসন্ত, তিনি কোন উচ্চবংশ-সম্ভূত ব্যক্তি। গুণানন্দ ও রাধাবসন্ত বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত বাংলার ইতিহাসে অপরিচিত। তবে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদে বাংলা দেশে সুলতান সৈয়দ আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্‌র (১৪৯৩—১৫১৮ খ্রীঃ) রাজত্বের শেষভাগে রামচন্দ্র খাঁ নামক এক পরাক্রান্ত হিন্দু জমিদারের উল্লেখ পাওয়া যায়। চৈতন্যভাগবত অনুসারে ছত্রভোগের গ্রামপতি রামচন্দ্র খাঁ মহাপ্রভুকে নীলাচল গমন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কেন না, তখন বাংলা ও উড়িষ্যার রাজার মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছিল এবং পথিকেরা "যাশু" (আরবী জাসুস্) বা গুপ্তচর সন্দেহে ধৃত হইয়া যুধ্যমান পক্ষদ্বয় কর্ত্তৃক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতেছিল। তথাপি এই রামচন্দ্র খাঁ মহাপ্রভুকে উৎকলযাত্রায় সাহায্য করিয়াছিলেন। মাদ্‌লাপঞ্জী অনুসারে ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে গৌড়ীয় সেনা কর্ত্তৃক উড়িষ্যা আক্রান্ত হইয়াছিল। সুতরাং এই রামচন্দ্র খাঁর প্রাদুর্ভাবকাল ঐ সময়ের কাছাকাছি হইবে। বৈষ্ণব-প্রবাদ অনুসারে মহাপ্রভুর আদেশে নিত্যানন্দ যখন বাংলা দেশে বৈষ্ণব

ধর্ম্ম প্রচার করিতে আসেন, তখন যশোহর-বনগাঁ প্রদেশের দুর্দ্দান্ত জমিদার মহাশাক্ত রামচন্দ্র খাঁ নিত্যানন্দকে অপমানিত করিয়াছিলেন; এই পাপের ফল হাতে হাতে ফলিয়াছিল—গৌড়েশ্বরের জনৈক মুসলমান কর্ম্মচারী তাঁহার জাতি নাশ করিয়া চণ্ডীমণ্ডপে গোহত্যা করিয়াছিল।* এই রামচন্দ্র খাঁর দুই পুত্র কৃষ্ণানন্দ ও ভুবনানন্দের উল্লেখ ইতিহাসে পাওয়া যায়। ভুবনানন্দ গৌড়াধিপের প্রিয়পাত্র হইয়া অযোধ্যাবাসী ব্রাহ্মণদিগকে দেশে বৃত্তি দান করাইয়াছিলেন।† পূর্ব্বোক্ত শিলালিপি-কথিত গুণানন্দ যশোহর-বনগাঁর জমিদার প্রসিদ্ধ রামচন্দ্র খাঁর অন্যতম পুত্র বলিয়া মনে হয়। কৃষ্ণানন্দ, ভুবনানন্দ ও গুণানন্দের "আনন্দ" উপাধি দেখিয়া মনে হয়, রাজরোষে পতিত ও সর্ব্বস্বহারা হইয়া রামচন্দ্র খাঁর পুত্রগণ হয়ত গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়াছিলেন; পৌত্র রাধাবসন্ত সম্ভবতঃ তৎকালীন গৌড়াধিপের কৃপায় নিজ বংশের জমিদারি ও লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন।

রামচন্দ্রের পুত্র গুণানন্দ কোন্ সময় মদনমোহনজীর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, উহার মোটামুটি কাল অনুমানসাপেক্ষ। সুলতান সিকেন্দর লোদীর রাজত্বকালে (১৪৮৮-১৫১৭) মহাপ্রভু বৃন্দাবন গিয়াছিলেন। তখন ব্রজমণ্ডলে কোন প্রসিদ্ধ মন্দির তিনি দেখেন নাই এবং কোন মন্দির থাকাও সম্ভবপর নহে। কারণ, মুসলমান-ইতিহাস অনুসারে সিকেন্দর লোদী মথুরার মন্দির ভগ্ন করিয়া দেবমূর্ত্তিসমূহ চূর্ণ করিয়াছিলেন। মূর্ত্তিচূর্ণ পানের চূণের সহিত মিলাইয়া হিন্দুদিগকে খাওয়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল; এমন কি, নাপিতের উপর হুকুম হইয়াছিল, তাহারা হিন্দুদের দাড়ি কামাইতে পারিবে না। লোদী-রাজত্বে বাঙালীদের পক্ষে বৃন্দাবনে মন্দির-প্রতিষ্ঠার কথা দূরে থাকুক, তীর্থভ্রমণও বিপদ্‌সঙ্কুল ছিল। যে "গৌড়াধিপে"র কৃপায় রামচন্দ্র খাঁর অন্যতম পুত্র ভুবনানন্দ অযোধ্যাবাসী ব্রাহ্মণদিগকে ভূমি দান করাইয়াছিলেন, সেই গৌড়েশ্বর শের শাহ্‌ ব্যতীত আর কেহ হইতে পারেন না। কারণ, শের শাহ্‌ই একমাত্র গৌড়াধিপ, যিনি দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়া ব্রাহ্মণদিগকে ভূমিদান করিবার ক্ষমতা ও সৎসাহস অর্জ্জন করিয়াছিলেন। মুসলমান-ইতিহাসেও শের শাহ্‌ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করার কথা লিখিত আছে। শের শাহ্‌র অপক্ষপাত শাসন ও দোর্দণ্ড প্রতাপে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খাইত, চোর-ডাকাত সওদাগরের মাল ও পথিকের পুঁটুলি পাহারা দিত। নিজে খাঁটি মুসলমান হইলেও হিন্দুর প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষবশে মন্দির ও দেবমূর্ত্তি ভগ্ন করিয়া স্বধর্ম্মনিষ্ঠার পরিচয় দেওয়া তাঁহার শাসননীতিবিরুদ্ধ ছিল। মোট কথা, ইংরেজ-রাজত্বে লালাবাবু বৃন্দাবনে যাহা করিতে পারিয়াছেন, আকবর-রাজত্বের পূর্ব্বে একমাত্র শের শাহ্‌ কিংবা ইস্‌লাম শাহ্‌র শাসনকালে বাঙালী গুণানন্দের পক্ষেও সেইরূপ মদনমোহনজীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর ছিল। শের শাহ্‌ হোসেন-

* রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তি-প্রণীত 'গৌড়ের ইতিহাস,' দ্বিতীয় ভাগ, পৃ. ১৩৬।

† সতীশচন্দ্র মিত্র-প্রণীত 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস,' ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৫।

শাহী বংশকে ধ্বংস করিয়া ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা দেশ অধিকার করেন; সুতরাং সেনশাহী বংশের প্রতি জাতবিদ্বেষ রামচন্দ্র খাঁর পুত্রগণের পক্ষে শের শাহ্‌র পক্ষ অবলম্বন করিয়া প্রতিষ্ঠাপন্ন হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

যোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বে বাংলা অক্ষরে কোন সংস্কৃত শিলালিপি-প্রশস্তি বাংলা দেশের বাহিরে কোথাও আবিষ্কৃত হইয়াছে কি না, আমার সঠিক জানা নাই। তবে মুঙ্গেরের দক্ষিণে বর্ত্তমান লক্ষ্মীসরাইয়ের নিকটবর্ত্তী প্রাচীন জয়নগর বিহারে ১১৯৭ হইতে ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে গয়াকর কায়স্থ কয়েকখানি তন্ত্রগ্রন্থ বাংলা অক্ষরে সংস্কৃত মূল গ্রন্থ হইতে নকল করিয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ আছে। মদনমোহনজীর মন্দিরের ভগ্নাবশেষের মধ্যে একটি বিষয় গ্রাউস সাহেব লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

> That [the tower] surmounting the sacrarium is a lofty octagon of curvilinear outline tapering toward the summit; and attached to its south side is a tower-crowned chapel of similar elevation···(*Mathura Gazetteer*, Pt. I, p. 127-128.)

অষ্টকোণ আকৃতি শূর-বংশীয় স্থাপত্যের একটি বিশেষ লক্ষণ—পুরানা কিল্লার (দিল্লী) হামাম ও শেরমঞ্জিল এবং মসজিদের কূপ ও ফোয়ারা ইহার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এ কথা সকলেই জানেন, বঙ্কিম রেখায় গঠিত (*curvilinear*) ছাদ ও গম্বুজ বাংলার মুসলমান-স্থাপত্যেরই একটা বিশেষত্ব। বাংলা দেশের দো-চালা বাংলা-ঘরের ইহা অনুকরণ মাত্র। মুসলমান-বিজয়ের পূর্ব্বযুগের এবং পরবর্ত্তী কালের হিন্দু মন্দিরাদির উহা একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। স্থাপত্য শিল্পে আমরা একটি বিষয় লক্ষ্য করিয়া থাকি, মন্দির বা মসজিদের কোন একটি বৈশিষ্ট্য যাহা গঠনকার্য্যে ব্যবহৃত হয়, উহাই ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর ভাবে অনুকরণ করিয়া অলঙ্করণ-কার্য্যে ব্যবহার করা হয়; যথা, বাংলা দেশের প্রাচীন মন্দিরাদির বঙ্কিম রেখায় গঠিত ছাদ এবং শের শাহ্‌র সাসেরামস্থ সমাধিমন্দিরের সূক্ষ্মচূড় খিলান-বিশিষ্ট দরজার অনুকরণে গম্বুজের ভিতরকার "খোল" হইতে ভিত্তিমূল পর্য্যন্ত সমাধি-প্রকোষ্ঠের চারি কোণায় নির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূক্ষ্মচূড় খিলানের সারি, মূল গম্বুজের ভার বহন করিবার নিমিত্ত নির্ম্মিত হইয়াছে। যদি মদনমোহনজীর মন্দির অটুট থাকিত, তাহা হইলে বঙ্গ-স্থাপত্যের এই বৈশিষ্ট্য হয়ত মন্দিরের অন্যান্য অংশেও আমরা দেখিতে পাইতাম। সুতরাং আমার মনে হয়, মদনমোহনজীর মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা গুণানন্দ নিশ্চয় বাঙালী ছিলেন এবং এই মন্দির বঙ্গস্থাপত্যের ধারা অনেক পরিমাণে বজায় রাখিয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল।

ইহাও হয়ত অনেকে জানেন, রাধাকুণ্ড ও মদনমোহনজীর মন্দির একই দেবোত্তর সম্পত্তি। রাধাকুণ্ড এখনও বাঙালীদের অধিকারে আছে। আমার সন্দেহ হয়, মদনমোহনজীর প্রতিষ্ঠাতা গুণানন্দের পুত্র শিলালিপি-কথিত রাধাবসন্ত নিজনামে এই রাধাকুণ্ড নির্ম্মিত করিয়া উৎসর্গ করিয়াছিলেন। মদনমোহনজী মানসিংহ কর্ত্তৃক স্থাপিত হইলে ইঁহার সেবার
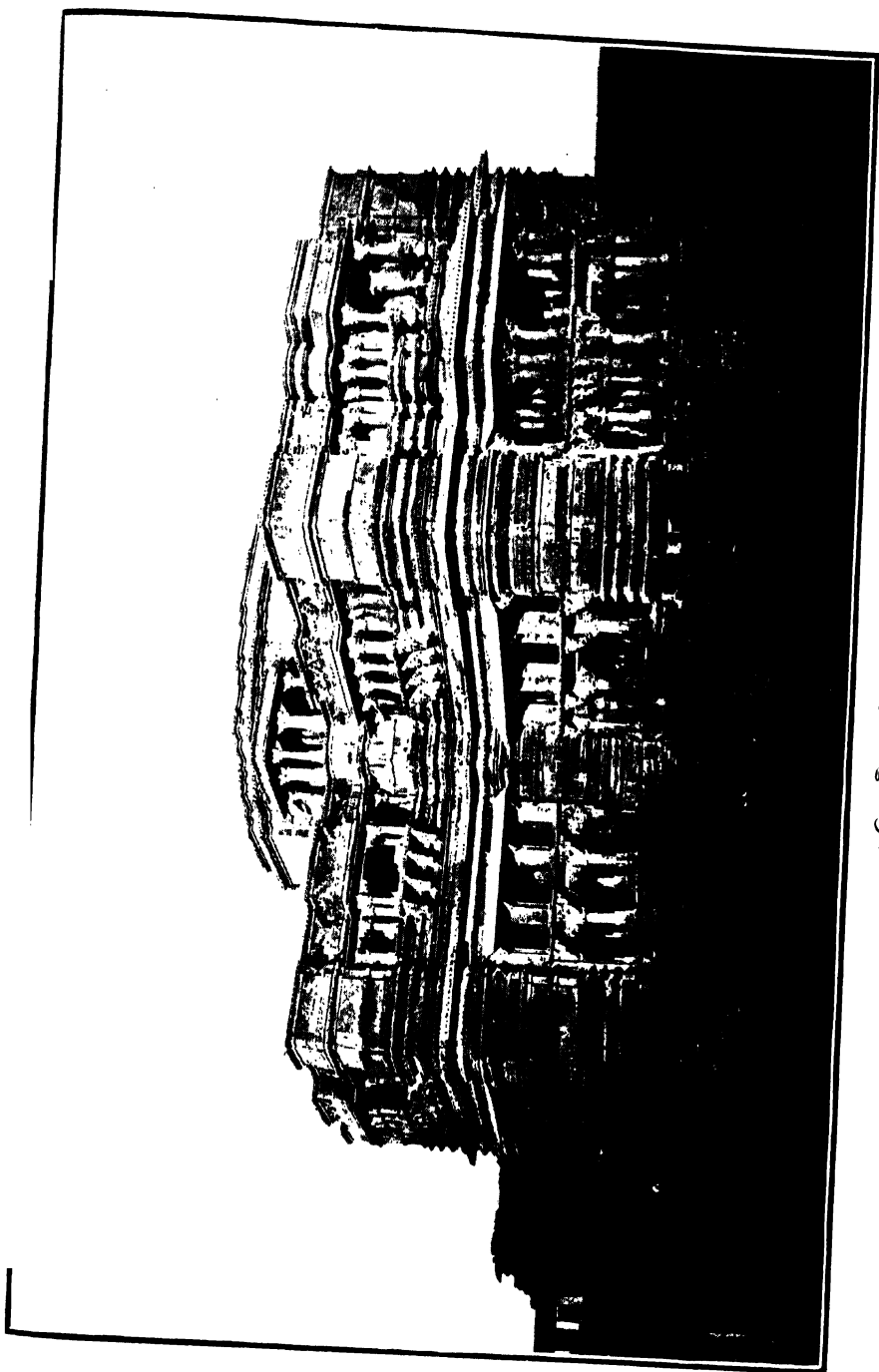
গোবিন্দজীর মন্দির—বৃন্দাবন

জন্য জয়পুর-দরবারের দেবোত্তর অবশ্যই থাকিত—যেমন গোবিন্দজীর মন্দিরের জন্য এখনও আছে।

গোবিন্দজীর মন্দির

গোবিন্দদেবের মন্দির মধ্যযুগে উত্তর-ভারতের হিন্দুস্থাপত্যের অনুপম কীর্ত্তি। বিক্রমাদিত্য-প্রতিম সম্রাট্ আকবরের নব-রত্ন সভার অন্যতম রত্ন সুপ্রসিদ্ধ রাজা মানসিংহ অজস্র অর্থব্যয়ে এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কথিত আছে, সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের রাজত্বে সাম্রাজ্যব্যাপী হিন্দু-মন্দিরধ্বংসলীলার সময় গোবিন্দজীর মন্দিরের এই দুর্দ্দশা হইয়াছিল। হিন্দু মন্দিরের আকাশচুম্বী শিখরসমূহ ধূলিসাৎ করিয়া পরধর্ম্ম-অসহিষ্ণু সম্রাট্ হিন্দুধর্ম্মের চিহ্ন ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া ফেলিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। বুন্দেলখণ্ডের লাল কবি তাঁহার 'ছত্র-প্রকাশ' কাব্যে সম্রাটের এই মনোভাবের চমৎকার বর্ণনা করিয়াছেন :—

বুন্দেলখণ্ডের ফৌজদার ফিদাই খাঁর কাছে বাদশাহী ফরমান্ আসিল—

"নগর ওঁড়ছা মেঁ সুনৈ,
হিন্দু ধরৈ গুমান।
তে নিত পথর পূজিকৈ,
ফৈলাবত কুফরান॥
উঁচী ধুজা দেবালন রাজৈ।
ঘণ্টা শংখ ঝালরৈ বাজৈ॥
ছাপৈ দেত তিলক ঠাটে।
মালা ধরে রহত মন বাটে॥
এসা হুকুম সরে' কা নাহী।
ক্যোঁ এ করত চিত কী চাহী॥
জো কঁহ কান শংখধুনি আবৈ।
মুসলমান তো ভিস্ত ন পাবৈ॥
সিসৌ ওঁটি কান জো নাবৈ।
তো দোজখ্ তে খুদা বচাবৈ॥
তাতৈ ঢাহি দেবালৈ দীজৈ।
তিনকে ঠৌর মসীদৈ কীজৈ॥
মুলনা তঁহা নিবাজ গুদারৈ।
বাঁগ দেহি নিত সাংঝ সকারৈ॥
ন্যাউ চুকাবৈ কাজিলকাজী।
জাত রহে গুসাই রাজী॥

অর্থাৎ "শুনিলাম, ওঁড়ছা শহরে হিন্দুর বড়ই গুমর। সেখানে নিত্য পাথর পূজা করিয়া তাহারা বে-ইমানী জাহির করিতেছে; উচ্চধ্বজা-বিরাজিত দেবালয়ে শঙ্খ, ঘণ্টা ও ঝাঁজ (cymbals) বাদ্য হইতেছে। হিন্দুরা ঠাট করিয়া তিলক কাটে, বুক ফুলাইয়া মালা জপে। শরিয়তের এ প্রকার হুকুম নাই; কেন ইহারা যা ইচ্ছা তাই করে? কানে যদি কখনও শঙ্খধ্বনি আসে, তাহা হইলে মুসলমান ত বেহেশ্‌তে (স্বর্গে) যাইতে পারিবে না! একমাত্র কানে ফুটন্ত গরম সীসা ঢালিয়া দিলে দোজখ হইতে খোদা তাহাদিগকে রেহাই দিতে পারেন। ওখানকার মন্দিরগুলি ভাঙিয়া মসজিদ করিয়া দাও। মৌলানারা ওখানে নমাজ পড়িবে, সকাল সন্ধ্যা আজান দিবে; এলেম্‌দার কাজীরা* মামলা বিচার করিবে—যাহাতে খোদা আমাদের উপর রাজী থাকেন।"

* মস্‌জিদে বসিয়া কাজীদের মোকদ্দমা বিচার করিবার প্রথা বহুদিন হইতে মুসলমান রাজ্যে প্রচলিত ছিল।

যাহা হউক, সম্রাট্ আওরঙ্গজেব বুন্দেলখণ্ডের ফৌজদারকে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, মথুরার ফৌজদারের উপরও বোধ হয়, সে রকম আদেশ হইয়াছিল। ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল মোগল সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র বাদশাহী ফরমান্ জারি হইল,—সুবাদারেরা যেন নিজ নিজ এলাকায় হিন্দুদের মন্দির ও টোলগুলি ধ্বংস করিয়া, হিন্দুর শিক্ষা ও ধর্ম্মচর্চ্চা কঠোর ভাবে দমন করেন। তাঁহার রাজত্বের শেষ কাল পর্য্যন্ত এ আদেশ বলবৎ ছিল। জুলফিকর খাঁ ও মোগল খাঁ নামক কর্ম্মচারিদ্বয় ইহাতে একটু শৈথিল্য প্রকাশ করায় তাঁহারা বাদশাহ্‌র কাছে ধমক খাইয়াছিলেন—"হিন্দুর মন্দিরের ত পা নাই যে, ঐগুলি হাঁটিয়া চলিয়া যাইবে?"

১৬৬০ হইতে ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শেখ আবদুন্নবী ছিলেন মথুরার ফৌজদার। ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একটি হিন্দুমন্দির ধ্বংস করিয়া উহার ভিত্তির উপর মথুরার বর্ত্তমান সুবৃহৎ জুম্মা মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। রাজা বীরসিংহ দেব বুন্দেলা ৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া কেশবজীর [কেশব-রায়] যে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, উহার একটি ভগ্ন রেলিং বা আবেষ্টনী শাহজাদা দারা শুকো পুনর্নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। আওরঙ্গজেবের আদেশে আবদুন্নবী উহা ধ্বংস করেন। জাঠদের হাতে ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে আবদুন্নবীর জীবনলীলা সাঙ্গ হওয়াতে মথুরাবাসীরা একটি গান বাঁধিয়াছিল; উহার ভণিতা—"নবীজী, তু বিনা সুন্ন মথুরা"—নবীজী, তোমা বিনা মথুরা আজ শূন্যপুরী। ১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দে রমজান মাসের রোজার সময় ধর্ম্মপ্রাণ সম্রাট্ কেশবজীর মন্দির ধ্বংস করিতে জরুরি আদেশ দিয়াছিলেন; অল্প দিনের মধ্যে তাঁহার কর্ম্মচারীরা এ কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া ছোট বড় মূর্ত্তিগুলি আগ্রায় পাঠাইয়াছিল। এগুলি এখন আগ্রার জাহানারা-মসজিদের সিঁড়ির নীচে প্রোথিত আছে।

বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর মন্দির কোন্ বৎসর ধ্বংস করা হইয়াছিল, ইতিহাসে তাহার কোন উল্লেখ নাই। কেশবজীর মন্দির ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে কিংবা অল্পকাল পরে বৃন্দাবনের মন্দিরগুলি ধ্বংস করা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। গোবিন্দজীর মন্দিরের গর্ভগৃহ—যেখানে বিগ্রহ স্থাপিত ছিল, সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হইয়াছিল; অন্যান্য অংশ মণ্ডপের ছাদের বরাবর করিয়া ভাঙা হইয়াছে। মুসলমানেরা বোধ হয়, মন্দিরের বর্ত্তমান অংশকে উচ্চ মঞ্চে পরিবর্ত্তিত করিয়া উহার উপর মথুরার মসজিদের মত একটি মসজিদ তৈয়ার করিবার অভিপ্রায়ে ইহা প্রায় অটুট রাখিয়াছিল। মধ্যচূড়ার ভগ্ন অংশের চারি দিকে একটা সামান্য ইটের দেওয়াল গাঁথা ছিল। বর্ত্তমানে ঐ কদর্য্য অংশ স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। কথিত আছে, এই ভাবে ইহাকে একটা মসজিদের মত করা হইয়াছিল; আওরঙ্গজেব উহাতে নমাজ পড়িয়াছিলেন। গোবিন্দজীর বিগ্রহ মন্দির-ধ্বংসের পূর্ব্বেই গোপনে আম্বরে নীত হইয়াছিল; এখন তিনি সেখানে পূজা পাইতেছেন। গোবিন্দজীর ভগ্ন গর্ভগৃহ পরবর্ত্তী কালে ইট-সুরকী দিয়া কোন প্রকারে দেবস্থানের উপযোগী করা হইয়াছে। বর্ত্তমান বিগ্রহ গিরিগোবর্দ্ধনধারীর মূর্ত্তি; দুই পাশে মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ।

মণ্ডপের পশ্চিম ভাগে একটি সংস্কৃত-প্রশস্তি লেখা ছিল। উহার ভগ্ন অংশটুকু গ্রাউস সাহেবের সময়ও পাঠোদ্ধারের প্রায় অযোগ্য ছিল। উহা হইতে আমরা জানিতে পারি, ১৬৪৭ বিক্রমাব্দে (১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে) কচ্ছবাহ-রাজ মানসিংহ রূপ-সনাতন গুরুদ্বয়ের নির্দ্দেশানুসারে এ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। গোসাই রূপ ও সনাতন হোসেন-শাহী আমলের লোক। গ্রাউস সাহেব লিখিয়াছেন, ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎকার হইয়াছিল এবং নিধুবনে তাঁহাদের কৃপায় বাদশাহ্ লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সনাতন গোস্বামীর মৃত্যু ১৫৫৮ এবং রূপ-গোস্বামীর মৃত্যু ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে হইয়াছিল বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।* সুতরাং ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা মানসিংহ তাঁহাদের প্রতি ভক্তিবশতঃ এ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন—এ কথা বলা যায় না। গোস্বামীরা বৃন্দাবনে আসিয়া সর্ব্বপ্রথমে বৃন্দা দেবীর এক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ; কেহ কেহ বলেন, ঐ মন্দির "সেবাকুঞ্জে"র মধ্যে অবস্থিত ছিল ; বৃন্দা দেবীর মন্দিরের কোন নিদর্শন নাই। অন্য প্রবাদ, গোবিন্দজীর মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম মণ্ডপের বহিঃপ্রাঙ্গণের মধ্যে "পাতালদেবী" নামক যে ভূগর্ভস্থ গুম্ফা আছে, উহাই গোসাইগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বৃন্দা দেবীর আদি মন্দির।

উক্ত শিলালিপি মানসিংহ কর্ত্তৃক খোদিত আদি প্রশস্তি কি না বিশেষ সন্দেহ আছে। আমার মনে হয়, পরবর্ত্তী কালে বাঙালী গোস্বামিগণ এই ভগ্ন মন্দিরে বর্ত্তমান বিগ্রহ স্থাপিত করিয়া মন্দিরের উপর নিজেদের দাবী দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এই প্রশস্তি পরে যোজনা করিয়াছেন। গোবিন্দজীর পূজারী পাণ্ডারা এখনও জয়পুরে আছেন। তাঁহাদের আদিপুরুষ এই গোস্বামিদ্বয়ের কোন বাঙালী সেবক ছিলেন, ইহা প্রমাণিত না হওয়া পর্য্যন্ত গোবিন্দজীর মন্দির-নির্ম্মাণে বাঙালী গোস্বামীদের কোন সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ সম্বন্ধ ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। যাহা হউক, ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে গোবিন্দজীর মন্দির যে রাজা মানসিংহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, মন্দির-গাত্রে খোদিত মন্দির-নির্ম্মাতা শিল্পীদের নামযুক্ত একখানি হিন্দী শিলালিপি দ্বারা তাহা নিঃসন্দেহ প্রমাণিত হয়। গ্রাউস্ সাহেব ইহার নিম্নলিখিত পাঠোদ্ধার করিয়াছেন :—

"সংবত্ ৩৪ শ্রী শকবন্ধ অকবর শাহ রাজ শ্রীকর্ম্মকুল শ্রী পৃথিরাজাধিরাজ বশ মহারাজ শ্রীভগবন্তদাসসুত শ্রীমহারাজাধিরাজ শ্রী মানসিংহদেব শ্রী বৃন্দাবন জোগপীঠস্থান মন্দির করাজৌ শ্রীগোবিন্দদেব কো কাম উপরি শ্রী কল্যাণ দাস আজ্ঞাকারী মাণিকচন্দ চোপাড়ু শিল্পকারি গোবিন্দদাস দীলবলি কারিগরুঃ দঃ। গোরখদসুবৌংভবল্ ॥"†

---

* বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১০।

† এই শিলালিপির কোন শুদ্ধ পাঠ কোথাও ছাপা হইয়াছে কি না, আমার জানা নাই। দঃ শব্দটির কোন অর্থ গ্রাউস্ সাহেব দেন নাই। মুসলমানেরা "Peace be on him" অর্থদ্যোতক আরবী কথা কয়েকটির পরিবর্ত্তে সংক্ষেপতঃ "দঃ" ব্যবহার করিয়া থাকেন। সুতরাং "দীলবলি কারিগরু" সম্ভবতঃ কোন মুসলমান কারিগরের নাম—যাহার জন্য "দঃ" "Peace be on him"—প্রার্থনাবাণী যোজনা করা হইয়াছে।

শ্রীবিক্রমাদিত্য আকবর শাহ্ রাজ-সংবৎ (regnal year) চতুস্ত্রিংশ বর্ষে কূর্ম্মকুলোদ্ভব [কচ্ছবাহ = কচ্ছপঘাত] রাজাধিরাজ শ্রীপৃথ্বীরাজবংশজাত মহারাজ শ্রীভগবন্ত দাস-সুত মহারাজাধিরাজ শ্রীমানসিংহ দেব কর্ত্তৃক যোগ-পীঠস্থান শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দদেবের এই মন্দির নির্ম্মিত হইল। [ইহার] কাম-উপরি [সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ?] শ্রীকল্যাণ দাস, আজ্ঞাকারী [পরিচালক] শ্রীমাণিকচাঁদ চোপাড় (?), শিল্পকারী [architect] গোবিন্দদাস…*

গ্রাউস্ সাহেব ইহার অনুবাদ করিয়াছেন :—

"In the 34th year of the era inaugurated by the reign of the Emperor Akbar, Sri Maharaj Man Sinh Deva, Son of Maharaj Bhagavan Das, of the family of Maharaj Prithiraj, founded, at the holy shrine of Brindaban, this temple of Govind Deva. The head of the work Kalyan Das, the Assistant Superintendent, Manik Chan Chopar (?), the architect, Govind Das of Delhi, the sculptor, Gorakh Das" (*ibid.*, p. 145.)

উক্ত অনুবাদে "শকবন্ধ" শব্দটি বাদ পড়িয়াছে। হিন্দুরা আকবর বাদশাহ্‌কে শকবন্ধ বা "শকারি বিক্রমাদিত্য" বলিয়া অভিহিত করিত। "কর্মকুল" সংস্কৃত কূর্ম্মকুল বা রাজস্থানী "কচ্ছবাহ্"-বংশোদ্ভব অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। "কাম-উপরি" রাজস্থানী কারবারী এবং মারাঠা "কারভারী" অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। টাকাপয়সার হিসাবরক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক (সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট) অর্থে ইহা প্রযুক্ত হইয়াছে। "আজ্ঞাকারী" বোধ হয় অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নয়; ইহা আজ্ঞাকারক অর্থাৎ পরিচালক (supervisor) অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। "Chopar" কোন শব্দ নাই, মাণিকচাঁদ চোপ্‌রা ক্ষত্রী হইতে পারে। চোপ্‌রা পঞ্জাবী ক্ষত্রী [বৈশ্য]দের মধ্যে এখনও প্রচলিত উপাধি। "দীলবলি" শব্দটি গ্রাউস সাহেব "দেহেল্‌বী" অর্থাৎ দিল্লীওয়ালা অর্থে লইয়াছেন। আমার মনে হয়, ইহা ভুল। যদি এই শব্দদ্বারা উহাই প্রকাশ করা লেখকের অভিপ্রায় হইত, তাহা হইলে শুধু "দীলবি" লেখা হইত। "দীলবলি" মুসলমানী নাম Dilwar [দিলবর] বলিয়া সন্দেহ করিবার কারণ আছে। কারণ, দঃ [Peace be on him !] এই আশীর্ব্বাণী কোন মুসলমানের নামের পর লিখিবার প্রথা আছে। দ্বিতীয়তঃ, সম্রাট্ আকবর হিন্দু ও মুসলমান উভয় স্থাপত্যধারার অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধন করিয়া ভারতবর্ষের জাতীয়তাদ্যোতক নূতন যে স্থাপত্যকলা প্রচলিত করিয়াছিলেন এবং যাহার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন তাঁহার ফতেপুর সিক্রী—সেই নূতন ধারা অনুসারে গোবিন্দজীর মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। গম্বুজাদি-নির্ম্মাণে মুসলমানেরাই অধিকতর দক্ষ ছিল। সুতরাং মনে হয়, হিন্দু গোবিন্দ দাস ছিল architect এবং "দিলবর" নামক ব্যক্তি ছিল কারিগর অর্থাৎ প্রধান রাজমিস্ত্রী।

* কাম-উপরি = মারাঠা কারভারী, হিন্দী কারবারী; আজ্ঞাকারী = আজ্ঞাকারক অর্থাৎ পরিচালক অর্থে অবহৃত হইয়াছে; চোপাড় = চোপরা, পঞ্জাবী ক্ষত্রী অর্থাৎ বৈশ্যদিগের মধ্যে এই উপাধি প্রচলিত আছে।
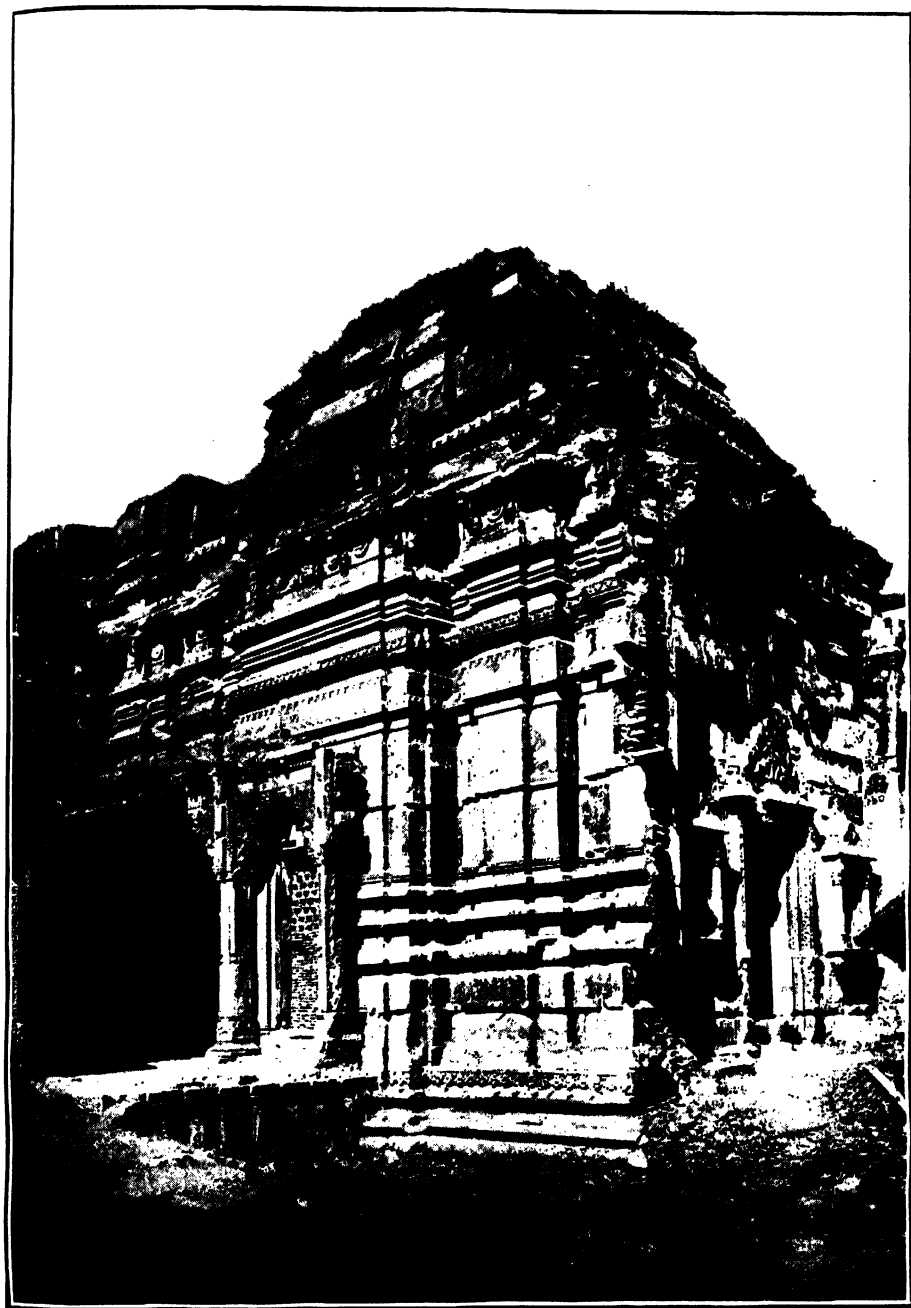
গোপীনাথজীর মন্দির—বৃন্দাবন

যাহা হউক, এই দ্বিতীয় শিলালিপিদ্বারা নিঃসংশয় প্রমাণিত হইতেছে, মহারাজ মানসিংহ্ আকবরের রাজত্বের ৩৪ বর্ষে অর্থাৎ ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে গোবিন্দজীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। গোবিন্দজীর মন্দিরের দক্ষিণ-মণ্ডপের সম্মুখে একটি "ছত্রী" ছিল। বর্ত্তমানে উহা পশ্চিমাংশে নূতন করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। মহারাণা অমর সিংহের দ্বিতীয় পুত্র রাজা ভীমের বিধবা পত্নী রম্ভাবতী এই চৌখণ্ডী বা ছত্রী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সম্রাট্ শাহ্জাহানের রাজত্বে ১৬৯৩ বিক্রম-সংবৎ (১৬৩৬ খ্রীঃ) কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে উহার প্রতিষ্ঠা হয়। ছত্রীর একটী স্তম্ভের গাত্রে রাজপুতানী ভাষায় লিখিত একটি শিলালিপি পাঠে উক্ত বিবরণ জানা যায় (*ibid.*, p. 146)। শাহ্জাহানের দরবারী ইতিহাস আবদুল হামিদ লাহোরী-লিখিত বাদশাহ্নামায় উল্লেখ আছে—জাহাঙ্গীর তাঁহার রাজত্বের শেষভাগে এক আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন যে, হিন্দুরা তাঁহার রাজ্যে কোথাও নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করিতে পারিবে না। এই নিষেধ প্রবর্ত্তিত হওয়ার পূর্ব্বে হিন্দুরা যে সমস্ত মন্দির নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছিল, শাহ্জাহানের রাজ্যারোহণের পর সেই অর্দ্ধনির্ম্মিত মন্দিরগুলি সম্পূর্ণ করিবার প্রার্থনা করিয়া তাহারা এক আবেদন করিয়াছিল। কিন্তু ইহাতে ফল হইল বিপরীত। সম্রাট্ আদেশ দিলেন, নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করা দূরে থাক্, পূর্ব্বকৃত মন্দিরগুলিও ভাঙিয়া ফেলিতে হইবে। বাদশাহ্নামার এক স্থানে লেখা আছে—অমুক তারিখে খবর পৌঁছিল, একমাত্র কাশীর আশপাশে ৭২টি হিন্দু মন্দির ধ্বংস করা হইয়াছে। সুতরাং এরূপ ধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমান সম্রাটের রাজত্বে রাণী রম্ভাবতী-কর্ত্তৃক এই ছত্রী নির্ম্মিত হওয়ার পশ্চাতে হয়ত কিছু ইতিহাস আছে। রাজা ভীম জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী খুর্‌রম বা শাহ্জাহানের বিশেষ বন্ধু এবং বিপৎকালের সহচর ছিলেন এবং তাঁহার জন্য যুদ্ধ করিয়া মারা গিয়াছিলেন। এই জন্যই বোধ হয় শাহ্জাহান কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হইয়া তাঁহার বিধবা বন্ধুপত্নীর এই শরিয়ৎ-বিরোধী কার্য্য অনুমোদন করিয়াছিলেন। ইহার অবশ্য নজীরও ছিল। সম্রাট্ জাহাঙ্গীর কাংড়ার জ্বালামুখী-মন্দিরে গোহত্যা করিয়া উহাকে মসজিদে পরিণত করিয়াছিলেন; কিন্তু আবার তিনিই আবুলফজলের হত্যাকারী বীরসিংহ দেব বুন্দেলা কর্ত্তৃক মথুরায় সুবিশাল কারুকার্য্যখচিত কেশবজীর মন্দির নির্ম্মাণ অনুমোদন করিয়াছিলেন। ইহাকেই বলে বাদশাহী খেয়াল; কিন্তু আওরঙ্গজেব ছিলেন শরিয়তের একনিষ্ঠ সাধক।

মহারাজা মানসিংহ্ গোবিন্দজীর সেবার জন্য বিপুল ভূসম্পত্তি দেবোত্তর করিয়া গিয়াছিলেন। জয়পুরের মহারাজারা এই মন্দিরের পুরুষানুক্রমিক অভিভাবক। ইহার জমিদারির আয় প্রায় ৪৫০০৲ টাকা। জয়পুর এলাকায় একটি ও আলোয়ার রাজ্যে একটি গ্রাম এই জমিদারির অন্তর্ভুক্ত। বৃন্দাবনে রাধাবাগ এবং অনেক বাড়ীও গোবিন্দজীর সম্পত্তি। লালাবাবুর মন্দিরের জমিও গোবিন্দজীর জমিদারি হইতে খরিদ করা হইয়াছে। এ জন্য লালাবাবুরা প্রতিবৎসর ১০২৲ টাকা জমা দিয়া থাকেন।

গোপীনাথজীর মন্দির

গোপীনাথজীর মন্দির মদনমোহনজীর মন্দিরের অনুকরণে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার প্রতিষ্ঠাতা শেখাবতী-রাজ্যের কচ্ছবাহ্ সামন্ত রায়সালজী। আকবরনামায় ইনি রায়সাল দরবারী বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ইহাঁর মণ্ডপটি সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হইয়াছে। এই মণ্ডপের স্থাপত্যবৈশিষ্ট্যও অপূর্ব্ব ছিল। ইহার উত্তরাংশে গোপীনাথজীর বর্ত্তমান মন্দির অবস্থিত। আকবরনামা, মাসির-উল-উমারা ও টডের রাজস্থানে রায়সালজীর জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। এই মন্দিরের নির্ম্মাণকাল অবশ্য আকবরের রাজত্বসময়ে। কিন্তু সঠিক তারিখযুক্ত কোন শিলালিপির অনুসন্ধান এ যাবৎ পাওয়া যায় নাই। ইহার দেবোত্তর সম্পত্তির আয় বার্ষিক ১২০০৲ টাকা। গোপীনাথজীর দেবোত্তর হইতে বার্ষিক ১৮৲ টাকা জমায় শেঠ-উদ্যানের জমির কিছু অংশ ক্রয় করা হইয়াছে।

যুগলকিশোরজীর মন্দির

বৃন্দাবনে মধ্যযুগের হিন্দু স্থাপত্যের আর একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন যুগলকিশোরজীর মন্দির। কেশীঘাটের নিকট এই মন্দিরের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান। ইহার গর্ভগৃহ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়াছে। গ্রাউস্ সাহেব এই মন্দির ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাহার কোন প্রমাণ তিনি উল্লেখ করেন নাই। জনশ্রুতি অনুসারে এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা নোন্-করণ (বা লুনকরণ) নামক একজন চৌহান ঠাকুর। এই নামের কোন চৌহান ঠাকুরের ঐতিহাসিক পরিচয় তাঁহার জানা ছিল না বলিয়াই তিনি লিখিয়াছেন—এই নোন্-করণ বোধ হয়, গোপীনাথজীর মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা শেখাবৎ রায়সালজীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নোন্-করণ। জনশ্রুতি উপেক্ষা করিয়া এইরূপ অনুমানের পক্ষে কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। নোন্-করণ বা লুনকরণ নামে রাজপুতানায় সম্ভরের এক রাজা ছিলেন। আকবরনামায় এই নোন্-করণ বা লুনকরণের একাধিক বার উল্লেখ আছে। মারবাড়ের রাও মালদেব কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়ায় ইনি নাগোরের শাসনকর্ত্তা মীর্জা শরফ-উদ্দীনের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন; পরে তিনি কচ্ছবাহ-রাজ ভড়মলের [বিহারী মল] সহিত একত্র হইয়া আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন। আকবরের সামন্তশ্রেণীভুক্ত হইয়া তিনি অনেক যুদ্ধে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার সময়—আকবরের রাজত্বের প্রথম ভাগ। শূরশ্রেষ্ঠ পৃথ্বীরাজের সময় হইতে সম্ভর-রাজ্য চৌহানকুলের অধীন ছিল। পৃথ্বীরাজও হিন্দী কাব্যাদিতে সম্ভরী-রায় * বলিয়া কথিত হইয়াছেন। সুতরাং এই চৌহান-বংশীয় নোন্-করণই যুগলকিশোরের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া যে জনশ্রুতি চলিয়া আসিতেছে, উহা ঐতিহাসিক সত্য সন্দেহ নাই। স্থাপত্যধারার দিক্ দিয়া বিবেচনা করিলেও ইহা প্রমাণিত হয় যে, এই মন্দির আকবরের সমকালীন।

---

* চাঁদকবির পুত্র জল্হন্ পৃথ্বীরাজের মৃত্যুবর্ণনায় লিখিয়াছেন :—

পরিয়ো সংভরী রায় দীসৈ উতংগা ;
মনৌ মের বজ্রী কিয়ঁ শৃংগ ভংগা।

অর্থাৎ সংভর-পতি ভূপাতিত হইলে অষ্ট দিক্ কাঁপিয়া উঠিল; মনে হইল, যেন বজ্রধারী ইন্দ্রদেব মেরুশৃঙ্গ ভূপাতিত করিলেন।
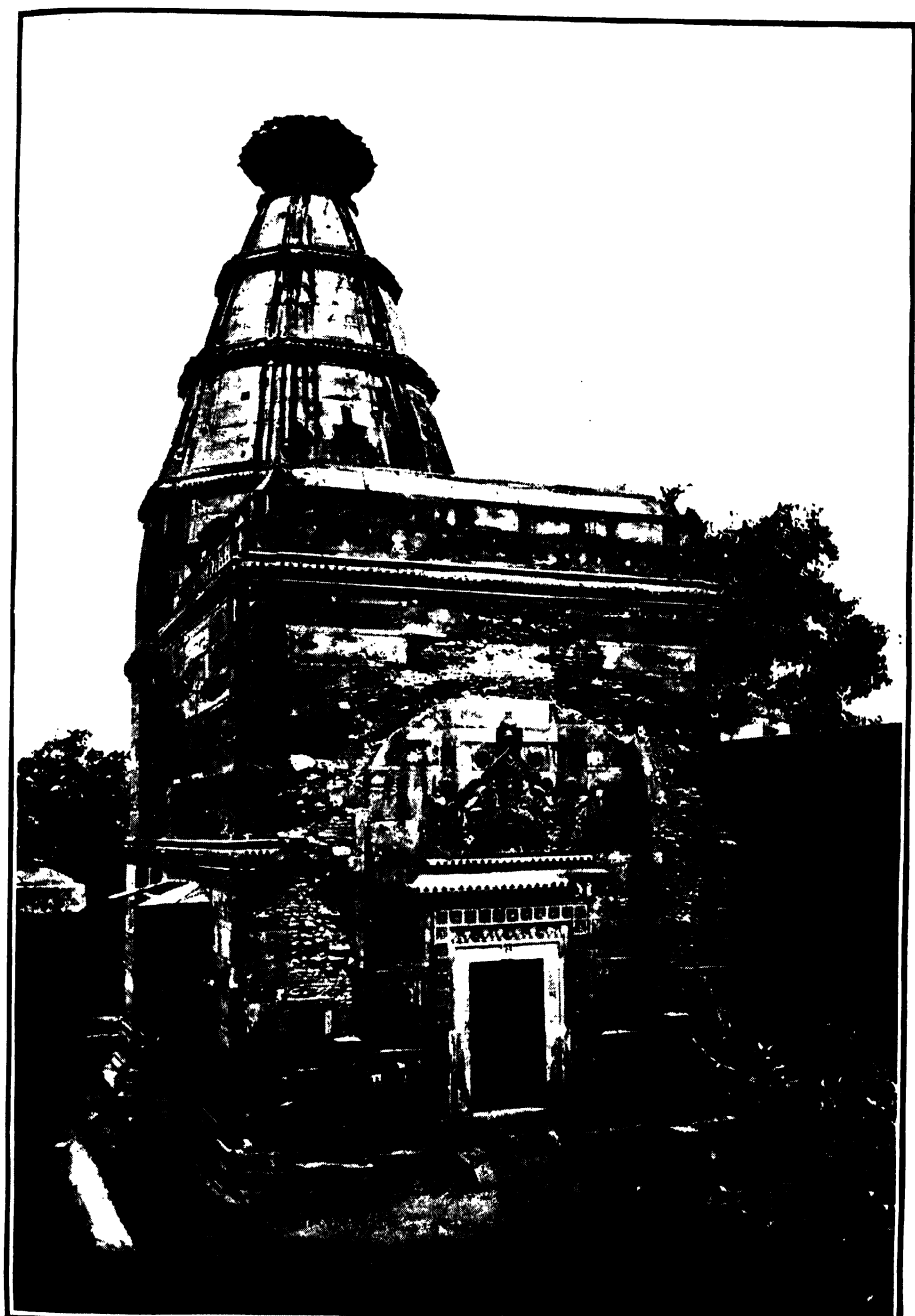
যুগলকিশোরজীর মন্দির—বৃন্দাবন

চোরের পাঁচালি

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী, এম-এ,

'চুরিবিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা,' এই প্রসিদ্ধ প্রবাদের দৃষ্টান্ত হিসাবে বহু গল্প বাংলার পল্লীতে পল্লীতে প্রচলিত রহিয়াছে। চোরের বুদ্ধির প্রখরতা এই সকল গল্পের প্রতিপাদ্য বিষয়। এই জাতীয় কোন কোন গল্পের সহিত অনেকেরই অল্পবিস্তর পরিচয় আছে। বাংলার নানা প্রান্তে চুরিবিদ্যার উৎকর্ষ ও চোরের কৃতিত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন উপাখ্যান বা রূপকথার প্রচলনের পরিচয় পাওয়া যায়। 'সন্দেশ' নামক অধুনালুপ্ত শিশুদের মাসিক-পত্রে 'চোরচক্রবর্ত্তী' নামে এইরূপ একটি উপাখ্যান প্রকাশিত হইয়াছিল। গুরুর নিকট চুরিবিদ্যায় উৎকর্ষ লাভ করিয়া পাখীর ডানার তলা হইতে পাখীকে না জানাইয়া ডিম চুরি করা, কোনও দ্বীপের রাজাকে পূর্বে সতর্ক করিয়া চুরির উপদ্রবে তাঁহার রাজ্য ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলা প্রভৃতি পরীক্ষায় সর্বথা কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়া চাষীর ছেলে কিরূপে 'চোরচক্রবর্ত্তী' উপাধি ও রাজ্য লাভ করিয়াছিল, তাহার বিবরণ এই উপাখ্যানে আছে। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তি-প্রণীত 'চোরচূড়ামণি'[১] নামক এক পুস্তকে এক রাজপুত্রের চুরিবিদ্যায় কৃতিত্বের বিবরণ পাওয়া যায়। সমস্ত বিদ্যা অধিগত হইবার পর রাজপুত্র চুরিবিদ্যা শিক্ষা করেন এবং পাখীকে না জানাইয়া তাহার ডানার তলা হইতে ডিম চুরি, রাজার গলা হইতে হার চুরি, এবং দেশান্তরের রাজাকে খবর দিয়া তাঁহার কন্যার গলা হইতে বহুমূল্য হার চুরি করা প্রভৃতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি সকলকে বিস্ময়বিমুগ্ধ করেন। যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়-লিখিত 'মজার গল্প' নামক পুস্তকেও চোরের কৃতিত্ববিষয়ক একটি গল্প আছে। বস্তুতঃ চোরের পাঁচালি বা চোরের উপাখ্যানমূলক এক জাতীয় পুস্তক পুরান বাংলা-সাহিত্যে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। পুরান বাংলায় রচিত এইরূপ একাধিক পাঁচালির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। একখানি পাঁচালি কয়েকবার মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। ইহার নাম 'চোরচক্রবর্তি'। ইহার চতুর্থ সংস্করণের ১৩১৩ হিজরি বা ১৮৯৫-৬ খ্রীষ্টাব্দের গোলাম মওলা নামাঙ্কিত মোহরযুক্ত এক খণ্ড বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুস্তকালয়ে আছে। ইহার পাতা-গুলি তথাকথিত 'মুসলমানী বাংলা পুথি'র মত ডান হইতে বাঁ দিকে সাজান। মূল পুস্তকের রচয়িতা, প্রাপ্তিস্থান ও প্রকাশের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে প্রকাশকের উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

এই পুস্তকের মুসাবিদাকারক মৃত পশুপতি এবং স্থানে স্থানে বির কাসিস্বর সন্ধ লেখা আছে[২]।

১। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দাসও 'চোরচূড়ামণি' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

২। কালিকাপ্রসাদে রচে কবি কালিদাসে—পৃঃ ৩। বলে বীর কাশীশ্বর সদয় ভগবতী—পৃঃ ১০। বলে বীর কাশীশ্বর দেবীর চরণে—পৃঃ ২০। গোলাম মওলা কয়—পৃঃ ২৩। বলে বীর কাশীশ্বর কালিকার বরে—পৃঃ ২৮। গোলাম মওলা বলে—পৃঃ ১৬।

এই চোর চক্রবর্ত্তির পুস্তক জেলা বগুড়ার কলুমগাড়ি সাকিনের শ্রীজুত মুন্সি সহরুল্লা ও উক্ত সাহেবের সাগ্রেদ শ্রীমুন্সি জমিরদ্দি আখন্দ সাহেবানদিগের সম্পূর্ণ সাহায্যে ও মেহেরবানিতে ঐ মুসবিদা আনাইয়া আমি শ্রীগোলাম মওলা অনেক পরিশ্রমে ঐ মুসবিদার কাপি সংসোধনপূর্ব্বক এবং স্থানে ২ নিজে রচনা করিয়া নিজ খরচ পত্রে সিবাদহ হাজিপাড়া সাকিনে আমার হবিবি প্রেসে চতুর্থবার ছাপাইয়া প্রকাশ করিলাম।

এই পুস্তকে 'চোরচক্রবর্ত্তী' উপাধিধারী প্রসিদ্ধ চোরের চমকপ্রদ উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। এই চোরচক্রবর্ত্তীর কাহিনী অবলম্বনে লিখিত আর একখানি পুস্তকের পুথি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় আছে। দীর্ঘকাল ধরিয়া নানা প্রসঙ্গে পরিষৎ-কর্ত্তৃপক্ষ ইহাকে একখানি মূল্যবান পুথি বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই পুথির আলোচ্য বিষয়ের কোনও পরিচয় এ যাবৎ কেহ প্রদান করেন নাই; কি হিসাবে ইহার মূল্য, তাহাও নির্ণীত হয় নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই দুই প্রসঙ্গেরই যথাসম্ভব আলোচনা করা হইবে।

এক প্রসিদ্ধ সুচতুর চোরের চৌর্য বর্ণনাই এই গ্রন্থের উপজীব্য বিষয়—ইহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তবে পূর্বকথিত মুদ্রিত পুস্তকের সহিত ইহার সাদৃশ্য থাকিলেও মিল নাই।[৩] এই পুথিতেও বীর কাশীশ্বরের ভণিতা আছে সত্য, তথাপি ইহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র গ্রন্থ। বোধ হয়, পুথিতে প্রাপ্ত কাশীশ্বরের গ্রন্থাবলম্বনে মুদ্রিত গ্রন্থখানি পশুপতিকর্ত্তৃক রচিত ও গোলাম মওলা কর্ত্তৃক সংস্কৃত হইয়াছিল। পুথির নকলের তারিখ ১১৭২ সাল। দুই পুস্তকেই চোর কালীর উপাসক—মুদ্রিত পুস্তকের মতে কালীর নিকট হইতেই চোর চুরিবিদ্যা শিক্ষা করে (পৃঃ ৩)।[৪] উভয় পুস্তকের বর্ণনীয় বিষয় এক—খুঁটিনাটি বিষয়ে কিছু কিছু পার্থক্য আছে মাত্র। এই সকল পার্থক্যের কথা পুথিখানির বর্ণনাপ্রসঙ্গে নিম্নে যথাস্থানে উল্লিখিত হইবে। মনে হয়, এক যুগে চোর-চক্রবর্ত্তীর নাম বাংলা দেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল এবং তাঁহার কীর্ত্তিবিষয়ক নানা উপাখ্যান জনসমাজে প্রচলিত হইয়াছিল। ইতঃপূর্বে উল্লিখিত 'সন্দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত উপাখ্যান ও চোরচূড়ামণির উপাখ্যান এই বহুপ্রচলিত বিক্ষিপ্ত উপাখ্যান-সমষ্টির অংশবিশেষ বলিয়া মনে হয়। এই উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত এক গ্রন্থের

৩। মাঝে মাঝে দুই এক পংক্তি প্রায় মিলিয়া যায়:—

> এক হাতে গুআ পান আর হাতে ঝাড়ি।
> স্বামীকে ভেটিতে জায় সাধুর কুমারী॥ (১৮ খ, পৃঃ ৩১)।
> অকুলীন ধন হৈলে হয়ত কুলীন।
> কুলীন নির্ধন হৈলে হয় বড় হীন॥ (১৯ ক, পৃঃ ৩২)

৪। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে মহাদেবের পুত্র দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে চৌর্যশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

কথা ১২১৩ সনে রাজা পৃথ্বীচন্দ্র-রচিত 'গৌরীমঙ্গল' নামক গ্রন্থেও উল্লিখিত হইয়াছে।[৫] আমাদের উল্লিখিত কোনও গ্রন্থের সহিত পৃথ্বীচন্দ্রের উল্লিখিত গ্রন্থ অভিন্ন কি না, বলিবার উপায় নাই। বর্ত্তমান অবস্থায় ইহাদের কোনখানিরই রচনা-কাল নির্ণয় করাও সম্ভবপর নহে। তবে এই দুইখানি পুস্তক হইতে দেবতার পাঁচালিপরিপূর্ণ পুরান বাংলা সাহিত্যে এক নূতন ধরণের পাঁচালির সন্ধান পাওয়া যাইতেছে, প্রাচীন সাহিত্যামোদীর নিকট ইহাদের কিছু মূল্য আছে। তাই ইহাদের একটু বিস্তৃত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল। রূপকথার ইতিহাসের দিক্ হইতেও এই সমস্ত গল্পের মূল্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবে দুঃখের বিষয়, বাংলা দেশে প্রচলিত এই জাতীয় গল্পগুলি সুশৃঙ্খল আলোচনার অভাবে পণ্ডিতসমাজের তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তাই ব্লুমফীল্ড নামক প্রসিদ্ধ মার্কিন পণ্ডিত "The art of stealing in Hindu fiction"[৬] নামক বিস্তৃত প্রবন্ধে বাংলা দেশে প্রচলিত উপাখ্যানের বিশেষ বিবরণ প্রদান করিতে পারেন নাই।

চোরের রীতিনীতি সম্বন্ধে সাধারণকে সচেতন করাই আলোচ্য পুস্তকের উদ্দেশ্য—চোরের প্রশংসা বা চৌর্যের উৎসাহ প্রদান ইহার কাম্য নহে। তাই গ্রন্থকার প্রথমেই বলিয়াছেন,—

চৌরচক্রবর্তিকথা শুনিতে মোধুর।
জে কথা শুনিলে লোক হয় ত চতুর ॥[৭]

চোরের নাম খরবর—পিতা বিজয়নগরের রাজার পাত্র উগ্রসেন, মাতা গুণবতী (পত্র ১ খ, ২ খ)।[৮] কাব্য, জ্যোতিষ ও অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া খরবর 'কৌতুকে শিখিল উত্তম অধম চৌরবিদ্যা' (৩৬ ক)।[৯] অতঃপর, চম্পাবতী নগরীর কর্তৃপক্ষের

৫। চোরচক্রবর্ত্তীকীর্ত্তি ভাষায় রচিল।
বিক্রমাদিত্যের কীর্ত্তি পয়ার করিল ॥—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৩, পৃ. ৫০।

এই কবিতায় দুইখানি গ্রন্থের কথা ('চোরচক্রবর্তিকীর্তি' ও 'বিক্রমাদিত্যকীর্তি') উল্লিখিত হইয়াছে মনে হয়। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় মনে করেন (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ১ম সংস্করণের ভূমিকা, পৃ. ১৩) ইহাতে চোরচক্রবর্তিরচিত বিক্রমাদিত্যের উপাখ্যানের উল্লেখ করা হইয়াছে।

৬। *American Journal of Philology*, ৪৪শ খণ্ড, পৃঃ ৯৭-১৩৩, ১৯৩-২২৯।

৭। মুদ্রিত গ্রন্থের মতে—'চোরচক্রবর্তি নাম রহে জার ঘরে। চোরে না দেখিবে চক্ষে তাহার মন্দিরে' (পৃঃ ২)। 'এই পুথি যেই জন ঘরেতে রাখিবে। তার ঘরে চোর চুরি করিতে নারিবে' (পৃঃ ৭৯)।

৮। মুদ্রিত পুস্তকে রাজার নাম রত্নেশ্বর বা বাণেশ্বর, পাত্রের স্ত্রীর নাম কলাবতী, চোরের বাড়ী বিক্রমপুর—'সোনার গ্রাম বিক্রমপুর মোর বাড়ীঘর' (পৃঃ ১১)। পুথিতেও এক স্থানে (৩৬ ক) কলাবতী নাম আছে। এই স্থানে চোরের আসল নামের উল্লেখও আছে—'বাছিঞা রাখিল মোর নাম কৃষ্ণ করি।'

৯। যে চতুঃষষ্টিকলা লোকের নিকট বিশেষ আদর ও সম্মান পাইত, তাহার মধ্যে চুরি-

অত্যাচারে ত্রস্ত হইয়া চোরের দল চোরচক্রবর্ত্তীর নিকট নিজেদের দুঃখের কথা জানাইলে

শুনিঞা প্রতিজ্ঞা কৈল চৌর খরবর ॥
জতেক চৌরের মধ্যে আমি নরপতি।
আমা বিদ্যমানে করে এতেক দুর্গতি ॥
শুনিঞা চৌরের কথা কোপিল প্রচণ্ড।
চাম্পাবতী পুরীখান করিমু লণ্ডভণ্ড ॥
তবে চৌরচক্রবর্ত্তী নাম সাফল।
চাম্পাবতী পুরীখান করিমু বিকল ॥
নগরিঞা লোক সব করিমু ভিখারী।
কেমতে রাখিবে রাজা আপনার পুরী ॥ (১খ)

গোপনে যাওয়া লজ্জার বিষয় মনে করিয়া চোর, এক পত্র দ্বারা নিজের প্রতিজ্ঞার কথা প্রথমে রাজাকে জানাইয়া দিল। তার পর চোর 'উর্দ্ধজানু করিঞা' কালীর ধ্যান করিল এবং দেবীর বরে বলীয়ান্ হইয়া প্রত্যুষে যাত্রা করিল। তপস্বীর বেশে চাম্পাবতী পুরীতে প্রবেশ করিয়া চৌকিদারের নিকট নিজের পরিচয় ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলিল—

শিশুকাল হইতে আমি হইলাউ সন্ন্যাস।
অযোধ্যাতে ঘর আমার নাম কৃষ্ণদাস ॥
নানাতীর্থ ভ্রমিতে আমি হাবিলাস করি। (৩খ)

তীর্থভ্রমণের দীর্ঘ বিবরণে সন্তুষ্ট না হইয়া চৌকিদার চোরকে রাজার নিকট লইয়া যাইতে চাহিলে চোর কপট ক্রোধের আশ্রয় গ্রহণ করিল। ভয়ে চৌকিদারও তাহাকে ছাড়িয়া দিল। নগরের মধ্যে রাজার মালীর নিকট নিজের প্রকৃত পরিচয় দিয়া, চোর তাহার সহিত বন্ধুত্ব করিল। মালীও তাহাকে অভয় প্রদান করিল—

রাজার প্রসাদে অমি কাকো না ডরাই।
বিশেষে রাজাকে আমি পুষ্প জোগাই ॥
মহাসুখে থাক তুমি না ভাবিহ ডর।
নির্ভয়ে থাক তুমি আমার ঘর ॥ (৭গ)

চোর তখন তপস্বীর বেশ ত্যাগ করিয়া, সাধু বা সদাগরের বেশ ধারণ করিল।

কর্ণের কুণ্ডল খসাঞা মালির হাথে দিল।
বিচারিঞা কেশ মাথে লোটাঞা বান্ধিল ॥ (৮ক)

বিদ্যারও স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। মল্লিখিত Two New Lists of kalas—*Indian Historical Quarterly* (৮।৫৪৭) দ্রষ্টব্য। রাজকুমারেরা অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় চুরিবিদ্যায়ও শিক্ষালাভ করিতেছেন, এরূপ বর্ণনা দশকুমারচরিত (কানের সংস্করণ, পৃঃ ২২) প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই বিদ্যাসম্বন্ধে প্রাচীন যুগে সংস্কৃতে বই লেখা হইয়াছিল। দুই একখানি বইয়ের পুথি এখনও পাওয়া যায়। একখানির নাম ষণ্মুখকল্প, আর একখানির নাম চৌরচর্যা বা চৌর্যস্বরূপ। প্রথমখানির পুথি কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটীতে ও দ্বিতীয়খানির পুথি পুণার ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টল রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউটে আছে। কর্ণীসুত বা মূলদেব ছিলেন এই শাস্ত্রের প্রথম গ্রন্থকার। মূলদেব লিখিত কোন বই এখন পাওয়া যায় না। তবে তামিল সাহিত্যে মূলদেবকৃত একখানি চৌর্যশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থের উল্লেখ আছে। তিনি নিজেও একজন প্রসিদ্ধ চোর ছিলেন। তাঁহার চুরির গল্পও এক যুগে বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তাহার কিছু বিবরণ কথাসরিৎসাগর নামক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থে পাওয়া যায়।

এইরূপ সাধুর বেশ ধারণ করিয়া চোর প্রথম দিন বাজারের গোয়ালিনীকে ঠকাইয়া প্রচুর দধিদ্বারা ক্ষুধার নিবৃত্তি করিল—দ্বিতীয় দিন নাপিতকে ঠকাইয়া ক্ষৌরকার্য সমাধা করিল এবং তাঁতীদের ফাঁকি দিয়া বিবিধ মূল্যবান্ বস্ত্র সংগ্রহ করিল। ইহার পর সে নগরের ঘরে ঘরে নিয়মিত চুরি আরম্ভ করিল।

রাত্রি চুরি করে চোর দিনে যায় নিন্দ। নগরিঞা লোক কান্দে মাথে হাথ দিঞা।
প্রভাতে উঠিঞা দেখ সর্ব্বঘরে সিন্ধ॥ হায় হায় করে লোক বিকল হইঞা॥ (১৩ ক)

কিন্তু এত সব করিয়াও চোরের মনে তৃপ্তি হইল না—সে রাজগৃহে চুরি করিবার জন্য কালিকার আরাধনা করিতে লাগিল—

নিশিকালী মহাকালী উন্মত্তকালী নাম।
চরণে পড়হু মাতা আইস এই ধাম॥ (১৪ খ)

দেবী বর দিলেন—'যাহ রাজঘরে আমি থাকিব সঙ্গতি' (১৪ খ)। কিন্তু চোরের ধনের আকাঙ্ক্ষা ছিল না—

চোর বোলে ধন লৈঞা আমি কি করিব।
রানি চুরি করি আমি কলঙ্ক থুইব॥ (১৫ ক)

চোর 'রাজার মন্দিরে গিঞা নিদানি ভেজাইল।' সকলে নিদ্রায় অচেতন হইলে

রানিক লইঞা চোর বাহির করিল॥ চিড়াকুটির স্ত্রীকে নিল সঙ্গেত করিঞা॥
পথেত যাইতে চোর মোনেত ভাবিলা। ত্বরায় আইল চোর রাজার পুরিতে।
চিড়াকুটির[১০] বাড়ি জাঞা প্রবেশ হৈলা॥ চিড়াকুটির স্ত্রীকে থুইল রাজ্যাতে [রাজার শয্যাতে॥]
চিড়াকুটির শয্যাতে রানিক থুইঞা।

নিদ্রাভঙ্গ হইলে রাজা দেখিলেন—পাশে শুইয়া এক রাক্ষসী। 'গুণী' ডাকা হইল—তাহারা মন্ত্র পড়িয়া রাক্ষসী তাড়াইতে চেষ্টা করিল। এ দিকে চিড়াকুটি ভাবিল—তাহার ঘরে দেবীর আবির্ভাব হইয়াছে। তাই পাড়াপড়সী সকলে মিলিয়া পূজার আয়োজন করিতে লাগিল। খবর পাইয়া রাজাও আসিলেন এবং তখন সকলে সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন।

এবার চোর ঠিক করিল, কোটাল দোসাতুর ঘরে চুরি করিয়া নিজ নামের সার্থকতা প্রতিপাদন করিবে।

তবে চৌরচক্রবর্ত্তী নাম পাড়াব।
জাতিনাশ ধননাশ কোটালের করিব। (১৬খ)

দরোয়ানের সহিত কথাপ্রসঙ্গে চোর জানিতে পারিল—কোটালের একমাত্র কন্যা লীলাবতীকে বিবাহ করিয়া সদাগরকুমার বিদ্যাধর দীর্ঘকাল বিদেশে গিয়াছে। কয়েক দিন পরে সদাগরের বেশ ধারণ করিয়া চোর কোটালের বাড়ীতে উপস্থিত হইল এবং কোটালের

১০। মুদ্রিত পুস্তকে চিড়াকুটির-স্থানে সূত্রধরের কথা বলা হইয়াছে (পৃঃ ৪৪)।

জামাতা বলিয়া নিজের পরিচয় দিল। পরম আদর যত্নে সে সেখানে রাত্রি যাপন করিল—লীলাবতী 'যৌবনের মদে পতি না চিহ্নে আপনার' (২০ক)। প্রাতঃকালে কোটাল রাজবাড়ী গেলে চোর রটাইয়া দিল—রাজা কোটালকে বন্দী করিয়াছেন—

হাথেতে বান্ধিঞা রাখিল কারাগারে।
না জানিএ রাজা কিবা করে আরে॥
জাতিপ্রাণ লঞা বুলিল পালাইতে মোরে॥ (২১ ক)

সুতরাং চোর কোটালের দুই স্ত্রী, কন্যা, ধনরত্ন লইয়া পলায়ন করিল। এদিকে রাজা চোর ধরিবার কোনও উপায় করিতে না পারিয়া কলাধর নামক সর্বজান বা সর্বজ্ঞকে আনাইলেন। লোক লইয়া কলাধর চোর ধরিবার জন্য যাত্রা করিল।

বেস্ত হঞা জায় চোর স্থান নাই পায়।
পলাইঞা চোর ধোবার ঘাটে জায়॥ (২৪ খ)

ঘাটে মনোহর ধোপা কাপড় কাচিতেছিল। চোর তাহাকে বলিল,—'রাজার আদেশে কোটাল তোমাকে কাটিতে আসিতেছে।'

চোর বোলে শুন ধোবা আমার বচন। এক গোটা পাতিল মুণ্ডের উপর দিঞা।
জলেত প্রবেশ করি থাকহ এখন॥ জলের ভিতরে তুমি থাকহ লুকাঞা॥ (২৫ ক)

প্রাণের ভয়ে ধোপা চোরের পরামর্শানুযায়ী কাজ করিল—চোর তাহার জায়গায় কাপড় কাচিতে লাগিল। কলাধর সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলে ধোপা-বেশী চোর তাহাকে জানাইয়া দিল যে, চোর জলের মধ্যে লুকাইয়া আছে। তাহার কথামত রাজার লোকেরা ধোপাকে জলের ভিতর হইতে উঠাইয়া রাজার নিকট লইয়া গেল। এদিকে চোর ধোপার সমস্ত কাপড় লইয়া পলায়ন করিল।

আসল চোর ধরিতে না পারায় কোটাল কলাধরকে উপহাস করিতে লাগিল। কলাধরও সাহঙ্কারে বলিল—

তবে মোকে সর্বজান বুলিহ কলাধর।
কালি ধরিঞা দিমু চৌর খরবর॥ (২৭ ক)

এদিকে চোরচক্রবর্তীও চিন্তিত হইয়া চণ্ডী দেবীকে ডাকিতে লাগিল। রাত্রিতে 'গুয়াপান' ও একখানি কাটারি লইয়া চোর কলাধরের বাসায় উপস্থিত হইল। অনেক ডাকাডাকির পর কলাধর জাগরিত হইলে চোর তাহাকে বলিল—'রাজায় গুআপান তোমাকে পাঠাইল।' তখন "গুয়া পান" গ্রহণ করিবার জন্য কলাধর হাত বাড়াইবা মাত্র কাটারির এক আঘাতে চোর তাহা দুই খণ্ড করিল। তার পর সেই কাটা হাত লইয়া রাজবাড়ীতে গেল এবং রাজার ঘরে সিঁধ কাটিল। কেহ জাগরিত আছে কি না, দেখিবার জন্য যেই চোর সেই কাটা হাতখানি ঘরের মধ্যে ঢুকাইয়া দিল, অমনি রাজা তাহার উপর খড়্গাঘাত করিলেন। চোরও কাটা হাত ফেলিয়া পলায়ন করিল। রাজা ভাবিলেন—এইবার চোরকে সনাক্ত করিবার উপায় হইল।

প্রাতঃকালে চোর গণকের বেশ ধারণ করিয়া রাজার বাড়ীতে উপস্থিত হইল। চোরের দৌরাত্ম্যের কথা শুনিয়া সে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া—

পাজি পুথি এড়ি দৈবক মালসাট মারে। আমিত ধরিঞা দিব চোরচক্রবর্ত্তি।
তবে রুদ্রখড়ি গোসাই বুলিহ আমারে॥ নৃপতি বলিল তবে বুজিব তোমার শক্তি॥ (৩০ক)

তার পর রাজাকে সঙ্গে লইয়া চোর কলাধরের বাসায় উপস্থিত হইয়া বলিল—'এই ঘরে চোর আছে।'

নৃপতির আজ্ঞা পাইয়া সান্ধাইল ঘরে। কাটাহাত দেখিঞা সবে বোলে চোর করি।
দেখে শুতিয়া আছে সর্ব্বজান কলাধরে॥ রাজার সাক্ষাতে লঞা আইলেন ধরি॥ (৩১ ক)

রাজা তাহাকে দেখিয়া অনেক তিরস্কার করিলেন এবং তাহাকে কাটিয়া ফেলিবার হুকুম দিলেন। পাইকগণ কলাধরকে বাঁধিয়া লইয়া গেল—নগরের লোকে তাহাকে মনের সুখে প্রহার করিল।

সর্ব্বজানের হাথ টুটা করিল চৌরবরে।
নড়িতে না পারে তবে লোকে প্রহার করে॥ (৩৪ খ)

ইহা দেখিয়া চোরচক্রবর্তীর মনে দুঃখ হইল এবং রাজার নিকট পূর্বাপর সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া বলিল। কোটালকে শিক্ষা দেওয়াই যে তাহার উদ্দেশ্য—চুরি করা যে তাহার উদ্দেশ্য নহে, এ কথা সে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিল। কোটালের চোর তাড়াইবার বিপুল আগ্রহকে উপহাস করিয়া সে বলিল—

হেন ছাড় বড়াই করিলে কিসের কারণ।
কন্যা গেল নারী গেল তোমার ব্যর্থ জীবন॥ (৪০ খ)

সমস্ত শুনিয়া রাজা সন্তুষ্টচিত্তে চোরের সহিত নিজ কন্যা মালাবতীর বিবাহ দিলেন। চোরও কিছু জিনিষ মালীকে দিয়া অপহৃত সমস্ত জিনিষের বাকী অংশ ফিরাইয়া দিল। কোটালের স্ত্রীকন্যাকেও ফিরাইয়া আনিল।

নাগরিকগণ মুক্তকণ্ঠে চোরের প্রশংসা ও কোটালের নিন্দা করিতে লাগিল—

হারাইলে বস্তু সব কেবা দিতে পারে। অল্প মনিষ্য হঞা কোটাল বড় সাদ।
ধন্য ধন্য চক্রবর্ত্তী আইল নগরে॥ এমন জনার সনে মরিতে করে বাদ॥
নগরিঞা লোক বোলে ধন্য নাম খরবর। রাজা[র পু]ত্র হইঞা জেবা করে চুরি।
বটকের বস্তু না নেহ আপন ঘর॥ অন্য জন তার সনে নহে বরাবরি॥ (৪১ খ)

নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া চোর স্বদেশে গমন করিল। সেখানে ব্রাহ্মণগণকে অনেক টাকা দক্ষিণা দিল এবং সকল চোরকে উপহার প্রদান করিল। তার পর চোরদের উপদেশ দিয়া বলিল—

আপনার সুখে তোমরা জথা তথা জাও। ব্রাহ্মণ সজ্জন দাতা বৈষ্ণব তিন জন।
ব্রাহ্মণ সজ্জন এড়ি চুরি করি খাও॥ ইহার ঘরে চুরি না করিহ কখন॥ (৪১ খ)

কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে যে কয় জন খ্যাতনামা পণ্ডিতের সন্ধান পাওয়া যায়, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন তাঁহাদের অন্যতম। স্মৃতিশাস্ত্রে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ছিল; তিনি এক সময় রামমোহন রায়ের সহিত শাস্ত্রবিচারে প্রবৃত্ত হইতে কুণ্ঠিত হন নাই। বাংলা-গদ্যের লেখক হিসাবেও তাঁহার স্থান উচ্চে। তাঁহার গদ্য-রচনা অতি সরস ছিল। সংস্কৃত কলেজের পুরাতন নথিপত্র ও সমসাময়িক সংবাদপত্রাদি হইতে তাঁহার জীবনকথা যেটুকু উদ্ধার করিতে পারিয়াছি, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহারই আলোচনা করিব।

কাশীনাথের কর্ম্মজীবন

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে-সকল ইংরেজকে শাসনকার্য্য পরিচালনের জন্য এদেশে পাঠাইতেন, তাঁহাদিগকে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে দিবার পূর্ব্বে এদেশীয় ভাষা শিক্ষা দেওয়া যে অবশ্যপ্রয়োজন, গবর্ণর-জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলী ইহা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৮০০ সনের শেষাশেষি কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮০১ সনের ৪ঠা মে তারিখে কলেজ-কাউন্সিলের অধিবেশনে এই কলেজের বিভিন্ন বিভাগে পণ্ডিত, মৌলবী প্রভৃতির নিয়োগ মঞ্জুর হয়। বাংলা-বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন—পাদরী উইলিয়ম কেরী। তাঁহার অধীনে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ('তর্কালঙ্কার' নহে) প্রধান পণ্ডিতের পদে এবং রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি দ্বিতীয় পণ্ডিতের পদে যথাক্রমে দুই শত ও এক শত টাকা বেতনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া মাসিক ৪০ু বেতনে আরও ছয় জন সহকারী পণ্ডিত নিযুক্ত হন; কাশীনাথ ইঁহাদের মধ্যে এক জন।

কাশীনাথ এই পদে প্রায় ২৪ বৎসর নিযুক্ত ছিলেন।* ৭ ডিসেম্বর ১৮২০ তারিখে কলেজ-কাউন্সিলকে লিখিত তাঁহার একখানি পত্র ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কার্য্যবিবরণ-পুস্তকের মধ্যে পাইয়াছি। পত্রখানি উদ্ধৃত করিতেছি :—

* সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকবর্গের নাম, বয়স, পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতা প্রভৃতির বিবরণযুক্ত একটি তালিকা প্রতিবৎসর সংস্কৃত কলেজ হইতে শিক্ষা-পরিষদে প্রেরিত হইত। ১ মে ১৮৪৭ তারিখের

মহামহিম শ্রীযুত কালেজ কৌন্‌সলের সাহেবান বরাবরেষু

কালেজের পণ্ডিত শ্রীকাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের নিবেদনমিদং আমি ন্যায়দর্শনের ভাষাপরিচ্ছেদ পুস্তকের গৌড়দেশীয় সাধুভাষাতে সিদ্ধান্তমুক্তাবলী প্রভৃতি টীকার অনুসারে স্পষ্টরূপে অর্থপ্রকাশ করিতেছি যে শাস্ত্রের অতি কাঠিন্যপ্রযুক্ত অর্থপ্রকাশ করণে অদ্যাপি কোন পণ্ডিত প্রবৃত্ত হয়েন নাই—মেস্তর পিয়র সাহেবের মুদ্রাগৃহে এই পুস্তকের মূলসহিত মুদ্রাকরণে পঞ্চ শত মুদ্রা ব্যয় হইবেক পুস্তকের মূল্যে [?] শ্রীযুতেরদিগের বিবেচনায় নির্ভর করিয়া দৃষ্টি করিবার নিমিত্তে পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ সমর্পণ করিতেছি এইরূপ বিংশতি ভাগ হইবেক তাহাতে শ্রীযুতেরা অনুগ্রহপূর্ব্বক এক শত পুস্তক গ্রহণ করিলে পুস্তক মুদ্রিত হইতে পারে ও আমার পরিশ্রম সফল হয় এবং কালেজের পাঠার্থি সাহেবদিগের অল্পায়াসে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে বিদ্যা ও বাঙ্গালাভাষাতে নৈপুণ্য হইতে পারে অতএব নিবেদন যে অনুগ্রহপূর্ব্বক এই প্রতিপাল্য ব্যক্তির প্রতি সফলা আজ্ঞা হয় ইতি ১৮২০ সাল তারিখ ৭ দিসম্বর

শ্রীকাশীনাথশর্ম্মণঃ।

কলেজ-কাউন্সিল দশ খণ্ড পুস্তক ৫০৲ মূল্যে ক্রয় করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন।

গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজের স্মৃতিশাস্ত্রাধ্যাপক

১ জানুয়ারি ১৮২৪ তারিখে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে পাঠারম্ভ হয়।*

এইরূপ একটি তালিকায় (কাশীনাথ তখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক) কাশীনাথ পূর্ব্বে যে-যে চাকরি করিয়াছিলেন, তাহার এইরূপ বিবরণ আছে :—

Pundit of the College of Fort William from 1813 to 1824. Professor of Smriti in the Government Sanscrit College from 1825 to 1826. Pundit and Sudder Ameen of the District of 24 Purganahs from 1827 to 1831.

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, কাশীনাথ ১৮০১ সনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

* গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজ প্রথমে ৬৬ নং বহুবাজারে অবস্থিত ছিল; ১৮২৬ সনের ১ মে পটলডাঙ্গার নূতন বাটীতে স্থানান্তরিত হয়। এই বাটী গবর্মেণ্টের খরচে ১৮২৪-২৫ সনে বার্ণ কোম্পানী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়।

সংস্কৃত কলেজের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু কলেজও এই বাটীতে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। এই বাটীর কোন্ অংশে হিন্দু কলেজ প্রথমে অবস্থিত ছিল, ২৮ জুন ১৮৩৭ তারিখে জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইন্‌স্‌ট্রাকশনকে লিখিত সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী রামকমল সেনের পত্র হইতে তাহা জানা যায়। তিনি লিখিয়াছিলেন :—

". . . . the Buildings attached to the Hindoo College are occupied as follows :— The Centre upper roomed house by the Sanscrit College. The two wings lower roomed houses by the Hindu College."

১৯ মে ১৮৩৫ তারিখে রামকমল সেন মাসিক ১০০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী ও সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হন এবং এই পদে তিনি ১৮৩৮ সনের শেষ পর্য্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন।

এই সময় হইতে রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পর-বৎসর নবেম্বর (?) মাসে বিদ্যালঙ্কারের মৃত্যু হইলে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। শিমুল্যা-নিবাসী কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন এই পদের জন্য আবেদন করেন এবং প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া মাসিক ৮০৲ বেতনে এই শূন্য পদে নিযুক্ত হন। কাশীনাথের এই পদপ্রাপ্তি উপলক্ষে 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় নিম্নোদ্ধৃত সংবাদটি প্রকাশিত হয়ঃ—

> পাণ্ডিত্য কর্ম্মে নিযুক্ত ॥—শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সংস্কৃত কালেজে শিমুল্যানিবাসি শ্রীযুত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য স্মৃতি শাস্ত্রাধ্যাপনায় নিযুক্ত হইয়াছেন যে কর্ম্ম ৺রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের ছিল।……
>
> শুনা গেল বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের পরলোক গমন হইলে তৎপদপ্রাপ্তি প্রত্যাশায় অনেক স্মৃতিশাস্ত্রব্যবসায়ি অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যেরা ঐ পাঠশালার কর্ম্মনির্ব্বাহক সাহেবেরদিগের নিকট কর্ম্মাকাঙ্ক্ষাসূচক পত্র অর্থাৎ দরখাস্ত দিয়াছিলেন তাহাতে ঐ বিজ্ঞ বিচক্ষণাপক্ষপাতি সাহেবেরা তাবতের দরখাস্ত লইয়া তাঁহারদিগের বিদ্যা পরীক্ষার্থে প্রত্যেকে কএক প্রশ্ন লিখিয়া দিয়া কহিয়াছিলেন যে এই প্রশ্নের যিনি সদুত্তর লিখিয়া প্রদান করিতে সক্ষম হইবেন তাঁহাকেই ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত করা যাইবেক। অনন্তর সেই সকল প্রশ্নের উত্তর প্রায় তাবতেই লিখিয়া দিয়াছিলেন তন্মধ্যে তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের উত্তরে সন্তোষ পাইয়া তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছেন।—৩ ডিসেম্বর ১৮২৫ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত।

গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকবর্গের বেতনের রসিদ-বইয়ে প্রকাশ, কাশীনাথ ১৯ নবেম্বর ১৮২৫ তারিখ হইতে বেতন লইয়াছিলেন। তিনি ১৮২৭ সনের পুরা এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত এই পদে নিযুক্ত ছিলেন।

চব্বিশ-পরগণার জজ-পণ্ডিত ও সদর আমীন

বৎসরাধিক কাল সংস্কৃত কলেজে যোগ্যতার সহিত অধ্যাপনা করিবার পর, ১৮২৭ সনের মে মাসে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ২৪-পরগণা জেলার জজ-পণ্ডিত নিযুক্ত হন। এই সংবাদে 'সমাচার চন্দ্রিকা' লিখিয়াছিলেনঃ—

> পাণ্ডিত্য কর্ম্মে নিয়োগ।—সিমুল্যা নিবাসি শ্রীযুত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য যিনি সংস্কৃত কালেজের স্মার্ত্তাধ্যাপক ছিলেন তিনি ২১ বৈশাখ ৩ মে বৃহস্পতি বারে জেলা চব্বিশ পরগণার পাণ্ডিত্যকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন।—১২ মে ১৮২৭ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত।

১৮২৭ হইতে ১৮৩১ সন পর্য্যন্ত কাশীনাথ ২৪-পরগণার পণ্ডিত ও সদর আমীনের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন—সংস্কৃত কলেজের নথিপত্র হইতে ইহা জানা গিয়াছে। ইহার পর তিনি চাকুরী হইতে বরখাস্ত হন। কাউন্সিল অব এডুকেশনের ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৭ তারিখের অধিবেশনের কার্য্যবিবরণে প্রকাশ—

> He was dismissed by order of the Sudder Dewany Audalat but by a subsequent proceedings of that Court it appearing that the said order did not prohibit his future employment . . . his name was registered in the Council's list for employment . . .

১৮৩২ হইতে ১৮৪৬ সন পর্য্যন্ত কাশীনাথ কি করিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় নাই। ১৮৪৭ সনে তিনি পুনরায় সংস্কৃত কলেজে যোগদান করেন।

গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের অধ্যাপক

সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণ শ্রেণীতে ছাত্রাধিক্য হওয়ায়, চারিটি শ্রেণীতে কুলাইতেছিল না। এই কারণে ব্যাকরণের পঞ্চম শ্রেণী স্থাপিত এবং মাসিক ৪০৲ বেতনে ঐ শ্রেণীর জন্য এক জন অধ্যাপক নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিয়া সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন সেক্রেটরী রসময় দত্ত ২৯ জানুয়ারি ১৮৪৭ তারিখে শিক্ষা-পরিষদ্‌কে লেখেন। পরবর্তী ফেব্রুয়ারি মাসে বঙ্গীয় গবর্মেণ্ট এই প্রস্তাব মঞ্জুর করেন। সেক্রেটরী রসময় দত্ত* এই পদে কাশীনাথকে নিযুক্ত করিবার জন্য শিক্ষা-পরিষদ্‌কে সুপারিশ করিয়াছিলেন; কাশীনাথের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে তাঁহার উচ্চ ধারণা ছিল। শিক্ষা-পরিষৎ ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৭ তারিখের অধিবেশনে কাশীনাথের নিয়োগ মঞ্জুর করিয়াছিলেন।

কাশীনাথ ১২ই মার্চ ১৮৪৭ হইতে মাসিক ৪০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের ৫ম শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাধ্যক্ষ

কাশীনাথ যখন ৫ম ব্যাকরণ-শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন, তখন তাঁহার বয়স ৫৯ বৎসর—একরূপ বৃদ্ধ হইয়াছেন। এই কারণে অধ্যাপনা-কার্য্য আশানুরূপ ভাবে তাঁহার দ্বারা চলিতেছিল না। সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হইবার প্রাক্কালে বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজের সাহিত্য-অধ্যাপক ও অস্থায়ী সেক্রেটরীরূপে সংস্কৃত কলেজের আমূল সংস্কারকল্পে শিক্ষা-পরিষদ্‌কে ১৬ ডিসেম্বর ১৮৫০ তারিখে এক সুদীর্ঘ রিপোর্ট পাঠাইয়াছিলেন; কাশীনাথকে ব্যাকরণের অধ্যাপক-পদ হইতে সরাইয়া গ্রন্থাধ্যক্ষ-পদে, এবং গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নকে গ্রন্থাধ্যক্ষ-পদ হইতে ব্যাকরণ-অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব এই রিপোর্টে ছিল। তিনি লিখিয়াছিলেন :—

> The 5th Grammar Professor, Pundit Kashinath Tarkapanchanana, is not quite equal to discharge the duties of his class. He is an old Pundit and seems to be in his dotage. He is altogether unacquainted with that discipline which is absolutely required for so young a class as his. Being an old man, he will not bear to be directed, as is usual with all Pundits of his age.
>
> From all these circumstances his class is the most irregular of all. Therefore, I beg leave to propose that he be placed in charge of the library with his present salary, Rs. 40 a month, ...

বিদ্যাসাগরের এই প্রস্তাব শিক্ষা-পরিষৎ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছিল। কলেজের বেতনের রসিদ-বইয়ে প্রকাশ, কাশীনাথ ১৮৫১ সনের জুন মাস হইতে "গ্রন্থাধ্যক্ষ" হিসাবে বেতন লইয়াছিলেন।

মৃত্যু

অভাবের তাড়নায় বৃদ্ধ বয়সে অপটু স্বাস্থ্য লইয়া কাশীনাথ অতিকষ্টে পদব্রজে সংস্কৃত কলেজে আসিতেন। ইহাতে তাঁহার অতিশয় ক্লেশ হইত। এই কারণে ১৯ জুলাই

---

* রসময় দত্ত ১৭ এপ্রিল ১৮৪১ তারিখে মাসিক ১০০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরীর কার্য্যভার গ্রহণ করেন। এই পদে তিনি ১৮৪৯ সনের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়াছিলেন।

১৮৫১ তারিখে তিনি যানারোহণে গমনাগমনের সুবিধার জন্য মাসে মাসে অতিরিক্ত কুড়ি টাকা প্রার্থনা করিয়া কলেজের অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট আবেদন করিলেন। তাঁহার আবেদনপত্রখানি উদ্ধৃত করিতেছি :—

গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত বিদ্যালয় পণ্ডিতপ্রধান—
শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয়েষু—

গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত বিদ্যালয় পুস্তকাধ্যক্ষ শ্রীকাশীনাথ তর্কপঞ্চানন পণ্ডিতের সাময়িক বিজ্ঞাপন—

ইং ১৮২৫ শালে এই সংস্কৃত বিদ্যালয়ে আমি স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপনাকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলাম আমার শিষ্যশাখায় এই বিদ্যালয় এবং দেশে দেশে ধর্ম্মাধিকরণ শোভিত হইয়াছে ইডুকেশন গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডীয় ও বঙ্গীয় অধ্যক্ষ মহাশয়েরা প্রায় সকলেই আমার বিদ্যাবুদ্ধি বয়স ও দুরবস্থা বিশেষরূপে জ্ঞাতা আছেন এইক্ষণে আমি এই কর্ম্ম ত্যাগ করিলে অন্নাভাবে সপরিবারের মৃত্যু হয় কর্ম্ম করিলে পদব্রজে গমনাগমন করিতে পথমধ্যেই মৃত্যু উপস্থিত হয় উভয়থাই মৃত্যুসম্ভাবনায় মহাশঙ্কট উপস্থিত অতএব এক্ষণে আমার প্রার্থনা এই যে আমাকে যানারোহণে গমনাগমনার্থ ২০ টাকা মাস২ দিতে আজ্ঞা হয় পুস্তকাধ্যক্ষের বেতন পূর্ব্বে ৬০ টাকা ছিল সে বিবেচনায় ইহাতে অধিক ব্যয় হইতে পারে না এবং ফোর্ট উলিয়ম কালেজে বৃদ্ধ পণ্ডিত ও মৌলবির প্রতি এমত রীতি আছে পরন্তু আমাকে অধিক কাল পর্য্যন্ত দিতে হবে এমত বোধ হয় না অথবা সংস্কৃত কালেজের ছাত্রদিগের বার্ষিক পরীক্ষার্থ আমাকে নিযুক্ত করিলে ঐ বেতনে আমার যানারোহণ স্বচ্ছন্দ রূপ নির্ব্বাহ হইতে পারে অথবা সংস্কৃত কালেজের লেখকদ্বারা যেসকল পুস্তক লিখিত হইয়াছে ও হইতেছে সে সকল পুস্তকের শোধনবিনা বৃথাব্যয়মাত্র অতএব ঐ সকল পুস্তকশোধনার্থ আমার তদুপযুক্ত বিশিষ্ট বেতন স্থির হয়। আমার এই নিবেদনপত্র আপনি ইংলণ্ডীয় ভাষায় শ্রীযুত দয়াময় অধ্যক্ষ মহাশয়দিগের চক্ষুঃ কর্ণগোচর করিলে পূর্ব্বলিখিত যে আমার উভয়থাই মৃত্যুশঙ্কট উপস্থিত তাহার আবশ্যক নিবারণ হইতে পারে ইহাতে এই প্রাচীন বৃদ্ধ পণ্ডিতের প্রতি যেমত অনুমতি হয় বিজ্ঞাপনমিতি ইং ১৮৫১ ১৯ জুলাই—

সংস্কৃতবিদ্যালয় পুস্তকাধ্যক্ষস্য—
শ্রীকাশীনাথ তর্কপঞ্চাননস্য

পরবর্ত্তী ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে শিক্ষা-পরিষদের নিকট ইংরেজী অনুবাদ-সমেত আবেদনপত্রখানি পাঠাইয়া বিদ্যাসাগর মন্তব্য করিলেন :—"If his old age be taken into consideration the applicant deserves the kind attention of the Council." কিন্তু শিক্ষা-পরিষদের মন ভিজিল না; তাঁহারা ১০ সেপ্টেম্বর তারিখের অধিবেশনে কাশীনাথের অনুরোধ রক্ষা করিতে অসামর্থ্যসূচক মন্তব্য করিলেন।

এই ঘটনার পর দুই মাস যাইতে-না-যাইতে ৮ নবেম্বর ১৮৫১ তারিখে কাশীনাথ সকল যন্ত্রণার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন; মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৩ বৎসর* হইয়াছিল। ১০ই নবেম্বর তারিখে বিদ্যাসাগর মহাশয় শিক্ষা-পরিষদ্‌কে লিখিলেন :—

* সংস্কৃত কলেজের নথিপত্রে প্রকাশ, ১ মে ১৮৫১ তারিখে কাশীনাথের বয়স ছিল "৬৩"।

I have the honor to report for the information of the Council of Education, that on the 8th Instant, Pundit Kasinath Tarkapanchanan the Librarian expired.

রচনাবলী

কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার যে-কয়খানি গ্রন্থের সন্ধান করিতে পারিয়াছি, নিম্নে সেগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম।

১। বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ। পৃ. ২৮

১৮১৮ সনে রামমোহন রায় সহমরণের বিরুদ্ধে 'প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ' প্রকাশ করিলে তাহার উত্তর-স্বরূপ কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ১৮১৯ সনের মাঝামাঝি 'বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ' প্রকাশ করেন; ইহাতে সহমরণের অনুকূলে শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি উদ্ধৃত হইয়াছিল।

এই পুস্তকের কোনরূপ আখ্যা-পত্র নাই; মলাটের উপর হস্তাক্ষরে লিখিত নিম্নাংশ হইতে জানা যাইতেছে যে, কালাচাঁদ বসু মহাশয়ের আদেশে কাশীনাথ এই পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন:—

॥ নত্বা শ্রীশং বিরচিতং শ্রীকাশীনাথশর্ম্মণা ॥
আদেশাদতুল শ্রীল কালাচাঁদ বসোরিদং ॥

১৮১৯ সনের জুলাই মাসের 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' পত্রে পুস্তকখানির প্রাপ্তিস্বীকার করিয়া যাহা লেখা হইয়াছে, তাহা হইতেও গ্রন্থকারের নাম ও পুস্তকের প্রকাশকাল জানা যায়। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' লেখেন:—

On the Burning of Widows.

. . . . a small work in defence of this practice just published in quarto without name or date; but a manuscript note on the first blank leaf informs us that it is published by *Cassee-nat'h-turkubagish*, by the desire of Cala-chund-bhose. It is in the form of a dialogue, written in Bengalee with an English Translation. This work we shall carefully examine in a future Number.—*The Friend of India* for July 1819, pp. 332-33.

পরবর্ত্তী অক্টোবর মাসের 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' পত্রে (পৃ. ৪৫৩-৮৪) এই পুস্তকের ইংরেজী অনুবাদের বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশিত হয়।

রচনার নিদর্শনস্বরূপ 'বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ' হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা হইল:—

প্রথম বিধায়কের বাক্য

শ্রুতিস্মৃতি পুরাণাদিতে বিহিত আছে যে সহমরণ ও অনুমরণ এবং সত্য ত্রেতাদ্বাপরকলি এই চারি যুগে মহাপ্রামাণিকেরা যে বিষয়ের ব্যবস্থা দিতেছেন এমন বিষয়ে যে তোমরা প্রতিবন্ধক হও এ বড় অনুচিত

নিষেধকের উত্তর

তোমরা শাস্ত্র না জানিয়া কহিতেছ যে এ অনুচিত কিন্তু শাস্ত্র জানিলে এমন কহিবা না

বিধায়ক

আমরা শাস্ত্র জানি না ইহা তুমি কহিতেছ অতএব সহমরণ অনুমরণ বিষয় শাস্ত্র কহি শুন। অঙ্গিরার বচন ॥ * ॥ মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী সমারোহেদ্ধুতাশনং। সারুন্ধতীসমাচারা স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥·· ···(পৃ. ১)

রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে এই পুস্তকের বাংলা অংশের দুইটি খণ্ড আছে।

২। A | System of Logic ; | written in Sunscrit by | The Venerable Sage Boodh, | and explained in a Sunscrit commentary by | The Very Learned Viswonath Turkaluncar. | Translated into Bengalee | By | Kashee Nath Turkopunchanun. | মহর্ষি গোতমকৃত | **ন্যায়দর্শন** ; | মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিশ্বনাথ তর্কালঙ্কারকৃত তদীয় | ভাষাপরিচ্ছেদঃ। | শ্রীকাশীনাথ তর্কপঞ্চাননকৃত তদীয়ার্থ সাধুভাষা সংগ্রহঃ। | **গ্রন্থনাম পদার্থকৌমুদী**। | স্কুলবুক সোসাইটি দ্বারা কলিকাতা মিসন মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হইল। | C. S. B. S. | Calcutta : | Printed for the Calcutta School-Book Society, | At the Baptist Mission Press, Circular Road. | 1821. | [পৃ. ১৪৫]

এই পুস্তকের আখ্যা-পত্রের পর-পৃষ্ঠায় গ্রন্থকারের নিবাস ও গ্রন্থের সঠিক প্রকাশকাল এইরূপ দেওয়া আছে :—

শ্রীবিশ্বনাথ তর্কালঙ্কার কৃত তদীয় ভাষাপরিচ্ছেদ। |

আরিয়াদহ গ্রামনিবাসি শ্রীকাশীনাথ তর্কপঞ্চানন কৃতঃ গৌড় | দেশ প্রচলিত সাধুভাষা রচিত, সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী সম্মত, তদীয়ার্থ | সারসংগ্রহ। |

গ্রন্থনাম পদার্থ কৌমুদী

কলিকাতা নগরে মিসন মুদ্রাযন্ত্রে বাঙ্গালা সন ১২২৭ শালের | চৈত্র মাসে ২ তারিকে মুদ্রিত হইল। |

রচনার নিদর্শন :—

বুদ্ধি দুই প্রকার হয় অনুভব ও স্মরণ। সেই অনুভব চারি প্রকার প্রত্যক্ষ অনুমিতি উপমিতি ও শাব্দ। এই প্রত্যক্ষাদি অনুভব চতুষ্টয়ের করণ যে প্রত্যক্ষ অনুমান উপমান ও শব্দ তাহার নাম প্রমাণ। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় করণক যে অনুভব তাহার নাম প্রত্যক্ষ। সেই প্রত্যক্ষের করণ যে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় তাহার নাম প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ব্যাপ্তি জ্ঞান করণক যে অনুভব তাহার নাম অনুমিতি। সেই অনুমিতির করণ যে ব্যাপ্তি জ্ঞান তাহার নাম অনুমান প্রমাণ। সাদৃশ্য জ্ঞান করণক যে অনুভব তাহার নাম উপমিতি। সেই উপমিতির করণ যে সাদৃশ্য জ্ঞান তাহার নাম উপমান প্রমাণ। পদ জ্ঞান করণক যে অনুভব তাহার নাম শাব্দ। সেই শাব্দের করণ যে পদ জ্ঞান তাহার নাম শব্দ প্রমাণ (পৃ. ৩৭-৩৮)

৩। শ্রীশ্রীহরিঃ।—| শ্রী আদি পুরুষায় নমঃ।—| উৎপত্তি স্থিতি লয়, জগতের যাঁয় হয়, পুনর্জন্ম হরে যাঁর | জ্ঞান। অনাদি অনন্ত শান্ত, যাঁর মায়ায় জগ|দ্ভ্রান্ত, স্মরি সেই পুরুষ প্রধান। | গ্রন্থনাম **আত্মতত্ত্ব কৌমুদী**। | শ্রীশ্রীকৃষ্ণমিশ্র কৃত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক, শ্রীকাশীনাথ | তর্কপঞ্চানন শ্রীগদাধরন্যায়রত্ন শ্রীরামকিঙ্কর শিরোমণি | কৃত, সাধুভাষা রচিত তদীয়ার্থ সংগ্রহ। | গ্রন্থের সংখ্যা ছয় অঙ্ক, প্রথমাঙ্কের নাম বিবেকোদ্যম, | দ্বিতীয়াঙ্কের নাম মহামোহোদ্যোগ, তৃতীয়াঙ্কের নাম পাষ|ণ্ডবিড়ম্বন, চতুর্থাঙ্কের নাম বিবেকোদ্যোগ, পঞ্চমাঙ্কের নাম | বৈরাগ্যোৎপত্তি, ষষ্ঠাঙ্কের নামে প্রবোধোৎপত্তি, এই | গ্রন্থের নাট্য-শাস্ত্রোক্ত সংজ্ঞাশব্দের অর্থ এবং মোহবিবেকা|দির লক্ষণ তত্তৎ শব্দার্থের নির্ঘণ্টপত্রে অকারাদিক্রমে দৃষ্টি | করিয়া অবগত হইবা। পুস্তকের মূল্য ৪ মুদ্রাচতুষ্টয় মাত্র। | মহেন্দ্রলাল প্রেষে মুদ্রাঙ্কিত হইল। | সন ১২২৯ শাল। | [পৃ. ১৮৯+শব্দার্থে নির্ঘণ্ট পত্র ৫]

'আত্মতত্ত্ব কৌমুদী'র রচনার নিদর্শনস্বরূপ কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল:—

একি আশ্চর্য্য অজ্ঞানিলোকেরা অজ্ঞান দৃষ্টিতে নারীতে কিং আরোপিত না করিতেছে দেখ মুক্তা রচিত হার, শব্দায়মান মণিময় স্বর্ণনূপুর, কুঙ্কুমের রাগ সুগন্ধি কুসুম রচিত আশ্চর্য্য মাল্য এবং আশ্চর্য্য বসন পরিধান, অর্থাৎ মুক্তাহারাদির শোভাতে শোভিতা কিন্তু ফলতঃ রক্ত মাংসময়ী যে নারী তাহাকে দর্শন করিয়া এই এই নারী কি পরমা সুন্দরী এইরূপ ভ্রান্তিতে ভ্রান্ত লোকেরা মুগ্ধ হইতেছে কিন্তু জ্ঞানিলোকেরা জ্ঞানদৃষ্টিতে সেই নারীকে নরকরূপে দর্শন করিতেছেন যেহেতু তাঁহারা তাবৎ বস্তুর বাহ্য ও অন্তর জ্ঞাত আছেন এবং নারীর কনকচম্পক সদৃশ যে শরীর তাহাও ফলতঃ মলমূত্রাদিতে পরিপূর্ণ আছে। (পৃ. ১০০-১০১)

রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে এক খণ্ড 'আত্মতত্ত্ব কৌমুদী' আছে। এই পুস্তক ১২৬৯ সালে 'প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক' নামে পুনর্মুদ্রিত হয়।

৪। মুগ্ধবোধ কৌমুদী।

২ জুন ১৮২১ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' এই "ইস্তাহার" মুদ্রিত হয়—

মুগ্ধবোধ কৌমুদী অথবা সংস্কৃত ব্যাকরণ ও গণ। গৌড় দেশীয় সাধু ভাষায় অর্থ। শ্রীবোপদেব গোস্বামির কৃত এতদ্দেশে প্রচরদ্রূপে চলিত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ ও তৎকৃত কবিকল্পদ্রুমনামক গণের পশ্চাৎ বক্ষ্যমাণ রীতিক্রমে এতদ্দেশীয় সাধুভাষায় গদ্যতে দুই খণ্ডে অর্থ প্রকাশ করা গিয়াছে।……

…কোন বিজ্ঞ ভদ্রলোক স্বপ্রয়োজনার্থে…মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের ও গণের গৌড়দেশীয় সাধু ভাষায় গদ্যেতে অর্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন তেঁহ স্বয়ং বা স্বার্থ এ পুস্তক ছাপা করিয়া প্রকাশকরণে অনিচ্ছুক কিন্তু পরোপকারার্থ ঐ পুস্তক আমাকে দিয়াছেন তাহা আমি বহু পরিশ্রমে শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ রামতর্কবাগীশ প্রভৃতির টীকানুসারে মূল ও ভাষার্থ শুদ্ধ এবং বাহুল্য করিয়া প্রস্তুত করিয়াছি ইহাতে গুরূপদেশ ব্যতিরিক্ত অনায়াসে সংস্কৃত পদ পদার্থ বোধ হইতে পারিবেক সংস্কৃত জ্ঞানেচ্ছুক ব্যক্তির মহোপকার হইবে।

পুস্তকের পরিমাণ ছোট আড়ার পুস্তকের ৫০০ পাঁচ শত পৃষ্ঠা হইবেক...উত্তম বাঙ্গালা অক্ষরে ছাপা হইবেক প্রতিপুস্তকের মূল্য ছাপার ব্যয়ানুসারে প্রথম খণ্ড ব্যাকরণ ৫ পাঁচ টাকা দ্বিতীয় খণ্ড গণ ১ এক টাকা সর্ব্বশুদ্ধ ৬ ছয় টাকা। ছাপার ব্যয়ের সংস্থান হইলে ছাপা করিতে উদ্যুক্ত হইতে পারি।...শ্রীকাশীনাথ শর্ম্মণঃ। কলিকাতা শিমুল্যা।

এই গ্রন্থ ছাপা হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু আমি কোথাও দেখি নাই।

৫। শ্রীশ্রীদুর্গা ॥—| জয়তি ॥—| (পাষণ্ডপীড়ন নামক প্রত্যুত্তর) | A | Reply, Entitled | "A TORMENT TO THE IRRELIGIOUS" | কোন ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষি কর্ত্তৃক কোন পণ্ডি- | তের সহায়তায় স্বদেশীয় লোক হিতার্থ | প্রস্তুত ও প্রকাশিত হইল | PREPARED AND PUBLISHED WITH THE ASSISTANCE | OF A PUNDIT, | *By a Person, wishing to defend and disseminate* | *Religious principles.* | FOR THE BENEFIT OF HIS COUNTRYMEN | সমাচার চন্দ্রিকা মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল ॥ | [Printed at] the Sumachara Chundrica Press. | CALCUTTA, | 1823. | কলিকাতা সন ১২২৯ ২০ মাঘ। | [পৃ. সংখ্যা ২৮৫]

'পাষণ্ডপীড়ন'-রচনার ইতিহাস এইরূপ। ৬ এপ্রিল ১৮২২ তারিখে শ্রীরামপুর মিশনরীদের 'সমাচার দর্পণ' পত্রে "ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী" এই ছদ্ম স্বাক্ষরে এক ব্যক্তি চারিটি প্রশ্ন করেন; এই প্রশ্নচতুষ্টয়ের ইঙ্গিত রামমোহন রায়কে লক্ষ্য করিয়া। ১৮২২ সনের ১১ই মে রামমোহন কর্ত্তৃক এই চারিটি প্রশ্নের উত্তর প্রকাশিত হয়; উহা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলীতে 'চারি প্রশ্নের উত্তর' নামে মুদ্রিত হইয়াছে। "ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী" এই উত্তরে সন্তুষ্ট না হইয়া প্রত্যুত্তর-স্বরূপ ১৮২৩ সনের ১লা ফেব্রুয়ারি 'পাষণ্ডপীড়ন' পুস্তক প্রকাশ করেন। ইহাতে "ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী"র চারি প্রশ্ন, "ভাক্তত্ত্বজ্ঞানী"র উত্তর, এবং "ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী"র প্রত্যুত্তর একত্র মুদ্রিত হয়।

'পাষণ্ডপীড়ন' উমানন্দন (বা নন্দলাল) ঠাকুরের নির্দ্দেশে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন কর্ত্তৃক রচিত হয়। উমানন্দন ঠাকুর পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর-গোষ্ঠীর হরিমোহন ঠাকুরের পুত্র। পুস্তকে গ্রন্থকাররূপে কাশীনাথের নাম না থাকিলেও, রামমোহনের 'চারি প্রশ্নের উত্তর' পুস্তকে তাহার ইঙ্গিত আছে; দৃষ্টান্ত-স্বরূপ একটি স্থল উদ্ধৃত করিতেছি :—

> "আর যদি এক ব্যক্তি বহু কাল ম্লেচ্ছসেবা ও ম্লেচ্ছকে শাস্ত্র অধ্যাপনা করিয়া এবং ন্যায় দর্শনের অর্থ ভাষাতে রচনাপূর্ব্বক ম্লেচ্ছকে তাহা বিক্রয় করিতে পারে সে আস্ফালন করিয়া অন্যকে কহে যে তুমি ম্লেচ্ছের সংসর্গ কর ও দর্শনের অর্থ ভাষায় বিবরণ করিয়া ম্লেচ্ছকে দেও অতএব তুমি স্বধর্ম্মচ্যুত হও তবে সে ব্যক্তিকে কি কহা উচিত হয়।"

কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'পাষণ্ডপীড়নে'র প্রকৃত রচয়িতা কে, জানিতেন না, কিন্তু তিনি 'সংবাদ প্রভাকরে' "সংবাদপত্র ও দেশীয় ভাষা এবং রচনা" প্রসঙ্গে 'পাষণ্ডপীড়নে'র ভাষা সম্বন্ধে এই মন্তব্য করিয়াছিলেন :—

দেওয়ানজী [রামমোহন রায়] জলের ন্যায় সহজ ভাষা লিখিতেন, তাঁহাতে কোন বিচার ও বিবাদ ঘটিত বিষয় লেখায় মনের অভিপ্রায় ও ভাব সকল অতি সহজে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইত, এজন্য পাঠকেরা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতেন, কিন্তু সে লেখায় শব্দের বিশেষ পারিপাট্য ও তাদৃশ মিষ্টতা ছিল না। ৺বাবু উমানন্দন ঠাকুর, যিনি নন্দলাল ঠাকুর নামে বিখ্যাত ছিলেন, তিনি 'পাষণ্ডপীড়ন' প্রভৃতি যে কয়েক খানা গ্রন্থ প্রকাশ করেন তাহা সর্ব্বাংশেই উত্তম অর্থাৎ শব্দের লালিত্য ও মাধুর্য্য প্রাচুর্য্য সর্ব্বদিগেই উত্তম হইয়াছিল, তদ্দৃষ্টে অনেকেই সরস রচনায় শিক্ষিত হইয়াছেন।—'সংবাদ প্রভাকর', ১৩ মার্চ ১৮৫৪।

'পাষণ্ডপীড়ন' সম্প্রতি "দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালায়" পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

৬। সাধু সন্তোষিণী।

মুদ্রিত বাংলা পুস্তকের তালিকায় পাদরী লং এই পুস্তকের নিম্নলিখিত বর্ণনা দিয়াছেন:—

In 1826, the *Sadhu Santoshini* to prove that AFFIDAVITS on the Ganges water are forbidden by the Hindu Law, by Kashinath Tarkapanchanan. (Long's *Descriptive Catalogue* . . . ., p. 56).

এই পুস্তকখানি এখনও পাওয়া যায় নাই।

৭। শ্যামাসন্তোষণ

কলিকাতা রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটিতে কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের 'শ্যামাসন্তোষণস্তোত্র' নামে একখানি পুথি আছে। পুথিতে ইহার রচনাকাল—চৈত্র ১৭৫৬ শক (=১৮৩৫ সন) এইরূপ দেওয়া আছে:—

রসশরমুনিচন্দ্রে রক্ষিতেঽস্মিন্ শকাব্দে
গগনগুণমিতাংশে সৌরচৈত্রে শুভাহে।
স্তুতিরিয়মতিসাধ্বী সম্মুখাম্ভোজজাতা
ভবতু চিরমবন্ধ্যাং

চতুর্থ পংক্তির শেষ অংশটুকু পুথিতে নাই। পরবর্ত্তী কালে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন বঙ্গানুবাদ-সমেত স্তোত্রটি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হইতেছে। ১ পৌষ ১৭৬৮ শকের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় 'শ্যামাসন্তোষণ' পুস্তকের উল্লেখ আছে:—

...শ্রীযুক্ত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন স্বকৃত শ্যামাসন্তোষণ নামক গ্রন্থে ইহার স্পষ্ট বিবরণ করিয়াছেন যথা...। (পৃ. ৩৮৫)

বর্ত্তমান শ্রীযুক্ত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন স্বকৃত শ্যামাসন্তোষণ গ্রন্থে দুই প্রকার গৃহস্থ অবধূতের প্রসঙ্গ লেখেন,...। (পৃ. ৩৮৭, পাদটীকা)

ভারতের মানব ও মানব-সমাজ

শ্রীশরৎচন্দ্র রায়, রাঁচি

পাশ্চাত্যে নৃতত্ত্ব-অনুশীলনের ইতিহাস

এক শতাব্দী মাত্র হইল, পাশ্চাত্য দেশে নৃতত্ত্ব বা Anthropology নামে বিজ্ঞানের একটি অভিনব শাখার প্রবর্ত্তন হইয়াছে। সর্ব্বপ্রথমে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী দেশের রাজধানী প্যারিস নগরে *Societe Anthropologie de Paris* নাম দিয়া একটি নৃতত্ত্ব-সমিতি গঠিত হয়। ইহার পাঁচ বৎসর পরে, ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে, ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন নগরীতেও "এথ্‌নলজিক্যাল সোসাইটি" নামে একটি নৃতত্ত্ব-সমিতি স্থাপিত হয়। এই সমিতিদ্বয় প্রধানতঃ বিভিন্ন দেশের, বিশেষতঃ ইউরোপের বিভিন্ন জাতির, মানবের দৈহিক গঠনের সাদৃশ্য ও বৈষম্য বিচারপূর্ব্বক তাহাদের শ্রেণী-বিভাগ ও পরস্পরের সম্বন্ধ নির্ণয়ের চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিল। কয়েক বৎসরের মধ্যেই উভয় সমিতিই উদ্যমহীন হইয়া মুমূর্ষু অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

পরে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মনীষী ডারউইনের *Origin of Species* নামক যুগান্তকারী পুস্তক প্রকাশিত হইলে উক্ত উভয় সমিতিই পুনর্জীবিত হইয়া উঠে। ডারউইন এবং ওয়ালেসের প্রচারিত বিবর্ত্তনবাদ নৃতত্ত্বসেবীদিগকে নূতন দৃষ্টি ও লক্ষ্য, নব উদ্যম, নব ঔৎসুক্য ও আশায় অনুপ্রাণিত করিল। কিন্তু ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনের নৃতত্ত্ব-সমিতির সভ্যগণের মধ্যে নৃতত্ত্বের মূল উদ্দেশ্য ও সমিতির নাম লইয়া মতভেদ উপস্থিত হয়। তখন উহার সভ্যমণ্ডলীর এক দল মূল-সমিতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া "এন্‌থ্রপলজিক্যাল সোসাইটি অব লণ্ডন" নামে একটি স্বতন্ত্র সমিতি স্থাপন করিলেন।

ইহার দুই বৎসর পরে, ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে, এডোয়ার্ড টাইলর তাঁহার *Researches into the History of Mankind* নামক প্রসিদ্ধ পুস্তকে বিভিন্ন অসভ্য জাতিদের রীতিনীতি, আচার ও ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে বহুল দৃষ্টান্তদ্বারা প্রমাণ করিলেন যে, সভ্য মানবের বহুবিধ সামাজিক আচার-ব্যবহার, পূর্ব্বপুরুষাগত সংস্কার ও ধারণা, ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মক্রিয়ার মূলের পরিচয় অসভ্য বা অনুন্নত জাতিদের মধ্যেই পাওয়া যাইতে পারে, সুতরাং ঐ সমস্ত জাতির জীবনধারা ও রীতিনীতি, সংস্কার ও বিশ্বাসের সহিত সম্যক্ পরিচয় না হইলে সভ্য মানব আপনাদিগের বহুবিধ সামাজিক আচার-ব্যবহার, বিশ্বাস, সংস্কার ও ক্রিয়াকলাপের তাৎপর্য্য ও মূল উদ্দেশ্য যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় না। নৃতত্ত্বের এই প্রথম পুস্তক পাঠে পাশ্চাত্য নৃতত্ত্বসেবীদের দৃষ্টির প্রসার ও অনুশীলনের ক্ষেত্রের পরিসর বৃদ্ধি হইল। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে এন্‌থ্রপলজিক্যাল সোসাইটির বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি ডক্টর হান্ট তাঁহার অভিভাষণে এই মত ব্যক্ত করিলেন যে, "অনতিবিলম্বে সামাজিক মনস্তত্ত্ব

দৈহিক নৃতত্ত্বের আলোচনার অনুগমন করিবে" ("After a time, I think, it will be found that the study of physical anthropology will be followed by researches in psychological anthropology")। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের *Anthropological Review* (Vol. V, p. LXVII) পত্রিকায় তাঁহার ঐ অভিভাষণটি প্রকাশিত হয়। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত পত্রিকাতে L'Owen Pike নিশ্চয়তার সহিত, জোর কলমে লিখিলেন, "মনস্তত্ত্বের জ্ঞান ব্যতিরেকে নৃতত্ত্বের অনুশীলন অসম্ভব" ("Without psychology, there is no anthropology")। ঐ বৎসর টাইলরের *Primitive Culture* নামক সুপ্রসিদ্ধ দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশিত হইল। তাহার পর বৎসরেই ইংলণ্ডের নৃতত্ত্বসেবী সমিতিদ্বয়, অর্থাৎ "Anthropologists" এবং "Ethnologists", আবার পুনর্মিলিত হইল। এই সম্মিলিত সমিতির নাম হইল "এনথ্রপলজিক্যাল ইনষ্টিটিউট অব গ্রেট ব্রিটেন"। ইহাই এখন "রয়াল এনথ্রপলজিক্যাল ইনষ্টিটিউট অব গ্রেট ব্রিটেন এণ্ড আয়ার্লাণ্ড" নামে পৃথিবীর নৃতত্ত্ব-সমিতিগুলির মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিতেছে। তখন হইতে পাশ্চাত্য দেশে প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ব (Prehistoric Archæology), দৈহিক নৃতত্ত্ব (Physical Anthropology) ও সামাজিক বা সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের (Social বা Cultural Anthropology) একত্রে অনুশীলন চলিতেছে।

এই প্রবন্ধে কেবল ভারতের সামাজিক নৃতত্ত্ব বা সমাজতত্ত্ব (Social Anthropology বা Sociology) সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে সামান্য আলোচনা করিব ; বিশদভাবে আলোচনা স্বল্পপরিসরে সম্ভব নয়। সমাজতত্ত্ব বা সামাজিক নৃতত্ত্বের ভিত্তি মূলতঃ মনস্তত্ত্বের উপর অধিষ্ঠিত। মন যন্ত্রী ও সমাজ যন্ত্র। নৈসর্গিক ও সামাজিক আবেষ্টনের ও জনসংখ্যার দ্বারা সমাজযন্ত্রের নির্ম্মাণভঙ্গী ও রূপ অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হয়। সমাজযন্ত্রের সাহায্যেই ভাষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, সুকুমার কলা, ধর্ম্ম, নীতি, রাষ্ট্র প্রভৃতি সংস্কৃতি ও সভ্যতার মূল উপাদান-গুলি গঠিত হয়।

সমাজতত্ত্বের বিষয়বস্তু

মানব-জগৎ নিরন্তর আনন্দ-বিষাদ, আশা-নৈরাশ্য, উত্থান-পতন, যুদ্ধ-দ্বন্দ্বের অবিশ্রান্ত কলরবে মুখরিত। ঔপন্যাসিক, নাট্যকার এবং কবির ন্যায় সমাজ-বিজ্ঞান-সেবীরও কারবার এই বিশাল জগৎ-মেলার আসা-যাওয়া, ভাঙ্গা-গড়া, হাসি-কান্না, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ, ভাবধারা, রীতি-নীতি, সংস্কার ও বিশ্বাস, প্রতিষ্ঠান (institutions), কার্য্যকলাপ ও অবদান লইয়া। ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার সমষ্টি-জীবনের বিবিধ সমস্যা ও বিশেষতঃ ব্যষ্টি-জীবনের সুখ-দুঃখ, ভাবনা-কামনা, সাফল্য ও পরাভব, অন্তরের দ্বন্দ্ব-বেদনা, তাঁহাদের হৃদয়ের গভীর সমবেদনা, সহানুভূতি ও একাত্মবোধের দ্বারা উপলব্ধি করেন, এবং তাঁহাদের রসানুভূতি ও সৃজনশক্তির সাহায্যে সমাজ-বিশেষের ও ব্যষ্টি-জীবনের বিভিন্ন দিকের বাস্তবানুগত কাল্পনিক খণ্ড চিত্র 'ভাষা দিয়া, ভাব দিয়া, আর ভালবাসা দিয়া' কলা-কৌশলে অঙ্কিত করেন।

আর জগতের রহস্যময় শ্রান্তিহীন কলরোলে উদ্বেলিত কবি-চিত্তে, বিশ্বসংসারের তরঙ্গ-আঘাত যে অনাদি সুখ-দুঃখ, গীতধ্বনি নিরন্তর বহন করিয়া আনিতেছে, কবি প্রতিভাবলে "শতলক্ষ সুরে গুঞ্জরিত" সেই বিশ্বগীতি ও "অসংখ্য ভঙ্গীতে উচ্ছ্বসিত" সেই বিশ্বনৃত্যকে যথাযথ ভাবে ভাষা ও ভাবসংযোগে মূর্ত্ত করিয়া অসীমের সীমা রচনা করেন—ভাষাতীত অরূপকে রূপ দিয়া ভাষার বাঁধনে বাঁধেন। তাঁহার ঐশ আলোক-দীপ্ত মানসপটে বিশ্বনাট্যের সমগ্র চিত্রই নিত্য নব নব রূপে উদ্ভাসিত হয়।

বস্তুতান্ত্রিক সমাজ-বিজ্ঞান-সেবী কবিসুলভ ঐশী অনুপ্রেরণার ও অপরোক্ষানুভূতির দাবী করিতে পারেন না। অন্ততঃ তাহা লইয়া গবেষণা আরম্ভ করেন না। আর ঔপন্যাসিক ও নাট্যকারের নিপুণ কল্পনাসৃষ্টিও সমাজ-বিজ্ঞান-সেবীর পক্ষে বিহিত নহে। সুতরাং তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে সামাজিক তথ্যনিচয় যথাশক্তি পর্য্যবেক্ষণ ও সমাহরণ, বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ করিয়া তাহার পুনঃসংযোগ ও সমাবেশের সাহায্যে মানব-সমাজের উদ্ভব, সংগঠন ও গতিপ্রকৃতি, উন্নতি ও অবনতির ধারার যথাযথ রূপ ও কারণ নির্ণয় করিতে প্রয়াস পান। আর শৃঙ্খলাসূত্রের অনুসন্ধানে এই অসীম জগৎ-জনতায় বেসুরো জটিলতার মধ্যে সুরের খোঁজ করেন।

আপাতদৃষ্টিতে যাহা মানব-জনতার অশ্রান্ত বিশৃঙ্খলতা বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সমাজ-বিজ্ঞানের গবেষণার দ্বারা তাহার মধ্যে কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ ও শৃঙ্খলার রহস্য ক্রমে উদ্‌ঘাটিত হয়, ছন্দ ক্রমে পরিস্ফুট হয়, সুর ধরা পড়ে। এই বিশ্ব-কোলাহলের মধ্যে কবি যে "অপূর্ব্ব গীতি, আলোকছন্দ" ও বিশ্ব-তন্ত্রী-নিঃসৃত "বিশ্ব-প্লাবিনী অমৃত-উৎস-ধারা রাগিণী" শুনিতে পান, সমাজ-বিজ্ঞানের অনুশীলনের সাহায্যে হয়ত সেই রাগিণীর সামান্য প্রতিধ্বনি আমাদের অনুভূতিগম্য হইতে পারে।

অন্যান্য বিজ্ঞানের ন্যায় সমাজ-বিজ্ঞানও এই বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে যে, ইহার আলোচ্য যে মানব-সমাজ, তাহাও বিশ্বশৃঙ্খলার অঙ্গীভূত, তাহাও শাশ্বত নিয়মাবলীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। অন্যান্য বিজ্ঞানের ন্যায় সমাজ-বিজ্ঞানেরও কার্য্য বিশ্ব-সৃষ্টির অংশ-বিশেষের কার্য্যপ্রণালী ও নিয়মাবলীর অনুসন্ধান, আবিষ্কার ও ব্যাখ্যান। সমাজতত্ত্ব যে মনস্তত্ত্বের ভিত্তিতে অধিষ্ঠিত, ভূমিকাস্বরূপ সে সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা প্রয়োজন।

মানবের জীবন-যাত্রার আদিম সরঞ্জাম

বিশ্ববিজয়ের জন্য অমৃতের সন্তান মানব যখন তাহার কর্ম্মক্ষেত্র এই জগতে আবির্ভূত হইল, তখন মানবের জীবন-যাত্রার আদিম সম্বল ও সরঞ্জাম ছিল কেবল তাহার শরীর ও ইন্দ্রিয়জ বোধশক্তি (senses), মন এবং কতকগুলি স্বাভাবিক সংস্কার বা প্রবৃত্তি (instincts)—যেমন আত্মপোষণ (self-maintenance) প্রবৃত্তি, যৌনপ্রবৃত্তি (sex-instinct), দ্বন্দ্ব-প্রবৃত্তি (pugnacity), [অনভ্যস্ত বস্তুদর্শনে] পলায়ন-তৎপরতা (instinct of flight),

ঔৎসুক্য (curiosity), সংগঠনশীলতা (constructive instinct), আত্মখ্যাপন ও আত্ম-অবনমনশীলতা (instinct of self-assertion and self-abasement), এবং অর্জ্জনস্পৃহা (acquisitiveness)।

পুনরাবৃত্তির ও অভ্যাসের ফলে সহজাত প্রবৃত্তিগুলির সহিত কতকগুলি সংশ্লিষ্ট সাড়া (conditioned reflex) জড়িত হইল। স্মৃতিশক্তির সাহায্যে ও অভিজ্ঞতা দ্বারা এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বা সংস্কারগুলির অল্পাধিক রূপান্তর ঘটিল। স্নায়ুমণ্ডলীর উপর মানসিক ক্রিয়ার (psychic processএর) প্রভাব বর্ত্তায়।

মানবের নৈতিক জীবনের ভিত্তি

মানব-মনের অভিব্যক্তির ফলস্বরূপ এবং আবেষ্টনের সহিত জীবনের সামঞ্জস্য সাধনের প্রচেষ্টায় সমাজ ও সভ্যতার উৎপত্তি, বিকাশ ও পরিণতি হয়। মনের তিনটি দিক্ বা রূপ আছে—ব্যক্ত ও জ্ঞানগত (conscious); অব্যক্ত ও অজ্ঞানাচ্ছন্ন (unconscious); এবং এই দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রচ্ছন্নপ্রায় মন বা মগ্নচৈতন্য (sub-conscious mind)। মানবের সহজাত সংস্কারগুলি যদিও আবহমান কাল তাহার মনের উপর ক্রিয়া করিয়া আসিতেছে, তথাপি তাহারা প্রাণিজগতের অন্যান্য জীবের উপর যেরূপ আধিপত্য করে, মানবের উপর তদ্রূপ করিতে পারে না। পশুর সহজাত সংস্কার অপেক্ষা মানবের সহজ সংস্কারগুলির সংখ্যাধিক্য-নিবন্ধন ঐ সংস্কারগুলির পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে ও তাহার ফলে এক সংস্কার অপরাপর সংস্কারকে সংযমিত বা প্রতিহত করিতে পারে, এবং মানব-মনের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির পরিচালনা দ্বারা প্রবৃত্তিবিশেষকে নির্ব্বাচন ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রবৃত্তিগুলিকে প্রত্যাখ্যান করিবার অবসর ঘটে। সাধারণতঃ এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা সংগ্রাম ও জয় পরাজয় মগ্নচৈতন্যেই অভিনীত হয়। একই সহজাত সংস্কার বিভিন্ন আবেষ্টনের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ বিভিন্ন ব্যক্তির মনে বিভিন্ন রূপ ধারণ করিতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যেমন হঠাৎ কোন অপরূপ বস্তু বা জীব দেখিলে মানবের মনে ভয়, ঔৎসুক্য, ক্রোধ, অথবা বশ্যতার ভাব প্রভৃতি নানাবিধ প্রবৃত্তি জাগ্রত হইতে পারে, এবং তাহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ব্যক্তিবিশেষ এই বিভিন্ন প্রবৃত্তির মধ্যে কোন একটিকে গ্রহণ ও অপরগুলিকে অল্পাধিক বা সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করে।

মানব সংঘবদ্ধ হইয়া কিরূপে অজ্ঞানান্ধ সহজাত সংস্কারের দ্বারা পরিচালিত পশুপ্রায় জীবন অতিক্রম করিয়া, বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত ও জ্ঞানালোকে আলোকিত জীবন প্রাপ্ত হয়,—হিন্দুর মনোবিজ্ঞানের ভাষায় কিরূপে অন্নময় কোষ হইতে মানব বিজ্ঞানময় কোষে পৌঁছায়,—তাহারই অনুসন্ধান নৃতত্ত্বের কার্য্য।

মানবের সহজাত সংস্কারগুলির মূল লক্ষ্য আত্মসংরক্ষণ। আত্মসংরক্ষণকল্পে মানবের সহজাত এই সংস্কারগুলি তাহার আত্মশক্তির অপচয় কিংবা অপরের ক্ষতিবৃদ্ধির দিকে

দৃষ্টিপাত করে না। বুদ্ধিবৃত্তিই মানুষকে তাহার শক্তির মিতব্যয়িতা সাধনে তৎপর করে এবং সংযত অথচ প্রশস্ত জীবনযাত্রার পথ নির্দ্দেশ করে।

মানবের সহজাত সংস্কারগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়,—'আত্মসংরক্ষণকারী' প্রবৃত্তি (self-maintaining instincts) এবং 'সমাজ-সংরক্ষণকারী' প্রবৃত্তি (group-maintaining instincts)। আত্মসংরক্ষণশীল প্রবৃত্তিগুলি প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক, এবং সমাজ-সংরক্ষণশীল প্রবৃত্তিগুলি সহযোগমূলক।

আত্মসংরক্ষণশীল প্রবৃত্তিগুলির মধ্যে আত্মপোষণ প্রবৃত্তি, আত্মরক্ষা প্রবৃত্তি, যৌন প্রবৃত্তি হইতেছে মৌলিক প্রবৃত্তি; এবং যৌন প্রবৃত্তির আনুষঙ্গিক লজ্জা, ঈর্ষা ও আত্মপ্রদর্শন ও শিশুলালন প্রবৃত্তি প্রভৃতি গৌণ প্রবৃত্তি। আত্মপ্রাধান্যস্থাপন, [স্বত্ববোধের মূলীভূত] অর্জ্জন-লিপ্সা, ভয়, বিবাদপ্রিয়তা [যাহা হইতে যুদ্ধপ্রিয়তা, এমন কি, মৃগয়া-প্রিয়তাও জন্মে] এইগুলিও আত্মসংরক্ষণশীল প্রবৃত্তি।

দলসংগঠনপ্রবৃত্তি ও তাহার আনুষঙ্গিক অনুকরণপ্রবৃত্তি, ইঙ্গিত-অনুসরণ-প্রবণতা, বশ্যতা, ভক্তি ও আত্মোৎসর্গ, যৌথ-ক্রীড়া প্রভৃতি প্রবৃত্তিগুলি "দলসংরক্ষণকারী"।

এই শেষোক্ত শ্রেণীর সংস্কারগুলি মানুষকে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করে। সমাজ-ধর্ম্মের ও নীতিধর্ম্মের প্রধান কার্য্য—এই সংস্কারনিচয়ের সুব্যবস্থিত পরিচালনা ও সংযমন দ্বারা মানবজীবনের ও সমাজের উৎকর্ষসাধন।

আত্মরক্ষণশীল প্রবৃত্তিগুলি দলরক্ষণশীল প্রবৃত্তিগুলির মূলতঃ কতকটা বিরোধী হইলেও, পরস্পরের সহায়ক হইয়া জাতি বা সমাজ সংরক্ষণের উপযোগী হইতে পারে। সমকক্ষতা-প্রিয়তা এবং আত্মনির্ভরশীলতা, এই উভয় প্রবৃত্তিই কার্য্যতঃ মানবসমাজের উন্নতি-বিধায়ক হইতে পারে।

যখন মানবের জীবনযাত্রার উপযোগী দৈহিক পরিবর্ত্তন ও ক্রমপরিণতি স্থগিত হইল, তখনই আরম্ভ হইল মানসিক ক্রমোন্নতি। অপরাপর কতকগুলি জন্তুর দেহ অপেক্ষা মানবদেহ হীনবল হইলেও মানসিক অভিব্যক্তির সাহায্যে মানবদেহ নব শক্তিতে বলীয়ান্ হইতে লাগিল। বুদ্ধিবলে অস্ত্রাদি উদ্ভাবন করিয়া মানব তাহার বাহুর বল বহুগুণ বর্দ্ধিত করিল। আর কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ-দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করিবার কৌশল আবিষ্কার করিয়া জড়-জগৎ ও জীবজগতের উপর কতকটা প্রভুত্ব স্থাপনে সমর্থ হইল।

পরস্পরের সংস্পর্শে বিভিন্ন ব্যক্তির মগ্নচৈতন্যে একজাতিত্ব-বোধ বা স্বজাতি-চেতনা জাগ্রত হইল; আর পরস্পরের সংসর্গে মানব-মনের স্বাভাবিক সংস্কারগুলি রস-সমন্বিত হইয়া চিত্তবৃত্তি বা হৃদয়াবেগ রূপে সাড়া দিল; যেমন যৌনপ্রবৃত্তি হইতে অনুরাগ বা প্রেম; পলায়নপ্রবৃত্তি হইতে ভয়; ঔৎসুক্য হইতে বিস্ময় ও অনুসন্ধিৎসা; বিরুদ্ধতা হইতে ক্রোধ, ইত্যাদি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, প্রত্যেক স্বাভাবিক প্রবৃত্তির সহিত একাধিক চিত্তবৃত্তি একত্র সংযুক্ত হওয়ায় মানবের ধীশক্তি এবং ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের অবকাশ

উপস্থিত হইল। ইহা হইতে ব্যক্তিত্বের ও নৈতিক স্বাধীনতার উদ্ভব হইল। ইহাই মানবের নৈতিক জীবনের ভিত্তি।

মানবের সহজাত সংস্কারগুলির সাহায্যে কেবল ইন্দ্রিয়বোধগম্য জগতের সহিত প্রথম পরিচয় ও সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল; আর চিত্তবৃত্তিগুলি মানবকে ভাব-সংযোগে মানস জগতের সহিত মিলনের বিচিত্র অনুভূতির আস্বাদন দান করিল। মানবের সহিত মানবের নানাবিধ সম্বন্ধ ও সংঘাতের মধ্য দিয়া সমাজ-বন্ধন দৃঢ় হইতে লাগিল।

মানব-সমাজের উৎপত্তি ও অভ্যুদয়

'সমাজ' শব্দের অর্থ, অমরকোষের মতে, "পশুভিন্নানাং সংঘঃ"। প্রকৃতপক্ষে 'সমাজ' কেবল ব্যক্তিসমষ্টি মাত্র নহে; তাহা অপেক্ষা বৃহত্তর ও উচ্চতর বস্তু। সমাজের জীবন তাহার অতীতের ও বর্ত্তমানের ভাবধারা, চিন্তাধারা ও কর্ম্মধারায় পরিপুষ্ট হইয়া তাহার ভবিষ্যতের নিয়ামক হয়। সংগঠনই সমাজের আত্মা। সংগঠনের ফলে সমাজের পরিচালন-ক্ষমতা জন্মে; শক্তি সঞ্চিত ও বর্দ্ধিত হয়, কার্য্যবিভাগের ফলে শক্তির, উপকরণের ও সময়ের অপচয় নিবারিত হয়। জার্ম্মান দার্শনিক ফিক্‌টে (Fichte) যথার্থই বলিয়াছেন, "সমাজের মধ্যেই মানুষ মানুষ হয়", অর্থাৎ পশুত্ব হইতে মনুষ্যত্বে উন্নীত হয়। "Man only becomes man among men." বস্তুতঃ সমাজের অঙ্গীভূত বলিয়াই ব্যক্তিবিশেষের ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট ও রূপায়িত হয়।

মানবের সুদূরতম অতীতের যাহা কিছু নিদর্শন ভূগর্ভ, নদীগর্ভ, গিরিগহ্বর প্রভৃতি হইতে পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, মানব-জীবনের প্রাক্কালেই আদিমানব জীবনীশক্তির অনুপ্রেরণায়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলবদ্ধভাবে খাদ্যান্বেষণে ঘুরিয়া বেড়াইত। সংঘবদ্ধ জীবনে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কতকটা ত্যাগ করিতে হয়, আর স্বেচ্ছায় কেহ সে ত্যাগ স্বীকার করে না; এজন্য অনুমান হয় যে, দলবদ্ধ হইয়া থাকিবার বাসনা মানবের সহজাত নহে। সভ্যতার ইতিহাসের যত গোড়ার দিকে যাওয়া যায়, ততই সংঘের ক্ষুদ্রতা ও জটিলতার ন্যূনতা দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, লাটিন ভাষায় 'অপরিচিত ব্যক্তি' এবং 'শত্রু' এই দুই অর্থে একই বাক্য (*hostis*) ব্যবহৃত হয়।

সে যাহা হউক, ইহা নিশ্চিত যে, অসহায় আদিম অবস্থায় জীবনসংগ্রামে আত্মরক্ষার অনিবার্য্য প্রেরণায়,—বিচার বা চুক্তি দ্বারা নহে,—আদিম মানবের আংশিক বিরোধমূলক সম্বন্ধও অজ্ঞাতসারে সহযোগিতায় পরিণত হইয়া স্থায়ী সঙ্ঘ বা 'সমাজ' গঠিত হইয়াছিল।

কেবল আত্মপোষণ ও আত্মসংস্থিতি (self-perpetuation), এই দুই প্রবৃত্তির প্রণোদনেই আদিম মানবের সমাজ উদ্ভূত হইয়া থাকিতে পারে। এই প্রবৃত্তিদ্বয়ের চরিতার্থতার প্রচেষ্টায় খাদ্যসংগ্রহ ও শ্রমসম্বন্ধীয় ব্যবস্থাপন (economic and industrial organization) ও পারিবারিক সংগঠন প্রভৃতি মূল সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি গড়িয়া উঠিতে পারে। সমাজের জনসংখ্যার সহিত উপজীব্যের সামঞ্জস্য সাধনকল্পেই স্বত্বের উৎপত্তি

এবং বিবাহ-ব্যবস্থা, দায়ভাগ ও দণ্ডবিধির উৎপত্তি হয়। যদিও আদিম মানব-সজ্ঘগুলির মধ্যে সম্ভবতঃ পারিবারিক স্বাতন্ত্র্য ছিল না, ক্রমে তাহা ধীরে ধীরে উদ্ভূত হইল।

আদিম সমাজবন্ধনের একটি প্রধান উপাদান বা সহায় ছিল—আধিভৌতিক ভীতি। মৃত্যু ও মৃত ব্যক্তির দর্শনে এবং অন্যবিধ অলৌকিক ঘটনার অনুভূতি হইতে ভয় জন্মে। ভয়ে মানুষ পরস্পরকে আঁকড়াইয়া থাকিতে চায়; আর ভয়ের কারণ নিরাকরণের জন্য সম্মিলিত হইয়া যাদু ও ধর্ম্মক্রিয়ার উদ্ভাবন ও অনুসরণ করে। সান্নিধ্য ও সাদৃশ্যজনিত মানসিক সহযোগের (associationএর) নিয়মানুসারে আদিম সমাজে যাদুক্রিয়ার উদ্ভব হইল।

আদিম মানব প্রাকৃতিক শক্তির সমগ্রভাবে ধারণা করিতে অসমর্থ হওয়ায় উহাকে খণ্ড খণ্ড ভাবে দেখে এবং বহুবিধ স্বতন্ত্র দৈবশক্তির কল্পনা করে ও তাহাদিগকে মন্ত্রতন্ত্রের বলে বা কৌশলে বশীভূত অথবা স্তবস্তুতি ও নৈবেদ্য বা বলি দ্বারা প্রীত করিতে প্রয়াস পায়।

ক্রমে নানাবিধ নৈসর্গিক ও সামাজিক শক্তির প্রভাবে মানব-জীবনের ও মানব-সমাজের আদিম সরঞ্জামগুলি পরিবর্দ্ধিত, সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত হইল। যখন মৌলিক প্রয়োজন সাধনোপযোগী প্রবৃত্তিগুলির প্রণোদনে জীবনোপায়ের মূল প্রতিষ্ঠানগুলি (maintenance-institutions) গড়িয়া উঠিল, তখন আত্ম-প্রীতিসাধক প্রবৃত্তিগুলি (impulses to self-gratification) জাগ্রত ও ক্রিয়াশীল হইতে লাগিল। আত্মপ্রশ্রয়, আত্ম-গর্ব্ব ও আত্ম-খ্যাপনের (self-assertion) উপায়-স্বরূপ বেশভূষা, অলঙ্কারাদি, যুদ্ধ ও ক্রীড়াদি, মাদক দ্রব্যের ব্যবহার, শিল্প, চিত্রাঙ্কন, নৃত্যগীতাদি ও অন্যান্য চারুকলার উদ্ভব হইল। যদিও সৌন্দর্য্যস্পৃহা ও সুকুমার কলা সমাজের পোষণ ও রক্ষণের জন্য অবশ্য-প্রয়োজনীয় নহে, তবু ইহাদের প্রণোদক প্রবৃত্তিগুলি এত প্রবল যে, তাহার জন্য মানব প্রভূত ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত। এই প্রবৃত্তিগুলির মধ্যে মানবমনের শক্তি ও উদ্যমের অদ্ভুত প্রকাশ দেখা যায়। আত্ম-গর্ব্ব অহঙ্কাররূপে পরিশুদ্ধ হইয়া ব্যক্তিত্বের ও শ্রেণীর বা জাতির বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ সূচিত করে; এক আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইলে অপর আকাঙ্ক্ষা আসে ও ক্রমে আদর্শ-প্রবণতা জন্মে। এইরূপে ধীরে ধীরে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনধারা, আচার-ব্যবহার, প্রকৃতি ও চরিত্র, নীতি, ধর্ম্ম ও শাসন-প্রণালী, সাহিত্য, কলা ও বিজ্ঞানের উদ্ভব ও পরিপুষ্টি হইল।

মোটের উপর সহযোগিতা এবং আত্ম-বিস্তৃতির বা মিলনের আকাঙ্ক্ষাই মানব-সমাজের মূল সুর—প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর সহিত মিলন বা সামঞ্জস্য সাধন, মানুষে মানুষে মিলন, সমাজে বৈষম্যের মধ্যেও সাম্য স্থাপন ও আধিভৌতিক জগতের সহিত ঐকতান স্থাপনের প্রচেষ্টাতেই সমাজের উৎপত্তি ও অভ্যুদয়। এই মিলন, সাম্য বা ঐকতান যত নিবিড় ও গভীর হইতে থাকে, সমাজও তত উন্নত ও সমৃদ্ধ হয়।

ধর্ম্মনীতি ও রাষ্ট্র-সংহতি সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করে। কোন কোন সমাজের উপর ধর্ম্মের

প্রাধান্য অধিক, যেমন হিন্দু সমাজে; আর কোন কোন সমাজে রাষ্ট্রের প্রাধান্য অধিক, যেমন সাধারণতঃ পাশ্চাত্য সমাজে।

নৈতিক জীবনের উদ্ভব ও পরিণতি

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মানবের সহজাত সংস্কারগুলির সংখ্যাবহুলতা মানব-জীবনের মূল্যবান্ সম্পত্তি! ইহারা পরস্পরকে সংযত করিয়া জীবন নিয়মিত করিতে পারে। আর ইহাদের সংখ্যাধিক্যের জন্যই মানবের ইচ্ছা-শক্তি প্রথমে কার্য্যকরী হয় ও সদসৎ বিচার-পূর্ব্বক স্বাধীনভাবে হিতকরী বা সৎ প্রবৃত্তি নির্ব্বাচন ও অহিতকরী বা অসৎ প্রবৃত্তি পরিহার করিতে পারে। মূল প্রবৃত্তিগুলি লইয়া হাতে-কলমে পরীক্ষা করিয়া বিভিন্ন জাতি ও সমাজ বিভিন্ন অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে এবং সেই অভিজ্ঞতানুযায়ী বিভিন্ন জীবনধারা অবলম্বন করিয়াছে। অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার সাহায্যে বাহ্য প্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির উপর আধিপত্য স্থাপনের বিভিন্ন পন্থা অনুযায়ী বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতি বা সভ্যতা বিভিন্ন ছাঁচে গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। আদিম সমাজে যুবক-যুবতীদের দীক্ষা ও শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি তাহাদিগকে স্ব-স্ব সমাজের আদর্শানুযায়ী জীবন ও চরিত্র গঠনে সাহায্য করে।

অভ্যাস,—নৈতিক জীবনের প্রারম্ভ।—পরস্পরবিরোধী প্রবৃত্তিনিচয়ের তাড়না হইতে আত্মরক্ষার জন্য অবস্থাবিশেষে মানব-মন প্রবৃত্তিবিশেষকে অনুসরণযোগ্য বলিয়া মনোনীত করে; পরে অনুরূপ অবস্থায় সেই প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে; এইরূপে উহা অভ্যাসে পরিণত হয়। ব্যক্তিগত অভ্যাস উত্তরাধিকার-সূত্রে বর্ত্তায় না। কিন্তু সমাজগত অভ্যাস বংশপরম্পরার উপর প্রভাব বিস্তার করে। পিতামাতার শিক্ষা ও শাসন, সমাজের ভয় ও পূর্ব্বপুরুষদের ভয়, দেবতাদের ভয় ও ঋদ্ধি বা সৌভাগ্য অর্জ্জনের স্পৃহা, এই সমস্ত শক্তির প্রভাবে সমাজানুমোদিত অভ্যাসগুলি বদ্ধমূল হয়। প্রচলিত সামাজিক অভ্যাসগুলিকেই সামাজিক রীতিনীতি বা আচারধর্ম্ম বলা হয়। এই রীতিনীতিই মানবসভ্যতার প্রথম অবস্থার নীতিশাস্ত্র। এই ব্যাবহারিক বিধিনিয়মের সামান্য ব্যতিক্রমও সমাজে দণ্ডার্হ হয়। আদিম সমাজে আত্ম-সমালোচনা বিশেষভাবে জাগ্রত হয় নাই। পুরুষানুক্রমিক আচার-ব্যবহারই সনাতন ধর্ম্মরূপে অবশ্যপালনীয়। উহার কোন দফায় কোন ত্রুটি বা অভাব থাকিতে পারে, এই ধারণা মনে অস্পষ্টভাবে জাগ্রত হইলেও, কেহই তাহার সংশোধনের প্রয়াস পাইতে সাধারণতঃ সাহসী হয় না।

আইন ও ধর্ম্ম।—প্রচলিত রীতিনীতিই আদিম সমাজে আইনের পদাভিষিক্ত হয়। প্রত্যেক আদিম সমাজেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে নেতার প্রভাব দৃষ্ট হয়। নেতার বা সমাজের প্রভুত্ব ও শাসন প্রত্যেক পরিবারে পিতামাতার প্রভুত্ব ও শাসনের স্থান অধিকার করে। আদিম সমাজে শৈশব কাল হইতে মানব আদেশানুবর্ত্তিতাতে এরূপ অভ্যস্ত হয় যে, সামাজিক আচারনীতি তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক অথবা ঐশ বিধিনিয়ম বলিয়াই

প্রতীত হয়; আর তাহার ব্যতিক্রম অচিন্তনীয়। বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রমের জন্য প্রকৃতিদেবী অথবা দেবতারা অবশ্য শাস্তি দিবেন, এই বিশ্বাস তাহাদের মনে স্বাভাবিক ও স্বতঃসিদ্ধ। স্বগোত্রে যৌন সম্বন্ধ বর্জ্জন, স্বগোত্রীয়ের প্রাণহননকারীর বিনাশ-সাধন, তাহাদের নিকট এরূপ স্বাভাবিক নিয়ম বলিয়া প্রতীয়মান হয় যে, এগুলি সমাজ-সৃষ্ট নীতিমাত্র, এ ধারণা তাহাদের কল্পনাতেও স্থান পায় না। বস্তুতঃ যত দিন পর্য্যন্ত উচ্চনীচভেদবিহীন (classless) আদিম (tribal) সমাজের স্থলে উচ্চনীচ শ্রেণী-বিভক্ত সমাজ ও রাজশক্তির উদ্ভব না হয়, তত দিন পর্য্যন্ত সামাজিক বিধিনিষেধ ও দণ্ডনীতি ধর্ম্মের অংশীভূত বলিয়া গণ্য হয়। অনেক স্থলেই এক হিসাবে আইন অপেক্ষা ধর্ম্ম অধিকতর শক্তিশালী ও সংযমনক্ষম। আদিম সমাজের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, ধর্ম্মের নিষেধ (taboo) অমান্য করিলে দৈব অভিশাপ ও দুর্ভাগ্য অনিবার্য্য; সমাজের বা গোষ্ঠীর ব্যক্তিবিশেষের পাপে, অর্থাৎ সামাজিক বিধি-লঙ্ঘনের ফলস্বরূপ সমগ্র সমাজ বা গোষ্ঠী পাপী, ধর্ম্মভ্রষ্ট, অপবিত্র ও কলুষিত হয় ও দৈব দণ্ডে দণ্ডার্হ হয়। সুতরাং সমাজের বা গোষ্ঠীর অপরাধ ক্ষালনের ও পবিত্রতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য অপরাধী ব্যক্তিকে সমাজ হইতে বহিষ্করণ করাই বিধি। আদিম সমাজে সনাতন আচারবিধির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুষ্ঠানের অলংঘ্যতা ও পবিত্রতার ধারণাই আদিম সমাজের আচার-নিষ্ঠতা ও রক্ষণশীলতার মূল কারণ।

আদিম সমাজের ধর্ম্ম-জীবন কেবল নিষেধ-নীতিতে (tabooতে) পর্য্যবসিত হয় না; তাহাদের বিশ্বাস যে, এই নিষেধ-নীতি-প্রসূত সংযমের ফলে নিগূঢ় শক্তি ('mana') অর্জ্জন করা যায়; আর ঐ শক্তি সংক্রামক; এবং উহার প্রভাবে আদিম সমাজগুলি স্ব-স্ব সৌভাগ্য বা ঋদ্ধি অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে। এই বিশ্বাস আদিম সমাজগুলির মনে নিশ্চিন্ততা ও বল প্রদান করে। পূর্ব্বপুরুষেরা তাঁহাদের জ্ঞান ও দেবানুরাগে অনুপ্রাণিত হইয়া এই সমস্ত বিধিনিষেধের বিধানপূর্ব্বক স্বজাতির কল্যাণের ও শক্তি সঞ্চয়ের পথ সুগম করিয়া গিয়াছেন, এই ধারণায় তাঁহাদের প্রতি সমধিক ভক্তিমান্ হয়। এই দৈবী শক্তির বর্ম্মে আবৃত হইয়া আদিম জাতিরা জীবনসংগ্রামে বলীয়ান্ হয়। কিন্তু এই বর্ম্ম একেবারে স্থিতিস্থাপকতাবিহীন।

আদিম সমাজের ন্যায়-অন্যায় বোধ পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান এবং সভ্য মানব অপেক্ষা আদিম মানবের মনের উপর সদসৎ বিবেকের প্রভাব সমধিক প্রবল হইলেও, তাহাদের ন্যায়-অন্যায়ের আদর্শ অনমনীয়, এজন্য তাহাদের স্বাধীন চিন্তার স্থান বা ক্রিয়া-ক্ষেত্র নাই বলিলেই চলে। নির্দ্দিষ্ট বিধি-নিয়মের তিলমাত্র অন্যথাচরণ করিলে সমাজচ্যুত হইতে হয়। তাহাদের বিশ্বাস যে, নূতন বা অনভ্যস্ত আচরণে মানুষকে অশুচি করে ও তজ্জন্য তাহার সংস্পর্শ অপরকেও অশুচি করিতে পারে বলিয়া ঐরূপ কদাচারী ব্যক্তি সমাজে পরিত্যাজ্য। আদিম সমাজ ব্যক্তিবিশেষের আচরণের উদ্দেশ্য বিচার করে না, স্বাধীন চিন্তা ও আচরণের প্রশ্রয় প্রদান করে না। কেবল অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি, সাহস, বদান্যতা প্রভৃতি সাধারণ গুণের উৎকর্ষ অনুসারে ব্যক্তিবিশেষকে দলপতি বা সমাজনেতা মনোনীত

করা হয়; এবং কালক্রমে অনেক স্থলে উত্তরাধিকারিসূত্রেও দলপতির পদ বর্ত্তায়। এই সমস্ত সমাজ-নেতা সাধারণ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে সমাজকে স্ব-স্ব পূর্ব্বপুরুষানুক্রমে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী পরিচালন করিতে সমর্থ হইলেও, অপ্রত্যাশিত সঙ্কট হইতে সমাজের উদ্ধারের জন্য অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন অন্যবিধ নেতার প্রয়োজন হয়। এইরূপ বিশিষ্ট নেতা দৈবশক্তির সহিত কারকারবারের জন্য জনসাধারণ হইতে স্বীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলে ও আভ্যন্তরীণ জীবনের দিকে মনোনিবেশ করে। এই জন্য ইহাদেরই স্বাধীন চিন্তা ও ব্যক্তিত্বের স্ফুরণের সুবিধা হয়। ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ও বিকাশ হইতেই সভ্যতার স্ফুরণ ও উন্নতি হয়। চিন্তাশীল স্বাধীনচেতা ব্যক্তিই সমাজের প্রকৃত নেতৃত্বের উপযোগী। কিন্তু সেরূপ ব্যক্তি আদিম সমাজে বিরল, এবং সভ্য সমাজেও প্রচুর নহে।

সমাজের জটিলতা বৃদ্ধি

সভ্যতার উন্নতির অনুপাতে সমষ্টিজীবনের যোগসূত্র ও পরিসর বৃদ্ধি হয়; পরস্পরের কর্ত্তব্যের ও দায়িত্বের বন্ধনও দৃঢ় হয় ও গুণভেদে প্রত্যেকের অধিকার নির্ণীত হয়। সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কোন কার্য্য করিতে গেলে নেতার প্রয়োজন হয়। আন্দামান দ্বীপবাসী মিনকোপি জাতির বা লঙ্কাদ্বীপের বেদ্দা জাতির ন্যায় সর্ব্বাপেক্ষা আদিম সমাজে নেতা নির্ব্বাচন করার রীতি বিরল; অপেক্ষাকৃত সুচতুর ব্যক্তি স্বতঃই দলনেতা হইয়া দাঁড়ায়। অপেক্ষাকৃত উন্নত সমাজে নির্ব্বাচন দ্বারা বুদ্ধিতে, বয়সে ও অভিজ্ঞতায় এবং কোন কোন স্থলে বংশ-মর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠ এক বা একাধিক ব্যক্তিকে দলপতি বা নায়ক নিযুক্ত করা হয়।

মৃগয়ার জন্য অথবা পশুচারণের জন্য প্রত্যেক মানব-সঙ্ঘের স্ব-স্ব কর্ম্মক্ষেত্রস্বরূপ বিভিন্ন জঙ্গলে বা অধিকৃত ভূমিতে ক্রমে স্ব-স্ব অধিকার বা স্বত্ববোধ জাগ্রত হয়। প্রথমে এই স্বত্ব ছিল অনির্দ্দিষ্ট সাধারণ স্বত্ব; ক্রমে হইল যৌথ স্বত্ব; তাহা অবশেষে পরিণত হইল বিভিন্ন নির্দ্দিষ্ট অংশে ব্যক্তিগত স্বত্বে।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির আদান-প্রদানের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের সূচনা হইতে লাগিল। প্রথমে পণ্যবিনিময়, পরে শস্য বা গৃহপালিত পশুপক্ষী, বস্ত্রাদি বা অন্য কোন দ্রব্য (যেমন আসাম-বর্ম্মার সীমান্ত প্রদেশে কোথাও কোথাও পেটা ঘণ্টার আকারে পিত্তলের চাকতি) বিনিময়ের বাহনস্বরূপ ব্যবহৃত হইতে লাগিল। পরে বিভিন্ন প্রাচীন দেশে মুদ্রা ও চীনদেশে প্রথম কাগজের 'নোট'এর উদ্ভব ও প্রচলন হইয়াছিল। বাণিজ্য ও সম্পত্তি বৃদ্ধির অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ আর্থিক বৈষম্য ও ধনি-দরিদ্রে সম্প্রদায়ভেদ উপস্থিত হইল।

কালক্রমে যখন বিভিন্ন মানব-সঙ্ঘের গতানুগতিকভাবে কার্য্য-ব্যবস্থা ও জীবন-প্রণালী গতিহীন হইয়া পড়ে, মানসিক জড়তা আসিয়া প্রগতির পথ রুদ্ধ হয়, জীবন-সঙ্গীতের সুর কাটিয়া যায়, তাল ভাঙ্গিয়া যাইতে থাকে, এরূপ সময় অনেক স্থলে দেখা যায় যে, এক বা একাধিক নবাগত জাতির বা সমাজের সংস্পর্শের ফলে ঐ স্থিতিশীল সমাজের

নবচেতনা আসে, ব্যক্তিগত স্বাধীন চিন্তা উদ্দীপিত হয়। মানবসমাজের প্রকৃত উন্নতির জন্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সমাজানুবর্ত্তিতা, উভয়েরই পুষ্টি অবশ্য-প্রয়োজনীয়। সমাজের কতিপয় চিন্তাশীল ব্যক্তি অভ্যস্ত বিধিনিষেধের তুলনামূলক বিচার দ্বারা তাহাদের আংশিক পরিবর্ত্তন করিতে প্রয়াসী হন ও অনেক সময় তাহাতে কৃতকার্য্য হন, আর আগন্তুকদের সমস্ত রীতি-নীতি, মত ও বিশ্বাস অনুমোদন না করিলেও তাহাদিগকে তাহা মানিয়া চলিতে দিয়া এবং নিজেরাও আগন্তুক জাতির কোন কোন বিশেষ প্রথা, আচার বা মত আপন সমাজে গ্রহণ করিয়া উদারতার পরিচয় দেন। ব্যক্তিত্বের স্ফুরণই উন্নতিশীল সমাজের লক্ষণ। এইরূপে নৈতিক স্বাধীনতার প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চলিতে থাকে। বিভিন্ন জাতি বা সংস্কৃতির দ্বারা আনীত নূতন ভাব, চিন্তা ও রীতিনীতির সংস্পর্শে স্বাধীন চিন্তা জাগ্রত হইলে দেখা যায় যে, একাধিক মনীষাশালী পুরুষ স্বীয় সমাজে নূতন ভাবধারা, নূতন আদর্শ ও শক্তি আনয়ন করেন ও সময়ের অনুপযোগী কোন কোন বিধিনিষেধের পরিবর্ত্তন সাধন ও নূতন নিয়ম বা প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়া সমাজের উন্নতির গতি উন্মুক্ত করিয়া দেন। এইরূপ এক বা একাধিক পুরুষসিংহের সাময়িক আবির্ভাবের অভাবে যে সঙ্ঘগুলি সময়োপযোগী সামাজিক পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া আপনাদিগকে নূতন সামাজিক আবেষ্টনীর সহিত সমীকরণ করিতে সমর্থ না হয়, তাহারা জীবন-সংগ্রামে পশ্চাৎপদ হইয়া ধ্বংসোন্মুখী হয়; ইহা কোন কোন আদিম জাতির মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। যেমন সমাজের মধ্যেই ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ও পরিপুষ্টি হয় ও মানুষ গড়িয়া উঠে, তেমনই আবার বিশেষ বিশেষ শক্তিমান্ মানুষই স্বীয় সমাজকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত করে।

সভ্যতর জাতির সংস্পর্শে বা সংমিশ্রণে যে সঙ্ঘগুলির উন্নতির গতি উন্মুক্ত ও বেগ বর্দ্ধিত হয়, তাহাদের মধ্যে অনেক স্থলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন গ্রামের স্বায়ত্তশাসনের পরিবর্ত্তে, সঙ্ঘে সম্মিলিত এক বা একাধিক ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। বিভিন্ন গ্রাম-নেতাদের নেতৃত্বে ক্রমে ক্রমে ঐরূপ রাষ্ট্রের স্বায়ত্তশাসন লুপ্ত হয়। রাজশক্তি এক বা একাধিক নেতার হস্তে কেন্দ্রীভূত হয় এবং সামন্ত বা অভিজাত-বংশের উদ্ভব হয়। অনেক স্থলে জায়গীর-প্রথা (feudalism) প্রবর্ত্তিত হয়। সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীবিভাগ বৃদ্ধি হয়। অনেক স্থলে দাস শ্রেণীর উদ্ভব হয়। শ্রমশিল্পের ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তৃতি হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে স্তর পরিবর্ত্তন বা গতিশীলতা (class-mobility) উপস্থিত হয়। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি স্ব-স্ব শক্তি বা যোগ্যতা অনুসারে নিম্নশ্রেণী হইতে উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত হয় এবং কেহ কেহ যোগ্যতার অভাবে উচ্চতর শ্রেণী হইতে নিম্নতর শ্রেণীতে অবনমিত হয়। অধুনা পাশ্চাত্য প্রদেশে যদিও উচ্চ-নীচ শ্রেণীভেদ বর্ত্তমান, তথাপি প্রায় সর্ব্বত্রই ঐ শ্রেণীবিভাগ এইরূপ গতিশীল বা পরিবর্ত্তনশীল। তবুও এই বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান অসাম্যের জন্য তথায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছে বিভিন্ন রাষ্ট্রতান্ত্রিক মতের মধ্যে—যেমন ধনসাম্যবাদ,[১] বিপ্লবী সাম্যবাদ,[২] বিপ্লববাদ,[৩] সমাজতন্ত্রবাদ,[৪] গণতান্ত্রিক সমাজ-তন্ত্রবাদ,[৫] গণতন্ত্রবাদ,[৬] প্রজাতন্ত্রবাদ,[৭] সঙ্ঘবদ্ধ

শ্রমিক সমাজতন্ত্রবাদ,[৮] এক-নায়কত্ববাদ,[৯] ধনতান্ত্রিকতা,[১০] রাষ্ট্রচালিত ও রাষ্ট্রপরিকল্পিত ধনতন্ত্রবাদ,[১১] অর্থনৈতিক গণতন্ত্র ও ব্যক্তিগত বণ্টননীতি [১২] এবং শ্রেণীগত বৈষম্যহীন সমাজ বা শ্রেণীহীন সমাজ।[১৩]

সৌভাগ্যক্রমে আমাদের প্রাচীন ঋষিরা ভারতে বিভিন্ন জাতির ও বিভিন্ন স্তরের জন-সমষ্টি লইয়া বৈষম্যের মধ্যে এমন সাম্যবিশিষ্ট শাশ্বত ধর্ম্মাশ্রিত রাষ্ট্র ও সমাজ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন যে, ভারতে এ সমস্ত সমস্যার উদয় এত কাল হয় নাই। কিন্তু প্রায় এক সহস্র বর্ষ যাবং রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা হারাইয়া ও গতানুগতিক ভাবে জীবন যাপন করিবার পরে সম্প্রতি প্রায় দুই শত বর্ষ যাবং পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া এখন এইরূপ সমস্যার আবির্ভাব হইতেছে। আমাদের সমাজের গতিশীলতা ক্রমে প্রায় বিলুপ্ত হওয়াতে এই সব সমস্যা সম্প্রতি ঘনীভূত হইতেছে।

ভারত-সমাজের বিভিন্ন উপাদান

যুগে যুগে ভারতমাতা নানা জাতিকে সন্তাননির্ব্বিশেষে ক্রোড়ে স্থান দিয়াছেন। বিভিন্ন জাতির এবং বিভিন্ন সমাজ ও সংস্কৃতির বিচিত্র সুরের ধারা এখনও ভারত-শোণিতে ধ্বনিত রহিয়াছে।

সর্ব্বসমন্বয়কারিণী ভারতমাতা এই সমস্ত বিভিন্ন সুরের যথাসম্ভব ঐকতান সাধন করিয়া এক অনন্যসাধারণ মহিমামণ্ডিত বিশাল হিন্দুসমাজ ও সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। ভারতের প্রাচীন ঋষিদের ভাবনা, সাধনা ও সুচিন্তিত ব্যবস্থার ফলে বহু বহু শতাব্দী পূর্ব্বে যে মহান্ বিচিত্র হিন্দুসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, অবস্থা-বিপর্য্যয়ে তাহার প্রভূত অবনতি ঘটিলেও তাহার বহুযুগব্যাপী সজীবতা, বিশিষ্টতা, বিশিষ্ট রূপ ও বিশিষ্ট উচ্চ আদর্শ প্রণিধানযোগ্য। প্রাচীন ভারতে এক বিরাট্ সমাজে বহু বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একতানের, বহুত্বের মধ্যে একত্বের যে বিচিত্র দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছিল পৃথিবীতে অন্য কোথাও তাহা দেখা যায় নাই।

নিম্নে ভারত-সমাজের বিভিন্ন মৌলিক জাতীয় উপাদানের যে সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিতেছি, ইহা হইতে এ ধারণা ভুল হইবে যে, বর্ত্তমানে ভারতের কোন জাতি নিছক অমিশ্র 'নর্ডিক-আর্য্য' বা অমিশ্র 'আল্পাইন-আর্য্য,' বা অমিশ্র 'প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড' বা অমিশ্র 'ইন্দো-মেডিটেরানিয়ান' বা অমিশ্র 'মঙ্গোলিয়ান'। বস্তুতঃ ভারতে বা জগতে অমিশ্র জাতির অস্তিত্ব বহুকাল যাবং লোপ পাইয়াছে; হয়ত আণ্ডামানদ্বীপবাসী নেগ্রিটোদের ন্যায় দুই

১। Communism; ২। Revolutionary Communism; ৩। Bolshevism; ৪। Socialism; ৫। Democratic Socialism; ৬। Democracy; ৭। Republicanism; ৮। Syndicalism; ৯। Fascism; ১০। Capitalism; ১১। State-controlled and State-planned Capitalism; ১২। Economic democracy and Individual appropriation; ১৩। Classless Society.

একটি মাত্র জাতি খানিকটা অমিশ্র অবস্থায় আছে। এ প্রবন্ধে কেবল জাতি-বিশেষের আনুমানিক মৌলিক উপাদান (radical element) হিসাবে 'নর্ডিক', 'আল্‌পাইন' প্রভৃতি নামে তাহাদিগকে অভিহিত করিয়াছি।

ভারতের বিলুপ্ত নেগ্রিটো-প্রায় জাতি

আধুনিক পণ্ডিতদের গবেষণার আলোকে যখন ভারতের তমসাচ্ছন্ন সুদূরতম অতীতের যবনিকা অপসারিত হইল, তখন পাওয়া গেল, দক্ষিণ ও মধ্য-ভারতে কতকগুলি অমার্জ্জিত প্রস্তরায়ুধ এবং সামান্য কয়েকটি প্রাগৈতিহাসিক গুহা-চিত্র। ঐগুলি ভারতের প্রাচীনতম অধিবাসীদের নিদর্শন বলিয়া সুধীসমাজে গৃহীত হইয়াছে। আর দক্ষিণ-ভারতে কাডার, পুলাঁয়া, উরালি প্রভৃতি লুপ্তপ্রায় দুই চারিটি বন্য অসভ্য জাতির মধ্যে অল্পসংখ্যক খর্ব্বাকৃতি, কৃষ্ণকায়, অনুন্নতনাসিকা ও উর্ণাসদৃশ, কেশ-যুক্ত ব্যক্তির দেহাবয়ব দেখিয়া ও তাহাদের পরিমাপ লইয়া কোন কোন নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত অনুমান করিয়াছেন যে, উহাদের ধমনীতে এখনও নেগ্রিটো-রক্তের ক্ষীণ ধারা বহিতেছে। ইহা হইতে অনুমান করা হয় যে, ভারতের সর্ব্বপ্রথম অধিবাসী ছিল এক বা একাধিক নেগ্রিটো জাতি। আসামের কোনিয়াক নাগাদের মধ্যেও নেগ্রিটো-শোণিতের ক্ষীণ ধারা বর্ত্তমান, এই মর্ম্মে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে গৌহাটী অনুসন্ধান-সমিতিতে ডাঃ হাটনের একটি প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল।* উত্তর-ভারতে ও বাংলা দেশেও এক সময়ে ঐ নেগ্রিটো জাতির অবস্থিতি অসম্ভব নহে। যদি কাডার প্রভৃতি জাতির অথবা আণ্ডামানের কিংবা মেলেনেসিয়ার আধুনিক নেগ্রিটো জাতিদের বর্ত্তমান অবস্থা হইতে ভারতের বিলুপ্ত নেগ্রিটো-সমাজের অবস্থা অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলবদ্ধ হইয়া বন্য ফল-মূল আহরণ এবং মৃগয়া ও মৎস্য-শিকার করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিত। তাহাদের মধ্যেও দল-নেতা ছিল ; যৌন সম্বন্ধ বিধি-নিয়মের দ্বারা নিয়মিত হইত, মৃতদেহ সংকারের ব্যবস্থা ছিল, সুতরাং পরলোকে বিশ্বাস ও ভূতের ভয় ছিল। হিন্দুর সমাজ-বিজ্ঞানের গুণ-বিভাগ অনুসারে উহারা তমোগুণ-প্রধান জাতি ছিল। সে যাহা হউক, বর্ত্তমান ভারতের সংস্কৃতিতে ঐ বিলুপ্ত নেগ্রিটো জাতি কোনও ছাপ রাখিয়া গিয়াছে, এরূপ বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই। ডাক্তার হাটন বলেন যে, অশ্বত্থবৃক্ষের পূজা এবং তীর-ধনুকের ব্যবহার এই নেগ্রিটো জাতির দান। কিন্তু তীর-ধনুর ব্যবহার অষ্ট্রেলিয়ার আদিম নিবাসী ব্যতীত পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই আদিম মানবের

---

* ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের *Man in India* পত্রিকায় ২৫৫-২৬২ পৃঃ "A Negrito Substratum in the Population of Assam শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

মধ্যে প্রচলিত থাকার প্রমাণ আছে। আর অশ্বত্থবৃক্ষের পূজা আণ্ডামানিজ* প্রভৃতি বর্ত্তমান নেগ্রিটোদের মধ্যে দেখা যায় না।

ভারতের দ্রাবিড়-পূর্ব্ব বা প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড জাতি

এই অধুনাবিলুপ্ত কৃষ্ণকায় নেগ্রিটো জাতির জীবন-নাট্য অভিনয়ের শেষভাগে ভারত-রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিল—প্রস্তরের অস্ত্রাদি হস্তে বর্ত্তমান মুণ্ডা, ভীল, সাঁওতাল, ওরাঁও-খণ্ড-গন্দ প্রভৃতি জাতিদের পূর্ব্বজরা। ইহারা সম্ভবতঃ ছিল ককেশীয় জাতির একটি অধস্তন শাখা।† ইহাদের বংশধরেরা বর্ত্তমানে 'কোল', 'ধাঙ্গড়' প্রভৃতি নিন্দাত্মক আখ্যায় পরিচিত। পণ্ডিতদের মতে ইহারা অষ্ট্রেলিয়ার বর্ত্তমান অসভ্য জাতিদের নিকটতম জ্ঞাতি; সেই জন্য তাঁহারা ইহাদিগকে 'প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড' জাতি বলেন এবং ইহাদের ভাষাকে 'অষ্ট্রিক' ভাষার অন্তর্ভুক্ত করেন। 'দ্রাবিড়ী' জাতিদের পূর্ব্বে ইহারা ভারতে আগমন করিয়াছিল বলিয়া ইহাদিগকে 'দ্রাবিড়-পূর্ব্ব' বা Pre-Dravidian জাতিও বলা যায়। ইহারা আপনাদিগকে 'হোড়', 'হোড়ো' 'হো', 'কোড়-কু', 'কোড়োয়া' প্রভৃতি মানবসংজ্ঞাত্মক নামে অভিহিত করে; কারণ, ইহাদের ধারণা, নিজেরা ছাড়া আর সকল জাতিই এত হেয় যে, 'মানব' নামের যোগ্য নহে।

ইহারা ক্রমে সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়া বহুকাল ভারতে আধিপত্য করে। অনুমান হয় যে, ইহারা পূর্ব্বতন নেগ্রিটো অধিবাসীদিগকে আংশিক নাশ ও আংশিক গ্রাস করিয়াছিল এবং তাহাদের সহিত রক্ত-সংমিশ্রণের ফলে এই নবাগত "প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড" মুণ্ডা প্রভৃতি জাতির দৈহিক আকৃতির অপকর্ষ ঘটিয়াছিল।

এই দ্রাবিড়-পূর্ব্ব বা প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড জাতিগুলিকে ভারতের বর্ত্তমান অধিবাসীদের মূল-স্তবক (substratum) বলিয়া অনুমান করা হয়। ইহাদের বিভিন্ন শাখা, প্রাকৃতিক ও সামাজিক আবেষ্টনের সহিত সামঞ্জস্য সাধনের পরিমাণ অনুসারে, সংস্কৃতি বা সভ্যতা ও সমাজ-নীতির উৎকর্ষাপকর্ষ হিসাবে বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত। কোন কোন শাখা মৃগয়াজীবী, কোন শাখা পশুপালক, কোন শাখা অস্থায়িভাবে কৃষিকার্য্য করে। কয়েকটি শাখা স্থায়ী কৃষিজীবী, কোন কোন শাখা অমার্জ্জিত হস্ত-শিল্পী অথবা শ্রম-শিল্পিরূপে জীবিকা অর্জ্জন করে। আর কতকগুলি শাখা জীবন-সংগ্রামে পরাস্ত হইয়া ক্ষেত্রদাস রূপে কিংবা নানাবিধ উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে।

* E. A. Man : *On the Original Inhabitants of the Andaman Islands*, p. 95.

† বর্ত্তমান মানবজাতির (*Homo sapiens*এর) আদিম নমুনাস্বরূপ যে কয়েকটি কঙ্কাল যবদ্বীপের Pleistocene স্তরে পাওয়া গিয়াছে, ঐ Wadjak জাতির সহিত বর্ত্তমান অষ্ট্রেলিয়ার আদিমনিবাসীদিগের সাদৃশ্য থাকায় ইহাদিগকে Wadjak জাতির অধঃপতিত একটি শাখা বলিয়া অনুমিত হয়। অষ্ট্রেলিয়ায় প্রাপ্ত Talgai skull এই দুই জাতির মধ্যবর্ত্তী যোগসূত্র বলিয়া অনুমান করা হয়। আর কেহ কেহ মনে করেন যে, এই Wadjak race দক্ষিণ-ভারতের কতকগুলি অসভ্য জাতির পূর্ব্বজ ছিল।

তবে এই বৃত্তিবিভাগ অনমনীয় বা দৃঢ় নহে। ইহাদের মধ্যে গ্রাম-নেতা ও গ্রাম-পুরোহিত সম্মানিত হইলেও সামাজিক উচ্চ-নীচ শ্রেণীবিভেদ বিশেষ দৃষ্ট হয় না। কেবল কয়েকটি অপেক্ষাকৃত উন্নত কৃষিজীবী শাখার মধ্যে দেখা যায় যে, কোনও বিশেষ গোষ্ঠী জঙ্গল আবাদ করিয়া গ্রাম স্থাপন করিলে তাহাদিগকে 'ভুঁইহার' বা 'খুঁটকাট্টিদার' প্রভৃতি সম্মানসূচক আখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু সে জন্য সামাজিক ব্যবহারের বিশেষ তারতম্য দেখা যায় না। যদিও ইহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ কোন কোন শাখা সম্ভবতঃ সভ্যতর দ্রাবিড় জাতিদের সহিত সংঘর্ষে ক্লিষ্ট ও অধঃপতিত হইয়াছিল, ইহাদের অপেক্ষাকৃত উন্নত শাখাগুলি দ্রাবিড়দের সংমিশ্রণে ও সাংস্কৃতিক সংস্পর্শে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রগতির পথে চালিত হইয়াছিল, এইরূপ অনুমান অসমীচীন হইবে না।

ইহাদের কৃষিজীবী শাখাগুলির মধ্যে পরস্পরের সহযোগিতা ও সম্মিলনের বা ঐকতানের অপেক্ষাকৃত নিবিড়তা পরিস্ফুট হইয়াছিল। কৃষিজাত খাদ্যের অপেক্ষাকৃত প্রাচুর্য্যের জন্য উহাদের লোক-সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও কোন কোন পরিবার আর্থিক স্বাচ্ছল্য ও অবসরবহুলতার জন্য মনের অপেক্ষাকৃত উৎকর্ষ সাধনে অল্পাধিক মনোযোগী হয়। বাহ্য সম্পদ্ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কতিপয় শাখার সামাজিক ও ব্যক্তিগত আত্মপ্রসার ও মানসিক সম্পদ্ বৃদ্ধি হইয়াছিল। যদিও এই 'দ্রাবিড়পূর্ব্ব' কৃষিজীবী জাতিগুলির সমাজের কেন্দ্র গ্রামেই ছিল, তথাপি ইহাদের মধ্যে মুণ্ডা, ওরাঁও প্রভৃতি কয়েকটি অপেক্ষাকৃত প্রগতি-শীল জাতির সমাজ-বন্ধন স্বগ্রামেই আবদ্ধ হয় নাই। অনেকগুলি গ্রাম মিলিয়া এক একটি গ্রামসঙ্ঘরূপ বৃহত্তর সমাজ স্থাপন করিয়াছিল ; ইহার ('পারহা' বা 'পট্টি') নিদর্শন এখনও বর্ত্তমান। আর ইহাদের মধ্যে কোন কোন জাতির কিংবদন্তী আছে যে, এক সময়ে ভারতে ইহাদের ক্ষুদ্র বা বৃহৎ গণতন্ত্র রাজ্য ছিল। রাজশক্তির চিহ্নস্বরূপ মুণ্ডা-ওরাঁও প্রভৃতি জাতির প্রত্যেক গ্রাম-সঙ্ঘে ও গ্রামে এখনও বিভিন্ন চিহ্ন-অঙ্কিত পতাকা সযত্নে ও সসম্মানে রক্ষিত হয়। মধ্যপ্রদেশে দ্রাবিড়পূর্ব্ব গন্দ-জাতির শক্তিশালী সমৃদ্ধ রাজ্য আধুনিক কাল পর্য্যন্ত ছিল। গঙ্গা-যমুনা উপত্যকায় রাজ্যাধিকারের কিংবদন্তী মুণ্ডা প্রভৃতি কয়েকটি জাতির মধ্যে এখনও বর্ত্তমান। আসামের খাসী জাতির ও বর্ম্মার মনখেমরদের ভাষার সহিত মুণ্ডা-ভাষাগুলির সাদৃশ্য দেখিয়া অনুমিত হয় যে, দ্রাবিড়পূর্ব্ব জাতিগুলি হিমালয়ের দক্ষিণ-পশ্চিম পাদদেশ হইতে গঙ্গা-যমুনার উপত্যকা হইয়া মধ্যদেশ, বঙ্গদেশ ও আসাম হইয়া, বর্ম্মা ও কাম্বোজ বা ক্যামবোডিয়া প্রভৃতি দেশেও বিস্তৃত হইয়াছিল। ভারত-পুরাতত্ত্ববিৎ পার্জিটার সাহেব পৌরাণিক গবেষণার দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মুণ্ডা প্রভৃতি দ্রাবিড়পূর্ব্ব জাতিগুলির পূর্ব্বজরাই পুরাণ-বর্ণিত "সৌদ্যুম্ন" জাতি ; "ঐল" বা "আর্য্য-নর্ডিক" জাতির প্রাধান্যের পূর্ব্বে, এই সৌদ্যুম্ন জাতি এবং "মানব" বা বর্ত্তমান দ্রাবিড় জাতির পূর্ব্বজরা ও "আনব" জাতি অর্থাৎ বর্ত্তমান বাঙ্গালী, গুজরাটী, মাহরাট্টী প্রভৃতি জাতির পূর্ব্বজরা ভারতে আধিপত্য করিতেছিল।

সে যাহা হউক, 'ঐল'-আর্য্যজাতির ভারত অধিকারের পর এই দ্রাবিড়পূর্ব্ব জাতিগুলির অধিকাংশ শোণ নদের ও গঙ্গা-যমুনা প্রভৃতি নদীর উপত্যকার উর্ব্বর ভূমি পরিত্যাগ করিয়া বন্য ও পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু এখনও তাহাদের অতীত প্রাধান্যের চিহ্ন কোন কোন স্থানের ও নদ-নদীর নামে এবং বাংলা, হিন্দী, উড়িয়া প্রভৃতি ভাষার কোনও কোনও শব্দে পাওয়া যায়। যেমন বাংলা 'দহ'* অর্থাৎ নদীগর্ভে গর্ত্ত, দ্রাবিড়পূর্ব্ব মুণ্ডা প্রভৃতি ভাষার 'দা' (অর্থাৎ 'জল') শব্দ হইতে উৎপন্ন; সুতরাং 'শিয়ালদহ', 'ঝিনাইদহ', 'বাঁশদহ' প্রভৃতি স্থানের নামও দ্রাবিড়পূর্ব্ব জাতিদের ভাষা হইতে উৎপন্ন বলিয়া বোধ হয়। "দামোদর" নদীর আসল নাম 'দামু দা'। মুণ্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতি জাতির মধ্যে 'দামু' ব্যক্তিবিশেষের নাম এবং 'দা' শব্দের অর্থ জল। এইরূপ মুণ্ডা 'ঢেঙ্কি' শব্দ হইতে বাংলা 'ঢেঁকি', মুণ্ডা 'মোটো' হইতে বাংলা 'মোটা', ইত্যাদি। মুণ্ডা ভাষায় 'উপুণ' অর্থে 'চারি', ইহা হইতে কোনও কোনও পণ্ডিত মনে করেন যে, বাংলা 'পোণ' অর্থাৎ 'চারি কুড়ি' এবং 'চারকে' এক একক ধরিয়া (গণ্ডা হিসাবে) সংখ্যা গণনার প্রথা এই দ্রাবিড়পূর্ব্ব মুণ্ডা জাতিদের নিকট হইতেই গৃহীত।

এই দ্রাবিড়পূর্ব্ব জাতিদের সমাজ ও শাসন-প্রথায় এখনও গণতান্ত্রিকতা প্রবল। 'পঞ্চায়ত' প্রথা সম্ভবতঃ ভারতে প্রথম ইহাদেরই প্রবর্ত্তিত। পঞ্চায়তকে ইহারা সত্য সত্যই ধর্ম্মাধিকরণ জ্ঞানে মান্য করে। এখনও আদালতে সাক্ষ্য দিবার পূর্ব্বে কোনও মুণ্ডা সাক্ষী তাহার জাতি-প্রথা অনুসারে 'পঞ্চের' নাম লইয়া এই বলিয়া শপথ করে, "সিরমারে-সিঙ্গবোঙ্গা ওতেরে পঞ্চ" অর্থাৎ—আকাশে সূর্য্যদেবতা, পৃথিবীতে পঞ্চায়ত। ইহাদের দেবতারা প্রায় সমস্ত স্ত্রীজাতীয়। ভারতে শক্তিপূজার প্রবর্ত্তন সম্ভবতঃ ইহারাই প্রথমে করে। ওরাঁও প্রভৃতি জাতির 'চাণ্ডী' নামক দেবতার সহিত হিন্দু চণ্ডী দেবীর সাদৃশ্য দেখা যায়। অর্দ্ধরাত্রে উলঙ্গ হইয়া 'চাণ্ডীর' ওরাঁও অবিবাহিত যুবক পূজারী 'চাণ্ডীস্থানে' গিয়া পূজা করে। আমাদের লক্ষ্মী দেবীর মত ওরাঁও মুণ্ডাদের 'সরণা' দেবীর চিহ্ন 'ধান্যশীর্ষ', তাঁহার মাথায় ধান্য-শীর্ষের জটা কল্পিত হয়। আর পিতৃপুরুষদের পূজা ইহাদের ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ।

ইহাদের মধ্যে বিভেদ-প্রবণতা এত অধিক যে, কোন কোন জাতি নিজ গোষ্ঠী ছাড়া অপর গোষ্ঠীর অন্ন খায় না। দ্রাবিড়পূর্ব্ব জাতিদের নিম্নতম স্তরের শাখাগুলি তমোগুণ-প্রধান; অপেক্ষাকৃত উচ্চতর জাতিদের জীবন-সুর রজোমিশ্রিত তমোগুণান্বিত। তবে তাহাদের কতক অংশ হিন্দুসমাজভুক্ত হইয়া সংসারে উন্নতি লাভ করিয়াছে। তাহারা কেহ কেহ 'ক্ষত্রিয়' বলিয়া আত্মপরিচয় দেয়, 'সিং' উপাধি গ্রহণ করে ও উপবীত ধারণ করে। সম্ভবতঃ প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রকারদের সময় এই সব জাতির উচ্চতর স্তরগুলির মধ্যে রজোগুণের প্রাধান্য ছিল। তাই উক্ত হইয়াছে :—

> শবরাঃ পুলিন্দাঃ ভীলাঃ এতে ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
> বৃষলত্বম্ উপগতা ব্রাহ্মণানাম্ অদর্শনাৎ॥

---

* কেহ কেহ এই 'দহ' শব্দ সংস্কৃত 'হ্রদ' শব্দের রূপান্তর বলিয়া অনুমান করেন।

প্রত্ন-দ্রাবিড় ও দ্রাবিড় জাতি

এই দ্রাবিড়পূর্ব্ব সমাজের গৌরব যখন উচ্চতম সীমায় উঠিয়াছিল, তখন ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ভেদ করিয়া "রণধারা বাহি, জয়গান গাহি, উন্মাদ কলরবে" আবির্ভূত হইল—প্রাচীন সুমেরীয়, ব্যবিলনিয়ন, ইজিপশিয়ান প্রভৃতি জাতির জ্ঞাতি, সম-সাময়িক সভ্যতায় সমুন্নত প্রত্নদ্রাবিড়, অর্থাৎ বর্ত্তমান দ্রাবিড়ী জাতিদের পূর্ব্বজরা। প্রাচীন ভারতে ইহাদের পরবর্ত্তী নর্ডিক-আর্য্যরা ইহাদের নাম দিয়াছিলেন "অসুর"। "দৈত্য", "দানব" প্রভৃতি আখ্যায়ও এই পরাক্রান্ত জাতি অভিহিত হইত। ইহারা ইউরোপের মেডিটারেনিয়ান জাতির পূর্ব্বজদের জ্ঞাতি বলিয়া ইহাদিগকে 'ইন্দো-মেডিটারেনিয়ান' নাম দেওয়া যাইতে পরে। ভারতে প্রবেশ করিয়া ইহাদের কয়েক দল পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়া স্থানে স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিল ; অনেক স্থলে দ্রাবিড়পূর্ব্ব জাতির সহিত সংমিশ্রিত হইল। ছোটনাগপুরের পার্ব্বত্য প্রদেশ উহাদের একটি কেন্দ্র হইয়াছিল এবং সেখানে উহাদের অনেক প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া যায়। পুরাকালে বর্ত্তমান আসাম প্রান্তেও উহাদের উপনিবেশ ও প্রভুত্ব স্থাপনের কিংবদন্তী আছে। মহিরাঙ্গ দানব, হাটক অসুর ও তাহার বংশধর সম্বর অসুর, রত্ন অসুর, নরক অসুর প্রভৃতির নাম জনশ্রুতিতে সুবিদিত।

উত্তর-পূর্ব্বভারতে ইহাদের কোন কোন দল উপনিবিষ্ট হইলেও গঙ্গা-যমুনা প্রভৃতি নদীর সুজলা সুফলা উপত্যকাগুলি মুণ্ডা প্রভৃতি দ্রাবিড়পূর্ব্ব জাতিদের অধিকৃত থাকায় এই 'প্রোটো-ড্রাভিডিয়ান' বা 'ইন্দো-মেডিটারেনিয়ান' অসুর জাতির অধিকাংশ দল ক্রমে বিন্ধ্য গিরি অতিক্রম করিয়া দাক্ষিণাত্যে গেল ও ধীরে ধীরে সমগ্র দক্ষিণ-ভারতে আধিপত্য স্থাপন করিল। ইহারাই বর্ত্তমান তামিল, তেলেগু, মালায়ালি প্রভৃতি জাতিদের পূর্ব্বপুরুষ।

সকলেই জানেন যে, দক্ষিণ-ভারতে ইহাদের স্থাপিত অন্ধ্র, রাষ্টিক (রাষ্ট্রকূট), চের, চোল বা কেরল, পাণ্ড্য প্রভৃতি রাজ্য প্রবল ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিল। এবং সমুদ্র-পথে মিশর প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশের সহিত ইহাদের বাণিজ্য চলিত। সভ্যতার উন্নতির সহিত শ্রেণীবিভাগের বৃদ্ধি হইয়াছিল। দ্রাবিড় সমাজের শ্রেণীবিভাগে সর্ব্বোচ্চ ছিল "মাল্লের" বা রাজা, তার পর পর্য্যায় অনুসারে 'বল্লাল' বা সামন্ত রাজা, তার পর 'বেল্লাল' বা ক্ষেত্রস্বামী বা কৃষক, তার পর 'বণিজ' বা ব্যবসায়ী। এই সব শ্রেণী ছিল উচ্চ বা 'মেলোর' ; তার পর শ্রমজীবী বা 'বিনইবলার', আর সর্ব্বনিম্নে দাস-জাতি বা 'আদি-ওর'। প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে আবার বহু বিভাগ ছিল। উচ্চনীচ ভেদ-প্রবণতা দ্রাবিড় জাতিব মধ্যে বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছিল। উহাদের অস্পৃশ্যতা-বোধ ক্রমে ভারতের বর্ত্তমান অনমনীয় বংশগত জাতিভেদ প্রথায় পরিণত হইল। সম্ভবতঃ দ্রাবিড় জাতির মধে হঠযোগের প্রচলন হওয়ায় এই অস্পৃশ্যতা-বোধ আরও প্রবল হইয়াছিল। পরিশেষে ইহারা যখন আর্য্য-নর্ডিক জাতির সংস্পর্শে আসিল, তখন দেখিল, আর্য্যেরা শুচি-প্রবণতার

জন্য অপরিচ্ছন্ন দ্রাবিড়পূর্ব্ব জাতিদের সংস্পর্শ বর্জ্জনের প্রচেষ্টা করিতেন। তাহাতে এই দ্রাবিড়দের বাহ্য শুচি-বোধ আরও উত্তেজিত হইল।

পার্জিটার সাহেব পুরাণাদির গবেষণা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই 'মানব' বা দ্রাবিড় জাতি হইতে অযোধ্যার ইক্ষ্বাকু রাজবংশ, বিদেহের জনক রাজার বংশ, বৈশালীর বৈশালক বংশ, আনর্ত্ত (গুজরাট) দেশের কুশস্থালীর সরয়াত বংশ এবং মাহিষ্মতীর করুষ-বংশ ও আরও কয়েকটি রাজবংশ উদ্ভূত হইয়াছিল। শেষে এই দ্রাবিড়-'মানব' বা পৌরব শাখার প্রাচীন বংশগুলির মধ্যে কেবল দক্ষিণ-ভারতের পাণ্ড্য, চোল, চের বা কেরল বংশ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারিয়াছিল; আর সকলেই 'ঐল' বা আর্য্য-নডিকদের কবলিত বা অধীন হইয়াছিল। ক্রমে প্রায় সমগ্র ভারতের সকল জাতির উচ্চতর বংশগুলি 'ঐল' বা 'আর্য্য' জাতির সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। কোন কোন স্থলে আর্য্য-শোণিতের সংমিশ্রণও ঘটিয়াছিল।

এই দ্রাবিড় বা অসুর জাতিই সম্ভবতঃ ভারতে প্রথম তাম্র ও পরে লৌহ গালাইয়া অস্ত্র অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করে, মৃৎপাত্র পোড়াইয়া নানা আকারের বাসনপত্র প্রস্তুত করে, ইষ্টক পোড়াইয়া গৃহাদি নির্ম্মাণ করে; মৃত ব্যক্তির জন্য প্রস্তরের কবর ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করে, জল-যাত্রার জন্য অর্ণবপোত নির্ম্মাণ করে, গম ও যবের চাষ প্রবর্ত্তন করে এবং জলসেচনের দ্বারা কৃষিকার্য্যের উন্নতি করে। ভারতে দেবদেবীর মূর্ত্তি গঠন এবং দেবোদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান সম্ভবতঃ ইহারাই প্রবর্ত্তন করে। সর্পপূজা, লিঙ্গপূজা ও মাতৃকাপূজাও হয়ত এই জাতিরই প্রবর্ত্তিত; তবে ইহা পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন জাতির মধ্যেও প্রচলিত ছিল; আর ধরিত্রীমাতার পূজা দ্রাবিড়পূর্ব্ব জাতির মধ্যেও বিশেষভাবে প্রচলিত আছে।

সাহিত্য ও সুকুমার কলার অনুশীলনে দ্রাবিড় জাতি সমধিক উন্নতি লাভ করিয়াছিল। তাহাদের এ বিষয়ে উৎকর্ষ প্রাচীন কাল হইতে বিশ্রুত। ময়াসুরের ন্যায় স্থপতি প্রাচীন ভারতে আর দ্বিতীয় কেহ ছিল বলিয়া উল্লেখ নাই। ইহাদের সঙ্ঘ-শক্তি ও কর্ম্ম-শক্তি প্রবল; তামিল জাতির বাস্তবের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও তেলেগু জাতির ভাব-প্রবণতা উল্লেখযোগ্য।

ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন, 'নারিকেল', 'মীন', 'খীরা', 'কালা', 'কাণা', 'খোকা', 'খুকি', 'গোটা' (সমস্ত), নোলা (জিহ্বা) প্রভৃতি বহু শব্দ বাংলা ভাষায় দ্রাবিড় ভাষা হইতে গৃহীত।

সকলেই জানেন যে, সম্ভবতঃ এই 'অসুর' জাতিরই একটি অপেক্ষাকৃত উদ্যমশীল ও ভাগ্যবান্ শাখা সিন্ধুনদের উপত্যকায় উপনিবিষ্ট হইয়া বিশেষ অনুকূল প্রাকৃতিক আবেষ্টনের প্রভাবে ও নানা জাতির সংস্কৃতির সহিত সংস্পর্শের সুবিধা লাভ করিয়া ক্রমে একটি সমুন্নত সমাজ ও সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিল ও জগতের তৎকালীন সভ্য জাতিদের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিল। মহেঞ্জোদারো ও হারাপ্পায় প্রাগৈতিহাসিক 'অসুর'-সভ্যতার বহুমুখী প্রতিভা ও

ঐশ্বর্য্যের যে সমস্ত নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে লিঙ্গপূজা, সর্পপূজা, বৃক্ষদেবতার পূজা, মাতৃকাপূজা ও যোগ-সাধন প্রভৃতির বহু নিদর্শন পাওয়া যায়।

কালক্রমে আনুমানিক পাঁচ সহস্র বর্ষ পূর্ব্বের সেই বিপুল 'অসুর'-সভ্যতাও সামান্য চিহ্নমাত্র রাখিয়া ইতিহাসের রঙ্গস্থল হইতে বিলুপ্ত হইল। দক্ষিণ-ভারতের দ্রাবিড়-সভ্যতার ন্যায় উত্তর-ভারতের এই অসুর-সভ্যতার মূল সুর ছিল রজস্তমোগুণাত্মক।

মঙ্গোলীয় জাতি

প্রাচীন কাল হইতে অলক্ষিতে ধীরে ধীরে তরঙ্গাকারে কয়েকটি পীতাভ মঙ্গোলীয় জাতি ভারতের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তে হিমালয়ের পাদদেশে উত্তীর্ণ হইয়াছে। ইহাদের কেন্দ্র আসামে। এখানে আছে 'বোড়ো' শাখা; ও গারো, কাচারি, রাভা, কোচ, টিপ্রা, লালুং, 'হাজোং'; 'তাই' শাখার খামটি, শান ও আহোম; কুকি-চীন শাখার প্রাচীন ও নূতন কুকি, ও মাইথি বা মণিপুরী; কাচিন বা সিংফো শাখা; মনখেমর শাখার খাসি ও সিংটেঙ্গ; ভোটচীন (Tibeto-Burman) শাখার আবর, মিরি, আকা, ডাফলা ও মিসমি এবং বিভিন্ন নাগা জাতি (আও, রেঙ্গমা, সেমা, লোহটা, ইত্যাদি)।

নেপালের লিম্বু জাতি এবং নেপাল ও সিকিমের রোঙ্গপা বা লেপ্‌চা জাতি মিশ্র মঙ্গোলিয়ান জাতি।

দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে বাস করিলেও এই জাতিগুলির অধিকাংশই সমাজ-ব্যবস্থায়, সংস্কৃতিতে, রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহারে হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত নহে।

আসামের হিন্দুদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, যাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বঙ্গদেশ হইতে বহুকাল পূর্ব্বে আসিয়াছিল। আসামে এইরূপ বহু পরিবারে কালে মোঙ্গলীয় শোণিতের অল্পাধিক সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, বর্ত্তমানে হিন্দু সমাজভুক্ত আসামের আদিম অধিবাসী। তৃতীয়তঃ, বাংলা দেশ হইতে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে সমাগত ও আসামে উপনিবিষ্ট বহু পরিবার।

রাজা ভাস্কর বর্ম্মার নিধানপুর তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, প্রায় দেড় সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে মহাভূতি বর্ম্মার রাজত্বকালে (খ্রীঃ ৪৯০-৫২০) অনেক বৈদিক ব্রাহ্মণ-পরিবার রাজার নিকট লাখরাজ ভূমি পাইয়া আসামে বসবাস করেন। আর দেশজ আদিম নিবাসী কতকগুলি পরিবার হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। মণিপুরবাসী অনেক ব্রাহ্মণের বিবাহ ক্ষত্রিয় রমণীর সহিত হইয়া থাকে। নেপাল তরাই-এর থারু ও বোগসা জাতির মধ্যেও মঙ্গোলয়েড রক্তের সংমিশ্রণ অনুমিত হয়।

ভারতের সমাজ ও সভ্যতায় মঙ্গোলিয়ান জাতির দান উপেক্ষণীয়।

বাঙালী প্রভৃতি 'আনব' বা আলপাইন জাতি

দ্রাবিড় জাতির ভারতে আগমনের পরে এবং নর্ডিক আর্য্যজাতির আগমনের পূর্ব্বে

মধ্য-এশিয়ার পার্ব্বত্য অধিত্যকা হইতে পামীর গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিয়া শ্বেতাঙ্গ আলপাইন জাতির একটি শাখা একাধিক দলে ভারত-রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিল। ইহারাই বাঙালী, গুজরাটী, মাহরাট্টী প্রভৃতি কয়েকটি জাতির পূর্ব্বজ। সম্ভবতঃ হিমালয়ের উত্তরে অবস্থানকালীন ইহারা ইন্দো-এরিয়ান গোষ্ঠীর ভাষা অবলম্বন করিয়াছিল।

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী হইল, সর্ হারবার্ট রিজলি এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, বাঙালী জাতি দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয় জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন। এই মত অধুনা সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। এখন এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, বাঙালী জাতি ও উহাদের জ্ঞাতি গুজরাটী মাহরাট্টী প্রভৃতি জাতি মূলতঃ আলপাইন-বংশোদ্ভূত। শ্বেতাঙ্গ আলপাইন জাতির এই ভারতীয় শাখা, ভারতে কৃষ্ণত্বক্ দ্রাবিড়পূর্ব্ব ও কৃষ্ণাভ বা ধূসরবর্ণ দ্রাবিড় জাতির সহিত অল্পাধিক সংমিশ্রণ সত্ত্বেও ইহাদের শোণিতের মূল-ধারা আলপাইনই রহিয়াছে। আর তাহাদের মধ্যে উচ্চতর ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য শ্রেণীগুলি হয়ত কোথাও কোথাও সামান্য আর্য্যশোণিতে রঞ্জিত হইয়াছে, এবং পূর্ব্ববঙ্গের নিম্নশ্রেণীতে কোথাও কোথাও সামান্য মঙ্গোলিয়ান রক্তের সংমিশ্রণ ঘটিয়া থাকিতে পারে।

ইউরোপের ফরাসী, ইটালীয়ান, আলবেনিয়ান, এবং রুষ ও জার্ম্মানের কতক অংশ এবং মধ্য-এশিয়ার ওয়াখি, শিঘনি, রোসনানি, ইসকাশানি, খোটানি ও পাকফো জাতিরাও আলপাইন জাতিভুক্ত।

পুরাণোল্লিখিত বংশানুক্রমগুলির সমীকরণ করিয়া পার্জিটার সাহেব এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, এক কালে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র, সৌবীর, মদ্র, বাহ্লীক ও শিবি, এই দেশগুলি 'আনব' জাতির অধিকৃত ছিল। নৃতত্ত্বের সিদ্ধান্তের সহিত এই পৌরাণিক সিদ্ধান্তের বিশেষ সঙ্গতি দৃষ্ট হয়।

বাঙালী জাতির শ্বেতাঙ্গ 'আলপাইন' কুলজীর সমর্থনকল্পে আর একটি তথ্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঐতরেয় আরণ্যকে (২।১।১) 'বঙ্গ' শব্দের সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। তাহা এইরূপ :—"ইমাঃ প্রজাস্তিস্রো অত্যায়মায়ংস্তানীমানি বয়াংসি বঙ্গা বগধাশ্চের-পাদান্যন্যা অর্কমভিতো বিবিশ্র ইতি।" অর্থাৎ—বঙ্গ, বগধ ও চেরপ্রমুখ ত্রিবিধ প্রজা বিস্তৃতি লাভ করিয়া বিহঙ্গমরূপে সূর্য্যাভিমুখে গিয়াছিল। এই শ্লোকে 'বঙ্গ' প্রভৃতি দেশের অধিবাসীদিগকে 'পক্ষী' বলা হইয়াছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "যখন আর্য্যগণ মধ্য-এশিয়া হইতে পঞ্জাবে উপনীত হন, তখন বাংলা সভ্য ছিল। আর্য্যগণ আপনাদের বসতি বিস্তার করিয়া যখন এলাহাবাদে উপস্থিত হন, তখন বাংলার সভ্যতায় ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাঁহারা বাঙালীকে ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য পক্ষী বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।" কিন্তু আমার মনে হয়, এই "পক্ষী" আখ্যা প্রদানের অধিকতর সমীচীন কারণ আছে।

আলপাইন জাতিদের মধ্যে আলবেনিয়ানরা সেদিন পর্য্যন্তও জাতীয়তা লাভ করে নাই, শ্রেণী-পর্য্যায়ভুক্ত ছিল। এখনও অন্যান্য পাশ্চাত্য আলপাইন জাতিদের

অপেক্ষা ইহারা পশ্চাৎপদ ; এখনও উহারা প্রাচীন রীতিনীতি কিছু রক্ষা করিয়া চলে। উহারা "Shkypetars" বা "ঈগলপক্ষীর জাতি" বলিয়া আত্মপরিচয় দেয়। তাহাদের দেশকেও "ঈগলপক্ষীর দেশ" (the Land of the Eagle) বলা হয়। ডারহাম্ (M. E. Durham) তাঁহার *Some Tribal Origins, Laws and Customs of the Balkans* পুস্তকে (১৬ পৃঃ) তাহাদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "It is noteworthy that even to-day a large proportion of the people…identify themselves with birds, and a mass of traditional ballads shows that the custom is ancient." ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, আজ পর্য্যন্ত এই জাতির অধিকাংশ (আলবেনিয়ান) লোক আপনাদিগকে পক্ষীর সহিত অভিন্ন মনে করে এবং তাহাদের বহু লোকসঙ্গীত হইতে বুঝা যায় যে, ইহা তাহাদের প্রাচীন প্রথা। এই তথ্য হইতে এই অনুমান কি অসঙ্গত হইবে যে, ভারতের বৈদিক যুগে বাঙালীরাও তাহাদের জ্ঞাতি আলবেনিয়ানদের মত আপনাদিগকে "পক্ষী" তুল্য মনে করিত, কিংবা হয়ত "পক্ষী" অঙ্কিত জাতীয় পতাকা ব্যবহার করিত ? এই অনুমানের সমর্থক আর একটি তথ্য এই যে, বাঙালীদের জ্ঞাতি মাহরাট্টা প্রভৃতি জাতির একটি গোষ্ঠীর নাম "গরুড়ে" অর্থাৎ গরুড় পক্ষী ; অপর একটি গোষ্ঠীর পদবী "বহিরে" অর্থাৎ শ্যেনপক্ষী (B. A. Gupte : *The Bombay Kayastha Prabhus* ২৯ পৃঃ)। রায় বাহাদুর গুপ্তে স্বয়ং জাতিতে মাহরাট্টা প্রভুকায়স্থ ছিলেন। তিনি এই 'গরুড়ে' শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, মাহরাট্টা 'গরুড়ে' গোষ্ঠী তাহাদের গোষ্ঠ-পতাকায় গরুড় পক্ষীর চিত্র অঙ্কিত করে। এই সম্পর্কে ইহা বিশেষ অনুধাবনযোগ্য যে, প্রত্যেক আলবেনিয়ান গোষ্ঠীকে অমুক "bairakh" বা পতাকা এবং প্রত্যেক গোষ্ঠী-পতিকে "bairakhtar" সংজ্ঞা দেওয়া হয়।

এই সম্পর্কে প্রাচীন রোমকসাম্রাজ্যের ঈগলপক্ষীর মূর্ত্তিযুক্ত পতাকা উল্লেখযোগ্য। রোমকেরাও আলপাইনজাতীয়। মধ্য-ইউরোপের আরও কয়েকটি আলপাইন জাতি যাহারা এক সময় রোমকসাম্রাজ্যভুক্ত ছিল, তাহাদের পতাকাচিহ্নও ঈগলপক্ষীর প্রতিচ্ছবি। কিন্তু কোন কোন পণ্ডিত, যাঁহারা সভ্যতার উদ্ভব প্রধানতঃ পরিব্যাপ্তিমূলক (diffusionist theory of culture) এবং সভ্যতার অধিকাংশ উপাদান প্রাচীন মিশর হইতে উদ্ভূত ও সর্ব্বদেশে পরিব্যাপ্ত বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা প্রাচীন মিশরবাসীদের সূর্য্যদেবতা ও ঐশীশক্তিসম্পন্ন শ্যেন ও শকুনির সমবায়ে ঐ পতাকা উৎপন্ন, এইরূপ মনে করেন।

এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, প্রাচীন তাম্রলিপ্তিভূমির (সুহ্মপ্রদেশের) প্রাচীনতম রাজাদের নাম তাম্রধ্বজ, ময়ূরধ্বজ, হংসধ্বজ ইত্যাকার ছিল। আর বর্ত্তমান বাংলা দেশে তাম্রলিপ্তি প্রদেশ অর্থাৎ বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলা 'ইন্দো-আলপাইন' জাতির একটি প্রথম উপনিবেশ হইয়াছিল, এইরূপ মনে করিবার সমীচীন কারণ আছে। সে যাহা হউক, এই প্রসঙ্গে বিষ্ণুর "গরুড়ধ্বজ" নামের কথা স্বতঃই মনে আসে। হয়ত এ অনুমান একেবারে ভিত্তিহীন না হইতে পারে যে, "বিষ্ণুই" বাঙালী প্রভৃতি

ভারতীয় আলপাইন জাতির আদিদেবতা এবং হয়ত শিব "শিশ্নদেবাঃ" অসুর বা দ্রাবিড় জাতির আদিদেবতা ছিলেন ও ব্রহ্মা নর্ডিক হিন্দু জাতির আদিদেবতা ছিলেন; পরে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়কারী হিন্দুধর্ম্মে এই তিন দেবতা একমেবাদ্বিতীয়ং ভগবানের ত্রিমূর্ত্তি বলিয়া খ্যাত হন।

এইরূপে বহু শতাব্দীব্যাপী দেশদেশান্তর ভ্রমণ ও বসবাসে বিভিন্ন দেশের ও জাতির সংস্পর্শে ও অল্পাধিক সংমিশ্রণে বাঙালী প্রভৃতি জাতির সংস্কৃতি পরিপুষ্ট হইতেছিল।

কোন কোন 'আলপাইন' দল হিমালয়ের পাদদেশ ধরিয়া হিমালয় এবং গঙ্গার মধ্যবর্ত্তী কোন কোন প্রদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। পার্জিটার সাহেব পুরাণ হইতে দেখাইয়াছেন যে, পাঞ্জাবে উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত বাদ দিয়া কোন কোন "আনব"-দল সিন্ধু-সৌবীর, কৈকেয়, মদ্র, বাহ্লীক, শিবি এবং আম্বষ্ঠ প্রদেশও অধিকার করিয়াছিল।

যখন এই আলপাইন জাতি ভারতে প্রবেশ করিল, তখন গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি নদীগুলির উপত্যকায় দ্রাবিড়-পূর্ব্ব ("সৌদ্যুম্ন") জাতির প্রাধান্য ছিল; হয়ত তখনও সিন্ধু-উপত্যকায় ইন্দো-মেডিটেরানিয়ান জাতির আধিপত্য বর্ত্তমান ছিল; আর দক্ষিণ-ভারত প্রত্নদ্রাবিড়দের অধিকৃত ছিল। নবাগত ইন্দো-আলপাইন জাতির কোন কোন দল বর্ত্তমান গুজরাট ও তৎসন্নিহিত প্রদেশে অধিষ্ঠিত হইল; কোন কোন দল বর্ত্তমান মহারাষ্ট্র প্রদেশে অবস্থান করিল, কোন কোন দল দক্ষিণে বর্ত্তমান কন্নাদ প্রদেশ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইল। অন্য দলগুলি মধ্যপ্রদেশ অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান ছোটনাগপুরের ধলভূম পরগণা হইয়া এক দল মানভূম জেলায় ও অপরাপর দল তাম্রলিপ্তি প্রদেশ বা বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলায় প্রবেশ করিল। ঐ ইন্দো-আলপাইন জনতার এক অংশ বর্ত্তমান মেদিনীপুর, হাবড়া প্রভৃতি সুহ্মপ্রদেশে উপনিবিষ্ট হইল, এক অংশ ভাগীরথী অতিক্রম করিয়া ক্রমে পূর্ব্বাভিমুখে বঙ্গ, অর্থাৎ বর্ত্তমান মধ্য-বঙ্গ ও পূর্ব্ব-বঙ্গে গমন করিল; আর এক অংশ বর্ত্তমান বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, মুরশিদাবাদ প্রভৃতি জেলায়, অর্থাৎ রাঢ়দেশে অবস্থান করিল। কোন কোন দল রাঢ়দেশ অতিক্রম করিয়া উত্তরে বর্ত্তমান মালদহ জেলা প্রভৃতি পুণ্ড্রদেশ ও রাজশাহী, বগুড়া প্রভৃতি বরেন্দ্রভূমিতে অধিষ্ঠিত হইল। আর এই ইন্দো-আলপাইন জন-প্লাবনের কোন কোন উচ্ছ্বসিত অংশ পশ্চিমে বর্ত্তমান সাঁওতাল পরগণা ও পূর্ণিয়া জেলায়, উত্তরে বর্ত্তমান আসামের কামরূপ প্রদেশে পরিব্যাপ্ত হইল। সুহ্মপ্রদেশ হইতে কতকগুলি ইন্দো-আলপাইন গোষ্ঠী ওড্র ও উৎকলে গিয়া ক্রমে উচ্চশ্রেণীর উড়িয়া জাতির মধ্যে পরিগণিত হইল; আর ইন্দো-আলপাইন কৃষি কুড়মী জাতি পশ্চিমে বিহার ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইল। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে ইন্দো-আলপাইন বাঙালী জাতির প্রকৃত "বাংলা" রাষ্ট্রীয় "বাংলা দেশ" অপেক্ষা অনেক বৃহৎ।

সুজলা সুফলা বাংলা দেশে জীবিকা অর্জ্জন সহজসাধ্য হওয়ায়, মানসিক ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ সাধনও অনায়াসসাধ্য। বাংলা দেশে আগত ভাবপ্রবণ, কল্পনাশীল, মেধাবী ও

কর্ম্মঠ আলপাইন সঙ্ঘগুলি গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া বাংলার এক বিশিষ্ট সভ্যতা লোকচক্ষুর অন্তরালে ধীরে ধীরে গড়িয়া তুলিল।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন, "প্রাচীন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, বড় বড় খাঁটি আর্য্য রাজগণ, এমন কি, যাঁহারা ভরতবংশীয় বলিয়া গৌরব অনুভব করিতেন, তাঁহারাও বিবাহসূত্রে বঙ্গেশ্বরের সহিত মিলিত হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। যখন লোকে লোহার ব্যবসায় জানিত না, তখন বেতে বাঁধা নৌকায় চড়িয়া বাঙালীরা নানা দেশে ধান চাউল বিক্রয় করিতে যাইত, সে নৌকার নাম ছিল 'বালাম' নৌকা। তাই সে নৌকায় যে চাউল আসিত, তার নাম 'বালাম'। 'বালাম' বলিয়া কোনও ভাষায় কথা আছে কি না জানি না। কিন্তু তাহা সংস্কৃতমূলক নহে। তমলুক বাংলার প্রাচীন বন্দর। অশোকের সময়, এমন কি, বুদ্ধের সময়ও তমলুক বাংলার বন্দর ছিল। তমলুক হইতে জাহাজ সকল নানা দেশে যাইত।"

বাংলা দেশের সম্বন্ধে মহাভারতাদির সব কথা কত দূর প্রামাণ্য বলা যায় না। বৌদ্ধ ধর্ম্মের অভ্যুত্থানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ আর্য্যদের পরিত্যাজ্য ছিল। পরে বৌদ্ধ প্রচারকগণের বঙ্গে আগমনকাল পর্য্যন্ত বাঙালীর প্রাচীন ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন। বৌদ্ধ ও জৈন প্রচারকগণের আগমনের পর হইতে গণতন্ত্রবাদী বাঙালী সমাজ-অনুকূল উপাদান সংগ্রহ ও সমীকরণ করিবার সুযোগ পাইয়া সর্ব্বপ্রকার উন্নতির পথে ক্ষিপ্রপদে অগ্রসর হইল।

সাম্রাজ্য-স্থাপনে বাঙালী জাতি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে নাই বটে, কিন্তু সংস্কৃতিতে বাঙালী ক্রমে ভারতে অগ্রণী হইয়াছে। নালন্দা, বিক্রমশিলা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের শীলভদ্র, অতীশ দীপঙ্কর, শান্ত রক্ষিত, অভয়াকর গুপ্ত প্রভৃতি বাঙালী পণ্ডিতদের খ্যাতি সুবিদিত। বাঙালী পণ্ডিতগণ প্রথমে সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্যাদির চর্চ্চা করিতেন, পরে প্রাকৃত ভাষায়। প্রাকৃত ভাষায় প্রসিদ্ধ গৌড়ী রীতি উদ্ভাবন বাঙালীর কৃতিত্বের একটি পরিচয়।

পরে বরেন্দ্রভূমিতে পালরাজবংশের অভ্যুদয়ে বাঙালী জাতির বহুমুখী প্রতিভা আরও বিকশিত হইতে লাগিল। নবদ্বীপের "নব্য ন্যায়" ও "গৌড়-মগধ" রীতির ভাস্কর্য্য, যাহা বরেন্দ্রভূমিতে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল এবং বাংলার নানাবিধ কলাশিল্প কারুকার্য্য প্রভৃতি বাঙালীর সমীকরণশীলতা, উদ্ভাবনী শক্তি ও বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। সামান্য গৃহকর্ম্মে ও আমোদ-প্রমোদেও বাঙালীর বৈশিষ্ট্য প্রতিভাত হয়; যেমন আলিপনা, পটঅঙ্কন, কাঁথা সেলাই, সুক্তো, ডান্‌লা, ঘণ্ট রন্ধন, সন্দেশ রসগোল্লা, ক্ষীরের ছাঁচ, চন্দ্রপুলি প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রতকথা, কবির গান, যাত্রা, কীর্ত্তন প্রভৃতি।

সমাজের আত্মা বা সুর সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত হয়। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতে বৌদ্ধ গুরুদের প্রভাবে বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি হইল ও উত্তরোত্তর তাহা সমৃদ্ধ হইতে লাগিল। বাংলা দেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের তিরোভাবের পর তন্ত্র প্রাধান্য লাভ করে। পরে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবে বৈষ্ণবীয় ভক্তিধর্ম্মের প্লাবন আসে। সম্প্রতি পাশ্চাত্য

শিক্ষার পরোক্ষ প্রভাবে বেদান্তধর্ম্ম ও মতের উপর বাঙালীর পক্ষপাতিত্ব লক্ষিত হয়। সমীকরণশীল বাঙালী জীবনে জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির সামঞ্জস্য করিবার পক্ষপাতী। এই এক শতাব্দীর মধ্যে ধর্ম্মক্ষেত্রে, সাহিত্য ও বিজ্ঞানক্ষেত্রে, রাজনীতি ও অন্যান্য কর্ম্মক্ষেত্রে বাঙালী জাতির মধ্যে যত অধিক মনীষাসম্পন্ন লোকোত্তর পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে, ভারতে আর কোন প্রদেশে এত হয় নাই।

উদারতা বাঙালী সমাজের একটি বৈশিষ্ট্য। যদিও ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা ও আন্তঃপ্রাদেশিক ঈর্ষা দেখা যায়, বাঙালী এই প্রাদেশিক ভাব হইতে সাধারণতঃ মুক্ত।

বাঙালী ব্যক্তিগত স্বাধীনতা-প্রিয়

কিন্তু যদিও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ফলে স্বাধীন চিন্তা, নব নব ধর্ম্মমত, নূতন বৈজ্ঞানিক মত, যন্ত্রাদি উদ্ভাবন, ইত্যাদি নানা বিষয়ে বাঙালীর প্রতিভা দেদীপ্যমান, তথাপি পরিতাপের বিষয় এই যে, যৌথ কর্ম্মক্ষেত্রে এ পর্য্যন্ত বাঙালী পশ্চাৎপদ রহিয়াছে। সাংসারিক ও সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তনে বাঙালীর যৌথ-পরিবারগুলি ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। ইহার জন্য আংশিকভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও বর্ত্তমান চাকুরী-জীবিকা দায়ী। আর সম্ভবতঃ জীমূতবাহন-প্রণীত বাঙালীর দায়ভাগ আইনও যৌথপরিবারের পরিবর্ত্তে পারিবারিক স্বাতন্ত্র্যের পোষকতা করিতেছে। সম্প্রতি এই সামাজিক আইনকে রাষ্ট্রীয় শক্তি দ্বারা আরও পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত করিবার চেষ্টা হইতেছে।

সে যাহা হউক, বিষ্ণু ও কালীর সাধক বাঙালী-জীবনের মূল সূত্র সত্ত্ব-মিশ্রিত রাজসিক। তবে সকল জাতিরই নিম্ন স্তরে তামসিক গুণের অল্পবিস্তর আধিক্য দেখা যায়; তাহাও বাঙালী সমাজে অপেক্ষাকৃত কম; বস্তুতঃ সকল হিন্দু সমাজের নিম্নশ্রেণীদের পক্ষেই এ কথা খাটে। সকল হিন্দু সমাজেরই ভিত্তি সত্ত্বগুণে, কোন সমাজে সেই মূল সুরের ঝঙ্কার সমধিক পরিস্ফুট, কোন সমাজে অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ, কোন সমাজে বা অস্পষ্ট ও লুপ্তপ্রায়। তথাপি ইহা মগ্নচৈতন্য হইতে বিলুপ্ত হয় না।

বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যে ফরাসী প্রভৃতি পাশ্চাত্য এক শ্রেণীর উপন্যাসাদি-লেখকদের অনুকরণে বাস্তবতার কদর্য্য নগ্ন মূর্ত্তি কখন কখন চিত্রিত হইতে দেখা যায়। ইহা বাঙালীর সমাজ-জীবনের ও সাধারণতঃ হিন্দু সমাজের মূল সুরের বিরোধী। সুতরাং এই শ্রেণীর সাহিত্য এ সব সমাজের অনিষ্টকর হইবে বলিয়া মনে হয়। সাধারণতঃ যেমন জাতীয় ও সামাজিক আদর্শই সর্ব্বত্র সাহিত্য ও সুকুমার কলাকে প্রভাবান্বিত করে এবং তাহার ছন্দ ও সুরকে নিয়ন্ত্রিত করে, তেমনি সাহিত্য ও সুকুমার কলাও আবার জাতি ও সমাজের আদর্শকে অলক্ষিতে ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে। তবে ভরসা এই যে, সাত্ত্বিক ভাব হিন্দুসমাজের মজ্জায়

এরূপ প্রগাঢ়ভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে যে, এরূপ সাহিত্য ভারতে স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা অল্প। যে সাহিত্য সত্য, শিব ও সুন্দরের প্রকাশ করিবে, ভারতের ও বাংলার জীবনের সুরের সহিত কেবল তাহারই সঙ্গতি হইবে, সমাজ-জীবনের যথার্থ প্রকাশ ও স্ফুরণ তাহা দ্বারাই হইবে।

"ঐল" বা ভারতের নর্ডিক-আর্য্য জাতি

যখন দ্রাবিড়-পূর্ব্ব দ্রাবিড় ও আলপাইন জাতির পরস্পর সংমিশ্রণে বহু জাতি ও বর্ণসঙ্কর ভারতের বিভিন্ন ভাগে স্ব-স্ব স্বতন্ত্র সংস্কৃতি ও সমাজ লইয়া বিযুক্ত, বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে দ্বন্দ্ব, কলহ, সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া দিন যাপন করিতেছিল, তখন ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত হইতে সবিতৃদেবের বরেণ্য ভর্গ-ধ্যানপরায়ণ চিত্তে উদ্গীত বেদগাথায় গগন ধ্বনিত করিয়া একটি প্রতিভাবান্, মহাশক্তিশালী, বিশিষ্ট ধীশক্তিসম্পন্ন, অপূর্ব্ব কল্পনাশীল অথচ কর্ম্মপরায়ণ জাতি ভারত-রঙ্গস্থলীতে আবির্ভূত হইল।

এই নর্ডিক আর্য্যজাতির আদি আবাসভূমি ও ভারত-আগমনের কাল সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মতভেদ আছে। সে যাহা হউক, ঋগ্বেদের বর্ণনা হইতে অনুমান করা যায়, উত্তর-ভারতে অধিকার-স্থাপনকল্পে 'অসুর'দের সহিত দীর্ঘকাল এই নবাগত জাতি সংগ্রামে ব্যাপৃত ছিল। এই 'অসুর' সংজ্ঞায় প্রধানতঃ পরাক্রান্ত ও সমৃদ্ধ দ্রাবিড় জাতিদিগকেই সূচিত করিত; তবে সম্ভবতঃ দ্রাবিড়-পূর্ব্ব জাতিদের কোন কোন উন্নততর শাখার যোদ্ধারাও দ্রাবিড়-অসুরদের সহিত সম্মিলিত হইয়া 'আর্য্য' নর্ডিকদের গতিরোধ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। অবশেষে আগন্তুকেরাই জয়ী হইল। তাহাদের দ্বারাই হউক কিংবা নৈসর্গিক বিপর্য্যয়েই হউক, সিন্ধু-উপত্যকাবাসী 'অসুরেরা' যে গৌরবময় সভ্যতা-সৌধ গড়িয়া তুলিয়াছিল, সামান্য কিছু বাস্তব নিদর্শন রাখিয়া তাহা লুপ্ত হইয়া গেল।

এই বেদবাহী আর্য্যজাতি বাস্তব সভ্যতায় অসুরদের ন্যায় সমৃদ্ধ ছিল না, কিন্তু সংস্কৃতিতে, ভাষা-গৌরবে, প্রতিভায়, কল্পনাশক্তিতে, আদর্শ-প্রবণতায় ও আধ্যাত্মিকতায় সমধিক গরীয়ান্ ছিল।

যখন পরস্পর যুদ্ধ ও বিরোধ প্রশমিত হইয়া শান্তি স্থাপিত হইল ও কিছু দিন পরস্পরের সংশ্রব, সাহচর্য্য ও অল্পাধিক সংমিশ্রণ এবং আদান-প্রদান চলিতে লাগিল, তখন আসুরিক বল ও বাস্তব সভ্যতার উপর মানসিক ও আধ্যাত্মিক বল এবং সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠতা প্রাধান্য লাভ করিল। দ্রাবিড়-অসুরেরা ক্রমে নর্ডিক আর্য্যদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। অসুর-সভ্যতা এবং পরে আলপাইন সভ্যতা ও আর্য্য-সভ্যতার সমবায়ে এবং আর্য্য গুরুদের নেতৃত্বে এক বিশাল হিন্দু সভ্যতা ও হিন্দু সমাজে গঠিত হইল। বৈদিক হোম যজ্ঞাদির সঙ্গে বৈদিক-পূর্ব্ব পূজাদি সংমিশ্রিত হইল। অসুরাদি

অনার্য্যের ধর্ম্ম মার্জ্জিত ও পরিশোধিত হইয়া হিন্দুধর্ম্মে স্থান পাইল। ভারতের বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন রীতিনীতির ক্রিয়াকর্ম্মের সামঞ্জস্য সাধন করিয়া বিভিন্ন সাংস্কৃতিক স্তর ও অধিকারভেদ অনুসারে বিবিধ শ্রেণীর কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব নির্দ্ধারিত হইল। তখন এই স্তর-বিভাগ অনমনীয় ছিল না। এইরূপ স্তর-বিভাগ ও অধিকার-ভেদ নির্দ্দেশ করিয়া সমাজ-সংস্কারের ও সকল শ্রেণীর ক্রমোন্নতির পথ সুগম করা হইল।

পাশ্চাত্য সমাজের ন্যায় হিন্দুসমাজের স্তর-বিভাগ ধনগত নয়, ইহা গুণগত। ত্যাগ, শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষান্তি, জ্ঞানবিজ্ঞান ও আস্তিক্য ব্রাহ্মণের গুণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গুণানুসারে প্রাচীন কালে এক বর্ণ হইতে নিম্নতর বর্ণে অবনমিত ও উচ্চতর বর্ণে উন্নীত হওয়ার দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে পাওয়া যায়। কিন্তু যখন 'নর্ডিক'-আর্য্য-সমাজনেতারা আর্য্যাবর্ত্তে ও পরে দ্রাবিড়-ভারতে বংশগত ও ব্যবসায়গত বহু শ্রেণী-বিভাগকে তাঁহাদের আদর্শানুযায়ী গুণগত চাতুর্ব্বর্ণ্যের কাঠামোতে খাপ খাওয়াইয়া সংস্কৃত করিতে প্রয়াস পাইলেন, তখন সে প্রয়াস সম্পূর্ণ সফল হয় নাই। কালক্রমে এই শ্রেণী-বিভাগ অনমনীয় জাতিভেদে পরিণত হইল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাবে ঐ জাতিভেদবোধ কিছু মন্দীভূত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ভারতে ঐ ধর্ম্মের গ্লানি ও অবশেষে বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে জাতিভেদের কঠোরতা বর্দ্ধিত হইয়া ও অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি দোষে দুষ্ট হইয়া সমগ্র হিন্দু সমাজকে বিকলাঙ্গ ও বিকারগ্রস্ত করিয়া ফেলিল।

সমাজ গঠন সম্বন্ধে পাশ্চাত্য ও হিন্দু পণ্ডিতদের মত

যে নানাবিধ নৈসর্গিক ও সামাজিক শক্তির প্রভাবে সমাজের পরিপুষ্টি হয়, পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে তাহা প্রধানতঃ চারিটি :—

(১) প্রাকৃতিক আবেষ্টনী (natural environment);

(২) বংশানুক্রম ও পূর্ব্বপুরুষাগত সংস্কার (heredity, বা hereditary tendencies);

(৩) সামাজিক আবেষ্টনী (social environment), যেমন জাতীয় ঐতিহ্য, পারিবারিক ও সামাজিক শিক্ষা;

(৪) অপরাপর জাতির ও সংস্কৃতির সহিত সংস্পর্শ ও সংমিশ্রণ (contact of cultures and races)।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের বহু যুগ পূর্ব্বে প্রাচীন হিন্দু ঋষিরা যে প্রত্যেক মানবের ও সমাজের দেবঋণ, পিতৃঋণ ও ঋষিঋণের দায়িত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহা সমাজ-বিজ্ঞানের এই মূল তথ্যেরই জ্ঞাপক। আর উক্ত চারিটি শক্তি ছাড়া মহাপুরুষদের প্রভাব সমাজের নবজীবন প্রদানের পক্ষে যে সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকারী, এই তথ্য হিন্দু ঋষিরাই প্রথমে বিশেষ ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাই গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

> যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
> অভ্যুত্থানম ধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্। (৪ অধ্যায়, ৭ম শ্লোক)

ব্যষ্টিজীবনের ও সমষ্টিজীবনের উৎকর্ষ সাধনের পন্থাস্বরূপ প্রত্যেক মানবের নিত্যকর্ত্তব্যরূপে তাঁহারা যে পঞ্চ মহাযজ্ঞের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, তাহার ভিত্তি সমাজতত্ত্বের এই মৌলিক তথ্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত। বরং হিন্দু ঋষিদের এই সম্বন্ধে ধারণা আরও গভীর, ব্যাপক ও বিশাল ছিল। আর হিন্দু ঋষিরা কেবল সামাজিক মনস্তত্ত্বের তথ্য উদ্ঘাটন করিয়া তৃপ্ত হন নাই; জ্ঞানলব্ধ তথ্য ব্যাবহারিক জীবনে প্রয়োগ দ্বারা ব্যষ্টিজীবনের ও সমষ্টিজীবনের উৎকর্ষ সাধনোপযোগী বিধিনিয়মের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তবে পরিতাপের বিষয় এই যে, ঐ সমস্ত বিধিনিয়মের মধ্যে যেগুলি তৎকালীন অবস্থার উপযোগী ছিল, দেশের সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও সেগুলির অবস্থানুযায়ী পরিবর্ত্তন সাধিত না হওয়ায় সমাজের উন্নতির পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইল। পঞ্চ মহাযজ্ঞাদি যে বিধিনিয়ম সনাতন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং অপর অনেকগুলি বিধি-নিষেধ যাহা সনাতন বা মৌলিক নহে, কেবল সময়োপযোগী মাত্র ছিল, তাহাদের মধ্যে প্রভেদ হৃদয়ঙ্গম না করিয়া সকল প্রচলিত আচার ও বিধিনিষেধকে ভগবৎ-আদিষ্ট ও দেশকাল-পাত্রনির্ব্বিশেষে অবশ্যপালনীয় বলিয়া গ্রহণ করাতেই সমাজের উন্নতির গতি রুদ্ধ হইয়া অবনতির দিকে চালিত হইতেছে। আমার মনে হয়, হিন্দুশাস্ত্রে দেবঋণ প্রভৃতির ও পঞ্চ মহাযজ্ঞের ধারণা এবং ঋগ্বেদীয় পুরুষসূক্তে বিরাট্ পুরুষের বিভিন্ন অঙ্গ হইতে যজ্ঞোৎপন্ন বিভিন্ন বর্ণের কল্পনা, তাহাই হিন্দু সমাজ-বিজ্ঞানের মূলসূত্র বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

হিন্দুর দেবযজ্ঞের উদ্দেশ্য—বিশ্বের ও বিশ্বজীবের নিয়ামক প্রাকৃতিক শক্তিনিচয়ের সহিত যজমানের বা যজমান-সঙ্ঘের আত্মসমীকরণ ও ঐকতান স্থাপন। তাই 'স্বাহা' এই আত্মযোজক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া হবির্দানের বিধি, দেবতাদের সহিত, কিংবা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের ভাষায়, প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর সহিত—ঐকতান স্থাপনের উদ্দেশ্যে। আদিত্য, বসু ও রুদ্রাদি দেবতারা বিশ্বনিয়ামক নৈসর্গিক শক্তিরূপে ভগবৎশক্তিরই প্রতীক।

পিতৃযজ্ঞে—পিতৃগণের প্রদত্ত দেহ ও দেহাশ্রিত গুণাবলীর (heredityর) অধিকারী যজমান, 'স্বধা' মন্ত্রে পিতৃগণের সহিত স্বীয় একত্বের ধ্যান ও উপলব্ধি করেন ও আত্মানুস্মৃতির কামনা করিয়া তর্পণ করেন।

ঋষিযজ্ঞের উদ্দেশ্য—মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ, শিক্ষাগুরু এবং দীক্ষাগুরু ও অন্যান্য জ্ঞানদাতাদের সহিত স্বাধ্যায়, মন্ত্রজপ ও ধ্যানদ্বারা অখণ্ড জ্ঞানের নিত্য সান্নিধ্য লাভ। ইহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের নির্ণীত সামাজিক আবেষ্টনীর অন্তর্ভুক্ত হইলেও তাহা অতিক্রম করিয়া যায়, সামাজিক আবেষ্টনীর ধারণাকে আরও ব্যাপকতা প্রদান করে। সমাজের উপর মহাপুরুষদের প্রভাবের গুরুত্ব পাশ্চাত্য সমাজ-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা সম্প্রতি স্বীকার করিতেছেন।

নৃযজ্ঞে আতিথেয়তা ও প্রীতি দ্বারা শ্রদ্ধাপরায়ণ হইয়া সমাজের ও বিশ্বমানবের সহিত একত্ব উপলব্ধি করিবার বিধি। বিশ্বমানবের ও বিভিন্ন মানব-সমাজের সহিত সংস্পর্শ এবং প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে তাহাদের প্রভাব ব্যষ্টিজীবন ও সমাজ-জীবনকে প্রভাবান্বিত করে বলিয়াই নৃযজ্ঞের প্রবর্ত্তন।

বিশ্বমানবের সহিত সম্বন্ধের এই ধারণা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের বিভিন্ন জাতি ও সংস্কৃতির পরস্পরের আন্তর্জাতিক ও সাংস্কৃতিক সংঘর্ষ ও সংমিশ্রণের (contact of races and cultures) ধারণা অপেক্ষাও অধিকতর ব্যাপক ও মহান্।

আর ভূতযজ্ঞের ধারণা ও অনুষ্ঠান হিন্দুসমাজের বৈশিষ্ট্য। ভূতযজ্ঞের উদ্দেশ্য—আব্রহ্ম-স্তম্বপর্য্যন্ত বিশ্বের সমস্ত জীবের সহিত মানবের বিচিত্র সম্বন্ধ হৃদয়ঙ্গম করিয়া সর্ব্বভূতে সমদর্শন ও পবিত্র দৃষ্টিতে সর্ব্বভূতের সেবা। হিন্দু সমাজনীতি মতে এইরূপে ক্রমিক আত্মপ্রসারের দ্বারা বিশ্বমানবের ও পরমাত্মার সহিত যোগযুক্ত হওয়া ব্যষ্টি ও সমষ্টিজীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

কিন্তু প্রায় সহস্র বর্ষ হইল, ভারত-সমাজের দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে। কবির ভাষায়,—

আমাদের কর্ম্মেরে করেছে পঙ্গু নিরর্থ আচারে,
জ্ঞানেরে করেছে হত শাস্ত্রকারাগারে।

আজ আমাদের ধর্ম্ম প্রাণহীন, সমাজ অর্থহীন আচারের চাপে বিকলাঙ্গ ও জীবন্মৃত। অপর দিকে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ভোগবাদ ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ ভারত-সমাজে আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। একমাত্র সুলক্ষণ এই যে, অধুনা পাশ্চাত্যের কৃষ্টির সংস্পর্শে আসাতে আমাদের দীর্ঘ-সুপ্ত জাতীয়তা ও স্বদেশ-প্রেম পুনরুদ্দীপিত হইতেছে ও তাহারই প্রণোদনে ভারতবাসী অন্তরের যে অমূল্য সম্পদ্‌রাজি হেলায় হারাইয়াছে, তাহার পুনরুদ্ধারের প্রয়াস দেখা যাইতেছে।

যে ভারতে নৃযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ মানবজীবনের পঞ্চ মহাযজ্ঞের মধ্যে পরিগণিত হয় ও যে দেশে "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" এই মন্ত্রের প্রচলন আছে, সেখানে জাতীয়তার অভাব হইতে পারে না। অবস্থাবিপর্য্যয়ে কয়েক শতাব্দী অর্দ্ধসুপ্ত অবস্থায় কেবল মগ্নচৈতন্যে বর্ত্তমান ছিল মাত্র। বর্ত্তমানে অবস্থার পরিবর্ত্তনে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আবার জাগ্রত হইতেছে। কিন্তু উহাকে 'পরমধর্ম্ম' বলিয়া গ্রহণ করিলে ভুল হইবে।

এই প্রসঙ্গে জাতীয়তা সম্বন্ধে ঋষিতুল্য স্বর্গীয় ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন,—"ইয়ুরোপীয় সমাজের সহিত তুলনায় প্রবৃত্ত হইয়া যাঁহারা ভারতবাসীর জাতীয় ভাবটি পরিস্ফুট হয় নাই মনে করেন, তাঁহারা ঐ ভাবের তথ্যটি ভাল করিয়া বুঝেন বলিয়া মনে হয় না। জাতীয় ভাবটি মনুষ্য-হৃদয়ের খুব উচ্চ ভাব বটে, কিন্তু উহা সর্ব্বোচ্চ ভাব নহে। জাতীয় ভাব একটি মিশ্র পদার্থ। ইহাতে ভাল এবং মন্দ, প্রশস্ততা এবং অপ্রশস্ততা, দুই-ই আছে। কোন

ভাবের সহিত তুলনায় ইহা অতি উদার ভাব; আবার কোন ভাবের সহিত তুলনায় ইহা অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ ভাব। জাতীয় ভাব সম্বন্ধে আমাদিগের বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্র সকলের প্রকৃত মর্ম্ম এই যে, ঐ ভাবটি অতি উৎকৃষ্ট, কিন্তু উহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর ভাব আছে—উহা মনুষ্যের হৃদয়োন্নতি-সোপানে একটি উচ্চ স্থান, কিন্তু উহাই উচ্চতম বা চরম স্থান নয়। (১) নিজের প্রতি অনুরাগ, (২) নিজ পরিবারের প্রতি অনুরাগ, (৩) বন্ধুবান্ধব স্বজনের প্রতি অনুরাগ, (৪) স্বগ্রামবাসীর প্রতি অনুরাগ, (৫) নিজ প্রদেশবাসীর প্রতি অনুরাগ,—এই পাঁচটি ধাপ ক্রমে ক্রমে ছাড়িয়া উঠিয়া, তবে (৬) স্বজাতিবাৎসল্য বা স্বদেশানুরাগ প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্থূল কথায়, প্রাচীন গ্রীক এবং রোমীয়দিগের অধিকার এই পর্য্যন্ত। আবার পর্য্যায়ক্রমে ইহার উপরে, (৭) স্বজাতি হইতে অনধিক ভিন্ন অপর জাতীয় লোকের প্রতি অনুরাগ। অগষ্ট কোমটি মতানুযায়ীদিগের প্রকৃত অধিকার এই পর্য্যন্ত। (৮) মানবমাত্রের প্রতি অনুরাগ। সরল-মনা যিশুর এবং মহাত্মা মহম্মদের দৃষ্টির এই সীমা। (৯) জীবমাত্রের প্রতি অনুরাগ, বৌদ্ধদিগের এই সীমা। (১০) সজীব-নির্জীব সমস্ত প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ, ইহাই আর্য্যধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ আসন,—আর্য্যেরা তাহারও উপরে, সেই অবাঙ্‌মনসগোচরে আত্মনিমজ্জন করিতে চাহেন। ভারতবাসীর হৃদয়ে ঐ উচ্চতম ভাব স্থান পাইয়াছে বলিয়াই তাহার নিম্নতর যে জাতীয় ভাব, সেটি আবৃত হইয়া আছে। সম্প্রতি এই আবরণের মোচন হইতেছে।"

কিন্তু আক্ষেপের সহিত বলিতে হইতেছে যে, বর্ত্তমানে কোন কোন প্রান্তীয় সরকার মুখে ভারতীয় জাতীয়তার গর্ব্ব করিলেও কার্য্যতঃ প্রান্তীয় জাতীয়তা-ভাবের ঊর্দ্ধে উঠিতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। কোথাও কোথাও দেশজ এবং উপনিবিষ্ট (native and domiciled) জাতিদের সম্পর্কে প্রভেদমূলক নীতির প্রবর্ত্তন দৃষ্ট হয়।

উপসংহার

সমাজ-বিজ্ঞানের যথাযথ অনুশীলনে এই শাশ্বত সত্যের উপলব্ধি হয় যে, ব্যক্তিগত জীবনে ঐকতান, সমাজ-জীবনে ঐকতান, বিশ্বমানবের ঐকতান, ইহাই বিশ্ব-লীলা-রহস্যের উদ্দেশ্য—ইহাই সম্ভবতঃ হইবে বিশ্বনাট্যের শেষ অঙ্ক, মানবজগতের বিধিনির্দ্দিষ্ট পরিণাম।

বিভিন্ন সমাজ ও সংস্কৃতি বিশ্ব-প্রাণের আত্মপ্রকাশের বিভিন্ন ধারা বা ছন্দ। প্রাচীন ভারত-সভ্যতা আর্য্য, দ্রাবিড়, আলপাইন, মঙ্গোলিয়ান প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির ও সংস্কৃতির সমাবেশ ও সংযোগে গঠিত হইয়া পার্থক্য-সমন্বিত এক মহান্ একত্বে গৌরবান্বিত হইয়াছিল।

কালক্রমে প্রতিকূল ঘটনাবলীর ও ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক বিপর্য্যয়ের ফলে আর্য্যসভ্যতার আদর্শ ক্ষুণ্ণ হওয়ায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সাংস্কৃতিক যোগসূত্র শ্লথ হইয়া এবং অনৈক্য ও বিভেদ বা বিচ্ছেদ-প্রবণতা উদ্ভূত হইয়া ভারতকে অধঃপাতিত করিয়াছিল। পুরুষপরম্পরাগত অনেক আচার ও বিধি-নিষেধ অবস্থার পরিবর্ত্তনে, বর্ত্তমান

অবস্থার ও কালের অনুপযোগী, সুতরাং অর্থহীন ও প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের কঠিন শৃঙ্খল হইতে সমাজকে মুক্ত করিতে হইবে, এবং আত্মসংযম, ত্যাগ, ফলেচ্ছাহীন কর্ম্ম, বিশ্বপ্রেম প্রভৃতি যে অন্তরের সম্পদ্ আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি, তাহার পুনরুদ্ধার করিতে হইবে।

অধুনা ভগবদ্‌বিধানে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে ভারতের জাতীয় ও সাংস্কৃতিক মোহ-নিদ্রা ভঙ্গ হইতেছে এবং ভারত-সন্তানগণ তাহাদের অর্দ্ধ-লুপ্ত সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। সেই সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য এখন প্রয়োজন—ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান-সম্মত পন্থার অনুসরণ। ভারতের সমাজনেতাদের ও রাষ্ট্রনেতাদের কর্ত্তব্য, বর্ত্তমান পরিবর্ত্তিত অবস্থার সহিত সমঞ্জসীভূত, সুচিন্তিত সামাজিক ব্যবস্থা ও কার্য্যপদ্ধতি নির্দ্ধারণ করা এবং অবিচলিতচিত্তে সেই পথে অগ্রসর হওয়া ও ভারত-সমাজকে চালিত করা। তাহা হইলেই ভারত আবার জগৎসভ্যতার জয়যাত্রায় অগ্রণী হইতে পারিবে।

অন্যান্য দেশের সমাজ-সংগঠনের সহিত ভারতের সমাজ-সংগঠনের মৌলিক প্রভেদ এই যে, অন্যান্য দেশের অধিবাসীরা প্রায় সকলেই মূলতঃ সমজাতীয়। কেবল ভারতেই বিভিন্ন জাতির বা বর্ণের অনন্যপূর্ব্ব একত্র সমাবেশ হইয়াছে। আর একমাত্র আমেরিকার যুক্তপ্রদেশে কতকটা এইরূপ বিভিন্ন জাতির একত্র উপনিবেশ ঘটিয়াছে বটে। কিন্তু সেখানে শ্বেত, পীত, কৃষ্ণ, বিভিন্ন জাতির পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষা, বিদ্বেষ ও বিরোধ বিরল নহে। অপর পক্ষে ভারতের প্রাচীন ঋষিরা তাঁহাদের উদারতা, সম্মিলন-প্রবণতা, সমীকরণশীলতা, সার্ব্বজনীন প্রীতি ও একাত্মানুভূতির প্রণোদনে ভারতে উপনিবিষ্ট প্রত্যেক জাতির স্ব স্ব প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া একটি বিরাট্, বিচিত্র, ঐশ্বর্য্যশালী ভারত-সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। এই সংযোগ ও সামঞ্জস্য যান্ত্রিক সংমিশ্রণে নহে। ভাব-সামঞ্জস্যে, ধর্ম্ম-সামঞ্জস্যে ও আদর্শের একত্বে অচ্ছেদ্য মানসিক বা আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক যোগ।

সমাজ-সংগঠনে স্তরবিন্যাস অনিবার্য্য। অন্যত্র এই স্তর-বিনিবেশের উচ্চনীচ পারম্পর্য্য প্রধানতঃ বৈশ্যশক্তি বা ধনের তারতম্য কিংবা ক্ষাত্রশক্তি বা শৌর্য্যবীর্য্যের তারতম্যের উপর অধিষ্ঠিত; কেবল ভারতেই উহা ত্যাগ ও ব্রহ্মণ্য বা সত্ত্বগুণের তারতম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতের বিভিন্ন সমাজের পারিবারিক ও সামাজিক রীতি, ব্যাবহারিক কর্ম্ম-প্রণালী, আচার-ব্যবহার, বেশভূষা, আহার-বিহার, বিভিন্ন প্রদেশের ও সামাজিক আবেষ্টনের ও ঐতিহাসিত ঘটনাপুঞ্জের প্রভাবে অসংখ্য রূপ ধারণ করিলেও, এই জাতির প্রাকৃতিক ও বিরাট্ হিন্দু সমাজের আদর্শ বা মূল স্বর ছিল আত্মসংযম, আত্মত্যাগ, অনাসক্তি, তিতিক্ষা, সন্তোষ ও শান্তি। বিভিন্ন রাগরাগিণীর মধ্যেও ছিল এই একই মূল স্বর।

সমাজ-তত্ত্বের আলোচনা হইতে এই অনুভূতি আসে যে, বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতি বিরাট্ পুরুষের আত্মপ্রকাশের বিভিন্ন রূপ, স্বর বা ছন্দ। এই ছন্দ হারাইয়া ভারতবাসী এখন ছন্নছাড়া হইয়াছে। আবার সেই ছন্দের বা স্বরের পুনরুদ্ধারের জন্য

ভারত-সন্তানদের প্রাণপণ সাধনার প্রয়োজন; সর্ব্বাঙ্গীন সহযোগিতা ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে ভারতবাসী প্রত্যেক জাতির ও সমাজের স্ব স্ব সুর বা বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এবং তাহাদিগকে সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সমান অধিকার প্রদান করিয়া হিন্দুসমাজের মৌলিক আদর্শের দিকে পরিচালিত করা সমাজবিজ্ঞানসম্মত পন্থা এবং প্রকৃষ্ট রাজনীতি। আমাদের প্রাদেশিক দেশ-নেতারাও ইহা স্মরণ রাখিয়া তাঁহাদের স্ব স্ব প্রান্তে উপনিবিষ্ট স্বদেশী প্রবাসী বিভিন্ন জাতির এবং তাহাদের ভাষার ও সংস্কৃতির উন্নতিতে বাধা প্রদান না করিয়া যদি যথাশক্তি উৎসাহ প্রদান করেন, তাহা হইলেই তাঁহারা ভারত-সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সহায়তা করিতে পারিবেন। তাহা হইলে আবার এক দিন ভারতের বিভিন্ন জাতির ও সংস্কৃতির বিভিন্নতার মধ্যে মহান্ মৌলিক একত্ব সংস্থাপিত হইবে। বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ছন্দ বা সুরের সমন্বয়ে ভারতমাতা আবার তাঁহার পূর্ব্বগৌরব পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইবেন। তখন মাহরাট্টার রুদ্রবীণা ও শঙ্খনিনাদ, পঞ্জাবীর জয়ভেরীর গম্ভীর নির্ঘোষ, বাঙালীর ও অসমীয়া হিন্দুর বংশীধ্বনির মধুর নিক্কণ, হিন্দুস্থানীর করতালের ঝনৎকার, দ্রাবিড়ীয় তানপুরার করুণ সুর, আর আসাম, ছোটনাগপুর ও মধ্য-প্রদেশের আদিম নিবাসীদের মৃদঙ্গের উল্লাস-ব্যঞ্জক ধ্বনি প্রভৃতির সম্মিলিত একতানবাদ্যে ভারতভূমি আবার মুখরিত হইবে। তখনই বহুত্বের মধ্যে একত্বের পরিচয়ে ভারতে একজাতীয়ত্বের যথার্থ অনুভূতি আসিবে। আর সেই একতানের আত্মাস্বরূপ, সকল রাগিণীর মূর্চ্ছনাস্বরূপ ভারতমাতার মহা-ওঙ্কারধ্বনি ভারতে ও জগতে নিরন্তন ধ্বনিত ও শ্রুত হইবে। সেই ধ্যান-মন্ত্রে "কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে ভারতে মিলিবে সর্ব্ব-জাতি",—আর তখনই সমগ্র ভারতবাসীর হৃদয়ে—

বিপুল গভীর মধুর মন্দ্রে
বাজিবে বিশ্ব-বাজনা,
উঠিবে চিত্ত করিয়া নৃত্য,
বিস্মৃত হবে আপনা।

বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ (৪)

শ্রীসজনীকান্ত দাস

উইলিয়ম কেরী

কেরীর প্রতিভা বহুমুখী, জীবন বহুধাবিস্তৃত ছিল; বাংলা গদ্য-সাহিত্যের আলোচনা-প্রসঙ্গে তাঁহার জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন পরিচয় দিতে গেলে একটি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিতে হয়। এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে ততখানি বিস্তারের স্থান নাই। ধর্ম্মপ্রচারার্থ বঙ্গদেশ যাত্রা করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনের সামান্য পরিচয় দিয়া, বঙ্গদেশে তাঁহার কার্য্যকলাপের অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত বিবরণ দিবার চেষ্টা করিব। কারণ, কেরীর জীবনের এই অংশের ইতিহাস (১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ নবেম্বর অর্থাৎ কলিকাতায় পদার্পণ-দিবস হইতে ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ৯ জুন মৃত্যু-দিবস পর্য্যন্ত দীর্ঘ ৪১ বৎসর) প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে বাংলা-গদ্যের প্রাথমিক ইতিহাসের সহিত জড়িত। এই কালের মধ্যে বলিতে গেলে তিনি এক দিনের জন্যও বঙ্গদেশ ত্যাগ করেন নাই—মদনাবতীতে অবস্থানকালে টমাসের সঙ্গে একবার ভুটান গিয়াছিলেন; বঙ্গদেশের পরিধি তখন ভুটান পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই ৪১ বৎসরের প্রথম ছয় বৎসর তাঁহার শিক্ষানবিশীর কাল; শিক্ষক—জন টমাস ও রামরাম বসু। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষে মার্শম্যান, ওয়ার্ড প্রভৃতির আগমনকাল হইতেই মিশনরী-গোষ্ঠীর তিনি পরিচালক, ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের সূত্রপাত হইতেই শ্রীরামপুর মিশনের পত্তন; কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তাঁহার সংশ্রব। এই শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহায়তায় বাংলা-গদ্যের বিকাশ ও পরিণতি এবং উভয় ক্ষেত্রেই উইলিয়ম কেরী প্রধান।

প্রবন্ধ-লেখকের এখানে একটু জবাবদিহি করিবার আছে। উইলিয়ম কেরী পৃথিবী-প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। শুধু এন্‌সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকাতেই তাঁহার বিস্তৃত জীবনী স্থান পায় নাই; ব্রাউন, কে, কার্ণ, লং, হাগ, মার্শাল, শেরিং, ডাফ প্রভৃতি-লিখিত ভারতের বিভিন্ন খ্রীষ্টীয় মিশনের ইতিহাসে কেরী অনেকখানি স্থান জুড়িয়া আছেন; সি. বি. লিউসের জন্‌ টমাস-জীবনী, ডব্লিউ এইচ কেরীর ওরিয়েণ্টাল ক্রিশ্চিয়ান বায়োগ্রাফি, স্যামুয়েল ষ্টেনেটের উইলিয়ম ওয়ার্ড-জীবনী, উইলিয়ম্‌সের শ্রীরামপুর-পত্রাবলী (*Serampore Letters*) প্রভৃতি অসংখ্য পুস্তকে কেরীর জীবনের বহু কথা লিপিবদ্ধ আছে। এতদ্ব্যতীত তাঁহার নিজস্ব জীবনীর সংখ্যাও কম নয়। ইউষ্টেস কেরীর *Memoir of William Carey, D. D.* (১৮৩৬); ডক্টর বেলচারের *Life of William Carey* (১৮৫৬); জন ক্লার্ক মার্শম্যানের *The Life and Times of Carey, Marshman and Ward*, দুই খণ্ড

(১৮৫৯); জে. কালরসের *William Carey* (১৮৮১); জর্জ্জ স্মিথের *The Life of William Carey, D. D* (১৮৮৫); পীয়ার্স কেরীর *William Carey* (১৯২৩); ডিয়াভিল ওয়াকারের *William Carey* (১৯২৬); মহেন্দ্রনাথ চৌধুরি-সঙ্কলিত 'আদর্শ চরিত' (১৮৮০); বি. বি. শাহ-অনূদিত 'কেরি সাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী' (১৮৯৪); অমৃতলাল সরকার-প্রণীত 'ভারতবন্ধু ডাক্তার উইলিয়ম কেরী' (১৯৩৪) প্রভৃতি বহু পুস্তকে কেরীর জীবন বহু ভাবে আলোচিত হইয়াছে। এইগুলির উল্লেখ করিলেই প্রবন্ধ-লেখকের কর্ত্তব্য সমাপ্ত হইতে পারিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কেরীর উপরি-উল্লিখিত কোনও জীবনীতেই বাংলা সাহিত্যের সহিত তাঁহার সম্পর্কের বিস্তৃত বিবরণ নাই—এগুলি খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারক পাদরি কেরীর জীবনের কাহিনী মাত্র। শুধু ইউষ্টেস কেরীর জীবনীর পরিশিষ্টে অধ্যাপক এইচ. এইচ. উইলসন "প্রাচ্য পণ্ডিত ও অনুবাদক" কেরী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন। সুতরাং বাংলা-গদ্যের সহিত কেরীর সম্পর্কের ইতিহাস আমাদিগকে তাঁহার এবং তাঁহার সঙ্গীদের চিঠিপত্র ও জর্ণাল ইত্যাদি হইতে বহু পরিশ্রমে সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। আমরা মূলতঃ শ্রীরামপুর কলেজ-লাইব্রেরির "বোর্ড রুমে"ই অধিকাংশ উপকরণ পাইয়াছি; এই কাজে শ্রীরামপুর কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ আমাদিগকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। এই সংখ্যায় মুদ্রিত প্লেটগুলিও সেখান হইতে গৃহীত।

১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই আগষ্ট তারিখে নরদাম্‌টনশায়ারের পলার্সপিউরি গ্রামে উইলিয়ম কেরী জন্মগ্রহণ করেন। পিতা এডমণ্ড কেরী তখন স্বহস্তে তাঁত বুনিয়া অন্নসংস্থান করিতেন। উইলিয়মের বয়স যখন ছয় বৎসর, এডমণ্ড তখন তন্তুবায়বৃত্তি ত্যাগ করিয়া স্থানীয় অবৈতনিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা সুরু করেন এবং স্থানীয় প্যারিশের কেরাণী নিযুক্ত হন। পিতার এই জীবিকা-পরিবর্ত্তন উইলিয়মের পক্ষে শুভ ফলদায়ক হইয়াছিল, শিক্ষক পিতার আদর্শে সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি তাঁহার অসাধারণ আগ্রহ জন্মিয়াছিল। ইতিহাস, ভূগোল অর্থাৎ পৃথিবীর নানা দেশের বিবরণ, ভ্রমণকাহিনী, বিশেষ করিয়া কলম্বসের আবিষ্কার-বৃত্তান্ত এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁহার জ্ঞানার্জ্জন করিবার আগ্রহ ও উৎসাহের কথা সকলেই উল্লেখ করিয়াছেন। এই সময়ের অধীত বিদ্যা উত্তরকালে বঙ্গদেশে অবস্থানসময়ে স্থানীয় পশুপক্ষী ও বৃক্ষলতাদি সম্পর্কে গবেষণাকার্য্যে তাঁহার সহায় হইয়াছিল। ব্যাপটিষ্ট মিশন সোসাইটির প্রথম ছয় খণ্ড 'পিরিয়ডিকাল অ্যাকাউণ্টসে' ইহার বহু পরিচয় আছে। পুস্তকগত জ্ঞান ছাড়াও বাল্যকাল হইতেই তিনি হাতে-কলমে উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান আলোচনা করিতেন। এই বিজ্ঞানে তিনি এমনই দক্ষ হইয়াছিলেন যে, এক সময় তাঁহাকে কলিকাতার কোম্পানীর বাগানের তত্ত্বাবধায়করূপে নিয়োগ করার প্রস্তাব উঠিয়াছিল এবং বিখ্যাত উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিৎ ডক্টর রক্সবার্গের অকালমৃত্যুতে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ *Flora Indica* পুস্তক উইলিয়ম কেরী কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। কলম্বসের জীবনী ও ভ্রমণকাহিনী বালক কেরীকে এমনই আবিষ্ট করিয়া রাখিত যে, তিনি

দিনের পর দিন তাঁহার সহপাঠীদের কাছে কেবলই কলম্বসের গল্প বলিতেন; তাঁহার উৎসাহাতিশয্য দেখিয়া তাহারা তাঁহাকে কলম্বস নামে ডাকিয়া উপহাস করিত। অন্যান্য বিষয়ে কেরী সাধারণ ছাত্রদের মতই ছিলেন, কেবল তাঁহার পিতা বাল্যে তাঁহার পাটীগণিত বিষয়ে দক্ষতার উল্লেখ করিয়াছেন, দেখিতে পাওয়া যায়।* বার বৎসর বয়সে কেরী পলার্স পিউরির তন্তুবায়-পণ্ডিত টমাস জোন্‌সের নিকট বিশেষ মনোযোগের সহিত লাটিন ভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন। কথিত আছে যে, তিনি মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই একটি লাটিন শব্দকোষ ('Vocabularium') কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। পীয়ার্স কেরী লিখিয়াছেন,—

Nature and he were Sister and brother.···To watch things grow was his dear recreation.···In the Paulerspury lanes and fields and forest, and in the moat between his father's schoolhouse and the rectory, little was hidden from his eyes. Bird—their forms, colours, changes, calls, songs, haunts, nests, flight, eggs···And plants—their times and seasons, their leaves and buds and flowers, their soil and roots, their devices and their seeds he eagerly and patiently discovered....He became a recognized encyclopædia amongst his Paulerspury mates on all things curious.

এডমণ্ডের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না, সুতরাং বার বৎসর বয়স হইতেই বালক কেরীকে উপার্জ্জনের চেষ্টা দেখিতে হয়। প্রথম দুই বৎসর তিনি কৃষিকার্য্য শিখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বিশেষ চর্ম্মরোগের জন্য রৌদ্রতাপ মোটেই সহ্য করিতে পারিতেন না বলিয়া এই জীবিকা তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হয়। তিনি হ্যাকেলটনের জুতা-নির্ম্মাতা ক্লার্ক নিকল্‌সের সহযোগী হিসাবে জুতা-সেলাইয়ের কাজ শিখিতে আরম্ভ করিয়া চার বৎসর শিক্ষানবিশী করিয়াছিলেন। এই সময়ে প্রত্যহ রবিবারে পলার্স পিউরি আসিয়া টমাস জোন্‌সের নিকট তিনি গ্রীকভাষা শিখিতে সুরু করেন। ক্লার্ক নিকল্‌সের দোকানে কয়েকটি ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ ছিল, কেরী সেগুলিও মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে থাকেন। ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ক্লার্ক নিকল্‌সের হঠাৎ মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার আত্মীয় টি. ওল্ডের দোকানে কেরী শিক্ষানবিশ হন। এই ভদ্রলোক একাধারে মণ্ডপ, বদমেজাজী ও ধর্ম্মবাতিকগ্রস্ত ছিলেন; বালক কেরীর সহিত প্রায়শঃ তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ে তর্ক হইত। তর্কে জিতিবার জন্য কেরী প্রাণপণে ধর্ম্মগ্রন্থসকল অধ্যয়ন করিতে থাকেন, এবং লাটিন, গ্রীক ও হিব্রু ভাষা শিক্ষায় অধিক মনোযোগী হন। এই সকল তর্কমূলক ধর্ম্মচর্চ্চা সত্ত্বেও কেরীর নৈতিক চরিত্র সংসর্গদোষে কলুষিত হইয়া পড়ে। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ আগষ্ট তারিখে ডক্টর রাইল্যাণ্ডকে তিনি নিজের বাল্যজীবন সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন,—

* মিঃ টমাস ব্লাণ্ডেলের নিকট এডমণ্ড কেরীর ৯ আগষ্ট, ১৮১৫ তারিখের চিঠি—"He was always attentive to learning when a boy, and was a very good arithmetician."

My companions were at this time such as could only serve to debase the mind, and lead me into the depths of the gross conduct which prevails among the lower classes in the most neglected villages : so that I had sunk into the most awful profligacy of conduct.

এই সময়ে জন্ ওয়ার (Warr) নামক এক জন সহ-শিক্ষানবিশের আদর্শ তাঁহার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া দেয়, তাঁহার মনে সত্যকার ধর্ম্মভাব জাগ্রত হয় ; চার্চ অব ইংলণ্ডের বিখ্যাত প্রচারক রেভারেণ্ড টমাস স্কটের সহিত তাঁহার এই সময়েই ঘনিষ্ঠতা জন্মে। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সে মনিব ওল্ডের শ্যালিকা নিরক্ষরা ডরোথি প্ল্যাকেটের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে নরদামটনশায়ারের ব্যাপটিষ্টমণ্ডলীর পালকসঙ্ঘে যোগদান করিয়া রাইল্যাণ্ড, সাটক্লিফ, ফুলার ও পীয়ার্সের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মূলটনে একটি অবৈতনিক পাঠশালার শিক্ষকতা গ্রহণ করিয়া কেরী পিডিংটন (হ্যাকেলটন) ত্যাগ করেন ; জুতা-সেলাইয়ের ব্যবসায় তিনি তখনও পরিত্যাগ করেন নাই। তৎপূর্ব্বেই ক্যাপ্টেন কুকের ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়, এই পুস্তক মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া পৃথিবীর অখ্রীষ্টান হিদেন জাতিসমূহের অনন্ত নিগ্রহের কথা ভাবিয়া তাঁহার মনে বেদনা জাগে ও তাহাদের মুক্তির উপায় তিনি চিন্তা করিতে থাকেন। মূলটনে আসিয়া তিনি স্বহস্তে পৃথিবীর একটি বৃহৎ মানচিত্র প্রস্তুত করেন ও সেটিকে দেওয়ালে টাঙাইয়া হিদেনদের উদ্ধার-চিন্তায় মনোনিবেশ করেন। তিনি এই সময়ে ডাচ, ইতালীয়ান ও ফ্রেঞ্চ ভাষাও শিখিতে থাকেন এবং ডাচ ভাষার একটি পুস্তক ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। তাঁহার এই প্রথম রচনা এখনও পাণ্ডুলিপি আকারেই আছে। ধীরে ধীরে জুতা-সেলাই ও শিক্ষকতাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া কেরী ধর্ম্মযাজকবৃত্তি গ্রহণ করেন ও ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে লীষ্টার শহরের হার্ভি লেনে পাকাপাকি রকম পাদ্রিরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে এখান হইতেই তাঁহার *An Enquiry*··· পুস্তক প্রকাশিত হয় এবং ঐ সালের ২রা অক্টোবর তারিখে কেটারিঙের ঐতিহাসিক সভায় The Partioular Baptist Society for propagating the Gospel amongst the Heathen নামক সমিতি গঠিত হয়। গত সংখ্যায় এই সভার কয়েকটি অধিবেশন ও জন্ টমাসের সহিত কেরীর প্রথম সংযোগের কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বঙ্গদেশে রওয়ানা হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কেরীর জীবন সম্বন্ধে ইহার অধিক তথ্য আমাদের ইতিহাসের পক্ষে অনাবশ্যক। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জুন ক্যাপ্টেন ক্রিসমাসের অধীনে পরিচালিত ডেনিশ ইণ্ডিয়াম্যান 'প্রিন্সেস মারিয়া'-যোগে জন্ টমাসের নেতৃত্বে উইলিয়ম কেরী—পত্নী ডরোথি, শ্যালিকা ক্যাথারিন প্ল্যাকেট, পুত্র ফেলিক্স, উইলিয়ম, পিটার ও সদ্যোজাত জ্যাবেজকে লইয়া বঙ্গদেশ অভিমুখে যাত্রা করেন। সেখানে ৪১ বৎসর নানাকীর্ত্তিবিভূষিত জীবন যাপন করিয়া ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জুন তাঁহার মৃত্যু হয়। আমাদের প্রয়োজনের পক্ষে কেরীর জীবনের তিনটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব—ভাষা শিক্ষায় তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা, শারীরিক ক্লেশ উপেক্ষা করিয়া তাঁহার অপরিসীম অধ্যবসায় এবং সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার প্রবল কৌতূহল।

কেরী, টমাস ও রামরাম বসু

(১৭৯৩ নবেম্বর—১৭৯৯ অক্টোবর)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কেরী ও টমাসের ধারাবাহিক জীবনী আমার প্রবন্ধের বিষয় নয় ; কৌতূহলী পাঠককে ইহার জন্য অন্ততঃ জর্জ্জ স্মিথ ও সি. বি. লিউসের শরণাপন্ন হইতে হইবে। রামরাম বসু সম্বন্ধে দুর্ভাগ্যবশতঃ সামান্য উপকরণই আমাদের হস্তগত হইয়াছে ; খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিলে মিশনরীদের কৃপায় প্রথম বাঙালী লেখকের জীবনের বিস্তৃততর বিবরণ আমরা পাইতে পারিতাম। শ্রীরামপুরের পাদরিদের সহিত কয়েক বৎসরের সম্পর্কবশতঃ তাঁহার সামান্য যেটুকু পরিচয় তাঁহাদের চিঠিপত্র ও জর্ণাল মারফৎ পাওয়া যায় তাহাতে আমাদের ঔৎসুক্য মিটে না। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তৎসম্পাদিত 'দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা'র ৩য় গ্রন্থ রামরাম বসু-লিখিত 'রাজা প্রতাপাদিত্যচরিত্র' গ্রন্থের ভূমিকায় সেই পরিচয়টুকু লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, রামরাম বসু সম্বন্ধে তাহার অধিক জানিবার উপায় নাই। স্বর্গীয় নিখিলনাথ রায়-সম্পাদিত 'রাজা প্রতাপাদিত্যচরিত্রে'র ভূমিকায় রামরাম বসু সম্বন্ধে আরও অনেক কাহিনী আছে বটে, কিন্তু অনুসন্ধানে জানিয়াছি, সেগুলির অধিকাংশই ভুল তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

কেরী-সমভিব্যাহারে তৃতীয় বার বঙ্গদেশ অভিমুখে রওয়ানা হইবার পূর্ব্বেই টমাস বাংলা দেশ, বাঙালী ও বাংলা ভাষা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল, বিকৃত উচ্চারণ লইয়াই তিনি বাংলায় অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারেন এবং ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে দ্বিতীয় বার স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বেই রামরাম বসুর সহায়তায় বাইবেলের ম্যাথু, মার্ক, জেম্‌স, জেনেসিসের কিয়দংশ, সাম্‌স (Psalms) ও প্রফেসিজ-এর বিভিন্ন অংশ বাংলায় অনুবাদ করিয়া মূল পাণ্ডুলিপির নকলের সাহায্যে মালদহের হিন্দুদের মধ্যে তাহার প্রচারও করিয়াছেন।* এই অনুবাদের অসংস্কৃত রূপ আমাদের হস্তগত হইলে মিশনরী বাংলার আদিমতম নিদর্শন হইতে পরবর্ত্তী পরিণতির একটা ইতিহাস রচনা করা সহজ হইত। তবে শ্রীরামপুর মিশনযন্ত্রে সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত 'মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত' পুস্তকের প্রথম সংস্করণে (১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ ১৮ মার্চ মুদ্রণ আরম্ভ) টমাস-রামরাম বসুর অনুবাদ কতকটা অবিকৃত আছে বলিয়াই অনুমান হয়। মার্ক, জেম্‌স, জেনেসিস প্রভৃতির টমাস-বসুকৃত অনুবাদকে ভিত্তি করিয়া কেরীকৃত সংস্করণ পরে মুদ্রিত হইয়াছিল।

* They have Matthew, Mark, James, some part of Genesis, and the Psalms, with different parts of the Prophecies, in Bengalee manuscript : three or four of them have all the above, and some only a single, part, which they lend to one another and copy."
—Thomas's "Narrative of Himself," *Rippon's Baptist Register*, No. V.

মালদহ হইতে দ্বিতীয় বার স্বদেশে ফিরিবার সময় টমাস সঙ্গে করিয়া কেটারিঙের ব্যাপটিষ্ট-মণ্ডলীর সম্পাদকের নিকট লিখিত "শ্রীপার্ব্বতী ব্রাহ্মণ, শ্রীরামরাম বসু, কায়স্থ" লিখিত ১১৯৮ বঙ্গাব্দের ৭ই মাঘ তারিখের একটি বাংলা নিমন্ত্রণপত্র সঙ্গে লইয়া যান; টমাস ইহার ইংরেজী অনুবাদ করেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই ঐতিহাসিক পত্রটির মূল বাংলা রূপ আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২০ মার্চ তারিখে লীষ্টারে ব্যাপটিষ্ট ভ্রাতৃমণ্ডলীর সভায় সকলে মিলিয়া এই পত্রের একটি জবাব প্রস্তুত করেন—

"A letter was drawn up, addressed to the Hindoo Christians in India, to whose conversion brother Thomas had already been instrumental......"

এই পত্রে লিখিত হইয়াছিল—

You requested in your letter sent to one of our brethren, that "Missionaries might be sent to preach the Gospel among you, and to half-forward the translation of the word of God." For these purposes we recommend to you our much esteemed brethren Thomas and Carey, men who are persuaded, are willing to hazard their lives for the name of the Lord Jesus......

W hope that upon the arrival of our brethren, you will be solemnly baptized......

Be subject to the laws of your country, in all things not contrary to the laws of God....Be faithful in all your relative connections......

রামরাম বসুকেও ১৭৮৮ সনের জুন মাসে রচিত তাঁহার খ্রীষ্ট-স্তবটির * জন্য ধন্যবাদ দিয়া একটি পত্র লিখিত হয়। এই দুইটি পত্র সঙ্গে লইয়া ১৩ই জুন তাঁহারা যাত্রা করেন। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৪ আগষ্ট গিল্‌স্‌বরোতে অনুষ্ঠিত মণ্ডলীর সভায় বঙ্গদেশগত মিশনরীদের সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়—

That as it will be necessary for sometime, that they should have the assistance of some of the natives, in order to enable them to learn the *Sanskrit* and *Bengal Languages*, the sum of 20 l. per annum be allowed to each, towards the discharge of those extra expenses.

কেরী জাহাজেই টমাসের নিকট বাংলা শিখিতে সুরু করেন, টমাসও জাহাজে বসিয়াই হিব্রু-ভাষাভিজ্ঞ কেরীর সাহায্যে জেনেসিসের অনুবাদ শেষ করেন। ১১ই নবেম্বর তারিখে কলিকাতা পৌঁছিয়াই রামরাম বসুর সহিত জাহাজঘাটে কেরীর পরিচয় হয়, টমাসের মুন্‌শী রামরাম সেই দিন হইতেই মাসিক কুড়ি টাকা বেতনে কেরীর মুন্‌শী নিযুক্ত হন। প্রকৃত পক্ষে টমাসের সহিত বাংলা-গদ্যের সম্পর্ক এই দিন হইতেই ঘুচিয়া যায়, অধিকতর পরিশ্রমী, অধ্যবসায়শীল এবং নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তির হাতে এই ভার অর্পিত হয়; রামরাম বসুর মধ্যস্থতায় বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিৎ উইলিয়ম কেরী বাংলা-গদ্যনির্ম্মাণে তাঁহার অপেক্ষাকৃত বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান লইয়া অগ্রসর হন। ১১ই নবেম্বর, ১৭৯৩ হইতে ১৭৯৬

* "কে আর তারিতে পারে লর্ড জিজছ ক্রাইষ্ট বিনা গো। পাতক সাগর ঘোর লর্ড জিজছ ক্রাইষ্ট বিনা গো।" ইত্যাদি।

খ্রীষ্টাব্দে মালদহের মদনাবাটীতে * একটি অমার্জ্জনীয় অপরাধের জন্য মুন্‌শীত্ব হইতে বরখাস্ত না-হওয়া পর্য্যন্ত রামরাম বসু বরাবরই কেরীর সহিত যুক্ত থাকিয়া ভাষা-শিক্ষায় এবং অনুবাদ-কার্য্যে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। খামখেয়ালী, অমিতব্যয়ী, এবং জুয়াড়ী টমাস মিশন-প্রদত্ত যাবতীয় অর্থ অপব্যয় করিয়া নিজে নানা বিপদের মধ্য দিয়া শেষ পর্য্যন্ত জর্জ্জ উড্‌নির আশ্রয়ে মালদহের মহীপালদীঘি নীলকুঠির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইয়া ১৭৯৪ সনের মার্চ মাসে সেখানে পৌঁছিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হন। বঙ্গদেশে পদার্পণ করিয়া পূরা সাড়ে সাত মাস কাল কেরী হালভাঙা নৌকার মত সমগ্র পরিবার এবং মুন্‌শী সমেত সম্পূর্ণ নিঃস্ব অবস্থায় কলিকাতা হইতে ব্যাণ্ডেল, ব্যাণ্ডেল হইতে নদীয়া, নদীয়া হইতে ব্যবসায়ী নেলু দত্তের বদান্যতায় তাঁহার মাণিকতলার বাগান-বাড়ীতে এবং শেষ পর্য্যন্ত সুন্দরবন অঞ্চলের † দেবহাট্টায় তাড়িত-বিতাড়িত হন। এই সময়ে শারীরিক ও মানসিক অত্যধিক যন্ত্রণায় কেরী-পত্নী ডরোথি অর্দ্ধোন্মাদ হইয়া যান। এই সাংঘাতিক অবস্থার মধ্যেও কেরী এক দিনের জন্যও তাঁহার আসল উদ্দেশ্যের কথা বিস্মৃত হন নাই এবং ভাষা শিক্ষা ও অনুবাদের কাজে শৈথিল্য প্রদর্শন করেন নাই। অনুতপ্ত টমাস মহীপালদীঘিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহারই-দোষে-বিপন্ন কেরীকে বাঁচাইবার জন্য জর্জ্জ উড্‌নিকে ধরিয়া মদনাবাটীর নীলকুঠির তত্ত্বাবধায়কের পদে তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়া সংবাদ পাঠান। ১৫ই জুন ১৭৯৪ তারিখে কেরী সপরিবারে রামরাম বসু সহ নৌকাযোগে ইছামতী, জলাঙ্গী, গঙ্গা, পদ্মা ও মহানন্দা নদীপথে মদনাবাটী পৌঁছান। পথিমধ্যে সুন্দরবনের কাছাকাছি চান্দুরিয়া নামক স্থানে কেরী সর্ব্বপ্রথম বাংলায় বক্তৃতা করেন। কেরীর চিঠিপত্র ও জর্ণাল হইতে এই সাড়ে সাত মাসের প্রয়োজনীয় বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

Calcutta, Nov. 25, 1793......I see one of the finest countries in the world, full of industrious inhabitants; yet three-fifths of it are an uncultivated jungle, abandoned to wild beasts and serpents........

I have had several conversations with a Brahmin who speaks English well, and being unable to defend himself against the Gospel, he purposes to come, attended by a Pundit, and try the utmost of their strength......It will be of very great service to us if the society can send out a *Polyglot Bible* by the next conveyance. *Ram Boshoo* is a good Persian scholar, and it will certainly help us much........

Bandell, Dec. 16, 1793......We have been near a month at *Bandell,* which is a Portuguese settlement, but are now going further up the country, perhaps, to *Nuddea, Cutwa, Gowr,* or *Malda;* at present it is uncertain which.

* ইংরেজী Mudnabatty ইতিপূর্ব্বে "মদনাবতী" রূপে বাংলায় লিখিত হইয়াছিল। পরে জানিয়াছি (Ward's *Journal*) "মদনাবাটী" উচ্চারণ হইবে।

† ইহা রামরাম বসুর খুড়ার জমিদারিভুক্ত ছিল। ইহা হইতে অনুমান করা চলিতে পারে যে, রামরাম বসুর বাড়ী এই অঞ্চলেই ছিল।

Bandell, Dec. 26, 1793....I entertain a very high opinion of him [Ram Ram Boshoo] as a converted person : He is a man after my heart. He is a faithful councellor and a discerning man, and very inquisitive, sensible and intelligent. If he wants anything it is zeal;......

Maniet-tullo, Jan. 1, 1794......The utmost harmony subsists between me and Mr. Thomas. Several Brahmins and Pundits, have been very pressing with us to settle at *Calcutta,* and preach to them; accordingly Mr. T. resides there, and I live at a house belonging to a blackman [Nelu Dutt], who generously offered it to me for nothing, till I am otherwise accomodated.

I am about renting a small quantity of land of a native, some miles east of the city [Debhatta], so that we may have opportunities of preaching the gospel all over the most populous part of *Bengal.* The city of Calcutta is very large; I have no doubt but there may be 200,000 black people there, besides the Europeans......I had fully intended to devote my eldest son to the study of Shanscrit, my 2d to the Persian, and my 3d Chinese.

Maniet-tullo, Jan. 3-5, 1794....Both Moors and Hindoos are very industrious, and in many branches of manufacture excellent workmen. The cultivated part of the country bears a great resemblance to some of our English countries......

The Moors, who are Mahometans, are more rigid and fierce than the Hindoos.....

The Hindoos acknowledge but one Supreme Being, but they make offerings to a variety of imaginary subordinate beings........

To the honour of the Government I may observe, that the black people here are as free as the natives of England, and the courts of law seem to favour them full as much as the Europeans.

Their national character is that of avarice, to this we may add a strong propensity to lying. The first of these seems to be the effect of the oppressive dealing which they have experienced under former governors., But the whole police has assumed a very different aspect under the government of Lord Cornwallis, and especially in favor of the natives.

Deharta, Feb. 15, 1794......My ear is somewhat familiarized to the *Bengalee* sounds. It is a language of a very singular construction, having no plural except to pronouns, and not a single preposition in it; but the cases of nouns and pronouns are almost endless, all the words answering to our prepositions being put after the word, and forming a new case. Except these singularities, I find it, an easy language.

এই সময়েই তিনি নিজের সুবিধার জন্য নিজেই বাংলা ভাষার একটি সংক্ষিপ্ত শব্দকোষ ও একটি ব্যাকরণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

উপরের সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতিগুলিতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকের বাঙালী ও বাংলা দেশের যে সামান্য পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহা হইতেই তৎকালীন সামাজিক ইতিহাসের উপাদান হিসাবে কেরী ও টমাসের এই পত্র ও জর্ণালগুলি যে কত মূল্যবান্ তাহা উপলব্ধি হইবে। উত্তরবঙ্গে এই দুই জন মিশনরীর কার্য্যকলাপের কাহিনীও কম চিত্তাকর্ষক নয়।

১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৫ আগষ্ট তারিখে মদনাবাটী হইতে কেরী সোসাইটিকে লিখিতেছেন—

"I cannot speak the language so well as to converse much, but begin a little."

তাঁহার ৯ আগষ্ট তারিখের পত্রে (মিঃ সাট্‌ক্লিফের নিকট লিখিত) দেখিতে পাই—

The language is very copious, and I think beautiful. I begin to converse in it a little; but my third son, about five years old speaks it fluently. Indeed there are two distinct languages spoken all over the country; the *Bengalee,* spoken by the Brammhans, and higher Hindoos; and the *Hindostanic,* spoken by the Musselmans, and lower Hindoos. This last is a mixture of Bengalee and Persian.

ঐ বৎসরের শেষে মদনাবাটীতে কেরীর এই তৃতীয় পুত্রটি (পিটার) মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের সূত্রপাত হইতেই কেরী বাংলা ভাষায় বেশ দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছেন, লিখিতে ও বলিতে তাঁহার বিশেষ অসুবিধা হয় না। এই সময়েই তাঁহার মাথায় বাইবেল মুদ্রণের খেয়াল চাপে, তিনি ইংলণ্ড হইতে হরফ প্রস্তুত করাইয়া আনিতে মনস্থ করেন। ৬ জানুয়ারির পত্রে তিনি লিখিতেছেন,—"I intend soon to send specimens of Bengalee letters, for types. A considerable part of this expense I hope to be able to bear myself." মদনাবাটীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই তিনি স্থানীয় কৃষক ও প্রজাদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন; যত দূর জানা যায়, ইউরোপীয় মতে দেশীয় লোকদের শিক্ষা দিবার চেষ্টা ইহাই দ্বিতীয়। মালদহের গোয়ামাল্‌টির জন্ এলার্‌টন ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই তাঁহার বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন।

২৭ জানুয়ারি তারিখেই কেরী ডক্টর রাইল্যাণ্ডকে লিখিতেছেন—

It will be requisite for the society to send a printing press from *England;* and, if our lives are spared, we will repay them. We can engage native printers, to perform the press and compositor's work.

কেরীর জর্ণালে ঐ বৎসরের ১৪ই জুন তারিখে লিখিত আছে—

The Translation also goes on—Genesis is finished and Exodus to the XXIII d. Chapter. I have also for the purpose of exercising myself in the language, begun translating the gospel by John; which Moonshee afterwards corrects......

এই পর্য্যন্ত কেরীর অনুবাদের খবর মাত্র আমরা পাইতেছি, নমুনা দেখিতে পাই না। মদনাবাটী হইতে ১৩ আগষ্ট লিখিত একটি পত্রে তিনি স্বয়ং নমুনা দিয়াছেন, কেরী-লিখিত বাংলার ইহাই সর্ব্বপ্রথম দৃষ্টান্ত। কেরী লিখিতেছেন,—

Ram Ram Boshoo and Mohun Chund are now with me....I often exhort them, in the words of the apostle, 2 Cor. VI. 17, which in their language I thus express:—

বাহিরে আইস এবং আলাদা হও এবং অপবিত্র বস্তু স্পর্শ করিও না এবং আমি কবুল করিব তোমারদিগকে এবং তোমরা হইবে আমার পুত্রগণ এবং কন্যাগণ এই মত বলেন সর্ব্বশক্ত ভগবান।*

কেরী এই সঙ্গেই লিখিয়াছিলেন যে, ইংলণ্ড হইতে হরফ আনাইবার ইচ্ছা তিনি ত্যাগ করিয়াছেন; কারণ, বাংলা দেশেই যে বাংলা হরফ পাওয়া যায়, ইহা তিনি অবগত হইয়াছেন। এখানকার মামুলি প্রথাতেই অবশ্য ইংলণ্ড হইতে দশগুণ বেশী খরচ করিয়া ক্রিসমাসের মধ্যেই বুক অব জেনেসিস পর্য্যন্ত ছাপান যাইবে, তিনি এরূপ আশা করেন।

---

* "Forth come and separate be: and unclean thing touch not: and I accept will you: and you shall be my sons and daughters: thus says the Almighty God."

ঐ বৎসরের ২রা অক্টোবর তারিখেও তাঁহাকে দুঃখ করিতে দেখি—

One of my great difficulties arises from the common people being so extremely ignorant of their own language, and the various dialects which prevail in different parts of the country. Though I can preach an hour with tolerable freedom, so that all who speak the language well, or can read or write, can perfectly understand me; yet the laboring people can understand but little. Notwithstanding the language itself is rich, beautiful, and expressive; yet the poor people,......have scarce a word in use about religion.

বাংলা-গদ্যের অন্যতম প্রবর্ত্তক উইলিয়ম কেরীর সাধনা পরবর্ত্তী কালে এই কল্পিত বাধার দ্বারাই মূলতঃ নিয়ন্ত্রিত হয়, তিনি জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত অর্থাৎ চল্‌তি ভাষা শিক্ষা ও রচনা পরিত্যাগ করিয়া ভারতীয় যাবতীয় ভাষার মূল, সংস্কৃতের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন।

From his second Mudnabati year Carey gave a third of his long working day to this language, which Ram Ram Basu extolled as almost divine. It was India's hall-mark of culture, the franchise of her real aristocracy; the tongue wherein her scriptures and classics were all enshrined; the speech which unlocked her very soul; the mother and queen of her many vernaculars. To conquer this was to lay open a dozen derivatives; to take this stronghold was to win a multifold domain........ (S. P. Carey).

ঠিক এই সময়েই কেরী (৩১ ডিসেম্বর ১৭৯৫) মদনাবাটী হইতে মিঃ পীয়ার্স্‌কে সংস্কৃত, বাংলা এবং প্রচলিত ভাষার পার্থক্য বুঝাইবার জন্য লিখিয়াছিলেন—

Should you pursue the knowledge of the Hindoo language, it will no doubt have its use; but could you learn to read, and understand, and pronounce well all the books that are written in that language, yet not one in a hundred of the people would understand you, nor could you understand them, so different is the language called Bengalee (which is spoken by the higher ranks of Hindoos) from the common language of the country, which is a mixture of Bengalee, Hindoostanee, Persian, Portuguese, Armenian, and English, that is a mere jargon. I much question whether Moonshee can translate the Bible so as to be understood by the common people, and the less so as there is an alteration in their dialect every ten or twelve miles; and if he could I am persuaded that he would be ashamed of writing language so completely ungrammatical.

নিজের অনুবাদের ভাষা সম্বন্ধে তাঁহার মনে যথেষ্ট সন্দেহ জাগিতেছিল বলিয়া তিনি ঐ চিঠিতে লিখিয়াছিলেন—

I have translated the gospel by John, and the Epistle to the Galatians myself, without his [Ram Ram Boshoo's] help; and the common people understand it much better than his; but it would be scouted by all above the rank of a farmer......

সংস্কৃত ও চল্‌তি বাংলা, এই দোটানার মধ্যে পড়িয়া কেরী কিছু কাল অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং কোনও ব্যাকরণ-অভিধানের আশ্রয় না পাইয়া শেষ পর্য্যন্ত নিজেই সংস্কৃতের আদর্শ ধরিয়া ব্যাকরণ-অভিধান রচনায় মনোনিবেশ করিলেন। ফর্‌ষ্টারের অভিধান তখনও প্রকাশিত হয় নাই এবং যে কারণেই হউক, হাল্‌হেডের ব্যাকরণ ও

আপ্‌জনের অভিধান তিনি সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তিনি বলিতেছেন (৩১ ডিসেম্বর, ১৭৯৫)—

I have been trying to compose a compendious grammar of the language, which I send you, together with a few pages of the Mahabharat, with a translation, which I wrote out for my own exercise in the Bengalee......I have also begun to write a dictionary of the language, but this will be a work of time;......

১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসেই কেরী রাইল্যাণ্ডের নিকট পত্রে লিখিতেছেন—

I have read a considerable part of the 'Mahabharata,' an epic poem written in most beautiful language, and much on a par with Homer. And were it, like Homer's 'Iliad' only considered as a great work of human genius, I should think it one of the finest productions in the world.

বাংলা ভাষা শিক্ষা ও গদ্য রচনার কাজ এই ভাবে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল, হঠাৎ মুন্‌শী রামরাম বসুর দুশ্চরিত্রতা প্রকাণ্ড বাধার সৃষ্টি করিল, ১৭৯৬ সালের জুন মাসে কেরী নিতান্ত দুঃখিতচিত্তে রামরাম বসুকে তাড়াইয়া দিতে বাধ্য হইলেন, বসুর সঙ্গে সঙ্গে পাঠশালার পণ্ডিতটিও পলায়ন করিলেন। সকল কাজ একসঙ্গে বন্ধ হইয়া গেল। কেরীর মানসিক অবস্থা এই সময়ে এত খারাপ হইয়াছিল যে, তিনি প্রায় হাল ছাড়িয়া দিবেন ভাবিয়াছিলেন। ঐ বৎসরের ১৭ই জুন একটি পত্রে তিনি লিখিয়াছেন—

With respect to printing the Bible, we were perhaps too sanguine. Means have hitherto failed. I think it will be well for the society to send at least one hundred pounds per annum, which shall be applied to the purposes of printing the Bible, and educating the youth.

I think it very important to send more missionaries hither, as we may die soon....

ঐ বৎসরের ১০ই অক্টোবর তারিখে জন ফাউন্‌টেন নামক এক জন যুবক প্রচারক কেরীর সহকারিরূপে মদনাবাটীতে উপস্থিত হইলেন। এই যুবকের উৎসাহে কেরী আবার নূতন উদ্যমে কাজ সুরু করিলেন, ফাউন্‌টেন অতি অল্প কালের মধ্যে বাংলা ভাষা শিখিয়া লইয়া স্কুলের কাজ ও অনুবাদের কাজে কেরীকে সাহায্য করিতে লাগিলেন, ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দ শেষ হইবার পূর্ব্বেই নিউ টেষ্টামেণ্ট সম্পূর্ণ অনূদিত হইয়া গেল, তখন শুধু ছাপার অপেক্ষা। কিন্তু তাহাতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, হিসাব করিয়া দেখা গেল, এদেশে ১০০০০ কপি ছাপিতে ৪৩৭৫০৲ টাকা খরচ হইবে। সুতরাং ইংলণ্ড হইতে একটি মুদ্রাযন্ত্র ও হরফ পাঠাইতে অনুরোধ করিয়া কেরী ১৬ই নবেম্বর তারিখে ফুলারকে পত্র দিলেন, এক জন দক্ষ মুদ্রাকরকেও ঐ সঙ্গে পাঠাইতে বলিলেন।

এই পত্রের জবাব আসিবার পূর্ব্বেই কেরী ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি কলিকাতা রওনা হইলেন—"To make the necessary enquiries about the expence of printing it here..." তিনি তখনও সংস্কৃত শিখিতেছেন এবং প্রত্যহ হিন্দুস্থানীতেও পাঠ লইতেছেন। কলিকাতার মুদ্রাকর হিসাব করিয়া জানাইলেন যে, নিউ টেষ্টামেণ্ট ছাপার অক্ষরে মোট ৬০০ পৃষ্ঠা হইবে, তাঁহারা সম্পূর্ণ নূতন সেট টাইপ কাটাইয়া সেই হরফে ১০০০০ কপি

ছাপিয়া দিতে প্রায় ৪০ হাজার টাকা লইবেন। অত টাকা সংগ্রহ করা অসম্ভব জানিয়া কেরী দুঃখিতচিত্তে মদনাবাটী ফিরিয়া আসিলেন। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ৬ জুলাই তারিখে ডক্টর রাইল্যাণ্ডকে লিখিত পত্রে দেখিতেছি—

I am forming a dictionary, Shanscrit, Bengallee and English, in which I mean to include all the words in common use. It is considerably advanced; and should my life be spared, I would also try to collate the Shanscrit with the Hebrew roots, where there is any familiarity between them........

মূল সমিতি কিন্তু মুদ্রাযন্ত্র ও হরফের কোনই ব্যবস্থা করিতে পারিলেন না, সুতরাং মুদ্রাকরের সন্ধানও প্রয়োজন হইল না। মদনাবাটীতে কেরীর জীবনযাত্রাও নিরুপদ্রবে চলিতেছিল না। অনাবৃষ্টি অথবা অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতে উপর্য্যুপরি তিন বৎসর নীলকুঠির কাজ প্রায় বন্ধ ছিল। খামখেয়ালি টমাসের কাজও ভাল চলিতেছিল না, মিশনের সহিত তাঁহার সম্পর্ক প্রায় ছিন্ন হইয়া আসিয়াছিল, ঝড়ের মত তিনি মদনাবাটীতে আসিতেন ও চলিয়া যাইতেন। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দেই টমাস মহীপালদীঘির কুঠি ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন। সেখানে কয়েক মাস অবস্থান করার পর তিনি রাজমহল পাহাড়ের পাদদেশে সেরাসিং নামক স্থানে সাঁওতালদের মধ্যে প্রচারকার্য্য করিতে যান। সদয়হৃদয় উড্‌নি বিপন্ন কেরীকে সাহায্যের জন্য আরও দুই এক বৎসর কুঠির কাজ চালাইতে মনস্থ করিলেন। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সংবাদ পাওয়া গেল যে, কলিকাতায় দেশীয় ভাষার হরফ প্রস্তুতের একটি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে—

A Letter-Foundry has lately been set up at Calcutta for the country languages, and I think it will be cheaper and better to furnish ourselves with types for printing the Bible in this country, than to have them cast in Europe......W. Carey, Jan. 1, 1798.

এই কারখানার কর্ত্তা কে ছিলেন জানা যায় না বটে, কিন্তু উইলকিন্স-শিষ্য পঞ্চানন যে এখানে কাজ করিতেন, জে সি. মার্শম্যান সে কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

All trace of the author or the result of this project has been lost except the fact that the punches were cut by the workman whom Sir Charles Wilkins had trained up. Mr. Carey immediately placed himself in communication with the projector of this scheme, and relinquished all idea of obtaining Bengalee types from England.—*The Life and Times of Carey, Marshman and Ward,* Vol. I, p. 80.

এইখানেই পঞ্চাননের সহিত ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কেরীর পরিচয় হয় এবং তাহারই ফলে শ্রীরামপুরে ছাপাখানা স্থাপিত হইবার পর পঞ্চানন কেরীর সহিত যোগদান করেন।

ইহারই কিছু দিন পরে ইংলণ্ড হইতে সদ্য-আগত একটি কাষ্ঠনির্ম্মিত মুদ্রাযন্ত্র কলিকাতায় নিলামে বিক্রয় হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপিত হয়, মাত্র ৪৬ পাউণ্ড (জে. সি. মার্শম্যানের মতে ৪০ পাউণ্ড) মূল্য ধার্য্য হইয়াছিল। বাইবেল-মুদ্রণের সাহায্যের জন্য ধর্ম্মপ্রাণ উড্‌নি উহা ক্রয় করিয়া আনাইয়া কেরীকে দান করিলেন। সেপ্টেম্বর মাসে (১৭৯৮) মুদ্রাযন্ত্রটি মদনাবাটী-ঘাটে আসিয়া পৌছিল। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের

প্রারম্ভে কেরী টাইপ অর্ডার দিবার জন্য কলিকাতা যাত্রা করিলেন।* মদনাবাটীতে আসিয়াই তিনি একটি বিপদে পড়িলেন। জর্জ্জ উড্‌নির নিকট হইতে মদনাবাটী কুঠির কাজ বন্ধ করিবার আদেশ আসিল। বিপন্ন কেরী নিকটবর্ত্তী খিদিরপুর গ্রামে নিজের এত দিনের সঞ্চিত সমস্ত অর্থ ব্যয় করিয়া উড্‌নির নিকট হইতে একটি নীলকুঠি ক্রয় করিলেন, কেরী ও ফাউন্‌টেন মুদ্রাযন্ত্রটি সমেত সেখানে নূতন সংসার পাতিতে গেলেন।

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর মার্শম্যান, ওয়ার্ড, ব্রান্সডন, গ্রাণ্ট প্রভৃতি নূতন মিশনরীদল কলিকাতায় আশ্রয় না পাইয়া ডেনিশ রাজ্য শ্রীরামপুরে পদার্পণ করেন। জন ফাউন্‌টেন তাঁহাদিগের সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য পূর্ব্বেই কলিকাতা গিয়াছিলেন। ভবিষ্যতের কর্ম্মপন্থা নিজেরা স্থির করিতে না পারিয়া সকলের পরামর্শমত কেরীর মতামতের জন্য ফাউন্‌টেন ও ওয়ার্ড ১৪ই নবেম্বর নৌকাযোগে খিদিরপুর রওয়ানা হইলেন। ১৭৯৯ সালের ১লা ডিসেম্বর তাঁহারা কেরীর গৃহে পৌছিলেন। নিজের ও মিশনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে কেরী তিন সপ্তাহ সময় লইলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত বহু কষ্টে উপার্জ্জিত খিদিরপুরের সমস্ত সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া মুদ্রাযন্ত্রটি সহ নৌকাযোগে ২৫এ ডিসেম্বর তারিখে শ্রীরামপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মুদ্রাকর ওয়ার্ড তাঁহার সঙ্গে রহিলেন।

But what of John Thomas through all the upheaval of these days?....With his wife and daughter he moved hither and thither; never in one stay. Now living in a boat, now in a bamboo hut; now in Nadia, now in Birbhum; now preacher, now sugar-refiner and distiller, and now again indigo-venturer: A rolling stone: a warm heart, a wayward judgment and will! (S. P. Carey).

শ্রীরামপুর মিশন—কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড

(১০ জানুয়ারি ১৮০০ হইতে ৮ এপ্রিল ১৮০১)

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর রবিবার ব্যাপটিষ্ট মিশনরী সোসাইটির দ্বিতীয় দল শ্রীরামপুরে উপস্থিত হন। শ্রীরামপুর তখন ডেনমার্কের অধীন। গঙ্গার ধারে এখন যেখানে কলেজটি অবস্থিত, তাহারই সন্নিকটে 'মায়ার্স ট্যাভার্ণ' নামে .একটি ডেনিশ

* Carey to Ryland, April 1, 1799—"I wrote to the society that I had reason to hope that a copy of the whole Old and New Testament might be completed, by the time the paper mentioned by brother Fuller, for printing 2,000 copies of the New Testament would arrive....We have a press, and I have succeeded in procuring a sum of money sufficient to get types cast. I have found out a man who can cast them, the person who casts for the Company's press; and I have engaged a printer at Calcutta to superintend the casting. The work is now begun, and I hope may be completed in less than six months, by which time the copy will be in forwardness to begin upon........

I went to Calcutta in company with Mr. F [ফারনাণ্ডেজ]

সরাইখানা ছিল ; পাদরিরা সেই সরাইখানায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। ওয়ার্ড তাঁহার দিনপঞ্জিকায় লিখিয়াছেন—

প্রকৃতি এখানে সহজ সাজে সজ্জিত ; তাঁহার সম্পদের মধ্যে কুটীর ও কুঞ্জোদ্যানগুলি। নদীতরঙ্গে তিনি খেলা করেন, জীবধাত্রী হইয়া এখানে বিরাজ করেন ; এখানে সব কিছুর উপর কে যেন মায়ার পরশ বুলাইয়াছে ; হিন্দুর ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে ইতিমধ্যেই আমার বাসনা জন্মিয়াছে ; এই সুন্দর নদীর তীরে কুটীর এবং কুঞ্জ-কাননমধ্যে আমি থাকিতে চাই। এই ভদ্র এবং শান্ত হিন্দুদের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করিব, এই চিন্তায় আমি আনন্দ অনুভব করিতেছি। এই নদী-তীরস্থ সামান্য কুটীরগুলির যে সৌন্দর্য্য, ইংলণ্ডের পরম রমণীয় উদ্যানের সৌন্দর্য্য তাহার অর্দ্ধেকও নহে। স্থানীয় অধিবাসীরা উচ্চতায় নাতিদীর্ঘ, নাতিহ্রস্ব, তাম্রবর্ণ এবং অনেকে দেখিতে সুন্দর। সম্পূর্ণ সমতল এই দেশ, স্থানে স্থানে অরণ্যসঙ্কুল, মাঝে মাঝে জানালাবিহীন খড়ের ছাউনি-দেওয়া কাদায়-গাঁথা কুড়েগুলি ; গৃহপালিত পশুর প্রাচুর্য্য—দলে দলে চরমান তাহাদের দেখিলে চোখ জুড়ায়। মাথায় এবং কোমরে জড়ান এক এক টুকরা কাপড় ইহাদের পরিধেয় ; ফলমূল, মৎস্য ও অন্ন ইহাদের প্রধান আহার্য্য এবং ধূমপান প্রধান বিলাস···এই দেশ এবং ইহার অধিবাসীদের দেখিয়া আমরা সত্যই আনন্দ পাইতেছি ; নয়নমনোহর মূর্ত্তির সংখ্যা ইংরেজদের অপেক্ষা ইহাদের মধ্যে অধিক···।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ জানুয়ারি কেরীর শুভাগমনে শ্রীরামপুর মিশনের পত্তন হইল। দলের প্রথম টমাস ও প্রধান কেরীর কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ফাউন্‌টেন, গ্রাণ্ট ও ব্রান্সডন অল্পকালমধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হন। টমাসও এই গোষ্ঠীতে ঘনিষ্ঠ ভাবে যোগ দিতে পারেন নাই। কেবলমাত্র মার্শম্যান ও ওয়ার্ড দীর্ঘকাল জীবনের শেষ পর্য্যন্ত মিশনের কাজে কেরীর সহযোগিতা করিয়াছিলেন।

জোশুয়া মার্শম্যান ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ এপ্রিল উইল্‌টশায়ারের ওয়েষ্টবেরি লে'তে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা জন্‌ মার্শম্যান তন্তুবায়ের কাজ শিখিয়া কিছু কাল নাবিকবৃত্তি অবলম্বন করেন, পরে তাঁতের কাজ ও ধর্ম্মচর্চ্চায় মনোনিবেশ করেন। জোশুয়া মার্শম্যান বাল্যকালে ইতিহাস এবং বীর ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের জীবনী পড়িতে ভালবাসিতেন। তাঁহার পুস্তকপ্রীতি দেখিয়া কেটর নামক এক জন পুস্তকবিক্রেতা তাঁহাকে মাত্র ১৫ বৎসর বয়সে লণ্ডনে তাঁহার পুস্তকের দোকানে সহকারী (পিওন) নিযুক্ত করেন ; নানা বই পড়িবার লোভে এই কাজে প্রথমটা তাঁহার আনন্দ হইলেও শেষ পর্য্যন্ত তিনি দেখিতে পান, কাজের চাপে পড়িবার অবসর মিলে না। পাঁচ মাস কাজ করিয়া তিনি ওয়েষ্টবেরি লে'তে ফিরিয়া আসেন ও পৈতৃক তাঁতবোনার কাজে আত্মনিয়োগ করেন, বই-পড়ার বদঅভ্যাস বশতঃ তিনি তখন গল্প-উপন্যাস, কবিতা, ইতিহাস, ভূগোল, ভ্রমণকাহিনী প্রভৃতি যাহা কিছু হাতের কাছে পাইতেন, বিনা-বিচারে পড়িয়া ফেলিতেন। পরবর্ত্তী দশ বৎসর তাঁহার ধর্ম্মজীবনের শিক্ষানবিশীর কাল। ১৭৯১ সালে হ্যানা শেফার্ডের সঙ্গে তাঁহার বিবাহে তিনি ব্যাপটিষ্ট-মণ্ডলীভুক্ত হইবার সুবিধা পান, হ্যানা বিখ্যাত ব্যাপটিষ্ট পরিবারের সন্তান। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ব্রিষ্টলে একটি স্কুলের শিক্ষকতা গ্রহণ করেন এবং ব্যাপটিষ্ট একাডেমির

জোশুয়া মার্শম্যান

প্রেসিডেণ্ট ডক্টর রাইল্যাণ্ডের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। এখানেই তিনি লাটিন, গ্রীক, হিব্রু ও সিরিয়াক ভাষা শিক্ষা করিতে থাকেন। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাপটিষ্ট মিশনরী সোসাইটির 'পিরিয়ডিক্যাল অ্যাকাণ্টস'গুলি পাঠ করিয়া এবং তাঁহার ভূতপূর্ব্ব ছাত্র গ্রাণ্টের উৎসাহে তিনিও মিশনরীরূপে ভারতবর্ষ যাত্রা করেন। শ্রীরামপুরে মিশন প্রতিষ্ঠিত হইবার কাল হইতেই তিনি সস্ত্রীক শিক্ষা-বিভাগের তত্ত্বাবধান করিতে থাকেন ; চীনা ভাষায় বাইবেল অনুবাদ তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি। সংস্কৃত রামায়ণের ইংরেজী অনুবাদে তিনি কেরীর প্রধান সহকারী ছিলেন। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একবার স্বদেশ যাত্রা করেন এবং ইউরোপ ঘুরিয়া ১৮২৯ সালে শ্রীরামপুর প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৮৩৭ সালের ৫ই ডিসেম্বর শ্রীরামপুরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

উইলিয়ম ওয়ার্ড ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ অক্টোবর ডার্বিতে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবাবস্থাতেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়, মাতা পুত্রের শিক্ষার ব্যবস্থার ত্রুটি করেন নাই। বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়াই তিনি ডার্বির মিঃ ড্রুরির ছাপাখানায় কিছু কাল শিক্ষানবিশ ছিলেন। ইহার পরেই তিনি 'ডার্বি মার্কারি' নামক পত্রিকা সম্পাদনের ভার পান। এই সময়ে তিনি ফরাসী বিপ্লবের সাম্য ও স্বাধীনতাবাদের দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। ওয়ার্ড শেষ পর্য্যন্ত 'হাল্ অ্যাডভার্টাইজার'-এর সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং হালে অবস্থানকালেই (১৭৯৬, আগষ্ট) ব্যাপটিষ্ট মিশন দলে দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে জর্ণালিজম ও পলিটিক্‌সে তাঁহার বিতৃষ্ণা জন্মে ও তিনি এক বৎসরকাল বিখ্যাত প্রচারক ডক্টর ফসেটের শিক্ষাধীনে থাকেন। কেরীর ভারতবর্ষ-যাত্রার প্রাক্কালে এক দিন ওয়ার্ডের সহিত তাঁহার দেখা হয় এবং প্রয়োজন হইলে তিনি বাইবেল-মুদ্রণের কাজে এই যুবকের সাহায্য প্রার্থনা করিবেন, এই আশ্বাস দিয়া যান। স্বদেশে থাকিয়াই (১৭৯৯) ওয়ার্ড শুনিতে পান, বাংলা দেশে কেরী বাইবেলের অনুবাদ প্রস্তুত করিয়াছেন, কিন্তু উপযুক্ত মুদ্রাকরের অভাবে ধর্ম্মগ্রন্থ মুদ্রিত হইতেছে না। তিনি অবিলম্বে মিশনের কাজে আত্মসমর্পণ করেন। শ্রীরামপুর মিশন প্রেস সম্পূর্ণ তাঁহার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। শ্রীরামপুরের কাগজ-প্রস্তুতের কারখানাও তিনিই স্থাপন ও পরিচালন করেন। *Account of the Writings, Religion, and Manners, of the Hindoos including Translations from their Principal Works* (In four volumes, Serampore, 1811) তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। ওয়ার্ড বাংলা খুব ভাল না শিখিলেও খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্পর্কে কয়েকটি চটি প্রচার-পুস্তিকা বাংলায় লিখিয়াছিলেন । ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মার্চ শ্রীরামপুরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

১১ই জানুয়ারি (১৮০০) হইতে মিশনের কাজ সুরু হইল। ওয়ার্ড, ব্রান্সডন ও কেরীর প্রথম পুত্র ফেলিক্স ছাপাখানা লইয়া পড়িলেন। সুদক্ষ মুদ্রাকর ওয়ার্ডের পরিচালনায় অত্যল্পকালমধ্যে খিদিরপুর হইতে আনীত কাঠের মুদ্রাযন্ত্রটি মিশনবাড়ীর একটি কক্ষে স্থাপিত হইল এবং কলিকাতা হইতে ক্রীত হরফ সাজাইয়া ওয়ার্ড, ফেলিক্স,

ব্রান্সডন ও এক জন দেশী কম্পোজিটর নিউ টেষ্টামেণ্টের ম্যাথুলিখিত সমাচার কম্পোজ করিতে এবং কপি ও প্রুফ সংশোধনের জন্য অবিরত কেরীর পিছনে ধাওয়া করিতে লাগিলেন। ১৮ই মার্চ তারিখে প্রথম শীট (sheet) মুদ্রণের জন্য প্রস্তুত হইল। মার্চ মাসের গোড়ায় কলিকাতা হইতে পঞ্চানন আসিয়া শ্রীরামপুর মিশন-ছাপাখানার কাজে যোগদান করিয়াছিলেন; সুতরাং টাইপের অসুবিধা যেটুকু ছিল, তাহাও দূর হইয়াছিল। ওয়ার্ডের জর্ণালে ১৮ মার্চ তারিখে লিখিত আছে—

This day brother Carey took an impression at the press of the first page in Matthew.

সেদিন মিশন-গোষ্ঠীর উৎসাহের আর সীমা ছিল না। বাংলা দেশের আকাশ-আচ্ছন্ন-করা কুসংস্কারের মেঘ ধীরে ধীরে কাটিয়া আসিতেছে, ইহা মানস নেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়া সেদিন তাঁহারা উৎসব করিয়াছিলেন।

মিশনের সমস্ত বিভাগের কার্য্যকলাপের পরিচয় দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এই ছাপাখানার সহিতই আমাদের সম্পর্ক। সুতরাং এই ইতিহাসের ধারাই আমরা অনুসরণ করিয়া চলিব। ওয়ার্ডের জর্ণালে ১৬ই মে তারিখের লিখন এইরূপ—

This week we have begun to print the first sheet of the New Testament. We print 2,000 copies, of which 1,700 are on Patna paper, and 300 on English. We also print 500 of Matthew to give away immediately, which will nearly be an expense of paper only, and so will not cost more than two or three pounds.

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের গোড়ায় * 'মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত' প্রকাশিত হয়। শ্রীরামপুর মিশন-ছাপাখানা হইতে মুদ্রিত ইহাই সর্ব্বপ্রথম গদ্য-পুস্তক।† এই পুস্তকটি নানা দিক্ দিয়া উল্লেখযোগ্য। ইহার পাণ্ডুলিপি ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিতের সাহায্যে কেরী কর্ত্তৃক সংশোধিত ও মুদ্রাযন্ত্রের জন্য প্রস্তুত হইলেও টমাস ও রামরাম বসুর অনুবাদকে ভিত্তি করিয়াই এই পাণ্ডুলিপি রচিত হয়। রামরাম বসু, টমাস ও কেরীর নাম একত্র গ্রথিত করিয়া এই পুস্তকটি বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে চিরকাল স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ১২৫ পৃষ্ঠায় (ডিমাই আটপেজী) সম্পূর্ণ এই পুস্তকের একটি মাত্র কপি শ্রীরামপুর কলেজ-লাইব্রেরির বোর্ড-রুমে (শো-কেসে) রক্ষিত আছে। আমরা এই প্রবন্ধে উক্ত পুস্তকের ১৯ পৃষ্ঠার প্রতিলিপি মুদ্রিত করিলাম। ভাষার নমুনা এইরূপ—

* ওয়ার্ডের জর্ণাল, ১৫ই আগষ্ট, ১৮০০

—"and also 500 additional copies of Matthew for immediate distribution; to which are annexed, some of the most remarkable prophecies in the Old Testament respecting Christ. These are now distributing........"

† খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী কর্ত্তৃক গেয় কতকগুলি সঙ্গীত ও রামরাম বসুর 'হরকরা' (কবিতা) ইতিপূর্ব্বে মুদ্রিত হইয়াছিল। এই সঙ্গীতগুলির কয়েকটি কেরী কর্ত্তৃক রচিত।

দের কিং আবশ্যক আছে তাহা তোমারদের যাচনের
৯ পূর্ব্বে তোমারদের পিতা জানেন। অতএব তোমরা
এই মত প্রার্থনা করহ হে আমারদের স্বর্গস্থ পিতঃ
১০ তোমার নাম পূজ্য করিয়া মানা যাওক। তোমার
রাজ্য আইসুক তোমার ইচ্ছা যে মত স্বর্গেতে সেই
১১ মত পৃথিবীতে পালিত হওক। আমারদের দিব
১২ সিক আহার এই দিবসে দেও। ও যেমত আমরা
আপনারদের দায়ীরদিগকে ক্ষমা করিতেছি সেই
১৩ মত আমারদের দাওয়া সকল ক্ষমা করহ। এবং
আমারদিগকে পরীক্ষায় লওয়াইও না কিন্তু মন্দ
হইতে রক্ষা করহ কেননা রাজত্ব ও পরাক্রম ও
১৪ গৌরব তোমার সদা সর্ব্বক্ষণে আমেন। অতএব
যদি তোমরা মনুষ্যেরদের অপরাধ ক্ষমা করহ তবে
তোমারদের স্বর্গীয় পিতা তোমারদিগকেও ক্ষমা
১৫ করিবেন। কিন্তু যদি তোমরা মনুষ্যেরদের অপরাধ
না ক্ষমহ তবে তোমারদের পিতা তোমারদের অপ
১৬ রাধও ক্ষমা করিবেন না। অপর যখন তোমরা
উপবাস কর তখন কপটীবর্গের মত বিষণ্ণ বদন হইও
না কেননা তাহারা মনুষ্যেরদিগকে উপবাসী দেখাই
বার কারণ আপনারদের মুখ বিকৃতি করে সত্য
আমি তোমারদিগকে কহি তাহারা আপনারদের
১৭ প্রতিফল পাইয়াছে। কিন্তু যখন তুমি উপবাস করহ
তখন আপন মস্তকে তৈলমর্দন কর ও মুখপ্রক্ষালন
১৮ করহ। তাহাতে যেন তুমি মনুষ্যেরদের প্রতি উপবাসী

শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত মঙ্গল সমাচার মতিউর রচিত
পুস্তকের একটি পৃষ্ঠা। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে মুদ্রিত।

আবরহামের সন্তান দাউদ তাহার সন্তান যিশু খ্রীষ্ট তাহার পূর্ব্ব পুরুষাখ্যান।

আবরহাম হইতে য়িসহকের উদ্ভব ও য়িসহক হইতে য়াকুবের উদ্ভব·· ·· ···

অতএব তোমরা এই মত প্রার্থনা করহ হে আমারদের স্বর্গস্থ পিতঃ তোমার নাম পুণ্য করিয়া মানা যাউক। তোমার রাজ্য আইস্থক তোমার ইচ্ছা যে মত স্বর্গেতে সেই মত পৃথিবীতে পালিত হউক। আমারদের দিবসিক আহার এই দিবসে দেও। ও যেমত আমরা আপনারদের দায়ীর-দিগকে ক্ষমা করিতেছি সেই মত আমারদের দাওয়া সকল ক্ষমা করহ। এবং আমারদিগকে পরীক্ষায় লওয়াইও না কিন্তু মন্দ হইতে রক্ষা করহ কেননা রাজত্ব ও পরাক্রম ও গৌরব তোমার সদা সর্ব্বক্ষণে আমেন।

২৫ মে তারিখে রামরাম বসু আসিয়া মিশনরী-গোষ্ঠীতে যোগ দিলেন এবং খ্রীষ্টমহিমাসম্বলিত 'হরকরা,' 'জ্ঞানোদয়' প্রভৃতি কবিতা-পুস্তক রচনা করিয়া পুনরায় তাঁহাদের দলে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে কেরী বার্মিংহামের স্যামুয়েল পীয়াস´-লিখিত *A Letter to the Lascars* নামক পুস্তিকার অনুবাদ ও মুদ্রণ করেন।

উদাসীন টমাসও বীরভূমের চিনি ও নীলের কুঠি পরিত্যাগ করিয়া অক্টোবর মাসের শেষে "খ্রীষ্টের খোঁয়াড়ে প্রবেশেচ্ছু ফকির নামক বীরভূমের একটি মেষ"কে সঙ্গে লইয়া শ্রীরামপুরে উপস্থিত হইলেন। ফকির শ্রীরামপুরে কয়দিন অবস্থান করিয়া আত্মীয়দের শেষ দেখা দেখিবার জন্য টমাসের সঙ্গেই বীরভূমে গিয়া আর ফিরিল না। মর্ম্মাহত টমাস শ্রীরামপুরে ফিরিয়া আসিলেন। এইবারে ভগবান্ টমাসের প্রতি প্রসন্ন হইলেন। কৃষ্ণ পাল নামক এক জন ধর্ম্মপ্রাণ ছুতারের গঙ্গাতীরে পদস্খলনের ফলে হাত ভাঙিয়া যায়। ডাক্তার টমাসের চিকিৎসায় সে আরোগ্য লাভ করে এবং যীশুর প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাঁহার শরণাপন্ন হইতে স্বীকৃত হয়। ২৮ ডিসেম্বর মিশনের সম্মুখস্থ গঙ্গার ঘাটে কৃষ্ণ পাল কেরীর নিকট দীক্ষা লাভ করে। আনন্দে অর্দ্ধোন্মাদ টমাস সম্পূর্ণ উন্মাদ হইয়া যান। তাঁহাকে মিশনের একটি ঘরে বাঁধিয়া রাখিতে হয়। এই অবস্থায় ১৮০১ সালের ১৩ই অক্টোবর তারিখে দিনাজপুরে জন্ ফার্ণাণ্ডেজের গৃহে তাঁহার মৃত্যু হয়।

১৮০১ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি বাংলা নিউ টেষ্টামেণ্টের মুদ্রণ সম্পূর্ণ হয়। 'মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত' পুস্তকের ভাষা অল্পকালের মধ্যে সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিয়া কেরী এইরূপ দাঁড় করান—

এ আবরহামের সন্তান দাউদের সন্তান যেশু খ্রীষ্টের পূর্ব্ব পুরুষের পুস্তক—

আবরহাম জন্ম দিল য়িছ্হককে এবং য়িছ্হক জন্ম দিল যাঁকুবকে···

অতএব এই মত কামনা কর আমারদের পিতা তিনি স্বর্গে পবিত্র হউক তোমার নাম তোমার রাজ্য আগমন করুক তোমার ইচ্ছা হউক যেমন স্বর্গে তেমন পৃথিবীর উপরে অদ্য আমারদিগকে দিও আমারদের নিত্য ভক্ষ এবং মর্য্যাদা কর আমারদিগকে আমারদের দেনা যে মত আমরা মর্য্যাদা করি আমারদের দায় গৃহস্থের দিগকে এবং আনয়ন করিও না আমারদিগকে পরিক্ষায় কিন্তু পরিত্রাণ কর আমারদিগকে আপদ হইতে একারণ রাজ্য ও শক্তি ও নাম তোমার সদাকাল আমেন।

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, কেরী ভাষার বিন্দুমাত্র শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারেন নাই। বাইবেল-মুদ্রণের ইতিহাস কেরীর শেষ জীবন পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলেও প্রাসঙ্গিকজ্ঞানে এইখানেই বর্ণন করিতেছি, শ্রীরামপুর মিশনেরও ইতিহাস এইখানেই শেষ।

১৮০১ সালের ১ম সংস্করণ নিউ টেষ্টামেণ্ট ডিমাই আটপেজী আকার, কোনও পৃষ্ঠা-সংখ্যা নাই। ইহার ২য় সংস্করণে "১৮০৩" সাল ছাপা থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হইয়াছিল। ১৮০২ সালে ওল্ড টেষ্টামেণ্টের **The Pentateuch** অংশ, ১৮০৩ **Job, Song of Solomon, 1807 Isaiah-Malachi,** ১৮০৯ **Joshua—Esther**। ১৮০৭ **St. Luke's Gospel, Acts and Romans**। ১৮১১ সালে নিউ টেষ্টামেণ্টের তৃতীয় ফোলিও সংস্করণ, ২য় সংস্করণেরই পুনর্মুদ্রণ। ১৮১৩ **The Pentateuch** দ্বিতীয় সংস্করণ। ১৮১৬ নিউ টেষ্টামেণ্ট ৪র্থ সংস্করণ। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে এইরূপ ৭টি সংস্করণ হয়।

মার্ডকের ক্যাটালগ হইতে জানা যায় যে, 'হরকরা', 'জ্ঞানোদয়', লাশকারদের প্রতি ও বিভিন্ন খণ্ড বাইবেল ছাড়া মিশন প্রেস হইতে নিম্নলিখিত পুস্তিকাগুলিও মুদ্রিত হইয়াছিল—

ওয়ার্ডের The Missionaries' Address to the Hindoos, কেরী-কৃত অনুবাদ।

পীতাম্বর সিংহের The Sure Refuge (কবিতা)

কেরী-কৃত A Short Summary of the Gospel.

মার্শম্যান-কৃত Address to the Hindoos.

মার্শম্যান-কৃত The Difference : or Krishna & Christ compared.

Watt's Historical Catechismএর অনুবাদ (কবিতা)

পীতাম্বর সিংহের Good Advice ও The Enlightner.

ইত্যাদি এইরূপ অসংখ্য পুস্তিকা।

মৃত্যুর কিছু কাল পূর্ব্বেই কেরী সম্পূর্ণ বাইবেলের সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করেন, সংশোধনে পূরা ১২ বৎসর লাগিয়াছিল। ইহার মধ্যে নিউ টেষ্টামেণ্টের ৮ম সংস্করণ স্থান পাইয়াছে। কেরীর শেষ সংশোধিত ভাষা এইরূপ—

অতএব এই মত প্রার্থনা কর হে আমারদের স্বর্গস্থ পিতা তোমার নাম পবিত্ররূপে মান্য হউক। তোমার রাজ্যের আগমন হউক। যেমন স্বর্গে তেমন পৃথিবীতে তোমার ইষ্টক্রিয়া করা যাউক। অদ্য আমারদের নিত্য ভক্ষ্য আমারদিগকে দেও। এবং যেমন আমরা আপনারদের ঋণধারির দিগকে মাফ করি সেই মত আমারদের ঋণ মাফ কর। এবং আমারদিগকে পরীক্ষায় চালাইও না কিন্তু আমাদিগকে আপদ হইতে পরিত্রাণ কর কেন না সদা সর্ব্বক্ষণে রাজ্য ও শক্তি ও গৌরব তোমার। আমিন।

ভাষার দিক্ দিয়া কেরী যে শেষ পর্য্যন্ত বিশেষ উন্নতি করিয়াছিলেন, তাহা মনে হয় না। মুন্‌শী ও পণ্ডিতদের প্ররোচনা দিয়া ও উৎসাহিত করিয়া তিনি যাহা করিয়াছেন, তাঁহার নিজের কীর্ত্তি তাহার তুলনায় সামান্য। তথাপি তাঁহার নিউ টেষ্টামেণ্টের প্রথম সংস্করণ প্রকাশের ফলেই ১৮০১ সালের ৮ই এপ্রিল তারিখে ভারতের তদানীন্তন গবর্ণর-জেনারেল মার্কুইস ওয়েলেসলি কর্ত্তৃক পূর্ব্ববৎসরে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বঙ্গভাষার অধ্যাপক (teacher)-পদে নিয়োগের প্রস্তাব ডেভিড ব্রাউন মারফৎ তাঁহার নিকট পৌছে। ভ্রাতৃমণ্ডলীর সহিত পরামর্শ করিয়া কেরী ৪ঠা মে ঐ পদ গ্রহণ করেন। বাংলা গদ্য-সাহিত্যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের স্থান আমার পরবর্ত্তী অধ্যায়ের বিষয়।

আলোচনা

কৃষ্ণকীর্ত্তনের সুর ও তাল

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা হইলেও উহার সঙ্গীত-অংশের যাচাই বাস্তবিকই এ-যাবৎ হয় নাই। শ্রদ্ধেয় রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় উপরি-উক্ত প্রবন্ধে ('সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', ৪৫শ ভাগ, ১ম সংখ্যা) সেই অভাব পূরণ করিয়া আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

আলোচ্য পুঁথির প্রত্যেক পদের পূর্ব্বে রাগ-রাগিণী এবং প্রায়শঃ একাধিক তালের নির্দ্দেশ আছে। 'ভৈরবীরাগঃ ॥ একতালী ॥ রূপকন্বা ॥', 'বিভাষরাগঃ ॥ দণ্ডকঃ ॥ একতালী ॥ রূপকন্বা ॥', 'বিভাষরাগঃ ॥ রূপকং ॥ যতির্ব্বা ॥' প্রভৃতি উক্তি হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এক একটি পদ একটি মাত্র রাগ বা রাগিণী এবং উল্লিখিত তালসমূহের যে কোন একটিতে গেয়। অধিকন্তু প্রবন্ধ নামক গীতে আস্থায়ী আদি চারি তুকে পৃথক্ পৃথক্ তালের ব্যবহার বিহিত; এবং রাগমালা গীতের ভিন্ন ভিন্ন কলিতে বিভিন্ন রাগ-রাগিণীরও সন্নিবেশ স্বীকৃত। যাহা হউক একটু অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যালোচনা করিলে রাগ-রাগিণী ও তালের তথাকথিত বিস্তৃত সমাবেশজনিত অভিনবত্বের কুয়াশা অচিরে কাটিয়া যাইতে পারে। খুব সম্ভব একাধিক তালের উল্লেখই যত গণ্ডগোল বাধাইয়াছে। পুঁথিলেখকেরা সময় সময় কিরূপ বিভ্রাটে ফেলেন, ইহা তাহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

অতঃপর মিত্র মহোদয় রাগ-রাগিণী ও তাল-সন্নিবেশের যে কয়টি উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। পা হা ড়ী আ (পহাড়িকা বা পহাড়ী), গু জ্জ রী (গুর্জ্জরী), রা ম গি রী (রামকিরী, রামকলী বা রামকেলী), বি ভা ষ (বিভাষিকা, বিভাষী বা বিভাষা) প্রভৃতি রাগিণী সর্ব্বজন-সুপরিচিত। কো ড়া রাগিণী নারদ-সংহিতার মতে মল্লার রাগের অনুগতা। মা ল ব (মালবী) হনুমন্মতে শ্রীরাগের রাগিণী; কিন্তু নারদ-সংহিতায় মালব ছয় রাগের অন্যতম। অপ্রসিদ্ধ হইলেও ক্রী ড়া, কু ড় ক্ক প্রভৃতি তাল যখন সঙ্গীত-রত্নাকরে গৃহীত হইয়াছে, তখন তাহাই পর্য্যাপ্ত। অ ঢ় ক্ক লিপিকরপ্রমাদ। রূ প ক, ল গ্ন ক আদি তালও অপ্রধান নহে। জ য় জ য় জয় বা জয়শ্রী'র মধ্যে একটি তাল হইতে পারে। প্র কী র্ণ ক মনে হয়, শব্দটি সঙ্কীর্ণ তাল অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। মহোদয় উইলসন (H. H. Wilson) তাঁহার সংস্কৃত-ইংরাজি অভিধানে প্রকীর্ণক শব্দের একটি অর্থ দিয়াছেন, Any collection of heterogeneous objects not arranged under any distinct classes or heads। চি ত্র বা চি ত্র ক প্রাচীন তালের মধ্যে ধৃত হইয়াছে; এবং লিপিকরের লেখনী অগ্রে বিচিত্র রূপ ধারণ করিয়াছে ও উহার পরে দুই দাঁড়ি পড়িয়া গিয়াছে। দ ণ্ড ক সম্ভবতঃ একটি ছন্দাত্মক তাল। ধ্রুপদের একটি বিভাগই ছন্দ। রূ প ক থা নহে, শব্দটি রূপকন্বা। ইত্যাকার ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য গ্রন্থ-সম্পাদকও অবশ্য কম দায়ী নহেন। এখন অসঙ্কোচে

বলা যাইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'এ ব্যবহৃত সুর ও তালের কোনটিই অর্ব্বাচীন অথবা অশাস্ত্রীয় নয়।

প্রবীণগণের মুখে শুনিয়াছি, অসংখ্য রাগ-রাগিণী ও তালের অধিকাংশই কালের কুক্ষিগত হইয়াছে; কতক বা নামে মাত্র আছে এবং অল্প কতিপয় নামকের করিয়া কারবার চালাইতেছে। প্রাদেশিক প্রণালী ব্যতীত সাময়িক সংস্কার সত্ত্বে সঙ্গীতের একটি প্রকৃষ্ট পদ্ধতি ছিল, যাহার আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল মার্গ সঙ্গীত (Music par-excellence)। এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'এ সেই রীতি অনুসৃত হইয়াছে বলিয়াই অনুমান হয়। মিত্র মহাশয় শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'এ দেশীয় বা স্থানীয় রীতির কি পরিচয় পাইয়াছেন, আমরা জানি না। তাঁহার কথার ভাবে মনে হয়, চর্য্যাপদে তালের অনুল্লেখই যেন প্রাচীন ও সরল রীতির পরিচায়ক। তাহা হইলে বিদ্যাপতির পদাবলী, এমন কি রামানন্দ রায়ের জগন্নাথবল্লভ নাটক প্রভৃতিও গীতগোবিন্দের পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া পড়ে। কেন না, বিদ্যাপতির পদাবলী ও রাম রায়ের গীতে কেবল সরল সুরের উল্লেখ আছে, তালের উল্লেখ নাই। চর্য্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'এর মধ্যে ব্যবধানও ৪০০।৫০০ বৎসর। আর চর্য্যাপদ এক মরমী সম্প্রদায়ের সাধন-সঙ্গীত। সঙ্গীতের কলা-কৌশল প্রদর্শনের প্রকৃত ক্ষেত্রও উহা নহে। আমরা উপরে দেখাইয়াছি, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'এ ব্যবহৃত সুর ও তাল প্রাচীন এবং শাস্ত্রসম্মতও বটে। তবে উহার সঙ্গীত-প্রণালীর উপর দেশ-কালের প্রভাব আদৌ পড়ে নাই, বলাও সঙ্গত নয়। সুতরাং উক্ত রীতি বেশী প্রাচীন নহে, কিরূপে সমর্থিত হইতে পারে?

একাধিক তালের উল্লেখ থাকিলেও যখন এক একটি পদ একটি সুর ও একটি তালে গীত হইবার ইঙ্গিত রহিয়াছে, তখন শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ও গীতগোবিন্দে একই রীতির অনুবর্ত্তন করা হইয়াছে, বলা চলে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন অনেক স্থলে জয়দেবের একান্ত অনুকরণ বলিয়া সর্ব্বত্র যে তাহা করিতে হইবে ইহারও কোন মানে নাই। গীতগোবিন্দ অপেক্ষা বড়ু চণ্ডীদাসের গ্রন্থে ব্রজলীলার অনেকখানি বেশীই পাওয়া যায়। পণ্ডিতসমাজে একটা মতও প্রচলিত আছে যে, গীতগোবিন্দের রচয়িতা এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকার উভয়েরই উপজীব্য কোন এক প্রাচীনতর প্রাকৃত-অপভ্রংশ আদর্শ।

মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'এর সাঙ্গীতিক পদ্ধতি অনুসৃত না হইবার প্রধান কারণ, বইখানা মোটেই গীতিকবিতার নয়। লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল, মাধবাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, ভাগবতাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী প্রভৃতি গ্রন্থেও ঐরূপ সুরের উল্লেখ আছে, তালের নাই।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'এর পুঁথিখানা শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী হইলে অবশ্যই তাঁহার প্রসঙ্গ থাকিত। তাহা থাকা দূরে যাউক, একটা তিলক-ফোঁটার চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। বরং উহাতে এমন সব কথা আছে, যাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের আদপে অনুকূল নহে। এবং তাহাই পুঁথির প্রাচীনত্বের একতম প্রবল প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। যেহেতু পুঁথিখানা বিষ্ণুপুর অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে এবং খ্রীষ্টীয় ১৭শ শতকে বিষ্ণুপুর সঙ্গীতচর্চ্চার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করে, সেই হেতু পুঁথির দেশ বিষ্ণুপুর ও কাল ১৭শ শতক, সিদ্ধান্তটা কেমন যেন শোনায় না কি? বিষ্ণুপুর রাজগণের ইতিবৃত্ত হইতে জানা যায়, ১৩শ শতাব্দীর শেষ ও ১৪শ শতাব্দীর প্রারম্ভেও বিষ্ণুপুরে সঙ্গীতচর্চ্চা ছিল। তর্কের অনুরোধে না হয় মানিয়া লওয়া গেল, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থখানা চৈতন্য-পরবর্ত্তী। এখন জিজ্ঞাস্য, মহাপ্রভু চণ্ডীদাসের কোন্ পদগুলির আস্বাদ লইতেন? শ্রীসনাতন গোস্বামীর বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণীতে চণ্ডীদাসের দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের উল্লেখ আছে। ঐ দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের খোঁজ আমরা পাইয়াছি কি?

যদি তাহা পাইয়া থাকি, তবে কোন্ দুইটি পালা ? আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই পুরাতন সমস্যায় আসিয়া পড়া গেল। যাহা হউক, সম্যক্ সমাধান বাঞ্ছনীয়।

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসুর আবিষ্কৃত দুইখানি পুঁথিই কীর্ত্তনের তালের পুঁথি। সুতরাং তাহাতে মার্গ সঙ্গীতের তালের প্রত্যাশা করা যায় না। আর পুঁথি দুইখানিতে উদাহরণস্বরূপ বড়ু চণ্ডীদাসের পদ উদ্ধৃত করিবার উদ্দেশ্য, ওগুলিকে কীর্ত্তনে আদায়ের প্রয়াস। পূর্ব্বে বিদ্যাপতি, জয়দেব প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের গীতের ন্যায় বড়ু চণ্ডীদাসের পদও কীর্ত্তনে গীত হইত না। অনেকেই শুনিয়াছেন, পুরীর শ্রীমন্দিরে আ'জও গীতগোবিন্দ কীর্ত্তনে গাওয়া হয় না। রায় বাহাদুরের স্মরণ থাকিতে পারে, তিনিও প্রদেশান্তরে জয়দেবের গীত শুনিয়া আসিয়াছেন, নিশ্চিতই তাহা কীর্ত্তনে নয়।

মাঙ্গএ সুরতি দান সান দেই মাথে। (২য় সংস্করণ, পৃ. ৪০)

রায় বাহাদুর 'সান দেই মাথে' পাঠে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা জোর করিয়া মস্তক সঞ্চালন দ্বারা সঙ্কেত করা অর্থ করিয়াছি। বস্তুতঃ পাঠে ভুল নাই, অর্থও সোজা। উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিটির অর্থ, [শ্রীকৃষ্ণ] মস্তক দ্বারা ইঙ্গিত দিয়া সুরতি দান মাগিতেছেন। অন্যত্র,

মিছাই মাথাএ পাড়এ সান। (২য় সংস্করণ, পৃ. ২)

সা ন প্রা° সণ্ণা, সন্না (সংজ্ঞা) ; সিন্ধী সৈনা, হিন্দী সৈন। (১) বংশীধ্বনি-পূর্ব্বক কামাচার অনুজ্ঞা বা আমন্ত্রণ ; (২) হস্তাদি সঞ্চালন সহকারে আহ্বান-চেষ্টা ; (৩) হর্ষামর্ষাদির অভিব্যঞ্জক সঙ্কেত-ভেদ। পদাবলীতে যাইতে হইবে কেন, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'এ দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

ঘাঅত উপর ঘাঅ বাঁশীর সান। (২য় সংস্করণ, পৃ. ১৩৮)
কাহ্নাঞি বাঁশীত দিল সানে। (ঐ, পৃ. ১৩৯)

এখানে আরও কএকটি উদাহরণ সঙ্কলিত হইল।

শঙ্খদত্ত তারে কয় জলের পরীক্ষা নয়
　　পথিক সহিতে ছিল সান। (কবিকঙ্কণ)
দেই রামা হাত সান ধনপতি ত্যজি মান
　　দণ্ডবতে পড়িল চরণে। (ঐ)
দাণ্ডাইনু গিয়া আমি রাজ বিদ্যমানে।
নিকটে যাইতে রাজা দিল হাত সানে।
　　　　(কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ)
ওড়ন কাড়ে বলে সানে।
তাক লইয়া ঘর কেনে। (ডাক)

পত্রিকা-সম্পাদক মহাশয় এখন দেখিবেন, 'সান দেই' কথাটির কেমন চমৎকার অর্থসঙ্গতি হয়। বীরভূমে কেন, মুর্শিদাবাদ ও বর্দ্ধমানের পশ্চিমাংশ, বাঁকুড়া, মানভূম অঞ্চলেও ঘোমটা দেওয়া অর্থে সান কাড়া কথা চলিত আছে।

ভাষার বিচারে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ও প্রাপ্ত পুঁথি দুইখানির মধ্যে যদি বেশী দিনের ব্যবধান অনুমিত না হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে লিপিকর প্রাচীন রূপটি রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, পরীক্ষা প্রয়োজন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদের সহিত বৈষম্য শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-প্রচারে একটা প্রকাণ্ড অন্তরায় হইয়াছিল। আমরা পুঁথির অপ্রাপ্তি জন্ত অনুযোগ করিয়া থাকি বটে, কিন্তু কেহ কি বলিতে পারেন, প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথির যথোচিত অনুসন্ধান হইয়াছে? জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, শূন্তপুরাণ, চর্য্যাপদ প্রভৃতির পুঁথিই বা কয়খানা পাওয়া গিয়াছে? কীর্ত্তনের তালের পুঁথিদ্বয়ে উদাহৃত গীতগুলির মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভাবের অস্তিত্ব কল্পনা করিবার মত কিছু আমরা পাই নাই। বড়ু চণ্ডীদাসের কএকটি গীত কীর্ত্তনে আদায়ের প্রচেষ্টাই সঙ্কলন-পদ্ধতিতে প্রকাশ পায়। অতি-বড় দুঃসাহস কি না জানি না, 'এক কাল হইল মোর জমুনার জল।' ইত্যাদি বিকৃত, রূপান্তরিত, আধুনিকতাপাদিত পদটার মূল বড়ু চণ্ডীদাসের বলিয়াই আমরা মনে করি। পদটা বড়ু চণ্ডীদাসের নামে চালাইবার চেষ্টা নয়, দ্বিজ চণ্ডীদাসই 'একে কাল হৈল মোর নয়লি যৌবন।' পদে বড়ুকে অনুকরণ করিয়াছেন, বলা যায়। পদটা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'এ না থাকিবার কারণ, পুঁথি খণ্ডিত।

রায় বাহাদুর শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ও নবাবিষ্কৃত পুঁথির মধ্যে ভাবধারার সাম্য লক্ষ্য করিয়াছেন, করিবারই কথা। পুঁথি দুইখানিতে উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত পদগুলি বড়ু চণ্ডীদাসের (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'এর) পদের নকল। নকলে অল্প-শিক্ষিত পুঁথি-লেখক দ্বারা যাহা বা যেমনটি হয়, তাহার অতিরিক্ত ভাবধারার বৈচিত্র্য বা বৈলক্ষণ্য ইত্যাদি কামনা করা যায় না।

আলোচনার সার্থকতা আপেক্ষিক, মীমাংসাও বাহিরের বস্তু নহে।

প্রত্যুত্তর

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ আমার উপরিউক্ত প্রবন্ধের যে 'আলোচনা' করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে পরিষৎ-পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয় আমার বক্তব্য বলিবার সুযোগ দিয়া আমার ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

বসন্ত বাবু বলেন, প্রবন্ধ ও রাগমালা গীতের "ভিন্ন ভিন্ন কলিতে বিভিন্ন রাগ রাগিণীরও সন্নিবেশ স্বীকৃত। যাহা হউক, একটু অভিনিবেশ সহকারে পর্যালোচনা করিলে রাগ রাগিণী ও তালের তথা-কথিত বিস্তৃত সমাবেশজনিত অভিনবত্বের কুয়াশা অচিরে কাটিয়া যাইতে পারে।" তার পরক্ষণেই বলিতেছেন "খুব সম্ভব একাধিক তালের উল্লেখই যত গণ্ডগোল বাধাইয়াছে। পুথিলেখকেরা সময় সময় কিরূপ বিভ্রাটে ফেলেন, ইহা তাহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।" কিন্তু এই দুইটি উক্তি যে কতখানি পরস্পর-বিরুদ্ধ, তাহাও একটু অভিনিবেশ সহকারে পর্যালোচনা করিলে বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় অনায়াসেই বুঝিতে পারিতেন। কারণ, যদি 'গণ্ডগোল বাধাইয়াছে' ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে 'তথাকথিত' শব্দের ব্যবহার চলে না। এবং পুথি-লেখক যদি 'বিভ্রাটে ফেলিয়া থাকেন' তাহা হইলে একটু অভিনিবেশে তাহার কুয়াশা কিরূপে কাটিতে পারে? একখানি তথাকথিত প্রাচীন পুথি যখন আমাদের সম্বল, তখন তাহারই সাহায্যে আমাদের সত্যনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

এক্ষেত্রে এক মূল পুথির কল্পনা করিয়া লিপিকারের স্কন্ধে দোষ চাপাইবার চেষ্টা করিলে তর্ক অগ্রসর হইতে পারে না এবং সত্যনির্ণয়ের চেষ্টাও ক্ষুণ্ণ হয়। কিন্তু কৃষ্ণকীর্তনের পুথিখানি যে নকল, আমার প্রবন্ধ বাহির হওয়ার পরে বসন্ত বাবুর এই স্পষ্ট স্বীকৃতি দেখিয়া আন্তরিক সুখী হইলাম। পুথিখানির বয়স যে ২৫০।৩০০ বৎসরের অধিক নহে এবং উহাই যে তাহার রচনাকালও বটে, এই সন্দেহই আমরা বরাবর করিয়া আসিতেছি।

বসন্ত বাবু প্রবন্ধ সঙ্গীত সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে। "প্রবন্ধ নামক গীতে আস্থায়ী আদি চারি তুকে পৃথক্ পৃথক্ তালের ব্যবহার বিহিত"; ইহা তিনি কোথায় পাইলেন? প্রবন্ধ সঙ্গীতের চারিটি অংশ আছে—যথা উদ্‌গ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুব ও আভোগ।

প্রবন্ধাবয়বো ধাতুঃ স চতুর্ধা নিরূপিতঃ।
উদ্‌গ্রাহঃ প্রথমস্তত্র ততো মেলাপকধ্রুবৌ॥
আভোগশ্চেতি তেষাং চ ক্রমাল্লক্ষ্মাভিদধ্মহে।—সঙ্গীতরত্নাকর

ধাতু অর্থে গেয়, অর্থাৎ যাহা গান করিতে হয়। তাহার প্রথমাংশ অর্থাৎ 'ধরতা'কে উদ্‌গ্রাহ বলে। গানের মধ্যে যাহা নিত্য, তাহাকে বলে ধ্রুব। উদ্‌গ্রাহ এবং ধ্রুবের মধ্যে যে অংশ, তাহাকে মেলাপক বলে। সব শেষের অংশের নাম আভোগ।

উদ্‌গ্রাহঃ প্রথমো ভাগস্ততো মেলাপকঃ স্মৃতঃ।
ধ্রুবত্বাচ্চ ধ্রুবঃ পশ্চাৎ আভোগস্তন্তিমো মতঃ।—সঙ্গীতরত্নাকর

ধ্রু কলি ও আভোগের মধ্যে যে অংশ থাকে, তাহাকে 'অন্তরা' বলে।

ধ্রুবাভোগান্তরে জাতো ধাতুরন্যোঽন্তরাভিধঃ।—ঐ

এইরূপ চতুস্কন্ধ সঙ্গীতের বিভিন্ন অংশ যে ভিন্ন ভিন্ন সুর তালে গীত হইত, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। এখনও মার্গ সঙ্গীতে স্থায়ী অন্তরা আভোগ সঞ্চারী আছে। কিন্তু সেগুলি একই সুরে ও একই তালে গীত হয়।

আমরা যত দূর জানি, তাহাতে 'তাল ফেরতা' আছে শুধু কীর্তনে। কিন্তু কীর্তনের বর্তমান পদ্ধতি মহাপ্রভুর পরবর্তী কালে উদ্‌ভাবিত হইয়াছিল। সুতরাং সেদিক্ দিয়াও কৃষ্ণকীর্তনের বয়স বেশী হইতে পারে না। বসন্ত বাবু বিভাষ, মালকোষ, পাহাড়ী, কোড়া প্রভৃতি কয়েকটি সুপরিচিত রাগরাগিণীর শাস্ত্রমূলকতা দেখাইয়া বলিতেছেন, "এখন অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এ ব্যবহৃত সুর ও তালের কোনওটিই অর্বাচীন অথবা অশাস্ত্রীয় নহে।" এরূপ উক্তি একেবারেই যুক্তি-সঙ্গত নহে। কারণ, তিনি কোনওটিকে বলিতেছেন লিপিকরপ্রমাদ, কোনওটিকে 'সম্ভবতঃ', 'হইতে পারে' ইত্যাদি পর্যায়ে ফেলিয়াছেন, অথচ তাঁহার 'অসঙ্কোচে' বলিতে দ্বিধা হইতেছে না—ইহা কিরূপে সম্ভবে?

কৃষ্ণকীর্তনের সুর ও তালের মধ্যে যেগুলির সন্ধান পাইয়াছি, তাহা আলোচ্য প্রবন্ধে আমি দিতে ত্রুটি করি নাই। যেগুলির সন্ধান আমি পাই নাই, তাহারই প্রতি বিশেষজ্ঞগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম। বসন্ত বাবু সে সম্বন্ধে কোনও আলোকপাত করিতে পারেন নাই।

'রূপকথা' কি বস্তু? আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। বসন্ত বাবু বলিয়াছেন, 'রূপকম্বা' হইবে। কিন্তু পুথিতে কি আছে? 'রূপকথা' না রূপকম্বা? যদি লিপিকারের দোষে রূপকম্বা রূপকথায়

রূপান্তরিত হইয়া থাকে, তবে তিনি নিজের স্কন্ধে দোষ চাপাইতে প্রয়াসী কেন? কেননা, তিনি বলিয়াছেন, "ইত্যাকার ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য গ্রন্থ-সম্পাদকও কম দায়ী নহেন।" এত দিন আমাদের ধারণা ছিল যে, কৃষ্ণকীর্তন একখানি সুসম্পাদিত গ্রন্থ, কিন্তু বসন্ত বাবুর এইরূপ অপ্রত্যাশিত স্বীকারোক্তিতে আমরা উদ্বিগ্ন না হইয়া পারি না। কিন্তু তিনি যে 'রূপকস্বা'কে রূপকথায় পরিণত করিয়াছেন, ইহা কিরূপে বিশ্বাস্য হইতে পারে? গ্রন্থখানিতে অন্ততঃ দুইবার 'যতির্ব্বা' আছে, কাজেই তাঁহার পক্ষে তুলনা করা কঠিন ছিল না।

'জয়জয়' কি? জানিতে চাহিয়াছিলাম। বসন্ত বাবু "জয় বা জয়শ্রীর মধ্যে একটি তাল হইতে পারে" বলিয়াছেন। কিন্তু কোনো প্রমাণ দেওয়া সঙ্গত মনে করেন নাই। 'লগ্নক তাল অপ্রসিদ্ধ নহে'—তাহাই বা তিনি কোথায় পাইলেন? কোনও একটি বিষয় যখন বিবদমান, তখন প্রমাণপ্রয়োগ ব্যতীত কিছু বলা সঙ্গত নহে।

'প্রকীর্ণক' শব্দের যে অর্থ তিনি উইলসনের অভিধান হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন (heterogeneous বা miscellaneous) তাহার সমালোচনা আমি আমার মূল প্রবন্ধে করিয়া দেখাইয়াছি যে, ঐ অর্থ সমর্থিত হইতে পারে না। যেখানে তালমানের যথেষ্ট বিবরণ দেওয়া আছে, সেখানে 'বিষয়-বিভাগেন বিনা প্রবৃত্তত্বম্' (সঙ্গীতরত্নাকর) প্রকীর্ণকের অবকাশ কোথায়? বসন্ত বাবু বলেন, "প্রকীর্ণক মনে হয় শব্দটি 'সঙ্কীর্ণ তাল' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।" প্রকীর্ণ অর্থে সঙ্কীর্ণ, ইহা সাধারণ বুদ্ধিগম্য নহে। তার পর 'সঙ্কীর্ণ তাল' অর্থ কি? সঙ্কীর্ণ বা মিশ্র রাগ বুঝা যায়, তাল আবার সঙ্কীর্ণ হইতে পারে না কি? যদি প্রকীর্ণক অর্থ সঙ্কীর্ণ তাল হয়, তাহা হইলে 'কাব্যোক্তি প্রকীর্ণক' (কৃ-কী, ৩৮০ পৃ.) শব্দের অর্থ কি হইবে, তাহা কি বসন্ত বাবু ভাবিয়া দেখিয়াছেন?

বিন্দুমাত্র প্রমাণ-প্রয়োগ না দিয়া বসন্ত বাবু অবলীলাক্রমে বলিতেছেন, "প্রাদেশিক প্রণালী ব্যতীত সাময়িক সংস্কার সত্ত্বেও সঙ্গীতের একটি প্রকৃষ্ট পদ্ধতি ছিল, যাহার আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল মার্গ সঙ্গীত (music par excellence) এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এ সেই রীতি অনুসৃত হইয়াছে বলিয়াই অনুমান হয়।" যে বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারসাপেক্ষ, তাহাকে 'অনুমান হয়' বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলে সত্যের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হইয়া পড়ে। সমস্যাই এখানে এই যে, ঐ পুথিতে এমন সব সুর ও তালের সন্ধান পাইতেছি, যাহা মার্গ অথবা দেশী আখ্যাযুক্ত সঙ্গীতের মধ্যে মিলিতেছে না। সেই জন্য আমি আমার মূল প্রবন্ধে বলিয়াছি যে, সম্ভবতঃ কৃষ্ণকীর্তন বাঁকুড়া অঞ্চলের তৎকাল-প্রচলিত কোনও সাম্প্রদায়িক পদ্ধতির ইঙ্গিত দিতেছে।

আমি ঐ প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, প্রাচীন কোনও পুথিতে কৃষ্ণকীর্তনের ন্যায় সুর-তালের বিস্তৃত উল্লেখ নাই। চর্যাপদ, গীতগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণবিজয় প্রভৃতি গ্রন্থে এরূপ পদ্ধতি অনুসৃত হয় নাই। তাহার উত্তরে বসন্ত বাবু বলিতেছেন, গীতগোবিন্দে সুর ও তালের উল্লেখ আছে, কিন্তু বিদ্যাপতির পদাবলীতে, রামরায়ের গীতে শুধু রাগরাগিণীর সরল উল্লেখ আছে, তাহা হইলে কি ঐগুলি জয়দেবের পূর্ববর্তী? বস্তুতঃ আমি এরূপ বলি নাই যে, সরল হইলেই তাহা প্রাচীন বা প্রাচীনতর হইবে। আমি বলিয়াছি যে, চর্যাপদে রাগরাগিণীর, গীতগোবিন্দে একটি রাগিণী বা একটি রাগিণী ও তালের উল্লেখ আছে। কোথায়ও কৃষ্ণকীর্তনের অত্যদ্ভুত রীতি দেখিতে পাই না। ইহার উত্তর কি? সঙ্গীতের এই অভিনব ধারা কৃষ্ণকীর্তন পুথির বয়স নির্দেশে সহায়তা করিতেছে। এবং মণীন্দ্রমোহন

বসু মহাশয়ের আবিষ্কৃত পুথি হইতেও এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোকপাত হইতেছে। ঐ পুথির আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, উহাতেও সুর-তালের প্রতি ঐকান্তিক মনোযোগ (emphasis) দেওয়া হইয়াছে। এই জন্যই আমি বলিয়াছি যে, কৃষ্ণকীর্তন ও ঐ পুথি দুইখানির প্রাচীনতর পুথির মধ্যে কালের ব্যবধান খুব বেশী নহে। এই দুইখানি পুথি ব্যতীত আর কোথায়ও কৃষ্ণ-কীর্তনের পদ অবিকল উদ্ধৃত হয় নাই। সুর-তালের উদাহরণ হিসাবে একমাত্র বড়ু চণ্ডীদাসের পদই ঐ পুথিতে উদ্ধৃত হইয়াছে। আমার বোধ হয়, সম্প্রদায়-বিশেষের মধ্যে ঐ গীতগুলির অনুশীলন ছিল। এই প্রকার সাম্প্রদায়িকতা স্বীকার না করিলে কৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গে ঐ পুথির সম্বন্ধ নির্ণয় কঠিন হইয়া পড়ে।

বসন্ত বাবু অন্য একটি সম্বন্ধ আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি বলেন, কৃষ্ণকীর্তনে "মার্গ সঙ্গীত অনুসৃত হইয়াছে" আর মণীন্দ্রবাবুর পুথিতে সেই "পদগুলিকে কীর্তনে আদায়ের প্রয়াস"। "বিদ্যাপতি জয়দেব প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের গীতের ন্যায় বড়ু চণ্ডীদাসের পদও কীর্তনে গীত হইত না।" ইহা তিনি কোথায় পাইলেন? আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে, এখন কীর্তন যে-প্রণালীতে গীত হয়, পূর্বে সেরূপ নিশ্চয়ই হইত না। কারণ, বর্তমান কীর্তন-সঙ্গীতরীতি মহাপ্রভুর পরবর্তী সময়ে উদ্‌ভাবিত হইয়াছে। তাঁহার পূর্বে জয়দেব ও বিদ্যাপতির পদাবলী কোন্ প্রণালীতে গীত হইত, তাহা জানিবার উপায় নাই। কৃষ্ণকীর্তনের অনেকগুলি সুর ও তাল কীর্তনে বহু পরিমাণে ব্যবহৃত হয়; সুর যথা: বিভাষ, শ্রী, ধানশী (ধানুষী), মল্লার, রামকেলি (রামগিরি), বেলাবলী, বরাড়ী, কেদার, ললিত, বসন্ত, ভৈরবী ইত্যাদি; তাল যথা: রূপক, একতালী, যৎ (যতি), অষ্টতাল (আঠতাল) ইত্যাদি। প্রাপ্ত পুথি দুইখানিতে কৃষ্ণকীর্তনের অনেকগুলি সুর ও তাল আছে; সুর যথা: পাহিড়া, বরাড়ি (বাড়ারি), ধানশী, বসন্ত, শ্রী ইত্যাদি। তাল যথা: রূপক, যতি (জোতি)। এই দুইখানি পুথিতে আবার এমন সুর ও তাল পাইতেছি, যাহা কীর্তনে অপরিজ্ঞাত; সুর যথা: বাগেশ্রী (বাগশ্রী), পাহিড়া ইত্যাদি। তাল যথা: চুটখিলা (বা ছোটখিলা), আলুটি, অপূর্ব কলিকা, জলদকান্তি ইত্যাদি। সুতরাং ইহা কিরূপে বলা যাইতে পারে যে, কৃষ্ণকীর্তনের মার্গসঙ্গীত পরবর্তী পুথিতে কীর্তনে আদায় করিবার চেষ্টা হইয়াছে? আমার বোধ হয়, বসন্ত বাবু তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ অনুসন্ধিৎসা এক্ষেত্রে প্রয়োগ করিলেই তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিতেন।

অতঃপর সঙ্গীতের দিক্ ছাড়িয়া তিনি মামুলি যুক্তির আশ্রয় লইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের "পরবর্তী হইলে কৃষ্ণকীর্তন-এ অবশ্যই তাঁহার প্রসঙ্গ থাকিত। তাহা থাকা দূরে যাউক, একটা তিলক কৌটার চিহ্ন পর্যন্ত নাই।" 'তিলক কৌটা'র চিহ্ন না থাকিলেও খোল-করতালের অভাব নাই। খোল করতাল মহাপ্রভুর নামের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। কোনও গ্রন্থে চৈতন্যের নামগন্ধ না থাকিলেই যে তাহা তাঁহার পূর্ববর্তী, এরূপ বলিতে পারা যায় না। ভবানন্দের হরিবংশেও ত মহাপ্রভুর নামগন্ধ নাই; তবে তাহাও কি চৈতন্য-পূর্ববর্তী বলিব? এমন হইতে পারে যে, যে-কারণে হরিবংশে 'তিলক কৌটার চিহ্ন' নাই, সেই কারণেই হয়ত কৃষ্ণকীর্তনেও নাই। পক্ষান্তরে কৃত্তিবাসের রামায়ণে এবং মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে তিলক-কৌটার চিহ্ন বর্তমান, সেগুলিকে কি আমরা চৈতন্য-পরবর্তী বলিব? আমার বোধ হয়, বিশ্ববল্লভ মহাশয় একটু প্রণিধান করিলেই বুঝিতে পারিতেন যে, ভবানন্দের হরিবংশ এবং চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তন, উভয় গ্রন্থই চৈতন্যবর্জিত সম্প্রদায়-বিশেষের গ্রন্থ। এরূপ সম্প্রদায়ের অভাব এ দেশে পূর্বেও ছিল না এবং এখনও হয়ত নাই।

হরিবংশে এবং কৃষ্ণকীর্তনে যে ভাবধারা দেখিতে পাই, তাহার সঙ্গে তিলক-ফোঁটার তাদৃশ সামঞ্জস্য নাই। এই সম্প্রদায়ের মতবাদ চৈতন্যধর্ম-বিরোধী। ইহাদের মতে একমাত্র কাম্য—যৌন সম্মিলন ; তাহাতে সম্বন্ধ-বিচারের প্রয়োজন নাই। ধর্মাধর্ম পাপপুণ্য এ সবই মিথ্যা, লোকাচার মাত্র।

তোহ্মার বচন রাধা সবই আতত।
পরদারে পাপ নাই মুনির সমত॥
* * *
নিজ পর নারী দোষ নাহিক সংসারে।
যত সতীপণ সব মিছা জান তারে॥
—কৃষ্ণকীর্তন, ৬৬ পৃ. (১ম সং)

নিজপর নারি দোশ নাহিক শংশারে।
জত শতিপনা শব মিছা জান তারে।
—প্রাচীনতর পুথি (সাঃ পঃ পত্রিকা, পৃঃ ১৯৪)

কৃষ্ণকীর্তনে কৃষ্ণ মাতুলানীর অঙ্গসঙ্গ করিতে ব্যস্ত। ভবানন্দের কৃষ্ণ রাধিকার ননদিনী অর্থাৎ যশোদার ভগ্নী (তথা কৃষ্ণের মাসী) মহোদার সহিত রতি উপভোগ করিতেছেন। (হরিবংশ—৪৪ পৃ.) বসন্ত বাবু ইহার পরও তিলক-ফোঁটার প্রত্যাশা করেন ?

আরও তুলনা করুন :

প্রথম প্রহর রাত্রি ফুটিল লবঙ্গ।
যৌবন থাকিতে প্রিয়া কর রস রঙ্গ॥
ভাল কিবা মন্দ বোলি মনে ভাবি চাও।
যার থাকে ধনকৌড়ি খাও আর বিলাও॥—হরিবংশ, ৩৪ পৃ.

মাতুলানী-লঙ্ঘন যে বিশেষ দোষের নহে, তাহা প্রমাণ করিবার জন্ম ভবানন্দ বহু উদাহরণ জোগাড় করিয়া শেষে বলিতেছেন :

বাপ পুত্র খুড়া ভাই ছোট ভাইয়ে লঙ্ঘে।
সকল গোষ্ঠীর রতি এক জনার সঙ্গে॥—ঐ, ৯৮ পৃ.

হরিবংশেও বড়াই ঘটকী। একটু প্রভেদ এই যে, ভবানন্দের বড়াই বুড়ী নিজেও কামমোহিতা।

গোবিন্দের রূপ দেখি কন্দর্প সমান।
কামে জর্জরিত বড়াই হত হৈল জ্ঞান॥—ঐ, ২৩ পৃ.

বসন্ত বাবু একটু অভিনিবেশ সহকারে বিচার করিলে দেখিতে পাইবেন যে, চৈতন্যের প্রসঙ্গাভাব প্রাচীনত্বের লক্ষণ বিবেচিত হইতে পারে না। তাঁহার অবগতির জন্য আরও কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি :

(১) চৈতন্য-সম্প্রদায়ে ভাগবতকে প্রামাণ্য বলিয়া গণ্য করা হয়। 'ভাগবতং প্রমাণমমলম্।' কৃষ্ণকীর্তনে কবি ভাগবতের অনুসরণ করেন নাই। ঐ গ্রন্থে কেশাবতারত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, যাহা 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং' এই বাক্যের বিরোধী। যমলার্জুনকে কংশচর অসুর বলা হইয়াছে। ইহা ভাগবতের মতবিরুদ্ধ। কৃষ্ণকীর্তন যে ভাগবতের পূর্ববর্তী, এ কথা ত কেহ বলেন না।

(২) কৃষ্ণকীর্ত্তনের কৃষ্ণ রাধাকে যেরূপ শালী, পামরী, ছিনারী, আছিদরী ইত্যাদি গালি দিয়াছেন, তাহার নিদর্শন প্রাচীন সাহিত্যে মিলে কি ?

(৩) দানঘাটের কলহে যে ভাব দেখিতে পাই, তাহার অনুরূপ কোনও প্রামাণিক গ্রন্থেই নাই। কৃষ্ণ রাধার উপর বলপ্রয়োগে উদ্যত হইলে রাধা বলিতেছেন যে, আমরা ষোল শত গোয়ালিনী বিকে (বিক্রয়ার্থ) যাই ; তোমাকে 'মাগু কিলে কিলাআঁ মারিবো তোহ্মা বাটে।' কৃষ্ণ তাহার উপযুক্ত প্রত্যুত্তর করিতেছেন :

ছাওয়াল না দেখ মোরে মাথা ঘোড়া চুলে।
মুণ্ডে মুণ্ডে ডুসাঞাঁ মারিবোঁ তোহ্মা হেলে ॥

এরূপ কিলানো, ডুসানো ইত্যাদি রুচির দিক্ দিয়া যাহাই হউক, আধুনিকতাগন্ধী মনে না করিয়া পারা যায় না।

(৪) রাধাকে কৃষ্ণ শেষ পর্য্যন্ত মারিয়াই ফেলিলেন।

বাম হাতে ধনুক ডাহিণ হাথে বাণ।
রাধার হিআত মাইল সুদৃঢ় সন্ধান ॥

তার পর কৃষ্ণ ঝাড় ফুঁক করিয়া তাঁহাকে পুনরায় বাঁচাইয়া দিলেন বা তাঁহার মূর্চ্ছাপনোদন করিলেন। ইহাও প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিত্যে পাওয়া যায় না।

(৫) শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গেলে প্রোষিতভর্ত্তৃকা শ্রীরাধার বিরহ-বর্ণনা পদাবলী সাহিত্যে দেখিতে পাই। কিন্তু কৃষ্ণকীর্ত্তনে 'রাধা বিরহ' সম্পূর্ণ অন্যরূপ। মদনবাণে জর্জরিতা রাধা কৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গ করিবার জন্য ব্যাকুল। ইহাই রাধাবিরহ। কৃষ্ণ তাঁহার কাকুতি মিনতি প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিতেছেন, 'আমি এখন যোগে মন দিয়াছি, মনপবন স্থির করিতে ব্যস্ত (প্রাণায়াম ?), আমাকে ও-সব কথা বলিও না।' কোনও প্রাচীন গ্রন্থে এরূপ অদ্ভুত ব্যাপারের উল্লেখ আছে কি ?

(৬) এই বিরহের পর ক্ষণিক মিলনান্তে কৃষ্ণের অকারণ মথুরা-প্রস্থানের কথা আছে। রতিশ্রান্তা নায়িকা যখন নায়কের উরুতে মস্তক রক্ষা করিয়া নিদ্রাগতা, সেই অবসরে নায়ক উঠিয়া মথুরায় চম্পট দিলেন। বড়াই বুড়ী তখন তাঁহাকে গাছের ডালে ডালে খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। প্রাক্-চৈতন্য যুগের সাহিত্যে এরূপ ব্যাপার কোথাও পাওয়া যায় কি ?

এরূপ দৃষ্টান্ত অধিক দিবার প্রয়োজন নাই। কারণ, বসন্ত বাবু নিজেই বলিতেছেন যে, "কৃষ্ণকীর্ত্তনে এমন সব কথা আছে, যাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের আদপে অনুকূল নহে। এবং তাহাই পুঁথির প্রাচীনত্বের একতম প্রবল প্রমাণ।" এইরূপ উক্তির মূলে একটি ভ্রান্ত ধারণা রহিয়াছে। এবং তাহা এই যে, মহাপ্রভুর পূর্বে বৈষ্ণব ধর্ম বা বৈষ্ণব সাহিত্যের অস্তিত্ব ছিল না। বিদ্যাপতি শ্রীচৈতন্যের দ্বারা প্রভাবিত না হইয়াও যদি লিখিতে পারিয়া থাকেন, 'মাধব হম পরিণাম নিরাশা', 'হে হরি বন্দোঁ তুয়া পদ-নায়' এবং এইরূপ বহু কবিতা, তাহা হইলে কৃষ্ণকীর্ত্তনের কবি চৈতন্য-পূর্ববর্তী হইলে, তাঁহার নিকটই বা আমরা সে ভাব প্রত্যাশা করিব না কেন ? বিদ্যাপতির অবিসংবাদিত পদগুলির সহিত কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা ও ভাব তুলনা করিলে, বসন্ত বাবুর 'একতম প্রবল প্রমাণ' টিকিতে পারে না। মহাভারত, ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত বা জয়দেব, ইহাদের কাহারও না কাহারও অনুসরণ করিলে প্রাচীনত্বের দাবী সমর্থিত হইতে পারিত। পক্ষান্তরে কৃষ্ণকীর্ত্তনে এমন শব্দ আছে, এমন ছন্দ আছে, এমন পদ আছে, যাহা পরবর্তী সাহিত্যের সাক্ষ্য দিতেছে। বৈষ্ণবশাস্ত্রবিরোধী

বৈষ্ণবসাহিত্যবহির্ভূত এবং সর্বকালে মানবের রুচিবিগর্হিত ব্যাপার আছে বলিয়াই আমার ধারণা যে, কৃষ্ণকীর্তন চৈতন্য-পরবর্তী কোনও সম্প্রদায়-বিশেষের গ্রন্থ। (এবং সঙ্গীতের দিক্ দিয়াও সেই মত সমর্থিত হইতেছে।)

'মাঙ্গে সুরতি দান সান দেই মাথে।'—এই কলিটির অর্থ লইয়া আমি আমার প্রবন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলাম। পত্রিকাধ্যক্ষ মহাশয় পাদটীকায় তাহার একটি ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তিনি মনে করেন, "উত্তমপুরুষে 'দেই' ক্রিয়ার প্রয়োগ সেকালের সাহিত্যে যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে 'সান দেই' কথাটির চমৎকার অর্থসঙ্গতি হয়।" কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, বসন্ত বাবু এই অর্থটির সুখ্যাতি করিলেও তিনি তাঁহার পূর্বপ্রদত্ত অর্থই সমর্থন করিতে চাহেন। বসন্ত বাবু 'দেই'কে অসমাপিকা ক্রিয়া ধরিয়া অর্থ করিতেছেন 'মস্তক সঞ্চালন করিয়া'। বস্তুতঃ প্রাচীন সাহিত্যে এইরূপ প্রয়োগই প্রসিদ্ধ। কিন্তু বসন্ত বাবুর পাঠ যদি প্রকৃত হয়, তাহা হইলে মণীন্দ্রবাবুর পুথিতে অন্যরূপ পাঠ আসিল কেমন করিয়া? মণীন্দ্র বাবুর উভয় পুথিতে 'সান' স্থলে 'অস্থানে' এবং 'মাথে'র স্থলে 'হাথে' আছে।

বসন্ত বাবু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, 'মহাপ্রভু চণ্ডীদাসের কোন্ পদগুলির আস্বাদ লইতেন?' এ প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্বে কৃষ্ণকীর্তনের কালনির্ণয় করা আবশ্যক। যদি কৃষ্ণকীর্তন মহাপ্রভুর পরবর্তী হয়, তাহা হইলে তিনি যে কৃষ্ণকীর্তনের পদ আস্বাদন করিতেন, একথা উঠিতেই পারে না।

শ্রীসনাতন গোস্বামী তাঁহার ভাগবতের টীকায় চণ্ডীদাসের দানখণ্ড নৌকাখণ্ডাদির উল্লেখ করিয়াছেন সত্য। বসন্ত বাবু ঠিকই বলিয়াছেন, 'তাহার খোঁজ আমরা পাইয়াছি কি?' কিন্তু সেগুলির খোঁজ না পাইলেই আমরা কৃষ্ণকীর্তনের দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড বুঝিব, ইহাই বা কিরূপ যুক্তি? প্রথমতঃ গোস্বামীপাদ দানখণ্ড নৌকাখণ্ড নামক দুইখানি কাব্যের কথা বলিয়াছেন, কৃষ্ণকীর্তনের অন্তর্গত দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড তাহাতে বুঝায় না। যদি এই কাব্যখানি তাঁহার অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে তিনি কৃষ্ণকীর্তনেরই নাম করিতেন। কালিদাসের কুমারসম্ভবের চতুর্থ সর্গ রতি-বিলাপ—অতি সুন্দর। কিন্তু কেহ কি বলিবে যে, কালিদাসের রতিবিলাপ একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য? তার পর কৃষ্ণকীর্তনের দানখণ্ড নৌকাখণ্ড কি সত্যই এত উৎকৃষ্ট যে, বৈষ্ণবতোষণীর ন্যায় প্রসিদ্ধ টীকায় শ্রেষ্ঠ কাব্যের নিদর্শনস্বরূপ সুকবি সনাতন গোস্বামী কর্তৃক উল্লিখিত হইতে পারে? আসল কথা সম্ভবত এই—চণ্ডীদাসের যে দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড সনাতন গোস্বামীর অভিপ্রেত, তাহার সন্ধান আমরা পাই নাই।

পরিশেষে 'এক কাল হৈল মোর জমুনার জল।' এই পদটি বসন্ত বাবুর মতে, 'বড়ু চণ্ডীদাসেরই বটে, দ্বিজ-চণ্ডীদাস তাহা অনুকরণ করিয়াছেন বলা যায়।' কিন্তু প্রমাণ কি? একখানি অতি অর্বাচীন পুথিতে উহা বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতায় পাওয়া গিয়াছে। ঐ পুথি যখন পরিষৎ-পত্রিকায় মুদ্রিত হয় (১৩৪০ সাল), তখন এই পদটি পরিত্যক্ত হইয়াছিল। এখন আমার সন্দেহ হইতেছে যে, উদ্দেশ্য করিয়াই, তর্কের হাত এড়াইবার জন্যই উহা বাদ দেওয়া হইয়াছিল। বস্তুতঃ এই পদটি কৃষ্ণকীর্তনের কবিতার সহিত খাপ খায় না। তার পর পদকল্পতরু এবং নীলরতন বাবুর আদর্শ পুথিতে ইহা দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতায় আছে। প্রাচীন পুথির পাঠ পরিত্যাগ করিয়া অর্বাচীন পুথির পাঠ গ্রহণ করা বিশেষ প্রমাণ ব্যতীত কখনই সমীচীন নহে। 'কৃষ্ণকীর্তনে পদটা না থাকিবার কারণ, পুঁথি খণ্ডিত।' এ যুক্তি ঠিক নহে।' কিন্তু দেখা যাউক, কোথায় কোথায় পুথি খণ্ডিত এবং তত্তৎস্থলে পদটি থাকার সম্ভাবনা কতদূর? দানখণ্ডে ১৬—১৭।১ এবং ৪১ পৃষ্ঠা মিলিতেছে না। কিন্তু পৌর্বাপর্য বিচার

করিলে দেখা যাইবে যে, এই পদটি সে স্থানে থাকা সম্ভব নহে। যমুনাখণ্ডে কয়েকটি পাতা নাই (১৪৫-১৫১); কিন্তু তাহাতেও উপরিউক্ত পদটির কোনও প্রসঙ্গ থাকিতে পারে না। রাধাবিরহ খণ্ডিত নহে। রাধা-বিরহের পরে পুথি খণ্ডিত বটে। কিন্তু ঐ পদের অস্তিত্ব সেই লুপ্ত অংশেও সম্ভব নহে। কারণ, উহাতে আছে,—

আর কাল হইল মোরে বড়ায়ের সঙ্গ।
আর কাল হইল দানি করে কত রঙ্গ।—মণীন্দ্রবাবুর পুথি।

ইহা অবশ্য রাধাবিরহখণ্ডের উক্তি হইতেই পারে না। নৌকাখণ্ডে এবং ভারখণ্ডে এই পদ থাকিলেও থাকিতে পারিত, ইহাও বলিবার উপায় নাই। কারণ, নৌকাখণ্ড সম্পূর্ণই আছে। ভারখণ্ডের যে দুই একটি পাতা পাওয়া যায় না, তাহার ভাব অন্যরূপ।